# ইসলামের দাওয়াত

শায়খ আহমদ মাহমুদ

# সূচীপত্র


সূচনা ........ ৫

১ম অধ্যায়: ইসলামী দাওয়াত বহন করার গুরুত্ব ........ ১০

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ দাওয়াতের একটি অংশ ........ ১১
তাবলীগ দাওয়াতের আরেকটি অংশ ........ ১২
একে অপরকে সত্যের ব্যাপারে সতর্ক করা (তাওয়াসী) দাওয়াতের অংশ ........ ১৩

২য় অধ্যায়: দাওয়াত বহনে ঈমানের গুরুত্ব এবং ফরয কাজসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ........ ১৭

প্রথম দিক: আমর বিল মা'রূফ এবং নাহি আ'নিল মুনকার ........ ১৭
ফরযে আইন (ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতা) ও ফরযে কিফায়া (সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা) ........ ১৯
ফরযে কিফায়া (সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা) ........ ২০
বাধ্যবাধকতার মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা ........ ২১
সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরযে কি্ফায়া ........ ২১
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় ........ ২৩
মা'রূফ ও মুনকারের জ্ঞান ........ ২৪
আমলের সাথে জড়িত জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরযে আইন ........ ২৫
দ্বিতীয় দিক: সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজের নিষেধ ........ ২৫
যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিবেদিত ........ ২৫
জ্ঞানের অপরিহার্যতা ........ ২৮
শাসকদের জবাবদিহী করা ........ ৩০

৩য় অধ্যায়: দাওয়াত বহনকারী একটি দল বর্তমান থাকার অপরিহার্যতা ........ ৩৩
দলটির বৈশিষ্ট্য ........ ৩৪
ইসলামের ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক দলের উপস্থিতির অপরিহার্যতা ........ ৩৬
কীভাবে একটি রাজনৈতিক দল বা সংগঠন তৈরী করতে হয় ........ ৩৬
ইসলামে রয়েছে ফিকরাহ (চিন্তা) এবং তরীকা (পদ্ধতি) ........ ৩৭
যারা ত্বারিকা (পদ্ধতি) কে উপেক্ষা করে ........ ৩৮
বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনই কর্মপদ্ধতি বিষয়ক হুকুমগুলোকে ঢেকে দিয়েছে ........ ৪০
আজকের পদ্ধতিও হবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পদ্ধতির অনুরূপ ........ ৪১

৪র্থ অধ্যায়: যে ভাবে দারুল ইসলাম (ইসলামী রাষ্ট্র) প্রতিষ্ঠা করতে হয় ........ ৪৩
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে ব্যক্তি তৈরির ধাপ ........ ৪৪
রাসূলুল্লাহ (সা) এর সময়ে গণসংযোগ পর্যায় ........ ৪৪
রাসূলুল্লাহ (সা) কতৃক গোত্রসমূহকে ইসলামের দিকে আহ্বান ........ ৪৬
দাওয়াতের আহ্বানে মদীনাবাসীর প্রতিক্রিয়া ........ ৪৭
আল 'আকাবার শপথ ........ ৪৮
মদীনায় হিজরত ........ ৪৯
নুসরাহ বা বস্তুগত সমর্থন অনুসন্ধান ........ ৫১
তরীকাহ (পদ্ধতি) এবং উসলূব (ধরন) ........ ৫৪
আজকাল কিছু মুসলিম তরীকার সাথে ধরনকে (উসলুব) গুলিয়ে ফেলে ........ ৫৯
শরীয় হুকুমসমূহ কী নিরীক্ষামূলক? ........ ৬১

৫ম অধ্যায়: যেসব পদ্ধতি শরী'য়া পদ্ধতির সাথে সাংঘর্ষিক ........ ৬৩
খিলাফতের বাধ্যবাধকতা কি কেবল শাসক, তার পারিষদবর্গকে আহবানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত? .... ৬৩
ইবাদত (আনুষ্ঠানিক ইবাদত) করাটাই কেবল প্রয়োজনীয় কাজ; ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা নয় কি? ........ ৬৬
রাসূলুল্লাহ (সা) এর সীরাতের যথার্থতা কি যাচাই করা হয়নি? ........ ৬৭
শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কি পরিবর্তনের সঠিক পদ্ধতি যা অনুসরণে আমরা বাধ্য? ........ ৭০

৬ষ্ঠ অধ্যায়: আহকাম (হুকুম) বুঝবার জন্য ইসলামের পদ্ধতি ........ ৭২
মানাত (বাস্তবতা) উপলব্ধি ........ ৭২
শরী'য়াহ উপলব্ধি করা ........ ৭৪
শরী'য়াহর উৎস ........ ৭৪
শরী'য়াহ বুঝার নিয়মসমূহ ........ ৭৫
আল মাসলাহাহ (জনস্বার্থ) ........ ৭৫
ক্বিয়াস আক্বলী (যুক্তির ভিত্তিতে ক্বিয়াস নির্ধারণ) ........ ৭৭

৭ম অধ্যায়: দলের বিকাশ প্রক্রিয়া (culture) ........ ৭৯
আক্বীদাহ'র গুরুত্ব ........ ৮০

৮ম অধ্যায়: দলের জন্য প্রয়োজনীয় চিন্তাভাবনাসমূহ গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা ........ ৮৪

৯ম অধ্যায়: একাধিক ইসলামী দল বা আন্দোলন থাকা কি বৈধ? ........ ৮৮
একাধিক দলের বৈধতা ........ ৯৪
আন্দোলন কি আঞ্চলিক হবে নাকি বৈশ্বিক? ........ ৯৭
কর্মকান্ড কি আংশিক হবে নাকি ব্যাপক এবং ভারসাম্যপূর্ণ হবে? ........ ৯৮

১০ম অধ্যায়: ক্রমাণ্বয়ে ইসলামের বাস্তবায়ন ........ ১০৩
১ম যুক্তি ও এর খন্ডন ........ ১০৭
২য় যুক্তি ও এর খন্ডন ........ ১০৯
৩য় যুক্তি ও এর খণ্ডন ........ ১১১
চতুর্থ যুক্তি ও এর খণ্ডন ........ ১১১

১১তম অধ্যায়: চিন্তা (Thought) ও পদ্ধতি (Method) হিসেবে আদর্শের প্রতি আনুগত্য ........ ১১৭
বিচ্যুতি ও আপোষের ব্যাপারে সতর্ক থাকা ........ ১১৯
গণতন্ত্র ........ ১২১
তাগুত কী? ........ ১২৫
পশ্চিমা সমাজে স্বাধীনতা ........ ১২৫
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ পশ্চিমা সভ্যতার ফলাফল নয় ........ ১২৮
গণতন্ত্র, শূ'রা নয় ........ ১২৮

১২তম অধ্যায়: কুফর শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ ........ ১৩০

১৩তম অধ্যায়: সাইয়্যিদুনা ইউসুফ (আ:) এবং কুফর ব্যবস্থার অধীনে শাসন ........ ১৩৫

১৪তম অধ্যায়: মাসলাহা'র (সুবিধা) দোহাই দিয়ে হারামকে অনুমোদন দেয়া ........ ১৪৬

১৫তম অধ্যায়: হারামের মাধ্যমে হালালে পৌঁছানো যায় না (উদ্দেশ্য পদ্ধতির ন্যায্যতা প্রমান করে না) ........ ১৫৯
সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ে ভিন্ন হুকুম ........ ১৫৯
ভিন্ন বিষয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ হুকুম ........ ১৬০

১৬তম অধ্যায়: খন্ডিত সংস্কার ও আমূল সংস্কার ........ ১৬৭

১৭তম অধ্যায়: ইসলাম গ্রহণের পরও কি রাসূলুল্লাহ্ (সা:) নাজ্জাশীকে কুফর শাসনের অনুমোদন দিয়েছিলেন? ........ ১৭০

১৮তম অধ্যায়: উদারপন্থা ও চরমপন্থা ........ ১৭৪

# সূচনা

সকল প্রশংসা জগতসমূহের অধিপতি **আল্লাহ** সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি এবং সালাম পেশ করছি রাহমাতাল্লীল আলামীন ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহম্মদ (সা), তাঁর পবিবার ও তাঁর সাহাবীদের প্রতি এবং যারা বিচার দিবসের আগ পর্যন্ত তাঁকে ইহসানের সাথে অনুসরণ করবেন তাদের প্রতি। অত:পর,

- 'ইসলামের দাওয়াত' শীর্ষক এই বইয়ে আমরা ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এই বিষয়টি ব্যাপক, অনেক শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত ও চিন্তাগ্রাহ্য। এটা এমন এক পথ যা কুসুমাস্তীর্ণ নয় বরং বন্ধুর। আমাদের পূর্ববর্তী আলেম ও মুজতাহিদগন (র) ইবাদত, মুয়ামালাত, বিবাহ, উত্তরাধিকার ইত্যাদির মত এত ব্যাপকভাবে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেননি। 'ইসলামের প্রতি আহবান' এর যে দিকটি নিয়ে আলোচনা বেশী আবর্তিত হয়েছে তা হল, 'আমর বিল মারুফ ও নাহি আানিল  মুনকার' অর্থাৎ 'সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ' ও ব্যক্তিপর্যায়ের দাওয়াত। কারণ তাদের বাস্তবতা এই রকম ছিল না যে, খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা সমূলে উৎপাটিত হয়েছে, ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে, শরীয়াহ পরিত্যাক্ত হয়েছে এবং দারুল ইসলাম দারুল কুফর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে তারা গবেষণা করতে পারেন না কেননা মুজতাহিদগন কেবলমাত্র বাস্তবে উদ্ভুত সমস্যাই বিবেচনা করেন, কোন আপাত বা কাল্পনিক বিষয় নিয়ে নয়।

  অতএব এই বইয়ে আমরা উক্ত বিষয়ে আলোকপাত করব। আমরা বলতে চাচ্ছি না এটা পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক। তবে এটা অবশ্যই এ বিষয়টিকে প্রবৃত্তির অনুসরণ, যথেচ্ছাচার, অতিরঞ্জিত চিন্তাচেতনা, কুফরের অন্ধ অনুকরণ ইত্যাদি থেকে ইসলামি শরীয়ার মূল ভিত্তির দিকে ফিরিয়ে নেয়ার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

- দাওয়াতের ফরযিয়াত ও মানদুব (সুন্নাহ) বিষয়সমূহ আলোচনার চেয়ে এই বইয়ে দাওয়াতী কাজ করবার পদ্ধতি নিয়ে বরং বেশী গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। কারণ বর্তমানে অন্য যে কোন বিষয়ের চেয়ে দাওয়াতী কাজ করবার পদ্ধতিগত জ্ঞানই সবচেয়ে  বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

  বইটিতে মূলত 'খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দাওয়াতের পদ্ধতি' নিয়েই আলোচনা করা হবে। কারণ আজকের দিনে দাওয়াত বহন করবার ক্ষেত্রে এটাই দাওয়াতের মেরুদন্ড হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা এখন আর অস্তিত্বশীল নয়- এই বাস্তবতায় আজকের দিনে যখন কোন ইসলামী আহ্বানের শীর্ষে খিলাফত রাষ্ট্র পুণ:প্রতিষ্ঠার আহ্বান না থাকে অথবা এটিকে মনোযোগের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত না করা হয় তখন বুঝতে হবে সে আহ্বান আংশিক অথবা বিচ্যুত।

- বইটি 'ইসলামের দাওয়াত' নিয়েই মূলত আলোকপাত করবে এবং 'দাওয়াতের কাজ করবার পদ্ধতি'  বিশেষ করে 'ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দাওয়াতের কাজ করবার পদ্ধতি'র উপর আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত করবে -যা ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ থেকে উৎসারিত। সেসব মৌলিক বিষয়গুলোও সংক্ষেপে উল্লেখ করা হবে, যদিও এসব মৌলিক বিষয় এই বইয়ের প্রধান প্রতিপাদ্য নয়। যেমন:

  ১. ইসলামী আক্বীদার স্পষ্টতা ও বিশুদ্ধতা-যা ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

  ২. ইসলামি আক্বীদার মধ্যে যন্ (অনুমাননির্ভরতা) বা ন্যূনতম যন্ন এর সুযোগ নেই বরং তা হতে হবে ক্বাত'ঈ (সুনির্দিষ্ট ও সিদ্ধান্তগ্রহণকারী) হতে হবে। এক্ষেত্রে ত্বাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণের সুযোগ নেই। যদি তা না করা হয় তাহলে মুসলিমগন কুসংস্কারকে গ্রহণ করবে  ও প্রবঞ্চণার মধ্যে পতিত হবে।

  ৩. আক্বীদার সাথে সর্ম্পকযুক্ত চিন্তার (ভিত্তিসমূহের শাখা) ক্ষেত্রে যৎসামান্য পরিমাণে যন্ বা অনুমাননির্ভরতা এবং ত্বাকলীদ বা অনুকরণ অনুমোদনযোগ্য। শরীয়াহ'এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

  ৪. শরীয়াহ'র আইনকানুন সমূহ সরাসরি শরীয়াহর দলিল এর উপর ভিত্তি করে গ্রহন করতে হবে অর্থাৎ কোরআন, সুন্নাহ, সাহাবাগনের ইজমা (ঐকমত্য), শরীয়াহর বর্ণণা থেকে আসা শরই **ইল্লাত** (ঐশী কারণ) এর উপর ভিত্তি করে qiyas। শরীয়াহ'র দলিল থেকে কেবলমাত্র মুজতাহিদ হুকুম বের করে নিয়ে আসেন।

আর মুক্বাল্লিদ (অনুসরণকারী) কে সুনিশ্চিত করতে হবে যে, তিনি যে মুজতাহিদের অনুসরণ করেন তার বক্তব্য তিনি বুঝতে পারছেন।

৫. যদি বাধ্যবাধকতার সংখ্যা অনেক বেশী হয়ে যায় এবং সবগুলো পালন করা মুসলমানের জন্য কঠিন হয়ে যায় বা তিনি অপারগ হন, তাহলে তাকে অবশ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বাধ্যবাধকতাটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। (এটাও শরীয়া দলিলের ভিত্তিতে হতে হবে, ব্যক্তিগত খেয়ালখুশী বা পছন্দের ভিত্তিতে নয়)

- যখন মুসলিমগন স্বাভাবিক অবস্থায় আছে, অর্থাৎ যখন ইসলামী খিলাফত রয়েছে তখন 'আমর বিন মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার' করা এবং রাষ্ট্রের ভেতরকার অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বানের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণভাবে দাওয়াতী কাজ করা হবে। আর রাষ্ট্রের বাইরের অমুসলিমদের প্রামাণ্য দলিল সহকারে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হবে। এবং এটা করা হবে খলিফার বিবেচনা অনুসারে জিহাদের মাধ্যমে।

  আর যখন মুসলিমগন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে থাকবে, অর্থাৎ খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা নেই তখন খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা পুণ:প্রতিষ্ঠাকে সামনে রেখে ইসলামী দাওয়াতের কাজ করতে হবে। মুসলমানদের সংস্কার সাধনের জন্য তখন মারুফের আদেশ-মুনকারের নিষেধে, এবং অন্যদিকে ইসলাম গ্রহণের জন্য অমুসলিমদের আহ্বানের কাজটি তখন সঙ্কীর্ণ পরিসরে চলবে। কারণ যখন ইসলামী শরীয়াহ বাস্তবায়নের জন্য মুসলিম ভূমিসমূহতে কোন রাষ্ট্র বা কর্তৃত্ব না থাকে তখন সেটি দারুল কুফর হয়ে যায়। তখন মুনকার সংঘটনের বিষয়টি একটি রীতিতে পরিণত হয় এবং সেকারণে সংস্কার সাধনের আংশিক কাজটি অকার্যকর ও অপর্যাপ্ত হয়ে যায়। আমূল পরিবর্তনের কর্মকান্ড তখন শরীয়াগত বাধ্যবাধকতা হয়ে যায়-যা কুফর ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে ইসলামী ব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন করবে। [খিলাফত অনুপস্থিত থাকা অবস্থায়] মুসলিম ভূমির বাইরে অমুসলিমদের দাওয়া করাকে বুঝায় তাদের ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দেয়া। অনৈসলামী চিন্তাকে চ্যালেঞ্জ করা এবং মুসলিম ভূমির বাইরে অবস্থানরত মুসলমানদের প্রচেষ্টাসমূহকে একীভূতকরণের দ্বারা মুসলিম ভূমিতে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করার মাধ্যমে এর বহি:প্রকাশ ঘটে।

- ইসলামের দাওয়াতের সাথে সম্পৃক্ত যে কোন বইয়ে দাওয়াতের মৌলিক নিয়মাবলী নিয়ে আলোচনা থাকা উচিত। এগুলো নিম্নরূপ:

১. খিলাফতের জন্য কাজ করা এখন ফরযে আইন (প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয)। এর জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ ও কর্মতৎপরতা সৃষ্টি করা একান্ত কর্তব্য।

২. একাজটি দলগতভাবে হতে হবে এবং ব্যক্তিগতভাবে করবার কোন সুযোগ নেই।

৩. এই দলের একজন আমীর থাকবেন যিনি শরীয়া প্রদত্ত ক্ষমতায় বলীয়ান - যার আওতার মধ্যে তাকে মান্য করা হবে।

৪. এই দলে পুরুষ এবং নারী উভয়ই থাকবে, কেননা দাওয়াত বহন করার ব্যাপারে উভয়ই দায়িত্বশীল।

৫. এই দলের সদস্যদের বন্ধনের ভিত্তি হবে ইসলামী আক্বীদা ও চিন্তা।

৬. দলটিকে তার কর্মকান্ডের জন্য অবশ্যই ইসলামী চিন্তা, নিয়ম কানুন ও মতামতকে গ্রহণ করবে এবং তাদের আনুগত্য থাকবে আদর্শের প্রতি, কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নয়।

৭. দলটি অবশ্যই রাজনৈতিক হবে, কারণ এর কাজ হল রাজনৈতিক-যা খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতায় যাবে।

৮. দলটির কাজ হবে বুদ্ধিবৃত্তিক; violent কোন কর্মকান্ডের সাথে এর সম্পৃক্ততা থাকবে না। কারণ ইসলামের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনমত তৈরি করে জনগনের সহায়তায় ক্ষমতায় আসাই এ দলের কাজ।

৯. বর্তমান কুফর শাসনব্যবস্থার সাথে কোনরকম ক্ষমতার অংশীদার হওয়া এ দলের জন্য নিষিদ্ধ।

১০. বর্তমান কুফর শাসনব্যবস্থার উপর যে কোন ধরনের নির্ভরশীলতা এ দলের জন্য নিষিদ্ধ। কুফর ব্যবস্থা থেকে কোন ধরনের অর্থনৈতিক সাহায্য বা নির্ভরশীলতা অবশ্যই বর্জনীয়।

- একইভাবে, ইসলামের দাওয়াত বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে এমন একটি বইতে দাওয়াত বহন করার পদ্ধতি বিষয়ে আহকামে শরীয়াহ আলোচিত হওয়া উচিত, যেমন:

১. বাস্তব মূলনীতির (practical principle) অনুসরণ - দাওয়াতের কাজ অন্তসারশূন্য হবে না, বরং সুচিন্তিত হবে। আর এই চিন্তাও কেবলমাত্র অনুমাননির্ভর হবে না, বরং তা আসবে বাস্তব উপলদ্ধি থেকে। এই চিন্তার সাথে কাজ যুক্ত করে একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হবে। এই লক্ষ্য, কর্মকান্ড ও চিন্তা সবই ইসলাম থেকে উৎসারিত হতে হবে। আর চূড়ান্ত লক্ষ্য হল ইসলামিক আক্বীদার ভিত্তিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটা দাওয়াত বহনকারীকে ঈমানের পরিবেশে রাখে, তাকে উদ্দীপনা দেয় এবং নিয়ন্ত্রনে রাখে।

২. পদ্ধতি ও উপকরণের পার্থক্য সুস্পষ্ট হতে হবে। তারিকা বা পদ্ধতি হল শরীয়াহর আহকাম-যা ক্বিয়ামতের দিন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট। উসলুব বা উপকরণ হল মুবাহ-যা পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে দাওয়াত বহনকারী গ্রহণ করতে পারে।

৩. আহকামে শরীয়ার মতই রাজনৈতিক বাস্তবতার জ্ঞান অপরিহার্য। এর কারণ হল হুকুমে শরীয়াহ প্রয়োগ করতে হলে হুকুমে শরীয়াহ ও এর বাস্তবতা বা মানাত (যে বাস্তবতার জন্য হুকুমটি এসেছে) সর্ম্পকে জ্ঞান থাকা দরকার। কেউ যদি শরীয়াহর হুকুম জানে কিন্তু মানাত না জানে, তাহলে সে তা প্রয়োগে ব্যর্থ হবে। And if we try to apply it, we would make a mistake because we would apply it to other than its reality. যারা বর্তমান ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে ক্ষমতা গ্রহণ করতে চায় তাদেরকে অবশ্যই কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ নয়, আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক রাজনৈতিক বাস্তবতার সম্পূর্ণ জ্ঞান রাখতে হবে।

৪. কেউ কেউ ভাবতে পারেন, খিলাফত প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতা গ্রহণের জন্য কেবলমাত্র ক্ষমতাধর ও কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিদের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালালেই হবে। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। বরং প্রথমে সাধারণ জনগনের কাছে দাওয়াত নিয়ে যেতে হবে। দাওয়াত যখন চিন্তা বিকাশের স্তর থেকে গনসংযোগের পর্যায়ে যাবে এবং সফলভাবে জনগনের সাথে সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হবে ও সাধারণ সচেতনতা থেকে ইসলামের পক্ষে জনমত তৈরি হবে তখন দলটি ক্ষমতাধর ও কর্তৃত্বশীল লোকদের কাছে নুসরাহ চাইবে।

৫. শরীয়াহ একাধিক কুতলাহ বা দল অনুমোদন করে। তবে শর্ত হল তারা অবশ্যই ইসলামী আক্বীদা ও শরীয়ার ভিত্তিতে গঠিত হবে।

৬. যদি একের অধিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি থেকে থাকে তবে, তাদের প্রত্যেককেই শরীয়াহ হুকুমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, যেন তাদের মধ্যকার মতপার্থক্যগুলো *আদাব আল ইখতিলাফ* বা মতপার্থক্যের নিয়মানুযায়ীই হয়ে থাকে। কোন বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হলেই একজন মুসলিম অপর মুসলিমকে কুফর বা সীমালঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত করবে-এ বিষয়টি অনুমোদিত নয়। কোন মতামতের পক্ষে দূর্বল বা শক্তিশালী দলিল বা দলিলের সাথে সাদৃশ্যতা (*শুবহাত আদ দলিল*) থাকলে এটি একটি আইনসঙ্গত মতামত। এ ধরনের মতামত অবলম্বনকারীদের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা যাবে না। দূর্বল দলিল বা দলিলের সাদৃশ্যতার ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে, আপনার মতামত ভুল বা দূর্বল এবং তার সাথে উত্তম নসীহত সহকারে প্রামাণ্য দলিলের ভিত্তিতে আলোচনা করতে পারি। যদি কোন মতামতের শরীয়াহভিত্তিক দলিল না থাকে অথবা সাদৃশ্য না থাকে তাহলে সে মতামতটি অনৈসলামিক (কুফরী মতামত) হবে। সেক্ষেত্রে এই মতামতের বিরুদ্ধাচরণ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকবে না এবং এ মতাবলম্বীদের এ ব্যাপারে সাবধান করে দেয়া উচিত (যদিও সবসময় কুফরী মতামত অবলম্বনকারীরা কাফের নয়)।

৭. যেসব শাসক ইসলামী শরীয়াকে পরিত্যাগ করে এবং চাপ প্রয়োগ না করা সত্ত্বেও অন্য আইন দিয়ে শাসন করে, তাদের অধিকাংশই কাফির-যদিও তারা সালাত আদায় করে, রোজা পালন করে, হজ্জব্রত পালন করে এবং মুসলিম বলে দাবি করে। এর কারণ হচ্ছে তারা ইসলামি আইন না নিয়ে কুফরী আইনকে গ্রহণ করেছে। যদি তারা বিশ্বাস করে যে ইসলামী শরীয়াহ হল সর্বশ্রেষ্ঠ আইন এবং তারা সাময়িকভাবে খেয়ালের

বশবর্তী হয়ে তা পরিত্যাগ করে তবে সে জালিম হবে, কিন্তু কাফের হবে না। সে কারণে একজন দাওয়াত বহনকারী কখনওই এ ধরনের শাসককে মেনে নেয়ার ঘোষণা দিতে পারেন না, সমর্থন ব্যক্ত করতে পারবেন না, এমনকি তার ব্যাপারে নীরবতা পালনও করতে পারবে না। কারণ এ ব্যাপারে যে প্রসিদ্ধ হাদীসটি রয়েছে, তা হলঃ

*"তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি অন্যায় কাজ হতে দেখলে সে যেন তার হাত দ্বারা তা প্রতিহত করে। তার এই সামর্থ্য না থাকলে সে যেন তার মুখ দ্বারা তা প্রতিহত করে। তার এই সামর্থ্যও না থাকলে সে যেন তার* অন্তর *দ্বারা তা প্রতিহত করে (ঘৃণার মাধ্যমে), আর এটা হলো দূর্বলতম ঈমান।"* (মুসলিম, তিরমিযী)

- ইসলামের দাওয়াত বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে এমন কোন বই দাওয়াতী কাজে রাসূলুল্লাহ (সা) এর অনুসরণ করার ব্যাখ্যায় নিম্ন লিখিত কিছু ইস্যু তুলে ধরবেঃ

  ১. রাসূলুল্লাহ (সা) কাফেরদেরকে ইসলামে প্রবেশ করবার জন্য আহ্বান জানাতেন। আর আমরা এখন অধিকাংশক্ষেত্রে মুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাই।

  ২. রাসূলুল্লাহ (সা) এমন এক সময়ে দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন যখন পুরো শরীয়াহ অবতীর্ণ হয়নি। এখন আমাদের সামনে সম্পূর্ণ শরীয়াহ রয়েছে। তার মানে রাসূল (সা) অবতীর্ণ না হওয়ার কারণে অনেক হুকুম মক্কায় পালন করতে পারেননি। কিন্তু আমাদেরকে এগুলো মেনে চলতে হবে। আবার কিছু আইন তিনি মেনে চলেছেন যেগুলো পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে। সে কারণে সেই রহিত আইনসমূহ আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়। যেমনঃ মক্কায় জিহাদ আইনসিদ্ধ ছিল না, কিন্তু এটা এখন বৈধ (রক্ষণাত্মক জিহাদ আজকে আমাদের উপর ফরয এবং এটা রাষ্ট্র না থাকলেও করা যাবে। কেননা এই ধরনের জিহাদের সাথে রাষ্ট্র বা খিলাফত থাকার বিষয়টি বিজড়িত নয়।) মক্কায় কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা) এর দাওয়াতের কাজ করা ফরয ছিল, কিন্তু সাহাবাদের জন্য এটা মানদুব ছিল, যেহেতু তখন তারা তাঁর প্রতি কেবল নারীদের বাইয়াতের অনুরূপ বাইয়াতে আবদ্ধ ছিলেন। এ অবস্থা চলতে থাকে যতদিন না দ্বিতীয় আকাবার শপথে আওস ও খাযরায গোত্র বায়াত প্রদান করে। এর পর থেকে শুধুমাত্র রাসূল (সা)ই নয়, বরং সাহাবীদের উপরও দাওয়াতের কাজ করা ফরয হয়ে যায়। আর যা রহিত হয়েছে তা হল মক্কা বিজয়ের পর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করবার ফরযিয়াত।

  ৩. কাজের প্রকারভেদের দিক থেকে মক্কার হুকুমসমূহ অধিকাংশক্ষেত্রে ব্যক্তির সাথে সর্ম্পকযুক্ত ছিল এবং মদীনার হুকুমসমূহ শাসকের (খলিফা) দায়িত্বের সাথে সর্ম্পকযুক্ত ছিল। কিছু কিছু নির্দেশ আছে যা কেবলমাত্র শাসকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ব্যক্তির বা দলের ক্ষেত্রে নয়; যেমনঃ হুদুদ বাস্তবায়ন, জিহাদ ঘোষণা করা এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদন করা। আবার কিছু কাজ আছে যা ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ব্যক্তি দারুল ইসলাম বা দারুল কুফর যেখানেই থাকুক, যেমনঃ ইবাদত (উপাসনা), আখলাক (নৈতিকতা), মু'তুয়ামাত (খাবার), মালবুসাত (পোশাক পরিচ্ছদ) এবং মু'আমালাত (লেনদেন)। আবার কিছু হুকুম রয়েছে যা ব্যক্তি ও শাসক উভযই সম্পাদন করে থাকে, যেমনঃ মসজিদ নির্মাণ করা, সৎ কাজের আদেশ প্রদান করা, অসৎ কাজে নিষেধ করা ও দলিলের ভিত্তিতে দাওয়াতী কাজ করা।

- খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবার মত কোন লক্ষ্যকে সামনে রেখে যখন কোন দাওয়াত বহনকারী অগ্রসর হয় তখন একটি ইস্যুর সম্মুখীন হয়, তা হলঃ এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট সময়সীমা আছে কি (দশ, বিশ বা ত্রিশ বছর)? নাকি নেই? এটা থেকে আবার দু'টি ইস্যুর জন্ম হয়। প্রথমতঃ এই কাজের প্রকৃতি অনুসারে (শরীয়াহ ও আক্বীদার ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা) এক, দুই বা তিন দশকের মধ্যে কি লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব? কারণ কুতলাহ বা দল যথেচ্ছভাবে কাজ করতে পারে না, বরং কাজের প্রকৃতি অনুসারে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে একটি পূর্বনির্ধারিত সময়কালের মধ্যে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অন্যথায়, বুঝতে হবে কুতলাহ আন্তরিক নয় এবং কোন নির্দেশনা ছাড়াই চলছে। দ্বিতীয়তঃ যদি দলটি ব্যর্থ হয় এবং সঙ্গত সময়ের মধ্যে লক্ষ্য অর্জন করতে না পারে, তাহলে এটা থেকে কি তার পরিকল্পনা ভুল এ সিদ্ধান্তে আসবে এবং তার গৃহীত নীতি কি সংশোধনের উদ্দেশ্যে পর্যালোচনা করবে? অথবা তারা কি এ সিদ্ধান্তে পৌছবে যে, দলটি আল্লাহর প্রতি আন্তরিক নয় এবং একারণে আল্লাহ তাদের মাধ্যমে ইসলামকে বিজয়ী করতে চাচ্ছেন না? এই বই এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করবে।

- ‘ইসলামের দাওয়াত’ বইটি কিছু প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করবে, কিছু সন্দেহ দূর করবে এবং কিছু বিষয়ে সঠিক ধারণা তুলে ধরবে। যেমনঃ

১. অনেকে নিম্নের আয়াতটিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে থাকে,

**‘হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা যখন সৎপথে রয়েছ, তখন কেউ পথভ্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন, যা কিছু তোমরা করতে**।’(সূরা মায়েদা-**১০৫**)

সুতরাং এই আয়াত থেকে অনেকে এ সিদ্ধান্তে পৌছে যে, মুসলিমগন কেবলমাত্র তার এবং তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল ও তাকে অন্য মুসলিমদের কাছে দাওয়াত বহন না করলেও চলবে।

২. নিম্নের হাদীসটিকেও অনেকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেঃ

*‘এটা ঠিক নয় যে, একজন মু’মিন নিজেকে অপমানিত হওয়ার মত পরিস্থিতিতে ফেলে দেয় এবং এমন দূর্ভোগের মধ্যে নিজেকে ঠেলে দেয়-যা বহনে সে অক্ষম।’*

এ হাদীস থেকে অনেকে এ সিদ্ধান্তে পৌছে যে, এমন কোন কাজ করা যাবে না যা তাকে কারাভোগ, কর্মস্থল থেকে পদচ্যুতি এবং অত্যাচারী শাসকের রোষানলে পড়তে হয়। সেক্ষেত্রে যদি তাকে দাওয়াতী কাজ থেকে বিরত থেকে অত্যাচারী শাসককে মেনে নিতে হয় তারপরেও।

৩. অনেকে হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা) বর্ণিত রাসূল (সা) হাদীসকে ভুল বুঝে থাকে, ‘আমি বললামঃ যদি মুসলিমদের কোন জামায়াত বা ইমাম না থাকে তাহলে কী হবে? তখন তিনি (সা) বললেন, **‘অতপর তুমি এসমস্ত দল গুলিকে পরিত্যাগ করবে, যদিও বা তোমাকে কোন গাছের গুড়ি কামড়ে থাকতে হয় যতক্ষন না তোমার মৃত্যু এসে যায়।”** লোকেরা এটা থেকে ধারণা করে যে, যখন মুসলিমদের খলিফা থাকবে না তখন মুসলমানদের জন্য খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা ফরয নয়। বরং এ অবস্থায় মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নিজেকে অন্যদের থেকে আলাদা করে ফেলবে।

৪. আবার কেউ কেউ নিচের বিখ্যাত হাদীসকে ভুল বুঝে থাকে

‘*তোমাদের কাছে এমন একটি দিন বা বছর আসবে না যা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত আরও বেশী মন্দ হতে থাকবে না* ।’ সুতরাং, এটা সেইসব লোকদের নিরাশ, হতাশ ও কর্মবিমুখ করে।

৫. আবার অনেকে বলেন যে, পরিবর্তনের দায়িত্ব ইমাম মাহদীর এবং এর জন্য আমরা দায়িত্বশীল নই। ফলে তারা এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে নিষ্ক্রিয় থাকে।

- এই বইটি এর ভূমিকাতে যেসব ইস্যু তুলে ধরেছে এইরকমের সব বিষয় নিয়ে পরবর্তীতে আলোকপাত করেছে। যদি এতে কোন ঘাটতি থাকে তবে মনে রাখতে হবে কেবলমাত্র **আল্লাহ** সুবহানাহু ওয়া তা’আলাই নিখুঁত হতে পারেন। সম্ভবত দ্বিতীয় মুদ্রণে আমরা **আল্লাহর** কৃপায় আরও সামগ্রিক ও নিঁখুত করবার প্রয়াস নেব । আমরা **আল্লাহ** সুবহানাহু ওয়া তা’আলার কাছে এই প্রার্থনা করছি যে, তিনি এ বই থেকে মুসলিমদের উপকৃত করবেন এবং এর লেখককে অনেক উত্তম প্রতিদান দিবেন।

  সালাম ও দরুদ পেশ করছি নবী মুহম্মদ (সা), তাঁর পরিবারবর্গ, শেষ দিবসের পূর্ব পর্যন্ত আগত তাঁর অনুসারীদের প্রতি এবং সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক **আল্লাহ** সুবহানাহু ওয়া তা’আলার।

# ১

# ইসলামী দাওয়াত বহন করার গুরুত্ব

দাওয়াত হচ্ছে আসক্তি ও উৎসাহ তৈরি করবার বিষয়। একজনকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবার অর্থ হল আপনি যে বিষয়ে একজনকে আহ্বান করছেন সে বিষয়ে ঝোঁক ও প্রবল ইচ্ছা তৈরি করা। সুতরাং ইসলামের দিকে দাওয়াতের অর্থ কেবলমাত্র কথা বলাই নয়, বরং ঝোঁক ও প্রবল ইচ্ছা তৈরি করবার জন্য কথা বলা ও কর্মকান্ড পরিচালনাকেও বুঝায়। অর্থাৎ দাওয়াত কথা বলা ও কর্মকান্ড উভয়কেই বুঝায়। একজন মুসলিম অবশ্যই নিজ জীবনে ইসলামকে ধারণ করবে এবং বাস্তব উদাহরণ দিয়ে লোকদের ইসলামের দিকে আহ্বান করবে এবং সত্য উপলদ্ধি থেকে ইসলামের ব্যাপারে সঠিক চিত্র তুলে ধরবে।

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

**'তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার যে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন মুসলিম?'** (সূরা হা মীম সিজদাহ-৩৩)

এবং তিনি আরও বলেন,

**'সুতরাং আপনি এর প্রতিই দাওয়াত দিন এবং হুকুম অনুযায়ী অবিচল থাকুন।'** (সূরা আশ শূরা-১৫)

সুতরাং **আল্লাহর** দাওয়াত বহন করা ফরয এবং এটি এমন একটি ইবাদত যার মাধ্যমে দাওয়াত বহনকারী **আল্লাহর** নৈকট্য অর্জন করে। এর মর্যাদা অনেক উচুঁতে এবং এর মাধ্যমেই **আল্লাহ** তাকে দুনিয়াতে সম্মান দেবেন ও আখিরাতে মুক্তি দেবেন।

দাওযাত ছিল রাসূলদের মিশন এবং এর মাধ্যমে তারা **আল্লাহর** দীনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

**'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র** ইবাদত **কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক।'** (সূরা আন নাহল : ৩৬)

**'হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। এবং আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।'** (সূরা আল আহযাবঃ ৪৫-৪৬)

সুতরাং আমাদের রাসূল (সা) দাওয়াত বহনকারী ও উম্মাহর জন্য একজন সতর্ককারী ছিলেন। তিনি দুনিয়াতে লোকদের যে দিকে আহ্বান করেছেন সে ব্যাপারে একজন সাক্ষী ছিলেন। সেকারণে তিনি লোকদের এবং **আল্লাহকে** সাক্ষী হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। বিদায় হজ্জের ভাষণে সে কারণে তিনি বলেন,

*'.....আমি কি পৌঁছে দেইনি? হে* **আল্লাহ,** *আপনি সাক্ষী থাকুন।'* (বুখারী)

সুতরাং দাওয়াত হল এ উম্মতের জন্য রাসূল প্রদত্ত উপহার এবং আমাদেরকে ইসলামের ভেতরে থাকতে হলে এ উপহারকে সংরক্ষণ করতে হবে।

এর কারণ হল ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দাওয়াত দেয়া ব্যতিরেকে এর কার্যকর উপস্থিতি দর্শন করা যাবে না। এবং এই দাওয়াত ছাড়া মানুষের মনের ভেতরের বিদ্যমান অন্ধকার ও বিচ্যুত **চিন্তাকে** দূরীভূত করতে পারবে না। আবার ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাওয়াত দেয়া ছাড়া ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। ইসলামকে দাওয়াতের মাধ্যমে ছড়িয়ে না দেয়া গেলে তা শক্তিশালীভাবে বি**স্তারও** লাভ করবে না।

ইসলামী দাওয়াত না থাকলে দ্বীন এত শক্তিশালী হত না, বি**স্তার** লাভ করত না, সুরক্ষিত হত না এবং **আল্লাহর** হুজ্জাত বা প্রমাণ তার সৃষ্টির সামনে প্রতিষ্ঠিত হত না।

সুতরাং কেবলমাত্র দাওয়াতের মাধ্যমেই ইসলাম তার হৃত গৌরব ও শক্তিশালী অবস্থান ফিরে পেতে পারে এবং এর প্রয়োজনীয়তা আজকের দিনে ভীষণ ভাবে দরকার।

দাওয়াতের মাধ্যমে সব মানুষের কাছে ইসলাম পৌঁছে দেয়া এবং জীবনব্যবস্থাকে **আল্লাহর** জন্য পরিণত করা সম্ভব। পৃথিবীর জন্য আজকে দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ইসলামী দাওয়াতের মাধ্যমে মুসলিমদের দলিলের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় এবং কাফেরদের দলিলের **ত্রুটি** প্রকাশিত হয় এবং ইসলাম পরিত্যাগের জন্য অবিশ্বাসীরা যেন কোন অজুহাত দাঁড় করবার সুযোগ পায় না। এ সম্পর্কে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

**'সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশীল, প্রাজ্ঞ।'** (সূরা আন নিসা-১৬৫)

সে কারণে মুসলিমদের কাছে দাওয়াত দেয়ার বিষয়টি এত **গুরুত্বপূর্ণ** হয়ে উঠে। এ কারণে ইসলামের প্রথম যুগে সাহাবীগন রাসূল (সা) এর সাথে সাথে দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং দ্বীনের মতই এটিকে **গুরুত্ব** প্রদান করেন। যদি ইসলামে দাওয়াত না থাকত, তাহলে ইসলাম আমাদের কাছে পৌছত না এবং কয়েকশ মিলিয়ন লোক এটা গ্রহণের সুযোগ পেত না। সে অবস্থায় ইসলাম কেবলমাত্র **রাসূলুল্লাহ** (সা) এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। সে কারণে **রাসূলুল্লাহ** (সা) এর উপর সর্বপ্রথম নাযিলকৃত কথাটি ছিল

**'পড়'** (সূরা আলাক:১)

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাকে পড়তে বলেছেন এবং লোকদের পড়ে শোনাতে বলেছেন।

প্রথমদিকে নাযিলকৃত আয়াতসমূহের মধ্যে একটি ছিল:

**'উঠুন, সতর্ক করুন'** (সূরা আল মুদ্দাসির:২)

সুতরাং, **রাসূলুল্লাহ** (সা) দাওয়াতের সব উপকরণের দ্বারাই এ কাজটি করেছেন এবং সর্বপ্রথম মুসলমান হিসেবে যাদের পেয়েছেন তারা তাঁর পর দাওয়াত বহনকারী হিসেবে সবচেয়ে উত্তম ছিলেন। ঐ সকল মুসলিমদের দাওয়াতই পরবর্তীদের নিকট পৌঁছে। এভাবে পূর্বের মত আজকেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দাওয়াত বহন করবার কাজটি করে যেতে হবে।

পানির সাথে প্রবাহের যে সম্পর্ক দাওয়াতের সাথে ইসলামের সে সম্পর্ক । যেমন: পানি দিয়ে সেচকার্য করা হয়, পিপাসা নিবারণ করা হয় এবং মানুষের আরও অনেক কল্যাণ সাধন করা হয়। কিন্তু এই পানির দায়িত্ব কাউকে নিতে হয়। একইভাবে ইসলাম যা একটি সত্য দ্বীন ও সঠিক জীবনব্যবস্থা-এটাকে এবং এর হককে কাউকে না কাউকে বহন করতে হয়। এতে করে **আল্লাহ** সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ, সেচকার্য পরিচালনা ও সুপথের নিদর্শন পাওয়া যায়।

সুতরাং ইসলাম ও দাওয়াতের মধ্যকার গভীর সম্পর্ক সুস্পষ্ট।

একারণে দাওয়াত ইসলামের অতীব **গুরুত্বপূর্ণ** বিষয় ও মৌলিক ভিত্তিসমূহের একটি। ইসলামের **বিস্তার** ও ইসলাম দ্বারা কাউকে প্রভাবিত করবার জন্য দাওয়াত খুব দরকার। যখন তা শুরু হয় তখন থেকেই দাওয়াতের যুগই ইসলামের যুগ, until Allah (SWT) inherits the earth and those inhabiting it.। সে কারণে মুসলমানদের জীবনে দাওয়াতকে অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব দেয়া উচিত। মুসলমানদের দাও'য়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এর জন্য সময় ও শক্তি বিনিয়োগ করতে হবে।

## সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ দাওয়াতের একটি অংশ

এ ব্যাপারে ইমাম আন নববী (র) তার শরহে সহিহ মুসলিম-এ 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ' শিরোনামে অধ্যায়ে বলেন, "এ বিষয়ে অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নির্দেশ সম্পর্কে- যা বহুপূর্বে দেখা যেত , কিন্তু বর্তমানে তা পরিত্যাজ্য তবে সামান্যতম কিছু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।"

এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন মন্দ কাজ পরিব্যপ্তি লাভ করে, তখন ভাল ও মন্দ সব ধরনের লোক শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। আর এমতাবস্থায় যদি কেউ অত্যাচারী শাসককে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবার জন্য উপদেশ না দেয় তাহলে **আল্লাহ** সবার উপর শাস্তি নাযিল করেন:

**'অতএব যারা রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।'** (সূরা নূর: ৬৩)

যতদিন মানুষ বাঁচে ততদিন 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ' তার নিজের নিরাপত্তা ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকবার জন্য অপরিহার্য। রাসূল (সা) এ বিষয়টি হাদীসের মাধ্যমে একটি উদাহরণ দিয়ে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখা করেছেন:

*"যারা আলাহ্'র হুকুম মেনে চলে আর যারা সেগুলোকে নিজেদের প্রবৃত্তির খেয়ালে লঙ্ঘন করে, (উভয়ে) যেন তাদের মতো যারা একই জাহাজে আরোহণ করে। তাদের একাংশ জাহাজের উপরের তলায় নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে এবং অন্যরা এর নিচের তলায় নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। যখন নিচের লোকদের পিপাসা মেটানোর প্রয়োজন হয় তখন তাদেরকে জাহাজের উপরের অংশের লোকদের অতিক্রম করে যেতে হয়। (তাই) তারা (নিচতলার লোকেরা) নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নিল, 'আমরা যদি জাহাজের নিচের দিকে একটা ফুটো করে নিই তাহলে জাহাজের উপরের তলার লোকদের কোন সমস্যা করবো না।' এখন যদি উপরের তলার লোকেরা নিচতলার লোকদেরকে এ কাজ করতে দেয় তবে নিশ্চিতভাবেই তারা সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আর তারা যদি তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখে, (তবে) তারা (উপরতলা) রক্ষা পাবে এবং এভাবে (জাহাজের) সবাই রক্ষা পাবে।"* (বুখারী)

এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি সামাজিক নিরাপত্তা ও জীবনের জন্য 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ' কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এ কাজের গুরুত্ব বুঝার ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের আত্মপ্রসাদ সেই জাহাজের নিমজ্জিত লোকদের মত অবস্থা হবে। সে অবস্থায় সবাই সমুদ্রের অতলে নিক্ষিপ্ত হবে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

পবিত্র কোরআনও বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে দাওয়াতের গুরুত্ব ও মানুষের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে। কুরআন কেবলমাত্র দাওয়াতের বিষয়বস্তু তুলে ধরেনি, বরং in addition to ahadeeth (traditions) of the Messenger, এর সাথে সংশ্লিষ্ট আরও অনেক কিছু যা দাওয়াতকে ঘিরে পরিগ্রহ করে তাও উপস্থাপন করেছে। সামগ্রিকভাবে না হলেও এদের কিছু আমরা এখানে উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি।

পবিত্র কুরআন দাওয়াতকে ' আমর বিল মা'রূফ এবং নাহি আ'নিল মুনকার ' বলে সম্বোধন করেছে। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

**'তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।'** (সূরা আল ইমরান: ১১০)
এবং তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন,

**'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।'** (সূরা আল ইমরান: ১০৪)
এ সর্ম্পকে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

*"ঐ সত্ত্বার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা অতি সত্বর আমর বিল মা'রূফ এবং নাহি আ'নিল মুনকার (সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ) কর। অন্যথায় অচিরেই তোমাদের উপর* **আলণ্ডাহ্‌**_র শাস্তি আরোপিত হবে। অতঃপর তোমরা তাকে ডাকবে কিন্তু তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবেনা।"_ (তিরমিযী)
এবং তিনি (সা) আরও বলেন,
*"তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি অন্যায় কাজ হতে দেখলে সে যেন তার হাত দ্বারা তা প্রতিহত করে। তার এই সামর্থ্য না থাকলে সে যেন তার মুখ দ্বারা তা প্রতিহত করে। তার এই সামর্থ্যও না থাকলে সে যেন তার অন্তর দ্বারা তা প্রতিহত করে (ঘৃণার মাধ্যমে), আর এটা হলো দূর্বলতম ঈমান।"* (মুসলিম, তিরমিযী)

## তাবলীগ দাওয়াতের আরেকটি অংশ

একইভাবে পবিত্র কোরআন দাওয়াতকে লোকদের সম্মুখে 'সাক্ষ্য দান করা' বলে উল্লেখ করেছে।

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

**'এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলীর জন্যে এবং যাতে রসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য।'** (সূরা আল বাক্বারা : ১৪৩)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

**'.....বিশ্বাসীরা হল পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষীদাতা।'** (ইবনে মাজাহ)

তিনি (সা) আরও বলেন,

*'যারা এখানে উপস্থিত আছ (সাক্ষীদাতারূপে), তারা যারা অনুপস্থিত তাদের কাছে পৌছে দাও।'*

কুরআন দাওয়াতের কাজকে তাবলীগ (বহন করা) অর্থে উল্লেখ করেছে। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

**'হে রসূল, পৌছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন।'** (সূরা মায়েদাহ-৬৭)

তিনি (সা) বলেন,

*' পৌছে দাও আমার পক্ষ থেকে যদি একটি আয়াতও হয়।'* (বুখারী)

## একে অপরকে সত্যের ব্যাপারে সতর্ক করা (তাওয়াসী) দাওয়াতের অংশ

কুরআন ও সুন্নাহ দাওয়াতের ধারণাকে একে অপরকে সত্যের ব্যাপারে সতর্ক করা (তাওয়াসী)) সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছে, সুসংবাদ প্রদান করা (তাবসীর), লোকদের সতর্ক করা (নসীহা) এবং তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া, আহলে কিতাবদের সাথে সর্বোত্তম পন্থায় বিতর্ক করা, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা। এছাড়াও আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে।

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

**'কসম যুগের, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তূ তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ দেয় সত্যের এবং তাকীদ দেয় সবরের।'** (সূরা আল আসর : ১-৩)

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

**'আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি; কিন্তূ অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।'** (সূরা আস সাবা-২৮)

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন,

**'আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিস্কার বোঝাতে পারে।'** (সূরা ইব্রাহিম-৪)

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন,

**'এটা (কুরআন) তো কেবল বিশ্বাবাসীদের জন্যে উপদেশ'** (সূরা আত তাকভীর: ২৭)

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

**'এটা আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্যে উল্লেখিত থাকবে এবং শীঘ্রই আপনারা জিজ্ঞাসিত হবেন।'** (সূরা আয যুখরুফ:৪৪)

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

**'............এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দনীয় পন্থায়।'** (সুরা আন নাহল:১২৫)

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

**'আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায়; এবং দ্বীন শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে যায়।'** (সূরা আল আনফাল-৩৯)

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

**'তিনি তাঁর রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্যধর্ম নিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সবধর্মের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।'** (সুরা আস সফ: ৯)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

*'অবশ্যই দ্বীন হল নসীহা (উপদেশ)। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, 'কার প্রতি ইয়া রাসূলুল্লাহ'। তিনি বললেন, আল্লাহ, তার কিতাব, রাসুলের জন্য, মুসলিমদের নেতা এবং জনসাধারনের প্রতি।* (মুত্তাফিকুন আলাইহি)

**সুলায়মান বিন বুরাইদাহ তার বাবার বরাত দিয়ে বর্ণণা করেন যে, 'যখন রাসূলুল্লাহ (সা) কাউকে কোন অভিযান বা সেনাবাহিনীর আমীর হিসেবে নিয়োগ দিতেন তখন তাকে আল্লাহভীতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন এবং তার সাথের মুসলমানদের প্রতি সদয় হতে উপদেশ দিতেন। তিনি (সা) বলতেন: আল্লাহর জন্য তার নামে জিহাদ কর। আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। যখন তুমি মুশরিকদের সাথে মিলিত হবে তাদের তিন পর্যায়ের কাজের প্রস্তাব দেবে। তারা যদি তিনটির কোন একটিকে গ্রহণ করে তাহলে সেটি মেনে নাও এবং তাদের কোন ক্ষতি করা থেকে বিরত থাক। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আমন্ত্রন জানাও; যদি তারা প্রস্তাব গ্রহণ করে তাহলে মেনে নাও এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাক.....।'** (মুসলিম)

**রাসূলুল্লাহ** (সা) আরও বলেন,
**'আল্লাহ যাতে তার মুখ উজ্জ্বল করে দেয় -যে আমার কথা শুনে, সেইরূপ স্মরণে রাখে, বুঝে এবং তা পৌঁছে দেয় । সেক্ষেত্রে কেউ ফকীহ না হয়েও ফিকহ (জ্ঞান) বহন করবে। আবার কেউ কেউ এমন কারও কাছে জ্ঞান বা ফিকহ বহন করে নিয়ে যাবে যে তার চেয়েও বড় ফকীহ।' (তিরমিযী)**

এইভাবে সংশ্লিষ্ট সব আয়াত ও হাদীস যুক্ত করে পুরো বিষয়টিকে উপস্থাপন করা হয়েছে -যেগুলোর উপজীব্য বিষয় হল দাওয়াত। প্রত্যেক মুসলিম সাধ্য অনুসারে দাওয়াত বহনের কাজ করতে হবে।

আমরা যদি দাওয়াত সংশ্লিষ্ট অন্য আয়াতসমূহের কথা চিন্তা না করে কেবলমাত্র ' আমর বিল মা'রূফ এবং নাহি আ'নিল মুনকার ' এর আয়াতের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে, ইসলামের এ শক্তিশালী ভিত্তির সাথে প্রত্যেকটি মুসলিম বিজড়িত। আমাদের অণুকরণীয় আদর্শ রাসূল (সা) এর সাথে সম্পৃক্ত একটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,
**'......... তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষনা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ.........'** (সূরা আ'রাফ-১৫৭)

এটা নবুয়তের সমাপ্তির কথা বলে। রাসূল (সা) এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সৎ কাজের্ আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ব্যাপারে নির্দেশ দেন, সব ভাল (তাইয়্যিব) জিনিসের অনুমোদন ও অবৈধ (খাবিত) জিনিষের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেন।
উম্মাহর সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**'তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।'** (সূরা আল ইমরান-১১০)

এখানে উম্মাহ বলতে সব মুসলিম, ব্যক্তিগতভাবে, সামষ্টিক বা দলগতভাবে এবং কতৃত্বশীল লোক সবাইকে বুঝানো হয়েছে এবং সবাইকেই ' আমর বিল মা'রূফ এবং নাহি আ'নিল মুনকার ' এর ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ব্যক্তিপর্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত একটি আয়াতে আল্লাহ বলেন,
**'আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কাজের্ শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে।'** (সূরা আত তাওবা-৭১)

ইমাম কুরতুবী বলেন, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমল বিন মারুফ ও নাহিয়ান মুনকার এর মাধ্যমে ঈমানদার ও মুনাফেকের মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন। অর্থাৎ ঈমানদারদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল 'আমর বিল মা'রূফ এবং নাহি আ'নিল মুনকার ' এবং এর প্রধান দিক হল ইসলামের দাওয়াত।' (তাফসীর আল কুরতুবী ৪/১৪৭)

দলগত দাওয়াতের কাজের আয়াতসমূহে দলের কাজ সুস্পষ্ট করা হয়, যেমনঃ
**'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।'** (সূরা আল ইমরান:১০৪)

কর্তৃত্বশীল লোকদের সর্ম্পকে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন,

**'তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে** কতৃত **দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র এখতিয়ারভূক্ত।'** (সূরা আল হাজ্জ:৪১)
কুরআন স্পষ্টভাবে বলেছে দাওয়াত ইসলামের **প্রতি:**
**'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের (ইসলামের) প্রতি.....'** (সূরা আল ইমরান:১০৪)

**'যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হয়েও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে; তার চাইতে অধিক যালেম আর কে?'** (সূরা আস সফ:৭)

**'আপনি তো তাদেরকে সোজা পথে দাওয়াত দিচেছন'** (সূরা মু'মিনুন:৭৩)

কুরআন স্পষ্টভাবে বলেছে এটি আল্লাহ**র** প্রতি দাওয়াত
**'যে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয়,........তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার?'**(সূরা হা-মীম সিজদাহ:৩৩)

**'বলে দিনঃ এই আমার পথ। আমি আল্লাহ্র দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই- আমি এবং আমার অনুসারীরা।'**(সূরা ইউসুফ:১০৮)

কুরআন স্পষ্টভাবে বলেছে এটি আল্লাহ**র** নাযিলকৃত শাসনব্যবস্থার প্রতি দাওয়াত
**'তাদের মধ্যে শাসন করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে আহবান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।'**(সূরা আন নূর-২৪)

**'মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে শাসন করার জন্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলেঃ আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম।'** (সূরা আন নূর-৫১)

**'.... আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি তাদের আহবান করা হয়েছিল যাতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করা যায়। অত:পর তাদের মধ্যে একদল তা অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।'** (সূরা আল ইমরান-২৩)

' আমর বিল মা'রূফ এবং নাহি আ'নিল মুনকার ' হল ফরযে কিফায়া। কারও কারও জন্য এটি বাধ্যতামূলক। যারা এ দায়িত্ব পালন করবে তাদের জন্য রয়েছে পুরষ্কার এবং যারা তা পালন করবে না তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবার আগ পর্যন্ত এর দায়ভার বহন করবে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দাওয়াত বহন করাকে মুক্তির পথ হিসেবে বাধ্যতামূলক করেছেন এবং দাওয়াত ত্যাগ করার ফলাফল যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**'অত:পর যখন তারা সেসব বিষয় ভুলে গেল, যা তাদেরকে বুঝানো হয়েছিল, তখন আমি সেসব লোককে মুক্তি দান করলাম যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত। আর পাকড়াও করলাম, গোনাহগারদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের না-ফরমানীর দরুন।'** (সূরা আ'রাফ: ১৬৫)

ঈমান যেমনিভাবে মা'রুফ এর মুখ্য বিষয় ও ভিত্তি, তেমনিভাবে কুফর হল সবচেয়ে বড় মুনকার ও সব মুনকারের ভিত্তি। আনুগত্যের সব কাজ হল এ মুখ্য মা'রুফ থেকে উদ্ভুত মা'রুফাত। আর অবাধ্যতা হল মুখ্য মুনকার থেকে উদ্ভুত মুনকারাত। আল্লাহর আইন দ্বারা শাসন করা হল আনুগত্যের সবচেয়ে বড় স্বাক্ষর-যার মাধ্যমে ঈমান ও আনুগত্যের বিভিন্ন কাজ প্রকাশিত হয় এবং যার মাধ্যমে দাওয়াত বহন করা হয় ও ইসলামের প্রসার ঘটে। অন্যদিকে আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা অবাধ্যতার চূড়ান্ত পর্যায়-যাতে মানুষের খেয়ালখুশী, প্রবৃত্তি ও পথভ্রষ্টতা প্রতিফলিত হয়।

এই ফরযিয়াত বাস্তবায়নের জন্য একত্র হওয়া ফরয। দ্বীন সর্ম্পকে প্রত্যেক সচেতন মুসলমানের জানা উচিত, সে যখন কোন আয়াত বা হাদীস পাঠ করে-তা শুধু নিজের জন্য নয় বরং সব মুসলিমের জন্য । এমনকি রাসূলের প্রতি জারিকৃত যে কোন নির্দেশও পুরো উম্মাহ'র জন্য প্রযোজ্য হবে যদি তাকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে এমন প্রমাণ না থাকে। যখন আল্লাহ তাকে (সা) ঈমান, ইবাদত এবং নাযিলকৃত আয়াতসমূহ দিয়ে শাসনের ব্যাপারে কোন নির্দেশ দেন তখন এগুলো সকলের জন্যও প্রযোজ্য।

# ২

# দাওয়াত বহন করবার ক্ষেত্রে ঈমানের গুরুত্ব এবং ফরয কাজসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদান

মা'রূফাতের সমন্বয়ে ইসলাম গঠিত এবং আল্লাহ একে প্রতিষ্ঠিত করবার ও মুনকারাত থেকে বিরত থাকবার ও অপসারণের নির্দেশ দিয়েছেন।

সর্বোচ্চ এবং সর্বপ্রধান মারুফ হচ্ছে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তায়ালার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, ইসলামিক আকীদার অন্যান্য ভিত্তিসমূহ।

মুনকারাতের চূড়ান্ত পর্যায় হল যে কোন ধরনের কুফরের নগ্ন বহিপ্রকাশ। আল্লাহ একে পরিত্যাগ করার, বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন ও এর ফাঁদে পা না দেবার ব্যাপারে সাবধান করেছেন।

মা'রুফের শ্রেণীবিভাগে ঈমানের পরে তাকওয়া আসে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও রাসূল (সা) এর আনুগত্যের মাধ্যমে এটা অনুধাবন করা যায়। এটা হল ঈমানের ফলাফল, এটা তা সম্পূর্ণ করে এবং এর প্রয়োজনের খাতিরে তা আসে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে ভয় করবার অর্থ হল তার ক্রোধ কে এড়িয়ে চলা। আল্লাহর আইনকে গ্রহণ করা ছাড়া এটি সম্ভব নয়। আর এই গ্রহণ করবার বিষয়টি ঈমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যখন একজন মুসলমানের ঈমান শক্তিশালী হয়, তখন আনুগত্যের বিষয়টিও শক্তিশালী হয়। যখন ঈমান দূর্বল হয়ে যায় তখন গ্রহণের বিষয়টিও দুর্বল হয়ে যায়। সেকারণে মুসলমানদের ঈমান থাকা এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও রাসূল (সা) এর প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয় এবং সবধরনের কুফর ও আনুগত্যহীনতার পরিচায়ক কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকবার নির্দেশ দেয়া হয়।

একজন মুসলমানের ঈমান ও তাকওয়া থাকা এবং কুফর ও পাপ থেকে বিরত থাকা ও এ বিষয়গুলোকে ছড়িয়ে দেয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর হবে না যদি না সে লোকদের দাওয়াত দেয় ও ইসলামকে বহন করে; সেই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে যা মুসলিম এবং তাদের আক্বীদা ও তাকওয়াকে  রক্ষা করে এবং তাদেরকে কুফর ও আনুগত্যহীনতার ফাঁদ থেকে সুরক্ষা দেয়। এটাই বাস্তবতা ও রাসূল (সা) এর কাজ থেকে এ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) তার সাহাবীদের কেবলমাত্র ঈমান ও তাকওয়ার নির্দেশ দেননি। বরং তিনি তাদের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঈমান ও তাকওয়ার পরিবেশ তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন-যে রাষ্ট্র প্রতিটি মুসলিমকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য ঈমান ও তাকওয়ামুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে। মদীনা আল মনোয়ারায় রাসূলুল্লাহ (সা) খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এটাই অর্জন করেছিলেন।

সুতরাং, মারূফাতের ফরয দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের অবশ্যই লোকদের কাছে দাওয়াত নিয়ে যেতে হবে। সাথে সাথে আমরা সে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যও লোকদের দাওয়াত দিব-যা এগুলোকে রক্ষা করবে। যে সকল মুনকারাত থেকে দুরে থাকতে হবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, তা থেকে পৃথক থাকতে হবে, এবং তাকে বিনাশ করতে হবে এবং যে ব্যক্তি মুনকার সম্পন্ন করবে তাকে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসতে হবে এবং যে ব্যবস্থা এই ধরনের মুনকারাতকে প্রতিষ্ঠিত করে ও সংরক্ষণ করে সেই ব্যবস্থা অপসারণ করতে হবে ।

সুতরাং ' আমর বিল মা'রূফ এবং নাহি আ'নিল মুনকার ' মুসলমানদের উপর ফরয। তবে আমর বিল মা'রূফের উপদেশ দেবার আগে ঐ ব্যক্তিকে আগে নিজেকে তা মানতে হবে এবং নাহি আ'নিল মুনকারের আদেশ দেবার আগে নিজেকে সে কাজ থেকে বিরত হতে হবে।

## প্রথম দিক: আমর বিল মা'রূফ এবং নাহি আ'নিল মুনকার

মুসলমানদের আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সব ইসলামিক আক্বীদার (আল্লাহ, তার ফেরেশতা, কিতাব, রাসূল, ক্বিয়ামত দিবস এবং ক্বাদা ওয়াল ক্বদর অর্থাৎ ভাল মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং কুরআন ও হাদীসে সুনিশ্চিত দলিলে যা এসেছে) উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। সুতরাং, ঈমান হল প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে আইন (ব্যক্তিগতভাবে ফরয)। তাকে অবশ্যই এই বিষয়গুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং এগুলোই ভিত্তি। সুতরাং, তাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলায় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এমনভাবে যে, তিনি সব কিছুর স্রষ্টা এবং তার সমকক্ষ কেউ নেই। নিখুত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ও সব

সীমাবদ্ধতামুক্ত সত্তা আমাদের স্রষ্টা। এ মহাবিশ্বে যা আছে, যার উপর জীবন নির্ভরশীল ও মানুষের জন্য প্রয়োজনীয়-তা সবই আল্লাহ আল কাদির এর পক্ষ থেকে। আকাশ ও পৃথিবীর কোন কিছুই তার দৃষ্টির বাইরে নয় এবং কোন কিছুই তার ইচ্ছা ও জ্ঞানের বাইরে যেতে পারে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই একমাত্র সত্তা যাকে উপাসনা করা যায়। কেবলমাত্র তার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করা যায়, আত্মসমর্পণ করা যায় এবং তার সন্তুষ্টির মধ্যেই প্রশান্তি নিহিত রয়েছে। মুসলমানদের ভেতরে যখন এ বিষয়ে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন আল্লাহর প্রতি ঈমান পরিপূর্ণ হবে। তাকে আরও বিশ্বাস করতে হবে যে, মুহম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল-যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য দ্বীন ইসলাম নিয়ে এসেছেন। এই দ্বীন আল্লাহ কতৃক অবতীর্ণ, মুহম্মদ (সা) এর বুদ্ধিমত্তা, প্রতিভা থেকে উদ্ভুত কিছু নয়। আর তিনি যে দ্বীন বহন করেছেন তা ছিল অভ্রান্ত। তাকে অবশ্যই আল- াাহর অন্যান্য রাসূলদের, অবতীর্ণ কিতাবের উপর সাধারণভাবে এবং ফেরেশতা, ক্বিয়ামত দিবস, ক্বাদা ওয়াল ক্বদর এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এগুলো হল ঈমানের ভিত্তি। যে ব্যক্তি এগুলোর ব্যাপারে স্বীকৃতি দেয় সেই মুসলিম, যদিও সে ব্যক্তির এসবের বিস্তারিত বিষয়ের জ্ঞানে সীমাবদ্ধতা রয়েছে – তবে তা ততদিন পর্যন্ত যতদিন তিনি এমন কোন কাজ বা অন্য কোন বিষয়ে বিশ্বাস করতে শুরু না করেন যা তার ঈমান কে লঙ্ঘন করে। তবে এই ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে , এজন্য সবসময় প্রচেষ্টা ও ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ অব্যাহত রাখতে হবে। যখন বিশ্বাসীরা স্রষ্টার চিরন্তন নিদর্শন ও কোরআন আয়াতসমূহ জানতে পারে তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপর তাদের বিশ্বাস দৃঢ় ও শক্তিশালী হয়। মুসলমান যত আল্লাহর সৃষ্টি, সৃষ্টির গঠন, স্রষ্টার ক্ষমতা, তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সর্ম্পকে ভাবে, ততই তার ঈমান বৃদ্ধি পায় ও ঈমানের উৎকর্ষ বিধান হয়। মানুষ যতই তার জন্য প্রদত্ত আল্লাহর নিয়ামত নিয়ে গভীরভাবে **চিন্তা** করে, ততই সে বিষয়ে উপলব্ধি শাণিত হবে-যে বিষয়ে আগে সে অবগত ছিল না। এভাবে স্রষ্টার প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্যের মাধ্যমে ইলাহর নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব। স্রষ্টা ব্যতিরেকে সবকিছুর সীমাবদ্ধতা নিয়ে মুসলিমরা যত ভাববে, যত বেশী তার প্রয়োজন ও দূর্বলতা নিয়ে **চিন্তা** করবে ততই সে ইবাদত, আনুগত্য ও আল্লাহর প্রতি নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে পারবে।

একইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতি বিশ্বাসও বাড়ে ও কমে। সুতরাং যতই একজন মুসলিমের কুরআন সর্ম্পকে জ্ঞান বাড়ে, ততই সে উপলব্ধি করতে পারে যে, এ গ্রন্থটি আল্লাহ ব্যতিত আর কারও কাছ থেকে আসেনি এবং এভাবে মুহম্মদ (সা) যে আল্লাহ প্রেরিত রাসূল সে ব্যাপারে বিশ্বাস দৃঢ়তর হবে। এভাবেই রাসূল (সা) এর সীরাত, তার জীবন, আল্লাহর পথে তার ত্যাগ তিতিক্ষা সর্ম্পকে যত জানবে ততই রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি মহব্বত বাড়বে ও এই বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রতি আগ্রহ তত বাড়বে। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনে ব্রতী হতে উৎসাহী হবে।

একই কথা বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যখন মুসলিমগন সেই বিচার দিবস সর্ম্পকে ভাববে যে বিচার দিবসের দিন দুশ্চিন্তা শিশুদেরও ভাবিয়ে তুলবে, প্রত্যেক স্নেহশীল মা সন্তানের যত্ন নেয়া ভুলে যাবে, প্রত্যেক গর্ভবতী নারী তার বোঝা ত্যাগ করবে, লোকদের মাতাল মনে হবে। বিচার দিবসের ভয়াবহতা সর্ম্পকে আল্লাহ প্রদত্ত বর্ণণা তাকে ভীত করে তোলে এবং সেদিনের এই ভয়াবহতা থেকে মুক্তির জন্য পথ খুঁজতে থাকে। মুসলিম ব্যক্তি জান্নাতের বর্ণণা আছে এরূপ আয়াত ও হাদীস যত বেশী পড়বে, জান্নাতে বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত চূড়ান্ত আরাম আয়েস ও চিরস্থায়ী সুখের কথা যত জানবে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আরাম আয়েস তার কাছে ক্ষুদ্রতর হতে থাকবে এবং মহিমান্বিত জান্নাতের প্রতি তার আকর্ষণ তীব্রতর হতে থাকবে। এছাড়াও বিশ্বাসীরা দোযখের শাস্তি সর্ম্পকিত কোরআনের আয়াত ও হাদীসগুলো যতই জানবে, জাহান্নামের যন্ত্রনা ও চিরস্থায়ী অগ্নিকুন্ডের ব্যাপারে তার ভীতি তত বেশী হবে। তখন দুনিয়ার জীবনের শাস্তি ও ভয় তার থেকে উবে যায় এবং যদি এ জন্য তাকে অত্যাচারী শাসকের কারাগারে যেতে হয় বা পিঠে চাবুকের আঘাতে জর্জরিত হতে হয় তারপরেও সে তখন দোযখের আগুনে যাওয়ার জন্য দায়ী কারণুলো এড়িয়ে চলে। সুতরাং যখন মুসলিমের হৃদয় ঈমানের সাথে গ্রন্থিত হয়, তখন তার শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আনুগত্য ও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়। আখিরাতের বিষয়টি যত বেশী প্রাধান্য লাভ করবে ততই মু'মিনের কাছে দুনিয়া তুচ্ছ হতে থাকবে। যখন ঈমান শক্তিশালী হয়, ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি ক্রমাগতভাবে শক্তিশালী হতে থাকে এবং বাধাবিপত্তির মুখে কথায় ও কাজে দৃঢ় থাকে।

আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে সাথে অন্য সব ইলাহ বা কুফরকে পরিত্যাগ করতে হবে-হোক সেটা কোন প্রতিমূর্তি বা **চিন্তা**। কুরআন মুর্তিপূজারীদের এবং এ ধরনের **চিন্তাধারণা** পোষণকারীদের ব্যাপারে বলেছে:

**'সে বলল: তোমরা স্বহস্ত নির্মিত পাথরের পূজা কর কেন? অথচ আল্লাহ্ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা নির্মাণ করছ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন।'** (সূরা আস সফফাত:৯৫-৯৬)

**'তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওযযা সম্পর্কে। এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে? পুত্র-সন্তান কি তোমাদের জন্যে এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহ্র জন্য? এমতাবস্থায় এটা তো হবে খুবই অসংগত বন্টন।'** (সূরা আন নাজম : ১৯-২২)

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন,

**'তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে। তাদের কাছে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন একথা বলা ছাড়া তাদের কোন যুক্তিই থাকে না যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে আস। আপনি বলুন, আল্লাহ্ই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, অতঃপর মৃত্যু দেন, অতঃপর তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না।'** (সূরা ঝাসিয়াঃ ২৪-২৬)

সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর প্রতি ঈমান আনা অনর্থক ও মিথ্যা। এটা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। ঈমানের জন্য প্রয়োজন **চিন্তা** ও গভীর উপলদ্ধি। একইভাবে কুফর বর্জনের জন্যও প্রয়োজন **চিন্তা** ও গভীর উপলদ্ধি। পূর্বোক্ত আয়াতটি মানুষকে **চিন্তা** করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং কুফরের চিন্তার বাস্তবতা নিয়ে ভাবতে আহ্বান জানায়-যাতে করে তারা ভুল বুঝতে পারে ও তাগুতকে বর্জন করতে পারে। আল্লাহ সুবাহানাহুতায়ালা বলেন,

**'দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়েত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত' দেরকে মানবে না এবং আল্লাহ্কে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙবার নয়। আর আল্লাহ্ সবই শুনেন এবং জানেন।'** (সূরা বাক্বারা-২৫৬)

**চিন্তা** ও গভীর উপলদ্ধি হল আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনের উপায় ও একইভাবে তাগুত পরিত্যাগের মাধ্যম। শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াবার ও সঠিক নির্দেশ পাবার জন্য একজন মুসলিমের উভয়টিই প্রয়োজন।

প্রত্যেক মুসলিমের ঈমান এর প্রতি তাকে প্রতিশ্রুত করে তোলে। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করল ও মিথ্যাকে পরিত্যাগ করল সে তার মহান প্রভু, সৃষ্টিকর্তা আল কাদির এর নৈকট্য পাবে। সুতরাং সে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবাসবে, ভয় করবে, করুণা ভিক্ষা করবে, তাকে উপাসনা করবে এবং নির্দেশ পালন করবে। এটা মুসলমানের মধ্যে আল্লাহ যা ভালবাসেন তার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে ও আল্লাহ যা ঘৃণা করেন তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে। মুসলিম ব্যক্তি তখন আল্লাহর নিয়ামত ও করুণার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। সে এটা করবে না কেন? কারণ সে অনুধাবন করতে পারে যে, সে দূর্বল ও অক্ষম এবং তাকে এমন একজনের কাছে আত্মসমর্পন করতে হবে যে তার দায়িত্ব নিতে যথেষ্ট পারঙ্গম। যদি এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য না হত তাহলে সে পথনির্দেশ পেত না, সঠিক পথের উপরে অবস্থান করত না এবং তার সমস্যাসমূহের ভাল সমাধান হত না। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশ মানার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ভাল জীবনযাপন করে এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্যুত হয়ে সে দূর্দশাগ্রস্ত ও অভিশপ্ত জীবন পায়। এভাবে সে দুনিয়া ও আখিরাত হারায়। সুতরাং ঈমান অবিসংবাদিতভাবে আনুগত্য ও তাকওয়ার দিকে ধাবিত করে। এটা প্রত্যেক মুসলিমকে স্রষ্টার উপাসনা ও আনুগত্যের পথে নিয়ে যায় এবং স্রষ্টার উষ্মার উদ্রেক করে এরকম কাজ থেকে বিরত রাখে এবং স্রষ্টাকে খুশি করবার ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে। কী আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে আর কী তাঁর ক্রোধের উদ্রেক করে? আল্লাহর প্রতি আনুগত্য তাকে সন্তুষ্ট করে-যার মধ্যে মুসলিমদের জন্য হুকুমদাতার নির্ধারিত অসংখ্য মারুফাত রয়েছে। আর আনুগত্যহীনতা স্রষ্টার ক্রোধের উদ্রেক করে-যার মধ্যেও স্রষ্টা নির্ধারিত অনেক মুনকারাত রয়েছে এবং এগুলো থেকে বিরত থাকবার ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

## ফরযে আইন (ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতা) ও ফরযে কিফায়া (সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা)

যে ব্যক্তি শরীয়াগত বাধ্যবাধকতা নিয়ে নিরীক্ষা করবে সে দেখতে পাবে যে, এদের কিছু ব্যক্তিগত ও কিছু সামষ্টিক। ফরযে আইন (ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতা) হল এমন বাধ্যবাধকতা যা প্রত্যেক **মুকাল-ীফ**কে (আইনগতভাবে দায়িত্বশীল ব্যক্তি) অবশ্যই পালন করতে হবে। যদি কোন মুসলিম এই বাধ্যবাধকতাকে ত্যাগ করে তাহলে সে পাপমুক্ত হবে না-যদিও সে ব্যতিত সব মুসলিম এই দায়িত্ব পালন করে। আর যদি কোন মানুষ এই হুকুম না মানে, কিন্তু একমাত্র ঐ ব্যক্তি তা মানে তাহলে সে আল্লাহর দোষারোপ ও পাপমুক্ত হবে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরযে আইন জানা ও মানা অত্যাবশ্যকীয়। এতে করে সে অভিযোগ এবং বাধ্যকতার স্রষ্টার সামনে বিবেকের পীড়ন থেকে মুক্তি পাবে। ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতার মত ব্যক্তিগত নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এর অর্থ হল মুসলমানদের সালাত আদায় করতে হবে, রমযানে রোজা রাখতে হবে, সামর্থবানদের হজ্জ পালন ও যাকাত আদায় করতে হবে এবং বাবা মা'র দেখশোনা করা, হালাল খাদ্য খাওয়া, মন্দ ও হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা, জিনা থেকে দূরে থাকা, মিথ্যা বলা ও গীবত করা এবং এজাতীয় সবকিছু থেকে বিরত থাকা বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ সে সব মারুফাত সম্পন্ন করবে এবং মুনকারাত বর্জন করবে।

# ফরযে কিফায়া (সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা)

এটা হল সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা যা মুসলমানদের মধ্য হতে যে কেউ সম্পন্ন করলেই হবে। প্রত্যেকের সম্পন্ন করা প্রয়োজনীয় নয়। এ অপরিহার্যতাটি থাকবে কিছু সংখ্যক বা অনেকের উপর । যদি তারা তা না করেন তবে সকল মুসলিম ততক্ষন পর্যন্ত গুনাহগার হবেন যতক্ষন না কাজটি সম্পন্ন হয়। তবে যারা এটি বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করেছে ও পরিশ্রম বিনিয়োগ করেছে তারা এ গোনাহ থেকে মুক্ত হবে। এ কথা কারো মনে করার সুযোগ নেই যে অপর মুসলমানের সাথে গুনাহ্ ভাগাভাগি করার ফলে গুনাহ্ হাল্কা হয়ে যাবে তাই সে সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। এটা সত্য নয়, বরং ক্বিয়ামতের দিন তাকে একাই আল্লাহর সম্মুখে দন্ডায়মান হতে হবে। সেকাণে তার অপরাধ তাকেই বহন করতে হবে। এ কারণে আল্লাহ বলেন,

**'কেয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে।'** (সূরা মারইয়াম-৯৫)

বাস্তবতা হচ্ছে, যখন উম্মাহ তার সাথে গোনাহে পতিত হয় তখন এটা ভেবে হয়ত তিনি দুনিয়াতে সন্তুষ্ট ভোগ করবেন, তবে তার আখেরাতের শাস্তি এতে সামান্য পরিমাণেও হালকা হবে না। সুতরাং, আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান এবং চক্ষু ও মন নিশ্চুপ হবার পূর্বে যারা কোন অসম্পাদিত বা অপ্রতিষ্ঠিত ফরযে কিফায়ার ব্যাপারে উদাসীন তাদের অনতিবিলম্বে তা সম্পাদন ও প্রতিষ্ঠা করতে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সুতরাং যেসব মুসলিম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলায় বিশ্বাস করে এবং তার সতর্কতায় ভয় করে, সে অবশ্যই তাকে (আল্লাহ) সন্তুষ্ট করতে, জান্নাত লাভ করতে ও জাহান্নামের আগুন থেকে বাচার চেষ্টা করবে। এ ধরনের মুসলমান সামষ্টিক বাধ্যবাধকতাকে তার দায়িত্ব মনে করবে ও তা সম্পাদন করবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালনে ঐ ব্যক্তি ব্রতী হবে ততক্ষণ সে গোনাহগার হতে থাকবে। তবে কিছু লোক যদি কাজটি সম্পন্ন করে ফেলে তাহলে তিনি সে দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। সেকারণে মুসলিমদের আল্লাহর প্রদত্ত দায়বদ্ধতা পালনের জন্য ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি সামষ্টিক বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে। যেমনঃ আল্লাহ প্রদত্ত আইন দ্বারা শাসন করা, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, ইজতিহাদ করা, সৎ কাজের আদেশ প্রদান করা ও অসৎ কাজে নিষেধ করা। এসবই হল সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা-যা মুসলিমগন সম্পাদন করবার জন্য চেষ্টা করবে এবং অন্যথায় তারা গোনাহগার হবে। যদি উম্মাহের ভেতরে কেউই ইজতিহাদ না করে, তাহলে যে ব্যক্তি ইজতিহাদ ফিরিয়ে নিয়ে আসবার চেষ্টা করছে সে ব্যতিত বাকী সবাই গুনাহগার হবে। ইজতিহাদ ফিরিয়ে নিয়ে আসবার জন্য কর্মরত লোকদের কাজ অন্যদের পাপমুক্ত করবে না-ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ ইজতিহাদ বাস্তবায়িত না হয়। যখন ইজতিহাদ শুরু হবে তখন সবাই এ ব্যাপারে পাপমুক্ত হয়ে যাবে। একই কথা ইসলামী খিলাফত রাষ্ট্র বাস্তবায়নের ব্যাপারে প্রযোজ্য। খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজের সাথে যুক্ত নয় এমন প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে গোনাহগার হবে। এসময় প্রতিষ্ঠার কাজে রত ব্যক্তিদের প্রচেষ্টার কারণে অন্যরা পাপমুক্ত হবে না-যতক্ষণ না খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। 'আল ফিকরুল ইসলামী' (ইসলামী চিন্তা) নামক বইয়ের 'ফরযে কিফায়া সব মুসলিমের উপর ফরয' শীর্ষক অধ্যায়ে এ বিষয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

'যতক্ষণ না যে কাজের জন্য বাধ্যবাধকতা রয়েছে সে কাজটি সম্পন্ন হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বাধ্যবাধকতা থেকে দায়মুক্ত হওয়া যাবে না। যে ব্যক্তি একে অবহেলা করল সে পরিত্যাগের কারণে শাস্তি ভোগ করবে। যখন সে দায়িত্ব পালন করবে তখন দায়মুক্ত হবে। এক্ষেত্রে ফরযে আইন ও ফরযে ক্বিফায়ার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। সব মুসলিমের উপর এটি তখন ফরয হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**'তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে.........'** (সূরা তাওবাহঃ ৪১)

এটি একটি ফরযে ক্বিফায়া এবং এই আমলটি সিদ্ধান্তগ্রহণকারী (তালবান যাজিমান)। সুতরাং ফরযে আইন ও ফরযে ক্বিফায়ার মধ্যে পার্থক্য করা একটি অপরাধ এবং আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার নামান্তর ও আল্লাহর হুকুম মানার ক্ষেত্রে আত্মতুষ্টি থেকে উদ্ভুত প্রবঞ্চণা। ব্যক্তির উপর দায়িত্বের অব্যাহতির দৃষ্টিতে বলতে গেলে, ফরযে ক্বিফায়া ও ফরযে আইনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কাজটি যতক্ষণ না সম্পন্ন হবে ততক্ষণ কোন ব্যক্তি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে না হোক তা ব্যক্তি পর্যায়ের যেমনঃ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা অথবা সব মুসলিমের উপর যেমনঃ খলিফার প্রতি বায়াত প্রদান করা। এদের কোনটি থেকে দায়মুক্ত হওয়া যাবে না যতক্ষণ না এগুলো প্রতিপালিত হয়, অর্থাৎ নামাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ও খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একজন খলিফাকে বায়াত প্রদান করা হয়। সুতরাং ফরযে ক্বিফায়ার দায়বদ্ধতা থেকে প্রত্যেক মুসলিম ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহতি পাবে না যতক্ষণ কিছু লোক চেষ্টা করতে থাকে এবং পরবর্তীতে সেটি সম্পন্ন হয়ে যায়। কাজটি যতক্ষণ না সম্পন্ন হবে ততক্ষণ প্রত্যেক মুসলিম গোনাহগার হতে থাকবে। সুতরাং ফরযে ক্বিফায়া হল সে ইবাদত যা কেউ আদায় করলে অন্যরা গোনাহমুক্ত হয়ে যাবে-এ কথা বলা সম্পূর্ণরূপে ভুল। বরং ফরযে ক্বিফায়া হল সে ইবাদত যা কেউ সম্পন্ন করবার পর বাকী সবাই গোনাহমুক্ত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ফরযে ক্বিফায়া হল ফরযে আইনের মতই। সুতরাং খিলাফত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব সব মুসলিমের অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিমের উপর এটা ফরয। খিলাফত বাস্তবায়নের আগ পর্যন্ত এ দায়িত্ব থেকে কোন মুসলিম অব্যাহতি পেতে পারে না। এ ব্যাপারে দায়িত্ব প্রত্যেক ব্যক্তি মুসলমানের উপর ও গোনাহগারও প্রত্যেক ব্যক্তি মুসলিম হবে। যে

কাজের মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে সে কাজে অংশগ্রহণের আগ পর্যন্ত একজন মুসলিম গোনাহমুক্ত হবে না এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত তাকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সুতরাং যে কোন ফরয়ে ক্বিফায়া ততক্ষণ পর্যন্ত ফরযে আইন থাকে যতক্ষণ না উক্ত কাজটি সুসম্পন্ন হয়।'

ফরযে আইন ও ফরয়ে ক্বিফায়ার বিষয়টি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হওয়ার পর আল্লাহসুবহানাহু ওয়া তা'আলার সামনে দোষমুক্ত অবস্থায় দন্তায়মান হবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি মুসলিম ফরযে আইন যেমনি **বাস্তবায়ন** করবে তেমনি ফরযে কিফায়া বাস্তবায়নের জন্যও নিজেকে শরীক করবে।

## বাধ্যবাধকতার মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা

ফরযসমূহ পালনের ব্যাপারে রয়েছে শরীয়াহ নির্ধারিত অগ্রাধিকার। যখন মুসলিমগন সব ধরনের ফরযে আইন ও ফরযে ক্বিফায়া সঠিকভাবে সুসম্পন্ন করতে পারছে তখন কোন সমস্যা নেই। তবে যখন দ্বন্দ শুরু হয় তখন ফরযে আইন ফরযে ক্বিফায়ার উপরে প্রাধান্য লাভ করে। আবার যদি ফরযে আইন আমলসমূহের মধ্যে দ্বন্দ তৈরি হয় তখন শরীয়ার ভিত্তিতে প্রাধান্য নির্ধারণ করতে হবে, মনের ভিত্তিতে নয়। যেমন পরিবারের নাফাকা (ভরণপোষণ) ঋণ পরিশোধের উপর এবং ঋণ পরিশোধ হজ্জের জন্য টাকা জমা দেয়ার উপর প্রাধান্য লাভ করে। রমযানের রোজা নদরের (প্রতিশ্রুত) রোজার উপর প্রাধান্য লাভ করে। জুম্মার নামায কারও প্রতি প্রতিশ্রুতি রক্ষার উপর প্রাধান্য লাভ করে ইত্যাদি.... ইত্যাদি। ফরযে ক্বিফায়া বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও যদি কোন দ্বন্দ হয় তখনও শরীয়ার ভিত্তিতে প্রাধান্য নির্ধারণ করতে হবে, মনের ভিত্তিতে নয়। এই ক্ষেত্রটি বিস্তৃত ও জটিল। এর কারণ হল অনেক ফরযে ক্বিফায়া রয়েছে যা সম্পন্ন করা খরচ সাপেক্ষ ও জটিল। আবার কিছু রয়েছে শ্রম ও সময়সাপেক্ষ। সংখ্যায় অনেক হওয়ার কারণে মুসলিমদের পক্ষে সবগুলো পালন করা সম্ভবপর নাও হতে পারে। সে কারণে তাকে কিছুর উপর অন্য কিছু ফরযে ক্বিফায়াকে প্রাধান্য দিতে হবে। কোনগুলো সে প্রতিপালন করবে এবং কোনগুলো সে পরিত্যাগ করবে তা খেয়ালখুশী, আকলী মূল্যায়ন বা ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসারে নির্ধারণ করা যাবে না। বরং এটা আইনগতভাবে হতে হবে যেখানে শরীয়াহ অগ্রাধিকার নির্ধারণ করবে। যার গুরুত্ব ক্বারা'ঈন (শরীয় দৃষ্টান্ত) থেকে স্পষ্ট হতে হবে।

## সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরযে ক্বিফায়া

যেমন ধরা যাক: যখন আমরা ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজটিকে ফরযে ক্বিফায়ার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি, তখন কুরআন ও সুন্নাহের ভিত্তিতে**ই** সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি।

**'যেসব লোক আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।'** (সূরা মায়েদাহ:৪৪)

**'যেসব লোক আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই জালেম।'**(সূরা মায়েদাহ:৪৫)

**'যারা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই ফাসেক (মিথ্যাবাদী)।'** (সূরা মায়েদাহ:৪৭)

**'অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক বলে মনে না করে।....'** (সূরা নিসা:৬৫)

**'আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না.....'** (সূরা মায়েদাহ:৪৯)

**'তারা কি জাহেলি যুগের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ্ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?'** (সূরা মায়েদাহ: ৫০)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ ও কোরআনের এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আয়াত ও হাদীসসমূহ প্রমাণ করে ইসলামী খিলাফত রাষ্ট্রের অপরিহার্যতা-যা আল্লাহ নাজিলকৃত বাণী দিয়ে শাসন করবে ।

যেসব আয়াতের মাধ্যমে হুদুদ বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে তাদের সংখ্যা অনেক।

**'যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও.............।'** (সূরা মায়েদাহ: ৩৮)

**‘ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ' করে বেত্রাঘাত কর।’** (সূরা আন নূর: ২)

**‘যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অত:পর স্বপক্ষে সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে...’** (সূরা আন নূর:৪)

**‘সে প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন; কিন্তু ন্যায়ভাবে। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দান করি.....’** (সূরা বনী ইসরাইল: ৩৩)

**‘যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচেছ এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিস্কার করা হবে।’** (সূরা মায়েদাহ:৩৩)

যারা মদ্য পান করে তাদের চাবুক দ্বারা আঘাত করা, বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করা, দাঁতের বদলা দাঁত, আঘাতের জন্য ক্বিসাস (অনুরূপ শাস্তি), ক্বিসাসের বদলে অর্থের বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ (আরস) এবং শরীয়া'তে যেসব অপরাধের ব্যাপারে নির্ধারিত শাস্তির বিধান নেই সেক্ষেত্রে তা'জীর বাস্তবায়ন করার ব্যাপারেও অসংখ্য হাদীস রয়েছে। এইসব আইন ও হুদুদ-যাদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশনা রয়েছে সেসব নির্ভর করছে আল্লাহ আইন দ্বারা পরিচালিত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর।

জিহাদ সম্বলিত কোরআনের আয়াতের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। যেমন:

**‘তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জেহাদ কর আল্লাহ্র পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে,......’** (সূরা তাওবাহ: ৪১)

**‘তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ্ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।’**(সূরা তাওবাহ:২৯)

**‘আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচেছ সমবেতভাবে।’** (সূরা তাওবাহ: ৩৬)

**‘আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহ্র সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।’**(সূরা আনফাল: ৩৯)

**‘আর প্রস্তূত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহ্র শুত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর ও যাদেরকে তোমরা জান না...’** (সূরা তাওবাহ: ৬০)

উপরোক্ত আয়াত ও জিহাদের সাথে সংশিষ্ট অসংখ্য হাদীস অনুসারে জিহাদ করতে হলে আল্লাহর বিধান দ্বারা পরিচালিত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা অপরিহার্য। এরকম অনেক হাদীস রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে জিহাদ ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত চলতে থাকবে এবং ন্যায়নিষ্ঠ লোকের ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায়হীন লোকের অন্যায় এটাকে বন্ধ করতে পারবে না। অন্য কথায় মুসলমানদেরকে তখনই জিহাদে ঝাপিয়ে পড়তে হবে যখন এ ব্যাপারে আহ্বান করা হবে-তখন ইসলামী রাষ্ট্র থাকুক বা না থাকুক এবং জিহাদে আহ্বানকারী আমীর পাপিষ্ঠ বা ত্বাকওয়াসম্পন্ন যাই হোক। তবে এখনকার শাসকগন জিহাদে রত নেই এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবার জন্য তারা কোন নির্দেশও প্রদান করে না। বরং তারা মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করবার জন্য নির্দেশ দেয়। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত এটা করতে থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ ও বিচার দিবসে বিশ্বাসীরা জেগে উঠতে পারবে ও কুফরী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উৎপাটন করে আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে।

বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়া ও মুসলিমদের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হওয়ার ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে:

**‘তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে....।’** (সূরা আল ইমরান:১১০)

**'শক্তি ও সম্মান তো আল্লাহ্ তাঁর রসূল ও মুমিনদেরই কিন্তূ ......।'** (সূরা আল মুনাফিকুন:৮)

**'..... কিছুতেই আল্লাহ্ কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না...।'** (সূরা আননিসা:১৪১)

**'এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও...।'** (সূরা বাক্বারা:১৪৩)

কীভাবে বিশ্বাসীরা সম্মানিত হবে এবং কাফেররা কোন পথ পাবে না, যখন মুসলিমদের কোন রাষ্ট্র নেই? কীভাবে তারা অন্যজাতিকে সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে যখন তারা নিজের ঘরে তা করতে অক্ষম। এসব কাজ আল্লাহ প্রদত্ত বিধান দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়া মোটেই সম্ভব নয়।

মুসলমানদের একজন ইমাম থাকার ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস রয়েছে-যাকে তারা আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহের উপর বায়াত দেবে:

"যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল যে, তার কাঁধে (কোন খলীফার) বাই'আত নেই, সে যেন জাহেলী মরণ মরল।"(মুসলিম শরীফ)

'ইমাম হচ্ছে ঢালস্বরূপ, যার পেছনে থেকে মুসলিমগন জিহাদ করে ও আত্মরক্ষা করে।'(মুসলিম শরীফ)

**'যদি কোন ব্যক্তি তার আমীরের মধ্যে এমন কিছু দেখে যা ঘৃণ্য, তাহলে সে যাতে এ ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে। এটা একারণে যে, যদি কোন ব্যক্তি জামায়াত বা দল থেকে নিজেকে এক হাত পরিমাণও সরিয়ে নিল এবং এ অবস্থায় মারা গেল, সে যেন জাহেলিয়াতের সময়কার মৃত্যু বরণ করল।'** (মুসলিম শরীফ)

সাহাবী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর মৃত্যুর পর একজন উত্তরসুরী খলিফা নির্বাচনের ফরযিয়াতের ব্যাপারে ইজমা বা ঐকমত্যে পৌছেছিলেন। তারা আবু বকর, উমর, উসমান ও আলীকে পর্যায়ক্রমে পূর্ববর্তী খলিফার মৃত্যুর পর তার (রা) স্থলাভিষিক্ত করবার ব্যাপারে একমত ছিলেন। প্রত্যেক সাহাবা তার পুরো জীবন ধরে একজন খলিফা নিয়োগের বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে সুনিশ্চিত ছিলেন। কে খলিফা হবেন এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে অনৈক্য থাকলেও একজন খলিফা নিয়োগের ব্যাপারে একমত ছিলেন।

একইভাবে মুসলিমদের জীবনের জন্য ইসলামিক সমাজে অত্যাবশ্যকীয়, যেমনঃ শিল্পকারখানা, ঔষধ, হাসপাতাল, গবেষণাগার, জ্বালানী উৎপাদন এবং অন্যান্য সামষ্টিক অপরিহার্যতা অর্জনের ক্ষেত্রেও সব মুসলিম সমান দায়িত্ব পালন করবে। যা হোক এ সমস্ত বিষয়সমূহ একটি পূর্ণাঙ্গ উপায়ে নিশ্চিতকরন যা সমৃদ্ধ ইসলামী জীবনের জন্য অপরিহার্য - যার একদিক নির্ভর করে আল্লাহ্ (সুব) তায়ালার দাসত্ব অন্যদিক নির্ভর করে মুসলিমদের শক্তি সামর্থ ও দাওয়া প্রচারের উপর – তা রাষ্ট্রীয় কাঠামো ছাড়া পালন সম্ভবপর নয়, যে কাঠামো এ সমস্থ বিষয়াদি ইসলাম এবং তার উদ্দ্যেশ্যের সাথে মিল রেখে কার্যকরভাবে তত্তাবধান করবে।

একইভাবে জনগন যাতে শরীয়াগত বাধ্যবাধকতা পালনে সচেষ্ট থাকে-এ ব্যাপারে ইসলাম শাসকদের দায়িত্ব প্রদান করেছে। ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া শাসকের সাথে বিজড়িত হুকুমসমূহ অকার্যকর হয়ে পড়ে। আবার জনগন যখন এইসব হুকুমসমূহ পালন করতে যাবে তখন তাদের বাধ্য করবার জন্য রাষ্ট্র ছাড়া তারা কোন শাসক পাবে না। তখন জনগনের দায়িত্বের সাথে সম্পৃক্ত সব হুকুম অকার্যকর হয়ে পড়ে। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মানবজীবনের উপর ইসলামের বাস্তব প্রয়োগের জন্য অন্যতম একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। যখন এ ভিত্তি থাকে না তখন অনেক হুকুমসমূহ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ইসলামের অনেক বাণী বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। মুসলিমরা তখন তাদের সম্মান হারিয়ে ফেলে, ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তাদের ভূমি বেদখল হয় ও শত্রুগন আধিপত্য বিস্তার করে ও মুনকারাত বিস্তৃতি লাভ করে-যা আজকে হচ্ছে।

## ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়

ভাবতে খুব আশ্চর্যজনক লাগে যখন লোকজন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে মুসলিমদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলামী খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজটিকে সাধারণ শরীয়া দায়িত্ব মনে করে এবং এটিকে অন্য হুকুমের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে না।

এমনকি আরও বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করা যায় যে, অনেক মুসলিমগন শরীয়া বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বশীল খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ না করে বর্তমান শাসনব্যবস্থার মধ্যে শরীয়া হুকুম বাস্তবায়ন করতে চায়।

সুতরাং আমরা অবশেষে বলতে পারি যে, সামষ্টিক দায়িত্বসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অনিবার্য বাধ্যবাধকতা হল ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা-যা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত হয়। আজকে মুসলিমদের একটি অংশ এ দায়িত্ব পালন করছে। তবে তারা অপরিহার্যতা পূরণে সক্ষম নয়। কেননা ইসলামী রাষ্ট্র এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। একারণে পুর্বের আলোচনার মত এ সামষ্টিক বাধ্যবাধকতাটি ব্যক্তিপর্যায়ের বাধ্যবাধকতা হিসেবে পরিগণিত হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিমকে তার সামর্থ অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে হবে।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা) সঠিক ও সুনির্ধারিত পদ্ধতি হল যে, মুসলিমগন আল্লাহ নির্দেশিত ফরযে আইনসমূহ সর্ম্পকে শিক্ষা নিবে। সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কতৃক নির্দেশিত নিষেধসমূহ সর্ম্পকেও জ্ঞান অর্জন করবে। তারপর তাকে সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা বা ফরযে কিফায়ার দিকে যেতে হবে এবং তার সামর্থ অনুযায়ী সেগুলো সম্পাদনের অংশগ্রহণ করতে হবে। জ্ঞানার্জনের পর আমাদেরকে সবচেয়ে বড় সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে-যা ইসলামের অধিকাংশ সামষ্টিক ও ব্যক্তিপর্যায়ের হুকুম বাস্তবায়নের পদ্ধতি।

এইভাবে একজন মুসলিম নিজেকে বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুত করে যেখানে সে তার কৃতকর্মের জন্য আল্লাহসুবহানাহু ওয়া তা'আলার সামনে জিজ্ঞাসিত হবে। কারণ সে ব্যক্তি পর্যায়ের সকল বাধ্যবাধকতা পালন করেছে ও নিষিদ্ধ কর্মকান্ড থেকে বিরত থেকেছে। তিনি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা পালন করেছেন-যা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনেক বাধ্যবাধকতা পালন না করার গোনাহ থেকে মুক্ত হয়েছেন। এ উপায়ে মুসলিমগন সব দিক দিয়ে সত্যকে ধারণ করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ সে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যাতে করে তার ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয। তিনি এমন ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছেন যাতে সমাজের মধ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি অন্যকিছু যা এখন পর্যন্ত গ্রহন করা হয়নি তা হয়ত হবে সামষ্টিক বাধ্যবাধকতার খুবই সামান্য অংশ। এই ধরনের বাধ্যবাধকতার প্রকৃতি সামষ্টিক নয় (**যেমন,** হাঁচি দিলে কারও জন্য দোয়া করা বা কারও জানাযার নামাজ আদায় করা) বরং ব্যক্তিপর্যায়ের।

## মা'রূফ ও মুনকারের জ্ঞান

মা'রুফের আদেশ ও মুনকারের নিষেধের জন্য এর জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যকীয়। জ্ঞান সবসময় বিধিনিষেধের আগে আসে। জ্ঞান ব্যতিরেকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ সম্ভবপর নয়। সুতরাং একজন মুসলিমের জন্য শরীয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে কতটুকু জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য?

এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, কাজের আগে কাজের ব্যাপারে জ্ঞান অগ্রগন্য। আবার কাজটিও শরীয়া জ্ঞান অনুসারে হতে হবে। আর না হয় কাজ আল্লাহর ইবাদত হবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একজন মুসলিমকে মা'রুফাত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং একারণে এ সর্ম্পকিত জ্ঞান থাকা বাঞ্চণীয়। একইভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একজন মুসলিমকে মুনকারাত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং একারণে এ সর্ম্পকিত জ্ঞান থাকা বাঞ্চণীয়।

সুতরাং উপাসনা, আনুগত্য ও পালনের জন্য জ্ঞানের অপরিহার্যতা অপরিসীম। নিছক জ্ঞানার্জনের জন্য জ্ঞানার্জন নয়, বরং আনুগত্য ও ইবাদতের জন্য জ্ঞানার্জন জরুরী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

**'বস্তুতঃ আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশানুযায়ী তাঁদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়।'** (সূরা নিসা:৬৪)

আবদুল্লাহ বিন আল মুবারক (র) এর মতে, 'আমরা সাধারণত জ্ঞানার্জনের জন্যই জ্ঞান অন্বেষন করি। কিন্তু স্বয়ং জ্ঞানই আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নিমিত্তে হতে নারাজ।' উপাসনা ও আনুগত্য কেবলমাত্র এ জন্যই। এ দু'বিষয়ের জ্ঞান এর সর্বনিম্ন সীমার মাধ্যমে অর্জন করা যায়, যেমন: তাকলীদ এবং এর সর্বোচ্চ সীমা হল ইজতিহাদ। উভয়ই ভাল যখন তা পালিত হয় ও আনুগত্যের জন্য উপলব্ধি করা যায়। যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে, সে সালাতের রুকন ও শর্তসমূহ পালন করে এবং এ ইবাদতকে প্রতিষ্ঠিত করে সেভাবে যেভাবে করতে বলা হয়েছে। যাহোক বাস্তবতা হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজস্ব ইজতিহাদ এবং জ্ঞান অর্জনের পন্থায় ইবাদত করেনি সে জ্ঞানের উৎকর্ষতা থেকে সীমাবদ্ধ করবে: এই উৎকর্ষই হচ্ছে জ্ঞান যার মাধ্যমে আল্লাহ্ মুসলিমদের বিভিন্ন মাত্রায় উথান ঘটান। মুকাল-ীদ হিসেবে ইবাদত সম্পন্ন করার অর্থ হল সম্পন্নকারী ব্যক্তি মুত্তাকী ও শরীয়ার

জ্ঞানসম্পন্ন যাকে মনে করবে তার কাছ থেকে হুকুম গ্রহণ করবে। অর্থাৎ তার ঐ ইসলামী চিন্তাবিদের প্রতি সন্দেহমুক্ত ধারণা থাকবে যে, তিনি সঠিক ও আল্লাহর আনুগত্যের অধিকতর নিকটবর্তী। একইভাবে একজন মুতাব্বী হিসেবে যিনি ইবাদত করেন তিনি দলিলসহ আরেকজনকে অনুসরণ করেন এবং একারণে তিনিও একজন মুকালি- দ। তবে তিনি একজন আম্মী অর্থাৎ দলিল ব্যতিরেকে তাকলীদকারীর চেয়ে উচুস্তরের মুকাল-ীদ। উভয়েই অন্যের কাছ থেকে হুকুমটি গ্রহণ করেছেন এবং আনুগত্য ও ইবাদতকে উপলব্ধি করেছেন। মুজতাহিদের স্থান সর্বোচ্চ ও পদমর্যাদায় অগ্রগামী। তিনি নিজেই আল্লাহ প্রদত্ত বাণী ও শরীয় দলিল থেকে হুকুম বের করে নিয়ে আসেন।

## আমলের সাথে জড়িত জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরযে আইন

মুকাল- াফ (আইনগতভাবে দায়িত্বশীল ব্যক্তি) এর ক্ষেত্রে শরীয়া বিধান অনুযায়ী, প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমের উপর তার জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করা ফরয। কারণ তাকে অবশ্যই আল্লাহ প্রদত্ত বিধিনিষেধ অনুযায়ী সব কাজ সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু এটা কখনওই তার কাজের সাথে সম্পৃক্ত শরীয়া জ্ঞান অর্জন ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয়। সুতরাং মুসলমানের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শরীয়া জ্ঞান অর্জন করা ফরযে আইন এবং এটা কখনও সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা নয়। আর এর চেয়ে বেশী কিছুই হল মুস্তাহাব। যখন সে সালাত আদায় করবে তখন তাকে অবশ্যই সালাত আদায়ের পদ্ধতি জানতে হবে। যদি তার সম্পদ নিসাব অতিক্রম করে থাকে ও একবছর পূর্ণ হয় তাকে অবশ্যই যাকাত দিতে হবে। তাকে অবশ্যই জানতে হবে সম্পদের কত অংশ যাকাত হিসেবে দিতে হবে। সম্পদ স্বর্ণ বা রৌপ্য হলে তাকে অবশ্যই যাকাত দেয়ার পদ্ধতি ও গ্রহীতাদের সর্ম্পকে জানতে হবে। কিন্তু সে যদি ফল বা ফসলের যাকাতের ব্যাপারে কিছু না জানে তাহলে কোন সমস্যা নেই। তবে যদি সে এসব সর্ম্পকে জানে তাহলে সে নেক কাজ করল এবং এর জন্য পুরস্কৃত হবে। সে যদি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজ করে তাহলে তাকে শিখতে হবে এটা প্রতিষ্ঠার জন্য কী করতে হবে। সুতরাং সব বাধ্যবাধকতা পালনকারীর দায়িত্ববোধ ও সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত।

এভাবে একজন মুসলিম তার ঈমানের বিশুদ্ধতা এবং ইসলাম পালনের বাধ্যবাধকতা সর্ম্পকে নিশ্চিত হতে পারে।

যদি এ বাসনা কেবলমাত্র তার প্রভুর জন্য হয় ও সে সঠিক পথে নির্দেশিত হয় তাহলে সে অবশ্যই এমন একজন করুণাময় প্রভূকে পাবে যিনি আমলসমূহকে কবুল করবেন এবং ক্বিয়ামত দিবসে তাকে রক্ষা করবেন।

## দ্বিতীয় দিক : সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজের নিষেধ

আমরা ইতোমধ্যে বলেছি যে, ইসলাম সব মারুফ ও মুনকারকে আমাদের সামনে পরিষ্কার করেছে এবং একজন মুসলিমকে অবশ্যই সব মারুফ মেনে চলতে হবে এবং মুনকার থেকে বিরত থাকতে হবে। এখানে যে প্রশ্নটি খুব বেশী শোনা যায়, সেটি হল একজন মুসলিমকে সে যেসব মারুফ মেনে চলে তার আদেশ করবে, নাকি এর অধিকাংশ কিংবা কম? একই প্রশ্ন মুনকার থেকে নিষেধ করার ক্ষেত্রেও উত্থিত হয়।

এ ব্যাপারে কথা বলবার আগে আমাদের অবশ্যই এ বাস্তবতা বুঝতে হবে যে, শরীয়া এগুলোকে কীভাবে অনুধাবন করতে বলে। শরীয়া মনে করে এমন একটি ইসলামী সমাজ কায়েম হবে যেখানে এমন একটি ধারণাও গ্রহণ করা হবে না যা শরীয়ার ধারণার বিরুদ্ধে যাবে, একটি কর্মকান্ডও গৃহীত হবে না যা শরীয়ার সাথে সাংঘর্ষিক হবে। প্রত্যেক মুনকারকে প্রতিরোধ ও শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা হবে। এককথায় হুকুম ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত সব নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে। যত মুনকার সংঘটিত হয়েছে এবং হতে পারে সবই প্রতিহত করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিমদের এ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এ কাজটিকে অত্যন্ত মহিমান্বিত করেছেন ও এর জন্য বড় পুরষ্কার বরাদ্দ করেছেন। ইমাম গাজ্জালী (র) তার বই 'ইয়াহইয়াউল উলুম উদ **দ্বীন** ' এ বলেন, 'আম্মা বাদ, অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজে নিষেধ করা হল দ্বীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদ। এই মিশন দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রত্যেক নবী রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। এ কাজ যখন বন্ধ হয়ে যায় বা অবহেলিত হয় তখন নবুয়্যত পরিত্যক্ত হয়, দ্বীন বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়, দ্বীনহীনতার কার্যকাল বলবৎ হয়, পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতা ব্যাপকতর হয়, দূর্নীতি বিস্তার লাভ করে, জান ও মালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়।'

## যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিবেদিত

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাবার পূর্বে আমরা জানার চেষ্টা করব শরীয়ার হুকুম সমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব কাদের উপর বর্তায়। উম্মাহর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তি, দল ও শাসকবৃন্দ। প্রত্যেক অংশের উপরে রয়েছে শরীয়াহ প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব। তারা যে বিষয়ে নিবেদিত সে বিষয়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিলে তাদেরকে উপদেশ, জবাবদিহিতা এবং সংশোধনের

আওতায় আনতে হবে। যদি এ বিষয়টি বুঝবার বাস্তবতা আমাদের কাছে পরিষ্কার না হয় তাহলে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ফরয দায়িত্ব পালনে জটিলতার সৃষ্টি হবে। একারণে আমরা নীচের কথাগুলো বলতে পারি।

শরীয়ার কিছু কিছু দায়িত্ব কেবলমাত্র খলিফার উপরে বর্তায়- এছাড়া অন্য কারও উপর নয়। আরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে যা ব্যক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট এবং ব্যক্তি পালনে অপারগ হলে খলিফা সেগুলো পালন করবে। আবার খলিফার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব রয়েছে যা ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তি সেগুলো পালন করতে পারে। দলের জন্য রয়েছে কিছু নিয়মনীতি।

ব্যক্তির উপর অর্পিত দায়িত্ব সমূহের মধ্যে রয়েছে: নামাজ পড়া, সাওম পালন করা, হজ্জ পালন করা, যাকাত প্রদান করা এবং নিষিদ্ধ জিনিষ থেকে বিরত থাকা, যেমন: মদ্যপান করা, জুয়া খেলা, সুদ, চুরি, হত্যা, ব্যভিচার, ধর্মত্যাগ, মিথ্যা, প্রতারণা, গীবত করা ইত্যাদি। মুসলিমগন দারুল কুফর ও দারুল ইসলাম বা ইসলামী এবং কাফের রাষ্ট্র যেখানেই বসবাস করুক না কেন তাদের এগুলো মানতেই হবে। এক্ষেত্রে একজন মুসলিম কেবলমাত্র মক্কা বা কেবলমাত্র মদীনাতে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তার সাহাবীগন কী কাজ করেছে সে ব্যাপারে চিন্তা করবে না। ইবাদত (উপাসনা), মুয়ামালাত (লেনদেন), মা'তুমাত (খাদ্যদ্রব্য), মালবুসাত (পোষাকপরিচ্ছদ), আখলাক (চরিত্র) এবং অন্যান্য ইসলামী বিশ্বাসসমূহ-এ সব সর্ম্পকিত শরীয়া নীতিমালা ব্যক্তিপর্যায়ের। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পরিবার সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করা হবে-যেখানে তিনি একজন ওয়ালী (অভিভাবক)। দারুল কুফরের শাসক যদি কোন মুসলিমকে তার ব্যক্তি পর্যায়ের শরীয় হুকুম পালনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তাহলে রায় হচ্ছে তাকে অবশ্যই অন্য কোন দারুল কুফর বা দারুল ইসলামে হিজরত করতে হবে। এ সর্ম্পকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**'যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলেঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান। কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, তারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না।'** (সূরা নিসাঃ ৯৭-৯৮)

একজন ব্যক্তির জন্য দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করা **মুস্তাহাব**(প্রাধিকারযোগ্য) হবে যদিও বা সে শরীয়া দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয় অন্যথায় সে  দারুল কুফরকে দারুল ইসলামে পরিণত করবার জন্য সেখানে থাকবে। এটা সর্বজনবিদিত যে, দারুল ইসলাম হল সে রাষ্ট্র যা ইসলাম দিয়ে শাসিত হয় ও এর নিরাপত্তা মুসলিমদের দ্বারা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

ব্যক্তির উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে খলিফা সে দায়িত্ব পালন করবে এমন দায়িত্বের উদাহরণ হল: একজনের ভরণপোষণ ও দেখভালের দায়িত্ব যখন অপর আরেকজন ব্যক্তির উপর অর্পিত হয় এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি অপারগ হন তখন খলিফা সে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিংবা অধিবাসীরা অপারগ হলে গ্রামে মসজিদ নির্মাণ করা বা শহরে বসতি গড়ে দেয়া....ইত্যাদি।

কিছু দায়িত্ব রয়েছে যা কেবলমাত্র আমীর বা খলিফার উপর বর্তায় এবং এর জন্য ব্যক্তি কোনভাবেই দায়িত্বশীল নয়। এগুলো হল হুদুদ বাস্তবায়ন করা, জিহাদ ঘোষণা করা, চুক্তি সম্পাদন করা বা আইন গ্রহণ করা এবং অন্যান্য বাধ্যতামূলক কাজসমূহ সম্পাদন করা। উল্লেখিত শরীয়া কর্তব্যসমূহ ও আর কিছু বিষয়ে শাসকগন দায়িত্বশীল।

খলিফার উপর অর্পিত কিছু দায়িত্ব ব্যক্তিও পালন করতে পারেন; তা কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন:জিহাদ। যদি কাফেরদের দ্বারা মুসলিমগন অকস্মাৎ আক্রান্ত হয়, তখন খলিফার অনুমতির অপেক্ষা না করে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়া মুসলিমদের জন্য ফরয। এমনও হতে পারে সেসময় তাদের কোন খলিফা নেই। শাসক যদি ফাযীরও হন এবং লোকবল সংখ্যায় কম থাকে তারপরেও জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে। যা হোক মূলকথা হল, মুসলিমরা সর্বশেষ এ বিষয়টি মেনে নেবার সুযোগ নেই, অর্থাৎ খিলাফত থাকবে না এবং তারা ফাযীর নেতার অধীনে  থাকবে।

দলের উপর অর্পিত শরীয়া দায়িত্ব হল খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা, শাসকদের জবাবদিহীতার আওতায় নিয়ে আসা, তাদের সত্যবিমুখতা থেকে ফিরিয়ে হক্বের পথে নিয়ে আসা ইত্যাদি। কোন ইসলামী দল, প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর কর্তব্য এর আওতায় পড়ে।

কাকে কী ধরনের শরীয়া দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তা পরিষ্কার করা জরুরী। কেননা এ জ্ঞান সর্ম্পকে অজ্ঞতা ও অবহেলা ব্যক্তি বা একটি আন্দোলনকে শরীয়া বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্ধভাবে অনুকরণ করতে প্ররোচিত করতে পারে। এভাবে মুসলিমগন সঠিক দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও এর কার্যকর প্রয়োগের ব্যাপারে বিভ্রান্ত হতে পারে। ফলস্বরুপ, মুসলিমরা দায়িত্বের

বাধ্যবাধকতাকে অবহেলা করবে এবং মানদুবাত (অনুমোদনযোগ্য কর্মগুলো) নিজের মত করে করবে। কর্তব্যের বিভিন্ন ভাগসমূহ সম্পর্কে না জানবার কারণে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ও দলের সদস্য হিসেবে অর্পিত শরীয়া দায়িত্বের বদলে দলটি ব্যক্তিপর্যায়ের দায়িত্ব নিয়ে অধিকতর সচেতন হবে। ইসলামী পন্ডিতগন তখন লোকদের সাথে ব্যক্তিপর্যায়ের শরীয়া দায়িত্ব নিয়েই বেশী আলোচনা করবে, যেমন: সালাত, যাকাত, রোজা অথবা গীবত থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা নিয়ে তারা আলোচনা করবে না, যেমন: ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। তিনি একজন ধার্মিক বা ভৎসনাকারী ব্যক্তি হতে পারেন। তবে তিনি এমন কোন রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন ইসলামী পন্ডিত হবে না যিনি উম্মাহের সাম্প্রতিক সমস্যা নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন এবং এ ব্যাপারে সমাধানে উপনীত হয়েছেন ও এর জন্য কাজে নেমে পড়েছেন।

প্রত্যেক ভাগের জন্য নির্ধারিত শরীয়া দায়িত্ব অবশ্যই পালিত হতে হবে। দায়িত্বে অবহেলা দেখা দিলে অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ দিতে হবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে হবে। যে দায়িত্ব কাউকে দেয়া হয়নি তার জন্য সে জবাবদিহীতার সম্মুখীনও হবে না। সে কারণে শরীয়ার বাস্তবায়নও কেবলমাত্র একটি অংশের উপর বর্তায় না। পুরো উম্মাহকে পূর্ণাঙ্গ শরীয়াহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তি ব্যক্তিপর্যায়ের, দল সামষ্টিক ও খলিফা তার উপর অর্পিত শরীয়া দায়িত্ব যখন সুসম্পন্ন করবে তখন ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হবে।

এখানে আমরা একটি বিষয়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই যে, প্রত্যেকটি মুসলিমকে পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীনভাবে ইসলামের উপর আস্থা স্থাপন করতে হবে। তবে সে তার প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেকটি বিষয় **বিস্তারিতভাবে** গ্রহণ করবে। ব্যক্তি তার প্রয়োজন অনুসারে এবং দলের সদস্যগন তার কাজের জন্য সামষ্টিকভাবে। এ দায়িত্বসমূহের কোনটির ব্যাপারে তার অবহেলার জন্য সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে জবাবদিহি করবে। তাকে ব্যক্তিগতভাবে শরীয়া দায়িত্ব পালন করতে হবে। একই কথা খলিফার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ তিনি নিজে সালাত আদায় করেন, সাওম ও হজ্জ পালন করেন, পিতামাতার দেখভাল করেন এবং সুদ ও যিনা থেকে নিবৃত থাকেন। শরীয়া খলিফা হিসেবে তার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তাও তিনি পালন করেন। অর্থাৎ তিনি আইন পাশ করবেন, জিহাদের ঘোষণা দেবেন, মুসলিমদের ভূমি রক্ষা করবেন, আল্লাহর কালাম দিয়ে শাসন করবেন ও হুদুদ বাস্তবায়ন করবেন। এ ব্যাপারে যে কোন অবহেলার জন্য তিনি আখেরাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে জবাবদিহীতার সম্মুখীন হবেন এবং দুনিয়াতে উম্মাহ তাকে জবাবদিহি করবে।

এই বাস্তবতা মুসলিমদের কাছে পরিষ্কার করতে হবে যাতে তারা বুঝতে পারে কখন মুহাসাবা (জবাবদিহিতা) করতে হয়। এতে করে ব্যক্তি, দল ও খলিফা এমন কোন কিছুর জন্য জবাবদিহিতা সম্মুখীন হবে না যা তার জন্য নয়।

শরীয়া প্রত্যেক মুসলিমকে তার সক্ষমতা ও জ্ঞান অনুসারে সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজের নিষেধের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেছে। মুসলিমকে ব্যক্তি, দল ও শাসক হিসেবে এসব শরীয়া বাধ্যবাধকতা যে কোন পরিস্থিতিতে সম্পন্ন করবার জন্য শরীয়া নির্দেশ প্রদান করেছে। তখন ইসলামী রাষ্ট্র থাকুক বা না থাকুক, শাসক ইসলাম দিয়ে অথবা কুফর দিয়ে শাসন করুন না কেন কিংবা শাসকগন ইসলামিক আইনের সঠিক প্রয়োগ করুক বা অপপ্রয়োগ করুক না কেন। সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজের নিষেধ রাসূলুল্লাহ (সা), সাহাবীগন, তাবেয়ীন ও তাদের অনুসারীদের সময়ে বলবৎ ছিল। ক্বিয়ামতের আগ পর্যন্ত এটা বলবৎ থাকবে।

নিম্নোক্ত ব্যাখ্যানুযায়ী, যদি রাষ্ট্রে ,ব্যক্তি, দলে এমন কিছু ঘটে যেখানে সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নির্দেশ দেবার বাধ্যবাধকতা দেখা দেয় তবে রাষ্ট্রকে, ব্যক্তিকে এবং দলকে অবশ্যই তা সম্পন্ন করতে হবে।

ব্যক্তি পর্যায়ে, মুসলিমদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সব হুকুমগুলোর আদেশ করার এবং নিষেধাজ্ঞাসমূহ নিষেধ করার - যদি তাদের সামনে এমন কিছু ঘটে যা এ প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করে - বিষয়টি নিজেদের জ্ঞানানুযায়ী করবে। ফলে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রদান ফরযে আইন হয়ে যায় এবং না পালন করলে সে গোনাহগার হবে এবং এর জন্য কোন অজুহাত দাঁড় করাতে পারবে না। সেকারণে একজন মুসলিমকে তার প্রতিদিনকার জীবনে নিজের স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, খরিদ্দার, পরিচিত ব্যক্তি কিংবা যার সাথেই সাক্ষাৎ হোক না কেন প্রত্যেককেই নসীহা বা সদুপদেশ দিতে হবে যদি সে কোন শরীয়াগত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় বা যথার্থভাবে আনুগত্যশীল না হয়। এরূপ না হলে কী উপায় আছে, যেহেতু এমন হতে পারে যে কোন একটি পাপকার্য সংঘটিত হবার বিষয়ে হয়তো সে-ই কেবল জানে। যেমন, এই রকম পরিস্থিতি হতে পারে যখন অপরাধ সংঘটনের সময় সে ও অপরাধী ব্যক্তি ব্যতীত ঐ স্থানে আর কেউ ছিলনা। যদি সে মুসলিম দর্শক ঐ অপরাধীকে সে সময় সদুপদেশ প্রদান না করে, তাহলে সে অপরাধী হবে। কিন্তু এর জন্য অন্য কেউ পাপী হবে না, কারণ সে সময় তারা অপরাধের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না ও এ ব্যাপারে তারা জ্ঞাতও ছিলেন না। ঐ দর্শকের পরিমন্ডলে যত অপরাধ বা মুনকার সংঘটিত হবে, এর কোনটির জন্য তিনি ব্যতিরেকে আরও কেউ গোনাহগার হবেন না।

যখন একজন মুসলিম তার নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট আল্লাহ নির্দেশিত হুকুমসমূহ মেনে চলবে অর্থাৎ তার সাথে সম্পৃক্ত সৎ কাজ বা মারুফ সম্পন্ন করবে ও মুনকার বা অসৎ কাজ বর্জন করবে, তখন সে অন্যদেরকে সে হুকুমসমূহ সর্ম্পকে জানাতে পারবে। যদি তিনি এসব হুকুম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে গ্রহণ করেন তাহলে তিনি সেভাবে অন্যদের কাছে বহন করতে পারবেন। তিনি যদি একজন মুত্তবী' (যিনি দলিলসহ মতামত প্রদান করেন) হিসেবে এসব গ্রহণ করেন, তখন তিনি সেরকম উচ্চমানসহকারে তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দিবেন। আবার তিনি যদি ত্বাকলীদ বা অনুকরণ করে 'আম্মি (সাধারন ব্যক্তি) হিসেবে হুকুম গ্রহণ করেন তাহলে 'আম্মি (সাধারন ব্যক্তি) এর মতই তা বহন করবেন। যদি কোন ব্যক্তি অন্যদের বুঝানোর ব্যাপারে অপারগ ভাবেন তাহলে তাকে এমন কোন ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হবে যার বুঝানোর সক্ষমতা রয়েছে যেমন: কোন ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফতী বা এমন কোন দাওয়াত বহনকারী যার এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও উপলব্ধি রয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

**'আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার আদেশ দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে।'** (সূরা আত তাওবা : ৭১)

এবং তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন:

**'সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না।'** (সূরা মায়েদাহ: ৫)
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন:

**'পৌঁছে দাও যদিও বা তা একটি আয়াত হয়।'** (আল বুখারী)

তিনি (সা) আরও বলেন,

*'আল্লাহ তার সে বান্দার মুখকে উজ্জল করুন, যিনি আমার কথা শুনেছেন, উপলব্ধি করেছেন এবং এমনভাবে পৌছে দিয়েছেন যে রকম আমি বলেছি। হয়ত যিনি বহন করছেন তিনি একজন ফকীহ নাও হতে পারেন, কিন্তু যার কাছে বহন করা হচ্ছে তিনি বহনকারীর চেয়ে বুঝার ক্ষেত্রে শ্রেয়তর হতে পারেন।'* (আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ)

এভাবে একজন ব্যক্তি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন অর্থাৎ নিজে মারুফ সম্পন্ন করবেন ও মুনকার থেকে বিরত থাকবেন ও অন্যকে এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করবেন।

## জ্ঞানের অপরিহার্যতা

এখানে এটা সবার কাছে স্পষ্ট যে, জ্ঞান এবং সমসাময়িক মারুফ ও মুনকার সর্ম্পকে ওলেমাদের পরিষ্কার ধারণা প্রদান, লোকদের মারুফ সম্পাদন ও মুনকার বর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

আলেমগন হল সে ব্যক্তিবর্গ যারা অন্যদের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করে। তাদের ব্যক্তিগত ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানার্জন করা তাদের জন্য ফরয। এর অতিরিক্ত হিসেবে উম্মাহর উপর অর্পিত বাধ্যবাধকতা সর্ম্পকেও তারা জ্ঞান লাভ করে। সুতরাং জ্ঞানার্জন একটি সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা এবং উলেমাগন উম্মাহর পক্ষ থেকে তা সম্পাদন করেন ও এর জন্য তারা যথার্থ পুরষ্কার অর্জন করবেন। এই জ্ঞানার্জন করবার পরও তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে মাহরুম হতে পারবেন না। অন্যদের মত তাদেরও ব্যক্তি পর্যায়ের ইবাদত সমূহ সম্পাদন করতে হবে। এ দায়িত্বের একটি হল খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা। যদি কেউ উত্তরাধিকার আইনের উপরে একজন বিশেষজ্ঞ হন বা একজন তাফসীরকারক হন অথবা তালাক বা বিয়ের উপর শরঈ নীতিমালার উপরে একজন বিচারক হওয়া সত্ত্বেও তার উপর অর্পিত শরঈ ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও পুরো উম্মাহর সাথে সংশ্লিষ্ট সামষ্টিক দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ পাবেন না। কারণ আলেমগন এ উম্মাহর অংশ এবং তাদের কাছে কোন কিছু পৌছার অর্থ হল তা পুরো উম্মাহর কাছে পৌছে যাওয়া। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সাথে আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে, আলেমগন শরঈ এ দায়িত্ব (খিলাফত প্রতিষ্ঠা) পালনে অপারগতা প্রকাশ করছেন। এর জন্য তারা অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং উম্মাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবেন।

জ্ঞান হল আনুগত্য ও উপাসনার জন্য। জ্ঞান হল এমন জিনিস যা মানুষকে ত্বাকওয়া বা আল্লাহভীতির দিকে পরিচালিত করে।

**'আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে।'** (সূরা ফাতির: ২৮)

ইতিহাসে উলেমাদের আমরা সবকিছুর আগে খুঁজে পাই-হোক সেটা সালাত, জিহাদ, দাওয়াত পরিবহন, শাসকদের জবাবদিহী করা, কুফর ও স্রষ্টাবিহীন চিন্তাকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রে। লোকদের সঠিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করা ও সে অনুযায়ী কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে আমরা তাদের অগ্রদূত হিসেবে দেখতে পাই।

এটা কারও ভাবা ঠিক হবে না যে, ইসলামে উলেমাদের আনুষ্ঠানিক কোন অবস্থান আছে-যা ধর্মীয় পদবি বা অন্য কোন স্বতন্ত্র পদবি। অথবা তাদের জ্ঞানের কারণে লোকদের নির্দেশ দেয় এবং তারা তা মেনে নেয়। বরং তারা অন্য সাধারণ মুসলিমদের মতই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বর্ণণায় তারা এমনভাবে এসেছেন যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবীগন অর্ন্তভুক্ত হয়েছিলেন।

শরীয়া ওলেমা ও জ্ঞানের বাধ্যবাধকতা সত্য উপলদ্ধি ও পালনের নিমিত্তে সুনিশ্চিত করেছে। শরীয়ার জন্য তারা হলেন মাধ্যম। তাদের মাধ্যমে মুসলিম তার উপর প্রভূর অধিকার সম্বন্ধে অবগত হয়। তাদের উপস্থিতি হল একটি সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা। যদি তাদের উপস্থিতি না থাকে তাহলে পুরো উম্মাহ গুনাহগার হবে। কারণ এ অবস্থায় পুরো উম্মাহ জাহেলিয়াতের মধ্যে পতিত হবে। ফলে ইজতিহাদ হল একটি সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা। সুতরাং এরকম একটি সময় কোনক্রমেই থাকা উচিত নয় যখন কোন মুজতাহিদ নেই। আর না হয় পুরো উম্মাহ গোনাহগার হবে।

আগ্রহের দিক থেকে উম্মাহর স্বাভাবিক প্রবণতা হল উলেমাদের মতামতকে গ্রহণ করা বা গুরুত্ব প্রদান করা। একারণে উলেমাদের কোন ধরনের প্রলোভনে সাড়া দেয়া ঠিক হবে না-পদ বা অবস্থান চাওয়া, সঠিক জ্ঞান না থাকা সত্তেও কোন বিষয়ে ফতওয়া প্রদান করা, নফসের বশবর্তী হয়ে বা শাসককে সন্তুষ্ট করবার জন্য শরীয়াকে অসত্যভাবে উপস্থাপন করা সমীচীন নয়। যেহেতু শরীয়ার জ্ঞান হল মারুফ, সেহেতু এক্ষেত্রে মুনকার হল রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা), নেতৃত্বের মনোবাঞ্চা এবং সস্তা সুবিধা খোজা। সেকারণে আজকের দিনে শাসকের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য উলেমাদের ক্রীড়ানক হিসেবে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি পূরণের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। একারণে এদের জন্য টাকা ছিটানো হয়, সম্মানিত ইসলামিক পন্ডিত হিসেবে পদবী দেয়া হয়। তখন তারা লোকদের জন্য নজীর বা বিশিষ্ট মুফতী হয়ে যান-যাদের কাছে লোকেরা বিভিন্ন বিষয়ের সমাধানের জন্য আসেন। সেকারণে তারা এমন ফতওয়া প্রদান করে যাতে শাসক সন্তুষ্ট হয় এবং আল্লাহর ক্রোধের উদ্রেক করে। শরীয়াকে তারা শাসকের আওতাধীন ও ইচ্ছাধীন করে দেয়। সেকারণে যদি দেখা যায় শাসকগন সুদকে জায়েয ঘোষণা করে, ওলেমাগনও এটাকে জায়েয বলে এবং এর জন্য বাণীকে বিকৃত করবার প্রয়োজন হলে তাই করে ও যেরকম চায় সেরকমভাবে দলিলাদি উপস্থাপন করে। যদি শাসকগন কোন কারণে কাফির রাষ্ট্রের সহায়তা চায় তাহলেও উলেমাগন তাতেও সায় দেয়। যদি শাসকগন ইহুদীদের সাথে শান্তি চায় তারা সেটাতেও সম্মতি প্রদান করে। তারা হল আজ্ঞাবহ ইসলামী পন্ডিত-যাদের সাবধান করতে হবে। উম্মাহকে তাদের কর্মকান্ডসমূহ দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখান করতে হবে এবং শরীয়াকে বিকিয়ে দিয়ে তাদের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখা যাবে না। এই ধরনের লোক যারা নিকৃষ্ট শাসকদের প্রতি সহায়তার হস্ত প্রসারিত করে, তাদের সর্ম্পকে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন:

*'আমার উম্মাহর ব্যাপারে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশী ভয় করি তা হল মুনাফেক আলেম ব্যক্তি।'* (মুসনাদে আহমাদ)

এসব লোকদের প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করতে হবে-যাতে অন্যরা তাদের মিথ্যে ফতওয়ার স্বীকার না হয়। এরা তারাই যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে ক্রয় করে নিয়েছে।

যখন মুসলিম সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও পালন এবং মুনকার পরিত্যাগের আদেশ প্রদান ও বিরত থাকার মাধ্যমে এইসব কার্যাবলী সম্পাদন করে তখন তার ব্যক্তিগত জীবন ভাল হয়। তখন একজন মুসলিম নিজস্ব কলেবরে যেমনি আনুগত্যশীল হয় তেমনি অন্যদেরও এ ব্যাপারে উপদেশ প্রদান করে, একইভাবে সে যখন তার ব্যবসা ও আশেপাশের লোকদের সাথে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল আচরণ করে তখন দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা আগেও বলেছি, দ্বীনের প্রধান লক্ষ্য হল আনুগত্য প্রকাশ করা, সৎ কাজ ও মুনকার বর্জন ও সমাজের কোন দিক যাতে আল্লাহর হুকুম ব্যতিরেকে না চলে-হোক সেটা ব্যক্তি বা সামষ্টিক পর্যায়ের। সমাজ কেবলমাত্র কিছু ব্যক্তির সমষ্টি নয়, বরং এই ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হয়েছে কিছু বিশ্বাসের ভিত্তিতে-যা থেকে জীবনের সবক্ষেত্রের জন্য একটি ব্যবস্থা উদ্ভুত হয়। যদি ব্যক্তিগত দিকটি অর্জিত হয় তাহলে কেবলমাত্র একটি দিক অর্জিত হয়। কিন্তু তারপরেও আরও অনেক দিক রয়ে যায় যে ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার শরণাপন্ন হতে হয়। এসব ব্যক্তিকে খলীফার দ্বারা শাসিত হতে হবে যিনি বাস্তবতায় ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। খলিফা তলোয়ারের দ্বারা এ বাস্তবতা প্রতিস্থাপন করবেন যখন মুসলিমরা এই বাস্তবতায় আল্লাহর ভয়ে স্বেচ্ছায় আওতায় আসবে না। 'আল্লাহ অবশ্যই শাসক দ্বারা সংযত রাখবেন যা কোরআন দ্বারা সংযত রাখা সম্ভব হয়নি।' শরীয়া ইসলামী বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত ও বিস্তৃত করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইসলামী রাষ্ট্রকে এর পদ্ধতি হিসেবে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ বিষয়টি শরীয়াহ স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে এবং বাস্তবায়নের পদ্ধতিও

উল্লেখ করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রকে এই বিশ্বাস সংরক্ষণ, প্রসার ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন: জিহাদ যা ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়ার ব্যাপারে ইসলাম রাষ্ট্রকে দায়িত্ব দিয়েছে এবং জিহাদের মাধ্যমে দাওয়াত করতে নির্দেশ দিয়েছে। কত সুন্দরই না লাগে যখন ইমাম গাজ্জালী (র) বলেন, 'অবশ্যই কোরআন এবং সুলতান জমজের মত। কুরআন হল ভিত্তি, সুলতান হল এর রক্ষক। যার কোন ভিত্তি নেই, তা খুব দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়; আর যার কোন রক্ষক নেই তা দ্রুত হারিয়ে যায়।'

## শাসকদের জবাবদিহী করা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কতৃক প্রদত্ত ও ব্যাখ্যাকৃত শরীয়া কেবলমাত্র কিছু চিন্তার সমষ্টি নয়, বরং আইনপ্রণেতা এসবকে বাস্তবিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। সেকারণে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বাস্তব হুকুমসমূহ উপস্থাপন করেছেন যাতে এগুলো বাস্তবে অস্তিত্বশীল হয় এবং যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা যাতে বর্জিত হয় ও এসবের বাস্তবায়নের পদ্ধতি হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা বাতলে দিয়েছেন। শরীয়াকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শাসকদের জন্য আইন দিয়েছেন ও তাকে নির্দেশ এবং বিধিনিষেধ দিয়েছেন যাতে সে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে ও এর রক্ষক হয়। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) উম্মাহকে শাসকের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাকে অবহেলার ক্ষেত্রে জবাবদিহী করতে বলেছেন। ব্যক্তি ও দল উভয়ক্ষেত্রে উম্মাহর কাছ থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এটা দাবী করেছেন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন:

*"শহীদদের সর্দার হামযা এবং ঐ ব্যক্তিও, সে অত্যাচারী শাসকের সামনে দাড়িয়ে উপদেশ দেওয়ার পর (ঐ শাসক) তাকে হত্যা করে ফেলে।"* (হাকিম)

তিনি (সা) আরও বলেন:

*"অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।"* (তিরমিযী)

তিনি (সা) আরও বলেন:

*'আল্লাহর কসম! তোমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজে নিষেদ প্রদান করতে হবে এবং অত্যাচারী শাসকের হস্তদ্বয় চেপে ধরতে হবে এবং সত্যের ব্যাপারে তাকে বাধ্য ও এর মধ্যে তাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।'* (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

সত্যের ব্যাপারে শাসককে বাধ্য ও সত্যের মধ্যে তাকে সীমাবদ্ধ রাখা শক্তি ও ক্ষমতা ছাড়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ এ কাজ কোন ব্যক্তি করতে পারবে না এবং এর জন্য অবশ্যই একটি দল প্রয়োজন।

সাহাবা এবং ইসলামী ফকীহগন একথা নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, এ কাজের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র হল পূর্বশর্ত। এ রাষ্ট্র অস্তিত্বশীল হলে হুকুমসমূহ বাস্তবায়িত হয়, অন্যথায় সেগুলো হয় না। যখন আবু বকর (রা) কে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সর্ম্পকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'কীভাবে এটি অব্যাহত থাকবে?' প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত ইমামগন সঠিক পথে থাকবে।' শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া আল ফাদিল হতে ইয়াদ এবং আহমাদ বিন হাম্বল' থেকে বরাত দিয়ে বলেন, 'যদি এমন কোন দোয়া থাকে যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা গ্রহণ করবেন, তিনি তা রেখেছেন সুলতান বা শাসকদের জন্য।'

ইসলাম সবার জন্য একটি জীবনব্যবস্থা। এর মধ্যে গোটা মানবজাতির জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এর বিশ্বাসসমূহ সার্বজনীন এবং এর ব্যবস্থাপনাও। বিশ্বের দরবারে বহন করবার জন্য এর রয়েছে রাষ্ট্র ব্যবস্থা দ্বারা ইসলাম বাস্তবায়ন ও দাওয়াতী কাজ করবার একটি পদ্ধতি। এ থেকে বুঝা যায় ইসলামিক রাষ্ট্র এর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য কতটা অপরিহার্য। সুতরাং এর কাজ কী? কে রাষ্ট্রের কার্য সম্পাদন করবে যদি তা অস্তিত্বশীল না হয়? কে তাকে সঠিক পথের দিশা দেখাবে যদি তা পথভ্রষ্ট হয়?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কতৃক রাষ্ট্রের উপর অর্পিত দায়িত্ব হল ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন। সুতরাং রাষ্ট্রের কাজ হল দ্বীন বাস্তবায়ন করা-হোক তা ব্যক্তিপর্যায়ের বা সামষ্টিক নিয়মনীতি অথবা ব্যক্তিপর্যায়ের বা সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য এটি দায়িত্বশীল, অর্থাৎ বাস্তবে মারুফ সম্পাদন ও মুনকার অপসারণ করা। যেমন: যদি কোন মুসলিম সালাত আদায় না করে তাহলে রাষ্ট্র তাকে তা করতে নির্দেশ প্রদান করবে; অন্যথায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। একইভাবে সে যদি যাকাত প্রদান না করে, হজ্জ পালন না করে বা সাওম পালন না করে অথবা এজাতীয় ব্যক্তিপর্যায়ের বাধ্যবাধকতা পরিত্যাগ করলে রাষ্ট্র এগুলোর উপস্থিতি নিশ্চিত করবার দায়িত্ব নেবে এবং নিয়মভঙ্গকারীকে জবাবদিহীতার আওতায় নিয়ে আসবে। একই কথা সামষ্টিক বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যদি রাষ্ট্র উম্মাহর জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় অধিকার সমূহ প্রদান না করে, যেমন: চিকিৎসা, প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং অন্যান্য-যেগুলোর জন্য ব্যবস্থাপনা, সমন্বয় ও বন্টন জরুরী সেগুলোর ব্যাপারে তিনি

জবাবদিহীতার মুখোমুখি হবেন। একই কথা যেসব বাধ্যবাধকতা জনগনের মধ্যে বিস্তৃত থাকে যেমন: জিহাদ এবং ইজতিহাদ এবং যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা খলিফাকে দায়িত্ব ও নির্দেশ প্রদান করেছেন-সেগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আইনপ্রণেতা এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছেন। প্রকাশ্য কুফর প্রদর্শন ব্যতিরেকে খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মুসলমানদের জন্য স্রষ্টা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

ইসলামিক রাষ্ট্রে মৌলিক বিষয় হচ্ছে শরীয়া আইনের ব্যাপারে শাসক হলেন অভিবাবকতুল্য। শরীয়া অনুসারে তিনি হলেন ব্যক্তি বা সামষ্টিক পর্যায়ের যে কোন মুনকারাত প্রতিহত করবার জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তি। একারণে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন:

*'ইমাম হলেন রাখাল এবং তিনি তার জনগনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।'* (মুত্তাফিকুন আলাইহি)

ব্যক্তি বা সামষ্টিক পর্যায়ে আল্লাহ প্রদত্ত সব নির্দেশনার ব্যাপারে লোকদের বাধ্য করবার ক্ষমতা দিয়ে আল্লাহ শাসকদের দায়বদ্ধ করেছেন। যদি কোন কাজ করবার জন্য বলপ্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে তাহলে খলিফার অধিকার রয়েছে তা করবার। একইভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন লোকদের হারাম করা থেকে নিবৃত করবার জন্য। আর এই নিবৃত করবার জন্য যদি বলপ্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে তাহলে তাকে তাই করতে হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্র মুনকারকে বলপূর্বক বা হাত দিয়ে প্রতিহত ও প্রতিরোধ করে। এর কারণ হল শরীয়া অনুসারে, রাষ্ট্র ইসলাম বাস্তবায়ন এবং লোকদের ইসলামী আইন কানুন মানতে বাধ্য করবার ব্যাপারে দায়িত্বশীল।

যদি শাসকগন কোন মুনকার করে, যেমন: অবিচার করা, অন্যের সম্পদ অসুদপায়ে জবরদখল করা, জনগনের অধিকার ভূলুন্ঠিত করা, নাগরিকদের অধিকার অবহেলা করা, কোন ফরয সম্পাদনের ব্যর্থ হওয়া, ইসলামের কোন আইনের সাথে দ্বন্দে জড়িয়ে পড়া কিংবা এ জাতীয় কোন মুনকার-তখন সব মুসলিমের উপর ফরয হয়ে যায় তাকে জবাবদিহী করা ও তার মুনকারগুলোকে প্রত্যাখান করা, ব্যক্তি বা দল হিসেবে তার কাজের পরিবর্তনের জন্য কাজ করা। অন্যথায় তারা নীরবতা পালন করলে এবং মুনকার পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করলে সবাই গোনাহগার হবে।

যখন শাসক কোন মুনকার করে তখন সেই মুনকারে বাধা প্রদান করা বা তা পরিবর্তন করার উপায় হচ্ছে কথার মাধ্যমে তাকে জবাবদিহী করা । উম্মে সালামা থেকে মুসলিম বর্ণণা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

*'তোমাদের উপর যারা আমীর নিযুক্ত হবে তারা ভাল কাজ করতে পারে আবার মন্দ কাজও করতে পারে। যারা তাদের মন্দ কাজকে ঘৃণা করবে তারা দায়মুক্ত হবে, যারা সেগুলোকে প্রত্যাখান করবে তারাও নিরাপদ; কিন্তু যারা সেগুলো গ্রহণ করবে বা অনুসরণ করবে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।'*

রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে ইবনে মাসউদও অনুরূপ বর্ণণা করেন,

*'আল্লাহর কসম, তোমাদেরকে অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে হবে এবং অত্যাচারী শাসকদের হাত চেপে ধরতে হবে ও সত্যের পথে ফিরে আনবার জন্য তাকে জোর করতে হবে ও সত্যের মধ্যে তাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।'*
*অন্য একটি বর্ণণায় এ ব্যাপারে বলা হয়,*

*'অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে কিছু লোক দ্বারা অন্যদের হৃদয়ে আঘাত করবেন। তারপর তিনি তোমাদের অভিসম্পাত করবেন যেমনি তিনি তাদের করেন।'* (আবু দাউদ)

একইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে হক্ব কথা বলাকে সর্বোত্তম জিহাদ বলেছেন। *যখন একজন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কোন জিহাদ সর্বোত্তম?' প্রত্যুত্তরে তিনি (সা) বললেন,'অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে হক্ব কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।'* (ইবনে মাজাহ ও নাসায়ী)

একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ কতৃক প্রমাণিত প্রকাশ্য কুফর করছে-যে কুফরের ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অর্থাৎ তিনি যখন কুফর দিয়ে শাসন করবেন এবং আল্লাহর হুকুমকে প্রকাশ্যে প্রত্যাখান করবেন। আউফ বিন মালিক আল আশযা'য়ী বর্ণণা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

*'ইমামদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে তারা যাদের তোমরা ভালবাস এবং যারা তোমাদের ভালবাসেন, যাদের জন্য তোমরা প্রার্থনা কর ও যারা তোমাদের জন্য প্রার্থনা করে। অন্যদিকে ইমামদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট হচ্ছে তারাই যারা তোমাদের অপছন্দ করে ও তোমরা যাদের অপছন্দ কর এবং তোমরা তাদের অভিশাপ দাও ও তারাও তোমাদের অভিশাপ দেয়।' আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'ও রাসূলুল্লাহ! আমাদের কী তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা উচিত হবে না?' তিনি (সা) বলেন, 'না, ততক্ষণ পর্যন্ত নয় যতক্ষণ তারা সালাত কায়েম রাখে।'* (মুসলিম)

What is meant by establishing the prayer is ruling by Islam, ie applying the rules of the Shar'a, by indicating the whole through naming the part (bab tasmiyat al-kull bismil juz'a). Umm Salamah narrated that the Rasool of Allah (saw) said;

**"Ameers will be appointed over you, and you will find them doing good deeds as well as bad deeds. The one who hates their bad deeds is absolved from blame, the one who disapproves of their bad deeds is also safe, but the one who approves and follows is doomed." They said: æShould we not fight them?" He (saw) said: "No as long as they pray."** (মুসলিম)

উবাদা বিন আস সামিত বর্ণণা করেন যে,

**'রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বায়াত দেয়ার জন্য আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন-যাতে এর মাধ্যমে তাকে আমরা সুখে দুখে, আনন্দে ও ক্লেশে তার কথা শুনি ও মান্য করি এবং নিজেদের উপরে তাকে প্রাধান্য দেই। আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কতৃত্বশীল লোকদের সাথে দ্বন্দে জড়িয়ে পড়ব না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ কতৃক সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত প্রকাশ্য কোন কুফর তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়। সর্বাবস্থায় আমরা যাতে হক্ব কথা উচ্চারণ করি এবং আল্লাহর পথে কাজ করবার সময় কোন মিথ্যে দোষারোপকে ভয় না করি।'(মুসলিম)**

হাদীস অনুসারে, শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ কতৃক প্রমাণিত প্রকাশ্য কুফর করছে-যে কুফরের ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

এসবই প্রযোজ্য যখন একজন মুসলিম শাসক অধিষ্ঠিত থাকেন এবং তিনি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন অথবা তিনি যদি স্পষ্ট কুফর দিয়ে শাসন করেন। এমতাবস্থায় উম্মাহকে ব্যক্তি অথবা সামষ্টিক উভয় পর্যায়েই শাসকের পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দাড়াতে হবে এবং এমনকি প্রয়োজনে অস্ত্র দিয়ে হলেও তাকে প্রতিরোধ করতে হবে। তাহলে কী অবস্থা হবে যখন কোন মুসলিম শাসক বর্তমান থাকে না বা কোন দারুল ইসলাম অনুপস্থিত থাকে? এমতাবস্থায় এটা স্বাভাবিক যে, আল্লাহর আইন তখন বাজেয়াপ্ত হবে, দূর্নীতি ও দূবৃত্ততা ব্যাপকতা লাভ করবে, অনিয়ম স্বাভাবিক হবে এবং ভ্রান্ত সর্ম্পকের উদ্ভব হবে, মুনকারাত উদ্ভুত ও প্রসার লাভ করবে এবং মারুফ হ্রাস পাবে ও ক্রমেই বিলুপ্ত হবে। মুসলিমগন তখন দূর্বল হবে, তাদের অবস্থান খর্ব হবে ও ক্ষমতা ক্ষয়িষ্ণু হবে। তারা এমন সিংহে পরিণত হবে যা দন্তহীন ও নখরবিহীন। তারা এমন এক দৃশ্যের অবতারণা করবে যার বাস্তবতা নেই-যেমনি খাবারের ছবি ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে পারে না এবং সিংহের ছবি ত্রাস সৃষ্টি করে না।

এমতাবস্থায় - বর্তমান বাস্তবতায় - উম্মাহর উচিত খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা যিনি আল্লাহ প্রদত্ত বিধান দ্বারা শাসন করবে কারন তার (খলিফার) উপস্থিতি ফরয। এখন প্রশ্ন হল কে খিলাফত প্রতিষ্ঠার দায়ভার কাধে তুলে নিবে এবং এটা কীভাবে করা হবে? সঙ্গত কারণেই এখন ইসলামিক একটি দলের অপরিহার্যতার কথা বলতে হয় যারা সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে।

# ৩

# দাওয়াত বহনকারী একটি দল বর্তমান থাকার অপরিহার্যতা

শরীয়াহ প্রদত্ত দায়িত্ব হিসেবে দলটি সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আমরা এখানে এমন কোন দলের দায়িত্ব নিয়ে আলোকপাত করব না যা আংশিকভাবে শরীয়াহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে, যেমনঃ দরিদ্র মুসলিমদের সাহায্য করবার জন্য গড়ে উঠা দাতব্য প্রতিষ্ঠান, নির্দেশনা ও উপদেশ দেবার জন্য গড়ে তোলা সংগঠন, মসজিদ নির্মাণের জন্য প্রতিষ্ঠান, কুরআন শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। বরং আমরা এমন একটি দল নিয়ে কথা বলব যারা পুরো দ্বীন বাস্তবায়নের দায়িত্ব কাধে তুলে নেবে। আর এটা করা হবে খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে-যা মুসলিমদের জীবনে ইসলামকে বাস্তবায়ন করবে। এর দায়িত্ব হবে শরীয়াহ প্রদত্ত সব মারুফাত বাস্তবায়ন করা ও সব মুনকারাতকে দূরীভূত করা। এই রাষ্ট্র তার ভেতরে ইসলামকে বাস্তবায়ন ও এর বাইরে পুরো বিশ্বে ইসলামকে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে ইসলামকে জীবনে বাস্তবায়ন করবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের রয়েছে শরীয়াহ প্রদত্ত বিশাল দায়িত্ব-যা ইসলামিক রাষ্ট্রের উপস্থিতি বাস্তবায়িত থাকলে হয় ও অনুপস্থিতি থাকলে বন্ধ হয়ে যায় এবং পরিত্যক্ত হয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত দল গঠনের গুরুত্ব তার এই লক্ষ্যের কারণেই। ইসলামিক রাষ্ট্র বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে যদি কোন দল রত না হয় তাহলে মুসলিমগন আলাহ প্রদত্ত সব ইসলামী গুরুদায়িত্বকে অবহেলা করল এবং এর চেয়ে বড় কোন গুনাহের কাজ আর কিছু হতে পারে না।

যখন কোন মুসলিম ইসলামী জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে না তখন কোন যিনাকারী যখন যিনা করে, চোর চুরি করে, শাসক অত্যাচার করে, নারীরা অর্ধনগ্ন অবস্থায় রাস্তায় বের হয়, দূর্নীতি ব্যাপকতর হয়, জিহাদ বন্ধ হয়ে যায়, কাফেররা মুসলিমদের অত্যাচার করে, মুনকার বিস্তৃতি লাভ করে এবং মারুফ সংকীর্ণ হয়ে যায় তখন তার গোনাহ ঐ মুসলিম ব্যক্তিকেই বহন করতে হবে। এর কারণ হল মুসলিমরা আল্লাহ নির্দেশিত খোলাফায়ে রাশেদীন প্রতিষ্ঠার কাজকে অবহেলা করবার কারণে এই মুনাকারাতসমূহ ব্যাপকতা পেয়েছে। ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রত্যেকটি জিনিসকে তার নির্ধারিত জায়গায় স্থাপন করবে, মুসলিমদের জীবনে শরীয়াহকে বাস্তবায়ন করবে, ঈমানকে মুমিনদের হৃদয়ে প্রোথিত করবে এবং তাকওয়া ও ইহসানের ফলকে আবাদ করবে। সুতরাং এই সামষ্টিক কাজটি একটি বাধ্যবাধকতা-যার মাধ্যমে শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন ও এর সংশোধন নির্ভরশীল। এই বাধ্যবাধকতা উম্মাহকে তার পতনের অতল গহ্বর থেকে টেনে তুলবে এবং পথের দিশাপ্রাপ্ত ও অন্য জাতির জন্য আলোর দিশারীরূপে হারানো গৌরব ও ক্ষমতা পুণরুদ্ধার করবে।

আজকের এ করুণ পরিণতি থেকে উদ্ধার করবে যে বাধ্যবাধকতা, তার চেয়ে বড় পুরষ্কার মুসলিমদের জন্য আর কী হতে পারে? এ ব্যাপারে রাসূলুলাহ (সা) বলেন,

*‘ আল্লাহ যখন তোমাদের দ্বারা কোন ব্যক্তিকে হেদায়াত দান করে তখন তা লাল উটের চেয়েও উত্তম।’* (আল বুখারী)

মুসলিমদের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন করা ও তাদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা, আর এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রশান্তিদায়ক দ্বীনে প্রবেশের জন্য লোকদের জন্য সব দরজা উন্মুক্ত করার চেয়ে উত্তম কাজ আর কী হতে পারে। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে জিহাদের সমতুল্য কোন কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি বললেন,

*‘‘না, আমি এর সমতুল্য কোন কিছুকেই মনে করি না।’ তখন তিনি (সা) ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘যখন একজন মুজাহিদ জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়ে তখন কি তুমি মসজিদে প্রবেশ করে ক্বিয়াম করতে থাক, কিন্তু ক্লান্ত হও না? রোজা রাখ কিন্তু ইফতার কর না?’ লোকটি তখন বলল, ‘এগুলো না করে কে থাকতে পারে?’’* (বুখারী)

রাসূল কী বলেননি,

*‘সর্বোত্তম জিহাদ হল অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলা।’*

রাসূল (সা) কী একথা বলেননি,

*'শহীদদের সর্দার হামযা এবং সেই ব্যক্তি যে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের জন্য দাড়াল এবং তাকে হত্যা করা হল।'* (আল হাকীম)

মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে নীরব থেকে তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে দেয়া কোন মুসলিমের পক্ষে সম্ভব নয়। যদি নীরব থাকে তাহলে সে তো হাদীসের বর্ণণার মত হতে পারবে না, যেখানে রাসূল (সা) বলেছেন,

*'....তারা একটি দেহের মত, যখন এর একটি অংশ ব্যাথা পায় তখন পুরো দেহ তাতে সাড়া দেয় ও জ্বর অনুভব করে ও নির্ঘূম রাত কাটায়।'*(মুসলিম)

*'....এমন একটি প্রাসাদ যেখানে একজন আরেকজনকে শক্তিশালী করে।'*

সুতরাং মুসলিমদের সামনে রয়েছে মহাপুরস্কার অথবা বিশাল পাপ- উভয় সুযোগ। আর এটাই ইসলামে (কোন কিছু) ফরয হবার শর্ত। এটি অন্যান্য ফরযের মতই। যখন মুসলিমগন এটা পালন করবে তখন পুরষ্কারপ্রাপ্ত হবে এবং যখন পরিত্যাগ করবে তখন শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমরা কোন আংশিক সামষ্টিক ইবাদতের কথা বলছি না যা ইসলামের একটি বা দু'টি হুকুম বাস্তবায়ন করবে। বরং আমরা এমন একটি দাওয়াতের কথা বলছি যা ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে বাস্তবায়ন করবে।

## দলটির বৈশিষ্ট্য

খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজের মাধ্যমে যারা পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে বাস্তবায়ন করবে এরকম একটি দল থাকা শরীয়াগতভাবে বাধ্যতামূলক। নীচের প্রসিদ্ধ আয়াতের মাধ্যমে এটা অনুধাবন করা যায়:

**'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকবে যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।'** (সূরা আল ইমরান: ১০৪)

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলমানদের এটা সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা করে দিয়েছেন যে, তাদের মধ্যে কমপক্ষে একটি ইসলামী দল থাকতে হবে যারা মানবজাতিকে কল্যাণের দিকে ডাকবে ও সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজের ব্যাপারে নিষেধ করবে।

আদেশ সূচক নির্দেশটি হল:
**'এমন একটা দল থাকবে'**-যা একটি বাধ্যবাধকতা, কারণ এটা কল্যাণের দিকে আহ্বান, সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজের নিষেধের জন্য।

**'তোমাদের মধ্যে'** (মিনকুম) এখানে অংশগ্রহনকারী আদেশ (তাবিদ), শরঈ নির্দেশনা (ক্বারিনা) থাকবার কারণে –যা বুঝায় যে, সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজের নিষেধ একটি সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা। তবে এটা সবার জন্য প্রয়োগ হবে না। কেননা এর জন্য এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক-যা সবার মধ্যে বিদ্যমান নেই। তাই **'উম্মাহ'** শব্দটি মুসলিমদের মধ্য হতে একটি দলের কথা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে-পুরো উম্মাহর কথা বলা হয়নি। নির্দেশটি হল মুসলিমদের মধ্য হতে অবশ্যই একটি ইসলামী দল থাকতে হবে। উম্মাহ শব্দটিকে পবিত্র কুরআনে 'এক দল লোক' অর্থে বুঝানো হয়েছে। যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসা (আ) সর্ম্পকে বলেন:

**'যখন তিনি মাদইয়ানের কুপের ধারে পৌঁছলেন, তখন কুপের কাছে একদল লোককে (উম্মাতান) পেলেন তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর কাজে রত।'** (সূরা আল কাসাস: ২৩)

এখানে যে কোন দলের কথা বলা হয়নি বরং মুসলিমদের মধ্য হতে একটি দলের কথা বলা হয়েছে-যাদের এই আয়াতেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে খায়ের তথা ইসলামের দিকে আহ্বান জানাবার এবং সৎ কাজের (মারুফ) আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজের (মুনকার) নিষেধের জন্য। এই বর্ণণার মধ্যে শাসকগনও রয়েছে। কারণ তারা সব মারুফ বা সব মুনকার কাজের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করেন। তারা হয় লোকদের ইসলাম বা শরীয়া দিয়ে শাসন করে অথবা এগুলোকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করে এবং তখন তাদের জবাবদিহীতার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দলটি রাজনৈতিক হবে। কারণ এর কাজ

শাসকদের [জবাবদিহীতার] সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। এই শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে শরীয়া প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসারে যদি তা বিদ্যমান না থাকে এবং অতপর তাদের অবহেলা ও পথভ্রষ্টতার জন্য জবাবদিহী করতে হবে এবং সত্যের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে বাধ্য করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) অনেক হাদীসে এই ফরয ও শাসকদের মধ্যকার সর্ম্পক নিরূপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,

*"ঐ সত্ত্বার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা অতি সত্বর আমর বিল মা'রূফ এবং নাহি আ'নিল মুনকার (সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ) কর। অন্যথায় অচিরেই তোমাদের উপর আলণ্ডাহ্র শাস্তি আরোপিত হবে। অতঃপর তোমরা তাকে ডাকবে কিন্তু তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবেনা।"* (আহমাদ ও তিরমিযী)

তিনি (সা) আরও বলেন,

*'অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে হক্ব কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।'* (ইবনে মাজাহ ও নাসায়ী)

তিনি (সা) আরও বলেন,

*"শহীদদের সর্দার হামযা এবং ঐ ব্যক্তিও, সে অত্যাচারী শাসকের সামনে দাড়িয়ে উপদেশ দেওয়ার পর (ঐ শাসক) তাকে হত্যা করে ফেলে।"* (হাকিম)

এছাড়াও রাসূল (সা) বলেন,

*'তোমরা আমর বিল মা'রূফ এবং নাহি আ'নিল মুনকার (সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ) কর। অন্যথায় তোমরা তাকে ডাকবে কিন্তু তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবেনা।'*

এবং তিনি বললেন,

*''দ্বীন হল নসীহা বা উপদেশ প্রদান'। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কার প্রতি, ইয়া রাসূলুল্লাহ!' তিনি বললেন, 'আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূল, মুসলিম শাসকগন ও তার অধীনস্ত জনগনের প্রতি।'* (মুসলিম)

একারণে দলটির কাজ হল কল্যাণের দিকে ডাকার পাশাপাশি সৎ কাজের আদেশ প্রদান করা ও অসৎ কাজে নিষেধ করা। এর একটি অংশ হল শাসকদের জবাবদিহীতার মুখোমুখি করা এবং শরীয়া অনুসারে শাসন করতে বাধ্য করা। শাসকের সাথে কাজটি সম্পৃক্ত হওয়ায় এটি একটি রাজনৈতিক কর্মকান্ড। সেকারণে এই আয়াতটি ইসলামের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের উপস্থিতির কথা বলে।

বাস্তবতা হল শরীয়ার নিয়মকানুনসমূহের অস্তিত্বের জন্য একজন খলিফার অপরিহার্যতা একটি শরীয়া নির্ধারিত বাধ্যবাধকতা। একারণে খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজটিও শরীয়া নির্ধারিত বাধ্যবাধকতা। আর এই কাজের জন্য একটি দল বা সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাও একটি শরীয়া নির্ধারিত বাধ্যবাধকতা। কারণ শরীয়ার মূলনীতি হল, 'ওয়াজিব পালনের জন্য যা করতে হয় তাও ওয়াজিব।' (মা লা ইয়াতিম্মুল ওয়াজিব ইল্লা বিহী ফাহু'ওয়া ওয়াজিব)

মূলতঃ উপরোক্ত মাদানী আয়াতে ইসলামের ভিত্তিতে গঠিত হওয়া একটি রাজনৈতিক দল থাকবার অপরিহার্যতার কথা বলা হয়েছে। এই আয়াত কাজের প্রকৃতিকেও সংজ্ঞায়িত করেছে: যা হল দাওয়াত, সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজের নিষেধ করা। সে কারণে সুনির্দিষ্টকারী প্রত্যয় 'আল' শব্দ উল্লেখিত হয়েছে। 'আল খায়ের', 'আল মারুফ' এবং 'আল মুনকার' হল সুনির্দিষ্টকারী প্রত্যয়-যার সার্বজনীনতা উপলব্ধি করতে হবে। আর, প্রকাশভঙ্গি অনুসারে এই নির্দেশ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বুঝিয়েছে এবং বাস্তবায়ন অল্প বা অনেক লোকের মাধ্যমে হতে পারে। সুতরাং এর মধ্যে ব্যক্তি, দল ও শাসকগন তথা সংশ্লিষ্ট সবাই অর্ন্তভুক্ত । অল্প না অনেক-এটি নির্ধারিত হবে শরীয়া এবং দল যা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কাজ করছে তা অনুসারে। ব্যক্তিগত ইচ্ছার অধীনে অস্পষ্টভাবে এটি হওয়া সম্ভব নয়। বরং এটি সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে, যদি এটি পরিত্যক্ত হয় তাহলে কাজ হওয়া উচিত সংশোধনমূলক, দলকে উপদেশ দিতে হবে যাতে তারা ভ্রান্তিকে স্পষ্ট দেখতে পায় ও পরিত্যাগ করে। সুতরাং এই বিষয়টিও অন্যান্য বিষয়ের মতই শরীয়া দ্বারা নিরূপিত। প্রবৃত্তি, স্বেচ্ছাচারীতা, পরিস্থিতি ও ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর এটি ছেড়ে দেয়া হয়নি।

## ইসলামের ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক দলের উপস্থিতির অপরিহার্যতা

উপরোক্ত আয়াতে একটি ইসলামী রাজনৈতিক দলের অপরিহার্যতা ছাড়া অন্য কোন কিছুর কথা বলা হয়নি। এটি দলের সাধারণ প্রকৃতি ও এর কাজ সর্ম্পকেও ধারণা দিয়েছে। কোন মারুফাত প্রতিষ্ঠা এবং মুনকারাতের মূলোৎপাটিত করার জন্য কাজ করতে হবে তা স্থির করার বেলায় দলটি যে বাস্তবতায় কাজ করবে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত যাকে বুঝে নিয়ে দলটি সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় শর'ঈ হুকুম গ্রহণ করবে যাতে করে এই বাস্তবতাকে পরিবর্তন করা যায়। সুতরাং এই আয়াতের সাথে মিল রেখে যে দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শাসককে জবাবদিহী করবার জন্য কাজ করছে-তার কাজ ও এর দৃষ্টিভঙ্গী কাজের বাস্তবতার সাথে সর্ম্পকযুক্ত হবে: তারা শাসকের কাজ পর্যবেক্ষণ করবে ও অবহেলার জন্য সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবান ও সত্য দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকবার নিমিত্তে তাকে জবাবদিহী করবে, জনগনের মধ্যে গনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং শাসকের সাথে ইসলামের দাওয়াত প্রসারের জন্য কাজ করবে। আয়াতের ভিত্তিতে গড়ে উঠা দলটি, যখন কোন খলিফা বা খিলাফত নেই, তখন তার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট সকল শরীয়া নির্দেশনা গ্রহণ করবে। শরীয়ার চাহিদা অনুসারে দলটি তার লক্ষ্য নির্ধারণ করবে এবং অত:পর যে পদ্ধতিতে এটি কাজ করবে ও যে চিন্তাকে ধারণ করবে তাকে সুনির্দিষ্ট করবে।

সুতরাং রাষ্ট্র থাকুক বা না থাকুন একটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব অপরিহার্য। দলটির লক্ষ্য, এর কাজ, চিন্তা বিকাশের প্রক্রিয়া ইত্যাদি বাস্তবতার সাথে সম্পৃক্ত।

যেহেতু এখন আমরা এমন এক সময়ে বাস করি যেখানে আল্লাহর আইন দিয়ে মুসলিমদের শাসন করবার জন্য কোন খলিফা নেই এবং যেসব ভূমিতে মুসলিমগন বসবাস করেন সেগুলো দারুল কুফর, যেসব ব্যবস্থা ও সর্ম্পক দিয়ে সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে সেগুলো ইসলামকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেনি, সমাজ অনৈসলামিক; সেহেতু এমন একটি দলকে থাকতে হবে যাদের কাজ হবে ভূমিসমূহকে দারুল ইসলামে পরিণত করবে, সমাজকে ইসলামী করবে, এমন একটি অবস্থার প্রত্যাবর্তন ঘটাবে যেখানে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধিবিধান অনুসারে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হবে অর্থাৎ ইসলামি জীবনব্যবস্থার পূণপ্রবর্তন হবে এবং বিশ্বের কাছে দাওয়াত পৌছে দেবে। আর এ লক্ষ্যকে উপলদ্ধি করেই দলটি তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

## কীভাবে একটি রাজনৈতিক দল বা সংগঠন তৈরী করতে হয়

একটি সংগঠন বা দল তার শরীয়া লক্ষ্য অর্জনের জন্য শরীয়ার কোন পদ্ধতিকে অনুসরণ করবে?

এই লক্ষ্যকে উপলদ্ধিতে আনবার জন্য দলটি কী ধরনের শরীয়া নীতিমালা মেনে চলবে?

দাওয়ার সংশ্লিষ্ট বিপুলসংখ্যক শরীয়া নিয়মের বেলায় দলটির উপলব্ধির ক্ষেত্রে মানদন্ড ও নীতিমালা কি হবে?

শরীয়া নিয়মনীতিকে দলটি কীভাবে দেখে? এর উৎসসমূহ কী? দলটি কী মনে করে একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আল্লাহসুবহানাহু ওয়া তা'আলার একাধিক হুকুম আছে? শরীয়া যেসব বিষয়ে ইক্বতিলাফ বা অনৈক্য রয়েছে সেসব ব্যাপারে দলটির অবস্থান কী?

চিন্তাকে দলটি কীভাবে দেখে এবং আক্বীদা ও শর'ই হুকুমসমূহ গ্রহণ করবার ক্ষেত্রে চিন্তার ভূমিকা কী?

বাস্তবতার ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী কী? দলটি কী একে চিন্তার উৎস বা চিন্তার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে?

লাভের (মাসলাহা) প্রশ্নে দলের অবস্থান কী এবং এটি কী শরীয়া না মনের ভিত্তিতে গৃহীত হয়?

আমরা যখন দলটির লক্ষ্য, এর কাজ, কাজের পদ্ধতি, চিন্তার প্রক্রিয়া সংজ্ঞায়িত করতে পারব, তারপর খুব সহজেই এর কার্যক্রম ও প্রতিষ্ঠার ভিত্তি জানতে পারব। এরপর আমরা জানতে পারব যদি দলটি পথভ্রষ্ট বা লক্ষ্যচ্যুত হয় তখন কী সংশোধনমূলক পদক্ষেপ বা উপদেশ প্রদান করতে হবে।

কাজ করবার শরীয়া পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমরা নিজেদের এমন একটি মূলনীতি মনে করিয়ে দেব যে বিষয়ে কারোই অজ্ঞ থাকা সঙ্গত নয়। তা হলো এই যে, মানুষের সম্পর্কে -দুনিয়ার কোন ব্যাপার হোক বা আখেরাতের কোন ব্যাপার হোক অথবা তাদের ভাল মন্দের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে যত বড় বা বিষয় হোক - কোন ব্যাপারেই শরীয়া কোন হুকুম বাদ রাখেনি। সুতরাং মানুষের কাপড় পরিধান বা খোলা, মসজিদ বা বাড়ীতে প্রবেশ করা বা সেখান থেকে প্রস্থান করা, অন্যের সাথে আচরণ, বিয়ে করা, সালাত আদায়, সাওম পালন, কথা বলা বা কাজ করা-সব বিষয়ে আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে হুকুম প্রদান করেছেন এবং কাজটি সম্পন্ন করবার পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছেন। কাজটি কী বাধ্যতামূলক নাকি বর্জনীয় অথবা মুস্তাহাব বা উৎসাহব্যঞ্জক

অথবা অপছন্দনীয়-যা থেকে সে বিরত থাকবে নাকি এটি মুবাহ-যে ব্যাপারে ব্যক্তির নিজস্ব পছন্দ রয়েছে। এটা মানুষের সব কাজের সাথে সম্পৃক্ত। কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কেও ধারণা দেয়া হয়েছে যদিও এ ব্যাপারে রয়েছে ভিন্নরকমের দৃষ্টিভঙ্গী। আর তা হল সব বস্তুই হালাল সেগুলো ব্যতিত যাদের ব্যাপারে শরীয়ার সুনির্দিষ্ট আপত্তি রয়েছে। সুতরাং এমন কোন কাজ বা বস্তু নেই যেগুলোর বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কোন হুকুম নেই। এটা নিম্নোক্ত দুটি শরীয়া মূলনীতি অনুসারে,

'কাজের ভিত্তি হল শরীয়া নীতিমালা' এবং
'বস্তু ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল যতক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারে শরীয়ার কোন আপত্তির ব্যাপারে দলিল না পাওয়া যায়।'

## ইসলামে রয়েছে ফিকরাহ (চিন্তা) এবং তরীকা (পদ্ধতি)

যখন আমরা আল্লাহর হুকুমকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য পদ্ধতির কথা চিন্তা করব তখন এ ব্যাপারে আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়া নিয়মকানুন অনুসন্ধান করব যাতে মুসলিমগন পরম করুণাময়ের কাছ থেকে পূর্ণ সচেতনতা, নির্দেশনা ও হেদায়েতের মাধ্যমে অগ্রসর হতে পারবে। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

**'বলে দিনঃ এই আমার পথ। আমি আল্লাহ্‌র দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই- আমি এবং আমার অনুসারীরা।'** (সূরা ইউসুফঃ ১১২)

এটা অবশ্যই বলা উচিত হবে না যে, 'শরীয়ার প্রকৃতিই এমন যে, এটি যে কোন বিষয়ে একটি হুকুমকে আমাদের সম্মুখে পরিষ্কার ভাবে উপস্থাপন করে এবং তারপর তা কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে তা লোকদের মন, পরিস্থিতি কিংবা, স্বার্থরক্ষার জন্য যে পদ্ধতি সুবিধাজনক হয় তার উপর ছেড়ে দেয়।' এ থেকে বুঝা যেতে পারে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইসলামী রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করাকে আমাদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন। সুতরাং উম্মাহর প্রচেষ্টা ফরয বাস্তবায়নের দিকে থাকা উচিত। কিন্তু, তা বাস্তবায়নের পদ্ধতি মুসলমানদের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে; এমন দাবী করা কোন অবস্থাতেই ঠিক নয়। কারণ, শরীয়া কোন কিছুই মানুষের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়নি এবং তার পছন্দের বশবর্তী করেনি। যদি করত তবে তা হত শরীয়া মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক। এমন কোন শরীয়া নীতি নেই যেখানে একটি সমস্যার সমাধান উপস্থাপন করা হয়েছে কিন্তু, তা বাস্তবায়নের প্রয়োগযোগ্য পদ্ধতি পরিষ্কার ও পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। বরং এইসব সমাধানসমূহ এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাতে তা বাস্তবায়ন করা যায় ও জীবনের বাস্তবতায় প্রয়োগ করা যায়। সেকারণে ইসলামের হুকুমসমূহের যদি বাস্তব পদ্ধতি না থাকে তাহলে সেগুলো হবে কেবলমাত্র পুস্তকনির্ভর আদর্শ, লোকদের চিন্তা ও কল্পনার বিষয়বস্তু-যেখানে লোকজন বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার মাধ্যমে প্রবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করবে এবং এটা ফলদায়ক হবে না।

সেকারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার শরীয়ার মধ্যে লোকদের সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। তিনি মানবজীবনের সাথে সম্পৃক্ত সব ধরনের সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যবস্থা প্রদান করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইসলামী আক্বীদা এবং তা থেকে উদ্ভূত ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের সব প্রবৃত্তি ও জৈবিক চাহিদা পূরণ করেছেন। সুতরাং ইসলাম স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এতেই থেমে থাকেননি, বরং তিনি শরীয় হুকুমগুলোকে বাস্তব ভাবে প্রয়োগ করবার জন্য এবং ইসলামকে অবাস্তব দর্শন বা মামুলী কিছু বিধিনিষেধ হিসেবে মনে না করবার জন্য অন্যান্য নীতিমালা নাজিল করেছেন। সেকারণে রাসূলুল্লাহ (সা) এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন না যিনি কেবলমাত্র স্রষ্টার বার্তাবাহক, বরং তিনি একজন শাসক ও আল্লাহর হুকুমসমূহের বাস্তব প্রয়োগকারীও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কেবলমাত্র এ বিষয়টি পরিষ্কার করেননি যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে শুধুমাত্র উপাসনা করতে হবে, বরং তিনি সেটা বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। তিনি লোকদের আল্লাহর দিকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং সাহাবীদের দলটিকে নিয়ে মক্কায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য কাজ করেছেন। অবশেষে তিনি ঈমানের ভিত্তিতে সে রাষ্ট্রটি বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন-যা ইসলামকে বাস্তবায়ন করেছিল এবং ইসলামিক আক্বীদা ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যারা গিয়েছিল তাদের শাস্তি দিয়েছিল। তিনি (সা) দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছেন। একারণে আমাদের কাছে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য নিয়মকানুন রয়েছে, কিভাবে তা প্রতিষ্ঠা করতে হবে সে ব্যাপারেও নির্দেশনা রয়েছে, রয়েছে উকুবাত (শাস্তি) এর হুকুম, জিহাদের হুকুম, সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রদানের জন্য নিয়মকানুন রয়েছে। এসবই বাস্তব পদ্ধতিগত শরীয়া হুকুম -যা শরীয়া দিয়েছে আক্বীদা ও ব্যবস্থাকে রক্ষা করবার জন্য, পরিচালনার জন্য, প্রসারের নিমিত্তে কাজ করবার জন্য এবং এগুলোকে শাশ্বত রূপ দিতে আহ্বান জানাবার জন্য।

যদি এসব শরীয়া নীতিমালার মাধ্যমে আক্বীদা ও ব্যবস্থা বাস্তবায়ন, সংরক্ষণ ও প্রসারের ব্যবস্থা না থাকত তাহলে ইসলাম হত অবরুদ্ধ এবং এটি আমাদের কাছে পৌছাত না এবং প্রসারও লাভ করত না। এটা খ্রীস্টান ধর্মের মত নিছক নীতিকথা সর্বস্ব হত। যেমনঃ "তোমরা ব্যভীচার করো না এবং প্রতিবেশীর স্ত্রীর প্রতি লোভ করো না"। ইসলাম তখন অন্যান্য ব্যবহারিক চিন্তা দ্বারা ধ্বংস হয়ে যেত বা সমূলে উৎপাটিত হত এবং এটা দিয়ে এমন কিছু করা যেত না যা এর আওতাধীন নয়।

অন্যান্য চমকপ্রদ চিন্তার মত এটাও ইতিহাসের পাতায় পুস্তকের গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, যেমনি আছে পে- টোর æThe Republic”.

উদাহরণস্বরূপ, যেহেতু যিনা ইসলামে হারাম, সেহেতু এর সাথে যুক্ত আরেকটি শরীয়া হুকুম এ অবৈধ সর্ম্পককে বাস্তবে প্রতিরোধ করে, এবং তাহলো যিনাকারীকে শাস্তি প্রদানের হুকুম, আর এটি বাস্তবায়ন করবে ইসলামী রাষ্ট্র। সুতরাং শরীয়া যিনা সর্ম্পকে হুকুম প্রদান করেছে, যেমন আল্লাহ বলেন,

**'আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশণ্টীল কাজ এবং মন্দ পথ।'** (সূরা বনী ইসরাইল : ৩২)

তাছাড়া তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) যিনাকারীর শাস্তি সর্ম্পকেও সুস্পষ্ট হুকুম প্রদান করেন যখন তিনি বলেন,

**'ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ, তাদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত কর।'** (সূরা আল নূর : ২)

তাছাড়া শরীয়া এই হুকুম (শাস্তি) বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বশীল কতৃপক্ষও সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে, যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

*'মুসলিমদের উপর হুদুদ বাস্তবায়ন যতটা সম্ভব কম করবার চেষ্টা করো। যদি তুমি তাকে কোনভাবে বাচিয়ে দিতে পার তবে তাই কর। একজন ইমামের পক্ষে শাস্তি প্রদানে ভুল করবার চেয়ে ক্ষমায় ভুল করা অনেক শ্রেয়।'* (তিরমিযী এবং আল হাকীম)

সুতরাং শরীয়া ইমামকে এ দায়িত্ব প্রদান করেছে।

একই কথা সালাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শরীয়া এটা পরিষ্কার করেছে যে, সালাত ফরজ এবং কেউ তা পরিত্যাগ করলে কী শাস্তি হবে। এক্ষেত্রেও এই শাস্তি বাস্তবায়নের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রকে দায়িত্ব দিয়েছে। এভাবে ইসলামের যে কোন হুকুমের পাশাপাশি তা বাস্তবায়নের পদ্ধতিও অন্য একটি হুকুমের মাধ্যমে পরিষ্কার করা হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইমামকেই এ ব্যাপারে কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই, ইসলামের রয়েছে একটি মৌলিক বিশ্বাস-যা হতে অন্যান্য শাখা বিশ্বাস ও চিন্তা সমূহ উৎসারিত হয়। তাছাড়া এমন চিন্তাসমূহ রয়েছে যা ভাল (খায়ের) ও মন্দকে (শর), হাসান (সুন্দর ও প্রশংসনীয়) এবং কুবহ (অসুন্দর ও নিন্দনীয়) কে, মারুফ ও মুনকারকে, হালাল (অনুমোদিত) ও হারামকে (নিষিদ্ধ) সুস্পষ্ট করে। এর ইবাদত (উপাসনা), মু'আমালাত (লেনদেন), মাতু'মাত (খাদ্যদ্রব্য), মালবুসাত (পরিচ্ছদ), আখলাক (নৈতিকতা)এর ব্যাপারে শরীয়া নীতিমালা রয়েছে। এগুলো সবই একটি ইসলামিক ও মানবিক সমাজে বসবাসের জন্য অপরিহার্য। ইসলাম যে সমাজের দিকে মানুষকে আহ্বান করে তা সর্ম্পকে এগুলো স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করে। এইসব বিশ্বাস, চিন্তা ও নিয়মকানুনকে *আল ফিকরাহ আল ইসলামিয়া* (ইসলামিক চিন্তা) বলা হয়।

শরীয়া নিয়মকানুন যা ইসলামী *ফিকরাহ*কে পূর্ণতা দান করে ও তা প্রতিষ্ঠিত করে, রক্ষা করে ও প্রসার ঘটায় এগুলো হল: শাস্তির বিধান, জিহাদের বিধান, খিলাফতের বিধান, শরীয়ার যে বিধানের কারণে ইসলামিক রাষ্ট্র বাস্তবায়িত হয় এবং মারুফ সম্পাদন ও মুনকার নিষিদ্ধ করবার বিধান। এসব সহায়ক শরীয়া বিধিবিধানকে *আত তারিকা আল ইসলামিয়া* (ইসলামিক পদ্ধতি) বলা হয়।

## যারা ত্বারিকা (পদ্ধতি) কে উপেক্ষা করে

যে জন্য আমরা ইসলামকে ফিকরা (চিন্তা) এবং ত্বারিকা (পদ্ধতি) এ দুয়ের সমষ্টি হিসেবে দেখাতে বাধ্য হচ্ছি তা হলো এই যে, এভাবে না দেখার কারণে মুসলিমরা অনেক শরীয়া বিধান বর্জন করছে এই বলে যে আমরা এগুলো অনুসরনে বাধ্য নই। তারা এই অজুহাতও দেখায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) অমুক কাজটি অমুক অবস্থা ও পরিস্থিতির কারণে সেসময় করেছিলেন। তাই, যদি সেগুলো আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে আমরা সেগুলো এখন গ্রহণ করব, অন্যথায় পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্য কোন আইন গ্রহণ করব। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই অনেকে ইসলামের পেনাল কোড পরিবর্তনের জন্য আহ্বান করে কেননা তারা মনে করে এগুলো বর্তমান সময়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তারা চাবুক মারা, পাথর মারা অথবা হাত কাটা এখন আর গ্রহণযোগ্য মনে করে না যেহেতু তাদের মতে এগুলো অনেক নিষ্ঠুর নিয়মকানুন ও পশ্চিমারা এসবকে মধ্যযুগীয় বর্বরতা মনে করে কেননা এসব তাদের মনে করিয়ে দেয় তাদের ধর্মের কথা যেখানে মধ্যযুগে কঠিন ও নিষ্ঠুর সব নিয়মকানুনের মাধ্যমে মানুষের উপর জুলুম করা হত, সুতরাং এইসব আইন কানুনের কথা বললে মানুষ ইসলাম থেকেও দূরে সরে যাবে। তাই, এইসব আইন কানুনকে জেল ও জরিমানা দিয়ে প্রতিস্থাপন করলে কোন অসুবিধা নেই। একইভাবে আমরা

দেখতে পাই কেউ কেউ জিহাদের অবলুপ্তির কথা বলে। ইসলাম প্রসারের জন্য যে জিহাদ এসেছিল তা বর্তমানে বিজ্ঞাপন ও প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। বর্তমান সময় হল সংস্কৃতি বিনিময়ের। যেহেতু ইসলামে রয়েছে প্রামাণ্য দলিলাদি ও পরিষ্কার সত্য, সেহেতু কলম, টেলিভিশন ও রেডিওর মাধ্যমে ইসলাম প্রচারে শক্তিপ্রয়োগের চেয়ে বেশী সুফল পাওয়া যাবে। আর শক্তি প্রয়োগ করা হলে হৃদয়সমূহ রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং ঘৃণা ও অসৎ প্রবৃত্তি জাগ্রত হবে। কেউ কেউ জিজিয়াকে বিড়ম্বনাকর ও দ্রোহাত্মক বলে একে পরিত্যাগ করবার পক্ষে মতামত প্রদান করে। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন, ইসলামিক আইনে খিলাফত ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক নয়। তারা এমন ফতওয়া প্রদান করেছে যা ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটিয়ে আধুনিক শাসনপ্রথা গ্রহণের যৌক্তিকতাকে দৃঢ় করেছে। তাদের মতে ইসলামিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা জরুরী , কিন্তু যে কাঠামো তা বাস্তবায়ন করে তা নয়, কেননা এই কাঠামো অনেক ধরনের হতে পারে।

এভাবে ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির ব্যাপারে অনেক প্রস্তাবনা এসেছে, যেমন: ইসলামী বই লেখা, মসজিদ নির্মাণ করা, দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, মিশনারী স্কুলের আদলে ইসলামি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, লোকদের নৈতিকতার দিকে আহ্বান করা, সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করা বা গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সরকারের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ক্ষমতা ভাগাভাগি করা ইত্যাদি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) এর ক্ষমতা গ্রহণের পদ্ধতি বরাবরই উপেক্ষিত থেকেছে।
এভাবে মুসলিমগন আজকে *ফিকরাহ*র সাথে সম্পৃক্ত শরঈ নীতিমালা অস্পষ্ট ও দ্বান্দিক উপায়ে গ্রহণ করছে। সেকারণে তারা ত্বারীকার সাথে যুক্ত শরীয়া নিয়মকানুনকে অবজ্ঞা করছে। এসবই ঘটেছে একারণে যে, তারা পশ্চিম ধ্যানধারণার শিকার হয়ে ইসলামকে পরিষ্কার ও আইনগতভাবে অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে এবং ফলশ্রুতিতে ইসলামের প্রয়োগকে বুঝতে অসমর্থ হয়েছে।

একারণে ফিকরাহ (চিন্তা) ও ত্বারীকা (পদ্ধতি) এর আলোচনা উঠে আসে যাতে করে মুসলিমগন গুরুত্বপূর্ণ শরীয়া নীতিমালাকে অবহেলা না করে- যেগুলো পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও আমাদের বাস্তব জীবনে বাস্তবায়নের জন্য এসেছে। এইসব হুকুমকে অবজ্ঞা করার অর্থ হল ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশকে পরিত্যাগ করা-যা একটি অপরাধ এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে এর জন্য আমাদের জবাবদিহী করতে হবে।

সেকারণে আমরা এই শ্রেনীবিন্যাসের মধ্যে এসেছি যে, 'ইসলাম হল ফিকরাহ (চিন্তা) ও ত্বারীকা (পদ্ধতি) এর সমন্বিত রূপ।' এর মাধ্যমে ইসলাম আরও স্পষ্ট হয়, বুঝতে সহজ ও প্রয়োগ সরলতর হয়। পূর্বে মুসলিমগন এ ধরনের শ্রেণীবিন্যাস করেছিল, যেমন: ইসলাম হল আক্বীদা ও ব্যবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মাতু'মাত (খাদ্যদ্রব্য) এর নিয়ম, মালবুসাত (পরিচ্ছদ), আখলাক (নৈতিকতা) ও ইবাদত (উপাসনা)। রাসূলুল্লাহ (সা) এর সময় এগুলো একসাথে সুবিন্যস্ত ছিলনা। তারপর ফকীহগন এগুলো সংগ্রহ ও সুবিন্যস্ত করেছেন এবং বইয়ের অধ্যায়ে স্থান দিয়েছেন-যাতে করে মুসলিমরা খুব সহজে এগুলো অনুধাবন ও প্রয়োগ করতে পারে ইত্যাদি।

এই আলোচনার অবতারণা একারণে করা হচ্ছে যাতে মুসলিমগন সুনির্দিষ্ট শরীয়া নিয়ম এমনভাবে গ্রহণ না করে যে প্রয়োজনে সেগুলো পরিবর্তিত, ও বিকৃত করে ফেলে এবং সবশেষে অবহেলা ও পরিত্যাগ করে।

শরীয়া শাস্তিকে আধুনিক শাস্তি দ্বারা প্রতিস্থাপন করা অনুমোদিত নয়, একইভাবে খিলাফতকে রিপাবলিকান পদ্ধতি দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যাবে না। পশ্চিমা সিভিল আইন ইসলামিক আইনের বদলে গ্রহণ করা যাবে না অথবা রাসূলুল্লাহ (সা) এর ক্ষমতা গ্রহণের পদ্ধতির বদলে নিজস্ব আকল বা নিয়মকানুন মানা যাবে না-যদিও এ ব্যাপারে অনেক ফতওয়া দেয়া হয়েছে।

সুতরাং, যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা একটি শরীয়া হুকুম, সেহেতু এটি প্রতিষ্ঠা করবার পদ্ধতিও একইভাবে শরীয়া হুকুম। এর অর্থ হল পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট শরীয়ার অন্যান্য নিয়মকানুনের মত এ ব্যাপারে বিস্তারিত দলিলাদি রয়েছে এবং গ্রহণ করবার জন্য এবং তা থেকে বিচ্যুত না হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

কেউ যদি ফিকাহশাস্ত্রের বইগুলোর দিকে তাকায় তাহলে দেখতে পাবে যে, মুসলিম ফকীহগন সুনির্দিষ্ট অধ্যায়ে **বিস্তারিতভাবে** উকুবাত (শাস্তি), জিহাদ, ইমারাত বা রাষ্ট্র এবং অন্যান্য পদ্ধতিগত হুকুম আলোচনা করেছেন। প্রয়োজন হয়নি বিধায় কেবলমাত্র ইসলামিক রাষ্ট্র বাস্তবায়নের পদ্ধতি সেখানে আলোচিত হয়নি। এর কারণ হল কালপরিক্রমায় মুসলিমগন এমন কোন পরিস্থিতিতে উপনীত হয়নি যখন একদিনের জন্যও ইসলামিক রাষ্ট্র ছিল না। কিন্তু আজকে মুসলিমদের এটি প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি বের করা ও তা গ্রহণ করবার জন্য সব প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করা উচিত। পরিস্থিতি বিবেচনা করে খেয়ালখুশী বা প্রবৃত্তির ভিত্তিতে নয় বরং এটা হওয়া উচিত শরীয় দলিলাদির ভিত্তিতে।

শরীয়া অনুসারে যখন পদ্ধতি আইনসম্মত হয়ে যাবে তখন আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (সা) এর আদর্শ সেখানে প্রতিফলিত হবে। যখন গ্রহণযোগ্যতা থাকবে তখন জবাবদিহীতা ও পরামর্শ প্রদানের সুযোগ থাকবে। অর্থাৎ আমীরসহ দলের যে কোন সদস্যকে তখন জবাবদিহী ও উপদেশ প্রদান করা যাবে। বিষয়সমূহ মানুষের মন, ব্যক্তিগত সম্পর্ক অথবা জীবনের অভিজ্ঞতার

দ্বারস্থ করা যাবে না। কর্মপদ্ধতি কখনওই পরীক্ষামূলক বিষয় হওয়া উচিত নয়, বরং এ ব্যাপারে শুধুমাত্র শরীয়ার দ্বারস্থ হওয়া উচিত।

যে ব্যক্তি ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবে সে স্বভাবতই এটা করবার শরীয়া পদ্ধতি ও বিস্তারিত দলিল সর্ম্পকে জানতে চাইবে। সে এ ব্যাপারে আলোচনা করবে ও লোকদের সেদিকে আহ্বান করবে। এখন জানা দরকার কী সেই শরীয়া কর্মপদ্ধতি যা একজনকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রহণ করতে হবে?

শরীয়া কর্মপদ্ধতি সর্ম্পকে ধারণা পাবার আগে একজন মুসলিমকে অবশ্যই আজকে মুসলিমগন কী ধরনের বাস্তবতার মধ্যে বসবাস করছে তা সুনির্দিষ্ট ও গভীরতার সাথে উপলদ্ধি করতে হবে- যাতে করে মৌলিক কার্যকারণ বুঝা যায়। এতে করে মৌলিক কার্যকারণের সাথে সংশ্লিষ্ট সব বিষয় সমাধান করা যাবে। সেকারণে এই সমাধান হবে মৌলিক। যখন বাস্তবতা অনুধাবনে আসবে ও মৌলিক কার্যকারণ বুঝা যাবে তখন শরীয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা সহজতর হবে। এর পরই দলটি তার শরীয়া কর্মপদ্ধতি সর্ম্পকে অবহিত হবে-যা তাকে মেনে চলতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর সুন্নাহকে অনুসরণ করতে হলে তাঁর জীবনকালের কোন সময় বর্তমান পরিস্থিতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বা নিকটবর্তী তা বিবেচনায় আনতে হবে।

## বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনই কর্মপদ্ধতি বিষয়ক হুকুমগুলোকে ঢেকে দিয়েছে

বাস্তবতার নিরীখে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলিমগন ব্যাপক বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের শিকার হয়েছে এবং পশ্চিমা কাফেররা এক্ষেত্রে যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দিয়ে মুসলিমদের ইসলামের সঠিক উপলব্ধি থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। একারণে মুসলিমরা ইসলামকে পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তিক মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে - যা হল দ্বীনকে জীবন থেকে আলাদা করা। যা পশ্চিমাদের জন্য পরবর্তী ধাপ নিয়ে কাজ করবার পথকে সুগম করেছে, অর্থাৎ তারা ইসলামী খিলাফতকে ধ্বংস করে মুসলিমদের জীবন থেকে ইসলামকে আলাদা করে ফেলল এবং ৫০ টিরও বেশী ক্ষুদ্র অকার্যকর স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত করে ফেলল। তারপর পশ্চিমারা প্রতিটি রাষ্ট্রে একজন করে তাদের প্রতি আজ্ঞাবহ শাসক বসাল-যারা সেসব দেশের সম্পদকে পশ্চিমের প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে পাহারা দিতে শুরু করল ও এমন ব্যবস্থা করল যাতে জনগন তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে না পারে। তারা এ জনগনকে পরিচালনা করবার জন্য নানা ব্যবস্থা প্রদান করল, প্রচারযন্ত্রকে তাদের চিন্তা প্রসারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করল, ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে পশ্চিমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করবার জন্য পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করে দিল। এসবকিছু মুসলিমদের উপরে পশ্চিমাদের আধিপত্যকে সুনিশ্চিত করল এবং বাস্তব জীবন থেকে ইসলামকে পুরোপুরি সরিয়ে দিতে সমর্থ হল।

এর ফলশ্রুতিতে মুসলিমগন আল হাক্ব বা সত্যের সাথে আল বাতিল বা মিথ্যাকে পার্থক্য করবার ক্ষেত্রে সন্দিহান হয়ে পড়লো। তাদের চিন্তা পশ্চিমা চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হল এবং তাদের জীবনব্যবস্থা পশ্চিমা মডেল অনুযায়ী গড়ে উঠল-যেখানে বৈষয়িক স্বার্থ জীবনের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে উঠল। তাদের আবেগ জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম ও আধ্যাত্মিক আবেগের মিশেলে তৈরি হল। একারণে মুসলিমদের পারস্পরিক বন্ধন ছিন্ন হল। মুসলিমগন নিজেদের কুফর ব্যবস্থার কাছে অর্পন করল এবং ইসলামিক রাষ্ট্র না থাকার বিষয়টি মেনে নিল। ফলে ইসলাম কিছু ব্যক্তিসর্বস্ব শরীয়া নিয়মনীতিতে পরিণত হল। অন্যকথায় তখন মুসলিমদের জীবনযাত্রা পশ্চিমাদের আদলে গড়ে উঠল যেখানে জীবন হতে দ্বীন বিচ্ছিন্ন। একারণে দুনিয়ার প্রতি মোহ বৃদ্ধি পেল এবং জান্নাত লাভের আকাঙ্খা তিরোহিত হল।

ফলস্বরূপ আল্লাহর বিধান (গজব) মুসলিমদের উপরে পতিত হল। দারিদ্রতা, জুলুম, বঞ্চণা, দ্বীন ও দুনিয়া সর্ম্পকে অজ্ঞতা, হানিকর নৈতিক চরিত্র ও অসুস্থ সর্ম্পক এসবই মুসলিমদের জীবনকে দূর্বিসহ করে তুলল।

এই বাস্তবতায় সঠিক দলটিকে অসুস্থতার মূল কারণ ও এর উপসর্গসমূহের মধ্যে পার্থক্য করতে জানতে হবে। যারা এই পার্থক্য করতে পারবে না তারা মনে করে যে, দারিদ্রতাই অসুখের মূল কারণ অথবা অসৎ নৈতিক চরিত্র, অজ্ঞতা ইত্যাদিও হতে পারে। তাই তারা সমস্যা সমাধানের জন্য যখন এগিয়ে আসবে তখন সেই সমাধান হবে আংশিক এবং তিনি রোগের মূল চিকিৎসা বাদ দিয়ে কেবল রোগের উপসর্গের চিকিৎসা করবেন। যদি কোন ব্যক্তি গভীরভাবে মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেন, তাহলে দেখবেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণেই মুসলিদের জীবনে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অনুপস্থিতি ঘটেছে। এই রাষ্ট্র না থাকায় তারা আজ অধপতিত, কাফেররা মুসলিমদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং অজ্ঞতা, দারিদ্র ও জুলুমের মত উপসর্গসমূহ ব্যাপকতা লাভ করেছে। ইসলামের পূণর্জাগরণ ঘটাতে হলে দলটিকে অনুধাবন করতে হবে যে, মুসলিমরা যে দারুল কুফরে এখন বসবাস করে সেটিকে দারুল ইসলামে পরিণত করতে হবে-যেখানে মুসলিমগন কেবলমাত্র ইসলামিক আইন কানুন দ্বারা শাসিত হবে। এছাড়াও বর্তমান অনৈসলামিক সমাজকে ইসলামিক সমাজে পরিণত করতে হবে যেখানের মানুষগুলো ইসলামিক চিন্তায় বিশ্বাস করে এবং এই আবেগের উপর ভিত্তি করে একীভূত থাকে।

ইসলাম দিয়ে তারা শাসন করে ও বিচারের জন্য ইসলামিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। আর তখনই ইসলাম পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত হয়।

এভাবে লক্ষ্য সুস্পষ্ট হয়-যা হল ইসলামিক আক্বীদার উপর ভিত্তি করে দারুল ইসলাম তথা ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা-যেখানে মুসলিমগন ইসলামিক জীবনব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হয় এবং যার ভিত্তি হলো আল্লাহ কতৃক প্রদত্ত হুকুম পালন ও নিষেধাজ্ঞা বর্জন ।

দলটি তার লক্ষ্য নির্ধারণের পর এবার সে লক্ষ্য অর্জনের শরীয়া পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে যা মেনে দলটিকে অগ্রসর হতে হবে। এটা বুঝতে হলে আমাদের রাসূলুল্লাহ (সা) এর মক্কীযুগে ফিরে যেতে হবে-যখন সেটা ছিল দারুল কুফর এবং রাসুল(সঃ) তাঁর দাওয়াতকে জনসমক্ষে আনার জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। সেখান থেকেই দলটি তার পথের মাইলফলক, কর্মধারা ও এর বিভিন্ন পর্যায় সর্ম্পকে ধারণা নেবে।

## আজকের পদ্ধতিও হবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পদ্ধতির অনুরূপ

সুতরাং, দলটিকে রাসূলুল্লাহ (সা) সে কর্মকান্ডসমূহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে যেগুলো তাকে মদীনাতে প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র বাস্তবায়নের দিকে নিয়ে গেছে। অবশ্যই পদ্ধতির বিভিন্ন ধাপসমূহ রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে নিতে হবে এবং দাওয়াতের নিয়মসমূহ সেসময়ের বাস্তবতা থেকে বুঝতে হবে। সুতরাং, দাওয়াত ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সাথে এগিয়ে যাবে, শত প্রতিকূলতার মাঝে; কেউ এ প্রতিকূলতা থেকে পরিত্রাণ পাবে না। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর আয়াত নাজিল হচ্ছিল তখন ওয়ারাকা বিন নওফেল বলেছিলেন,

‘তুমি মিথ্যুক হিসেবে সাব্যস্ত হবে, ক্ষতির শিকার হবে, পরবাসে যেতে বাধ্য হবে এবং যুদ্ধের মুখোমুখি হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ‘তারা কি আমাকে তাড়িয়ে দেবে?’ ওরাকা বললেন, ‘তোমার আগে এমন একজন নবীও আসেনি যারা নির্বাসনে যেতে বাধ্য হননি।’

এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন,
**‘আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গম্বরকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তারা এতে সবর করেছেন। তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌছা পর্যন্ত তারা নির্যাতিত হয়েছেন। আল্লাহ্‌র বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। নিশ্চয়ই আপনার কাছে পয়গম্বরদের কাহিনী পৌছেছে।’** (সূরা আনআমঃ ৩৪)

আজকের পদ্ধতিও হবে রাসূলুল্লাহ (সা.) দেখানো সেই পদ্ধতি। তিনি (সা) মক্কায় দারুল কুফরে বসবাস করতেন। তিনি স্বতপ্রণোদিত হয়ে এমন কিছু কর্মসূচী হাতে নিয়েছিলেন যা তাকে মদীনাতে দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। মক্কা থেকে মদীনাতে হিজরতের সময়টি ছিল দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে পরিণত হবার ক্রান্তিকাল।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, তাহলে কী এখন দাওয়াত দু’টি পর্যায়ে পরিচালিত হবে, অর্থাৎ মক্কী ও মাদানী পর্যায়?

উত্তর হল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর সময় দাওয়াত বহন করা হয়েছিল দু’টি পর্যায়েঃ

১. মক্কী পর্যায়ে বিশ্বাস ও সামান্য কিছু হুকুম রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর নাজিল হয়েছিল। আইনগতভাবে মুসলিমগন তখন যা নাজিল হত এর বাইরে আর কোন কিছুর জন্য দায়িত্বশীল ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল লোকদের ক্ষমা করে প্রজ্ঞা ও উত্তম উপায়ে আহ্বানের করবার জন্য। নিষেধ করা হয়েছিল যে কোনধরনের হিংসাত্মক কর্মকান্ড থেকে বিরত থেকে প্রতিকূল পরিবেশে ধৈর্যধারণ করবার জন্য।
২. মাদানী যুগে বা পর্যায়ে বিশ্বাস সর্ম্পকিত বাকী আয়াত ও আহকাম সর্ম্পকিত পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা সম্বলিত আয়াত নাজিল হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ইসলামিক আইন বাস্তবায়নের, উকুবাত (শাস্তি) সম্বলিত হুকুমসমূহ প্রতিষ্ঠা করবার, জিহাদ ঘোষণা করবার, নতুন ভূমি জয় করবার এবং লোকদের দেখভাল করবার। এ অবস্থায় মুসলিমগন ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অংশের জন্য দায়িত্বশীল হল।

আজকে আমরা মক্কা ও মদীনার হুকুম নির্বিশেষে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। যে কোন আইনের অবহেলায় জবাবদিহীতার সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং তালাক, বিয়ে, ব্যবসা, জিহাদ, রোযা, হজ্জ, শাস্তির বিধান, ভূমি, মালিকানা ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত মদীনায় নাজিলকৃত আয়াত সমূহের ব্যাপারে মুসলিমদের জবাবদিহী করতে হবে। এমন আইন রয়েছে যেগুলো

পালনের জন্য মুসলিমদের খলিফা অত্যাবশ্যকীয় এবং কোন মুসলিম ব্যক্তিগতভাবে তা গ্রহণের জন্য দায়িত্বশীল নয়, যেমনঃ শাস্তির বিধিবিধান, দাওয়াত প্রসারের জন্য আক্রমণাত্মক জিহাদ পরিচালনা, রাষ্ট্রীয় সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা ও খিলাফতের সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুমসমূহ। আবার এমন হুকুম রয়েছে যেগুলো খলিফার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এবং পরিস্থিতি নির্বিশেষে মুসলিমদের জন্য পালন করা বাধ্যতামূলক। এগুলো পালনে তারা ব্যর্থ হলে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে-হোক সেটা মক্কা বা মদীনায় নাজিলকৃত; এবং ইসলাম সেসব মুসলমানদের জন্য হিজরতকে বাধ্যতামূলক করেছে যারা অবস্থানরত ভূমিতে ব্যক্তিপর্যায়ের হুকুমসমূহ পালন করতে পারছে না। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**'যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলেঃ এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহ্‌র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান। কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, তারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না।'** (সূরা নিসাঃ ৯৭-৯৮)

সুতরাং আজকের সময়ে মক্কীযুগ বা মাদানীযুগ নিয়ে আলোচনা করা অবান্তর। দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমরা কেবলমাত্র মক্কীযুগে রাসূলুল্লাহ (সা) যে ধাপগুলো অতিক্রম করেছেন সেটা গ্রহণ করব যা কিনা পরবর্তীতে ইসলামিক রাষ্ট্র বাস্তবায়নের পথকে সুগম করেছিল। আর ব্যক্তিগত হুকুম দারুল ইসলাম বা দারুল কুফর নির্বিশেষে সর্বাবস্থায় মুসলিমদের উপর বাধ্যতামূলক।

# ৪

# যে ভাবে দারুল ইসলাম (ইসলামী রাষ্ট্র) প্রতিষ্ঠা করতে হয়

আমরা এখন শরীয়া কতৃক নির্ধারিত কর্মপদ্ধতি ও এর বিভিন্ন ধাপ নিয়ে আলোচনা করব-যা দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

আমরা আলোচনাকে প্রধানত দু'টি ভাগে বিভক্ত করব-

একটি ভাগে থাকবে রাসূলুল্লাহ (সা) এর পরিবর্তনের পদ্ধতি।

দ্বিতীয় ভাগে রাসূলুল্লাহ (সা) এর পদ্ধতিতে একটি দলের পরিবর্তনের কাজের পদ্ধতি আলোচিত হবে।

## THE STAGE OF CULTURING IN HIS (saw) TIME

যখন রাসূলুল্লাহ (সা) কে দাওযাতের কাজের দায়িত্ব দেয়া হল তখন তিনি লোকদের সেদিকে আহ্বান জানাতে আরম্ভ করলেন। কেউ কেউ তার আহ্বানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করল এবং কেউ কেউ অবিশ্বাস করল। যখন মক্কায় ইসলাম ব্যাপক পরিচিতি লাভ করল তখন সাধারণ জনতা এটা নিয়ে কথা বলা শুরু করল। রাসূলুল্লাহ (সা) শুরুতে তাদের বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাৎ করতেন। মক্কায় তিনি লোকদের প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতেন আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী,

'*হে চাদরাবৃত, উঠুন, সতর্ক করুন*' (সূরা মুদ্দাসিরঃ ১-২)

তিনি প্রথমে দলটিকে গোপনে সংঘটিত করেন। সাহাবাগন (রা) তখন লোকালয় থেকে দূরে উপত্যকায় গিয়ে সালাত আদায় করতেন। নতুন কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ (সা) তৎক্ষণাৎ কোরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য কাউকে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি যয়নব বিনতে আল খাত্তাব ও তার স্বামী  সাইদকে কুরআন শিক্ষার জন্য খাব্বাব বিন আরাতকে তাদের বাড়িতে প্রেরণ করেন। এটি সেই হালাকা বা পাঠদানচক্র ছিল- যেখানে সাইয়্যদনা ওমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি (সা) আল আরকামের বাড়িটিকে বিশ্বাসীদের কেন্দ্র ও নতুন দাওয়াতের জন্য বিদ্যায়তন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এ বাড়ীতে রাসূলুল্লাহ (সা) কুরআন শিক্ষা দিতেন ও সাহাবীদের মুখস্থ ও উপলব্ধি করবার পরামর্শ দিতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ততক্ষণ পর্যন্ত সাহাবীদের গোপনে শিক্ষা দিয়ে আসছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত নিম্নের আয়াতটি নাজিল না হয়ঃ

'*অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না।*' (সূরা আল হিজরঃ ৯৪)

শুরুতে রাসূলুল্লাহ (সা) বয়স, সামাজিক পদমর্যাদা, নারী-পুরুষ, বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশের আগে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ, বয়সের প্রায় চলি- শজন নারী ও পুরুষ এ দলের সাথে যুক্ত হয়। তারা বিভিন্ন বয়সের হলেও অধিকাংশই ছিল তরুণ। ধনী, দরিদ্র, দূর্বল ও শক্তিশালী সব অংশের প্রতিনিধিত্ব ছিল।

যখন চিন্তা বিকাশের ক্ষেত্রে সাহাবাগন (রা) পরিণত হল, তাদের মনস্বতত্ত (আকলিয়া) সুগঠিত হল অর্থাৎ সেটি ইসলামিক হয়ে গেল এবং তাদের নাফসিয়াও ইসলামিক হল ও রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নিশ্চিত হলেন যে এ দলটি পুরো সমাজকে মোকাবেলা করবার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছে তখন তিনি আল্লাহর নির্দেশে প্রকাশ্যে আর্বিভূত হলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) কে যেদিন দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল সেদিন থেকে ইসলামের দাওয়াত ছিল প্রকাশ্য। মক্কার লোকেরা জানত মুহম্মদ (সা) নতুন দ্বীনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন এবং অনেক লোক ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে। তারা এটাও জানত যে, নবদীক্ষিত মুসলিমরা এই নতুন দ্বীনের সাথে তাদের সর্ম্পক ও এর প্রতি তাদের আনুগত্যের বিষয়টি গোপন করছে। এ তথ্য জানার অর্থ হল নতুন দাওয়াত ও দাওয়াত গ্রহণকারী নতুন লোকদের সর্ম্পকে মক্কাবাসীর একধরনের অনুভূতি ছিল- যদিও তারা জানত না কারা মিলিত হচ্ছে এবং কোথায় মিলিত হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর ইসলামের প্রতি দাওয়াত একেবারে নতুন ছিল না, বরং যা নতুন ছিল তা হল বিশ্বাসীদের নতুন এই দলটির প্রকাশ্যে আর্বিভাব।

যখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এ আয়াতটি নাজিল হলঃ

*'অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না। বিদ্রূপকারীদের জন্যে আমি আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট। যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে, অতিসত্বর তারা জেনে নেবে।'* (সূরা আল হিজর: ৯৪-৯৬)

রাসূলুল্লাহ (সা) প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াতের ঘোষণা দিলেন এবং এর মাধ্যমে দাওয়াত ব্যক্তি পর্যায় থেকে গণপর্যায়ে উন্নীত হল। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) আগ্রহী লোকদের গোপনে দাওয়াত করবার পর্যায় থেকে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে গনসংযোগ পর্যায়ে নিয়ে আসলেন। এটা ছিল ঈমান ও কুফরের মধ্যকার দ্বন্দের সূত্রপাত এবং সঠিক চিন্তা ও ভুল চিন্তার মধ্যকার সংঘাত। সুতরাং দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হল। এটি হল গনসংযোগ ও সংগ্রাম করবার পর্যায় এবং সব সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (সা) এর বাড়ীতে পাথর ছুড়ে মারা হল। আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল রাসূলুল্লাহ (সা) এর বাড়ীর পথে ময়লা ফেলে রাখত। নবী (সা) এগুলো পরিষ্কার করে সন্তুষ্ট থাকতেন। আবু জাহেল তাদের দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত ভেড়ার নাড়িভূড়ি রাসূলুল্লাহ (সা) এর বরাবর ছুড়ে মারে। কিন্তু এসব রাসূলুল্লাহ (সা) এর ধৈর্য এবং সহ্যক্ষমতাই বৃদ্ধি করছিল কেবল । মুসলমানদের সতর্ক করা হচ্ছিল ও ক্ষতিসাধন করা হচ্ছিল। দ্বীন গ্রহণ করবার কারণে প্রত্যেক গোত্রই মুসলিমদের অত্যাচার ও যন্ত্রনা দিতে ঝাপিয়ে পড়েছিল। এ অত্যাচারের শিকার হয়েছিল বিলাল, আম্মার, তার মা ও বাবা এবং আরও অনেকে-যারা দূর্ভোগ লাভ ও অকথ্য নির্যাতনের পরও দৃঢ়তার উত্তম দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিল।

শুরুতে কাফেররা (কুরাইশগণ) রাসূলুল্লাহ (সা) এর কথা একজন নেহায়েত ধর্মপ্রচারক বা জ্ঞানী ব্যক্তির ভাবালুতা মনে করে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। তারা মনে করত লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবে। সেকারণে তারা মুহম্মদ (সা) কে দোষারোপ করেনি বা তার থেকে পালাতে চেষ্টা করেনি। যখন তাদের আড্ডার সামনে দিয়ে তিনি যেতেন তখন তারা বলত, 'এই হল আবদুল মুত্তালিবের সন্তান যে আকাশ থেকে আগত বাণী প্রচার করে।' রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের দেবতাদের কথা উল্লেখ করে এগুলোকে অসম্মান করলেন, তাদের চিন্তা ও পূর্বপুরুষদের পথভ্রষ্টতার জন্য দোষারোপ করার মাধ্যমে তিনি বিরোধিতা শুরু করলেন ও দ্বন্দে অবতীর্ণ হলেন। অতপর তারা তাকে শত্রু হিসেবে ঘোষণা দিল এবং বিরোধিতায়, শত্রুতায় এবং সহিংসতায় তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হল।

তার নবুয়্যতের দাবীকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করে তাকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেকারণে তারা তার আলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপাত্মক উপায়ে অবগত হওয়ার চেষ্টা করল। তারা বলত, 'তাহলে মুহম্মদ কেন সাফা ও মারওয়া স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দিচ্ছে না?' 'কেন আকাশ থেকে একটি কিতাব নাজিল হচ্ছে না?' "Why does Jibreel not appear in front of them?" "Why does he not give life to the dead?" ধীরে ধীরে তারা আরও একগুয়ে হতে লাগল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রভুর নির্দেশের প্রতি লোকদের আহ্বান অব্যাহত রাখল। কুরাইশরা তাঁকে দাওয়াত থেকে ফেরানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছে। সাহাবীদের উপর অত্যাচার, প্রপাগান্ডা ও বয়কট এবং এ ধরনের আরও অপচেষ্টা রাসূলুল্লাহ (সা) কে আল্লাহর রজ্জুকে আরও দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে সাহায্য করেছে এবং দাওয়াতের প্রতি প্রবল আগ্রহী করে তুলেছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর উপর অত্যাচারের খবর বিভিন্ন গোত্রের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল এবং দাওয়াতের বিষয়টি সাধারণভাবে সবার জানা ছিল। পুরো উপদ্বীপ ইসলাম সর্ম্পকে জানত এবং আরোহীরা বিভিন্ন জায়গায় ইসলাম নিয়ে কথা বলত। পবিত্র মাসসমূহ ছাড়া মুসলিমদের লোকদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) কাবার কাছে এসে লোকদের আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আহ্বান জানাতেন, তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) পক্ষ থেকে পুরষ্কারের সুসংবাদ জানাতেন এবং তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) শাস্তি ও ক্রোধ থেকে সতর্ক করতেন।

## রাসূলুল্লাহ (সা) এর সময়ে গণসংযোগ পর্যায়

কুরাইশদের সাথে দাওয়াত নিয়ে সংঘাত ছিল স্বাভাবিক। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) এই দলটিকে সাহসী ও চ্যালেঞ্জিং পদ্ধতিতে প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছিলেন। দাওয়াতের প্রকৃতির কারণে মক্কার সমাজ ও কুরাইশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। এ দাওয়াত এক আল্লাহর উপাসনা ও তাওহীদের প্রতি আহ্বান করেছিল এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বলেছিল ও যে দূর্নীতিগ্রস্ত নষ্ট শাসনব্যবস্থার মধ্যে তারা বসবাস করত তার সমূল উৎপাটন করবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। তিনি তাদের স্রষ্টাকে উপহাস করতেন, সস্তা জীবনধারাকে আক্রমণ করতেন এবং তাদের জীবনব্যবস্থার অবৈধ দিকসমূহ উন্মোচন করতেন। তিনি সত্য দিয়ে তাদের চ্যালেঞ্জ করতেন এবং তারাও করত মিথ্যে ও গুজব দ্বারা। তিনি লোকদের সুস্পষ্টভাবে আহ্বান জানাতেন এবং এ আহ্বানে কোন দ্ব্যর্থবোধকতা, নমনীয়তা বা বশ্যতার লেশমাত্রও ছিল না। সব অত্যাচার,

প্রত্যাখান, বিতাড়ন, গুজব ও বয়কটকে তোয়াক্কা করে তিনি এসব কিছু করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দিলেন এবং ইসলাম প্রসারিত হওয়া শুরু করল।

যখন তাঁর (সা) স্ত্রী ও চাচা মারা গেলেন এবং কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা আরও ঘনীভূত হল তখন তিনি সমর্থন আদায় ও নিরাপত্তার জন্য তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন এই ভেবে যে, হয়ত তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। কিন্তু তারা অকল্পনীয়ভাবে মন্দ আচরণ ও শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে তাকে প্রত্যাখান করল। তিনি এমন এক পর্যায়ে এসে উপনীত হলেন যখন নিরাপত্তা ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করতে পারছিলেন না। সেদিন তিনি আল মু'তিম বিন 'আদি এর প্রহরায় মক্কায় প্রবেশ করলেন। কুরাইশ কতৃক রাসূলুল্লাহ (সা) এর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়তে লাগল এবং প্রত্যাখান এর মাত্রা আরও প্রবল হল। বিরোধীরা তার কথা শুনতে লোকদের বারণ করত এবং এটা খুব বেশী কার্যকর হয়নি। হজ্জের মৌসুমে বিভিন্ন গোত্রের কাছে তিনি যাওয়া শুরু করলেন এবং তাদের ইসলামের দিকে আহ্বান করা শুরু করলেন ও প্রচার করলেন যে, তিনি একজন আল্লাহ প্রেরিত রাসূল ও এতে তাদের বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। তাঁর চাচা আবু লাহাব সাধারণত তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মিথ্যাচারের অভিযোগ আনত এবং লোকদের তাঁর কথা না শুনবার জন্য উদ্ধুদ্ধ করত। এ প্রচারণার একটা প্রভাব শ্রোতাদের উপর পড়ত, যেমন: তারা মাঝে মাঝে শুনত না। তারপর তিনি গেলেন বানু কিন্দা, বানু কাব, বানু হানিফা, বানু আমি'র বিন সা'সা এর কাছে। কিন্তু কেউ তার কথায় কর্ণপাত করত না। কেউ কেউ বিতৃষ্ণা নিয়ে খুব বাজেভাবে প্রত্যাখান করত। গোত্রসমূহের কাছ থেকে প্রত্যাখানের মাত্রা বেড়ে যাবার আরেকটি প্রধান কারণ হল কুরাইশরা মুহম্মদ (সা) এবং তার সাহায্যকারীকে তাদের শত্রু হিসেবে বিবেচনা করত। ব্যক্তি বা গোত্র হিসেবে লোকেরা আরও ক্রমবর্ধমান হারে রাসূলুল্লাহ (সা) কে প্রত্যাখান করা শুরু করল। তিনি ক্রমেই নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছিলেন এবং মক্কা ও এর আশেপাশে দাওয়াতের কাজ করা কঠিনতর হয়ে যাচ্ছিল। মক্কার সমাজ কুফরী ব্যবস্থার উপর অটল থাকল এবং কঠিন প্রতিপক্ষ হিসেবে দৃঢ় থাকল। যখন অত্যাচারের মাত্রা তীব্রতর হয়ে গেল তখন আবদুর রহমান বিন আউফ (রা)সহ আরও অনেকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে অস্ত্র ধারণের অনুমতি প্রার্থনা করল। তারা বলল, **'হে আল্লাহর রাসূল, আগে আমাদের মুশরিক হিসেবে সম্মান ও ক্ষমতা ছিল। আর যখন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম তখন অপমানিত হচ্ছি।'** রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের নিষেধ করে বললেন,

**'অবশ্যই, আমাকে ক্ষমা করে দেবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সুতরাং লোকদের সাথে যুদ্ধ করো না।'** (আন নাসায়ী ও আল হাকিমে ইবনে আবি হাতিমের বর্ণণায়)

এইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় দাওয়াতের দু'টি পর্যায় অতিক্রম করেছেন:

- শিক্ষণ, গঠন বা চিন্তার বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির পর্যায়। এটা হল চিন্তাকে উপলব্ধি করতে পারা, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সে চিন্তাকে মজ্জাগত করা এবং তাদের সুসংগঠিত করার পর্যায়।

- দাওয়াতের বিস্তৃতি ও সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার পর্যায়। এটা হল চিন্তাকে সমাজ পরিচালনার শক্তি হিসেবে সরবরাহ করা, চিন্তাকে প্রয়োগ করে জীবনের মূল ধারায় স্থান করা যাতে সাধারণ জনগন এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, বহন করে এবং প্রতিষ্ঠার পথে সর্বাত্নক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে।

প্রথম পর্যায়ের ক্ষেত্রে, এটা হল লোকদের ইসলামের দিকে আহ্বানের পর্যায় এবং এর চিন্তা দিয়ে তাদের চিন্তার বিকাশ ঘটানো, নিয়মকানুন শিক্ষা দেয়া এবং এমন একটি সংগঠন গড়ে তোলা যারা ইসলামিক আক্বীদার ভিত্তিতে এ কাজগুলো করতে পারবে। এ পর্যায়ে দাওয়াতকে গোপনে সংগঠিত করতে হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) দাওয়াত থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। তিনি যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের চিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছেন। তাদেরকে দারুল আরকামে একত্রিত করে একটি সংগঠনের কাঠামোর ভেতরে নিয়ে এসেছিলেন। এভাবে প্রতিদিন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তাদের মধ্যকার বন্ধন সুদৃঢ় হয়। তাদের মধ্যে বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা এবং কর্মসূচী গ্রহণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সে কারণে দাওয়াতের জন্য তারা নিজেদের উৎসর্গ করবার জন্য প্রস্তত ছিল। দাওয়াত তাদের হৃদয় ও মনে গভীরভাবে প্রোথিত ছিল। ধমনীতে রক্ত যেভাবে প্রবাহিত হয়েছিল সেভাবে ইসলাম তাদের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল। সেকারণে লুকোচুরি, গোপন কাঠামো ও গোপন বৈঠকের মধ্যেও তাদের ভেতরে দাওয়াত লুক্কায়িত ছিল না। বিশ্বাসী ও দাওয়াত গ্রহণের জন্য আগ্রহী লোকদের সাথে তারা এ দাওয়াত নিয়ে যেত। এভাবে লোকেরা তাদের উপস্থিতি ও দাওয়াত বুঝতে পারত। এভাবে দাওয়াতের সূচনা হল। অতপর দাওয়ার প্রকাশ অত্যবশ্যকীয় হয়ে উঠল। কিছু কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছিল এর প্রকাশ ও লোকদের সম্বোধন করার জন্য। এভাবে প্রথম ধাপ অতিক্রান্ত হল যেখানে গোপন কাঠামো তৈরি করা ও শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা হয়-যা এই কাঠামো তৈরিতে সাহায্য করে।

তারপর আরেকটি পর্যায় শুরু হল-যা ছিল গণসংযোগ ও সর্বাত্নক সংগ্রাম পর্যায়। লোকদের এসময় ইসলাম উপলব্ধি করবার সুযোগ দেয়া হয়। সেকারণে তখন তারা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে এবং এবিষয়ে আগ্রহী হয়েছে। আবার অন্যদিকে তারা

এটাকে প্রত্যাখান ও পরবর্তীতে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং এভাবে এ চিন্তার সাথে দ্বন্দ শুরু হয়েছে। এ দ্বন্দে কুফর ও কুচিন্তা পরাভূত হয়েছে, ঈমান ও সত্য বিজয় হয়েছে এবং সঠিক চিন্তাই প্রবলতর হয়েছে। এভাবে গনসংযোগ শুরু হল এবং একটি চিন্তা ও আরেকটির মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হল, অর্থাৎ এ প্রতিযোগিতা ছিল মুসলিম ও কাফেরদের মধ্যে। এর সূত্রপাত হয়েছিল যখন রাসূলুল্লাহ (সা) গণমানুষের কাছে সাহস ও চ্যালেঞ্জের সাথে দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেয়া শুরু করলেন। তাওহীদের দাওয়াত, মূর্তিপূজা ও শিরকের চিন্তাকে আঘাত এবং কোন চিন্তা ছাড়া পূর্বপুরুষকে অন্ধভাবে অনুকরণ করার বিষয়গুলোকে সমালোচনা করে রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর আয়াত নাজিল হতে লাগল। আয়াতসমূহতে ত্রুটিপূর্ণ বিনিময় ব্যবস্থা, বাণিজ্য এবং মাপে কম দেয়ার সমালোচনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) দলে দলে লোকদের সাথে কথা বলা শুরু করলেন, ইসলামকে গ্রহণ ও সাহায্য করবার জন্য আহ্বান জানালেন। কুরাইশ ও নবী (সা) এর মধ্যকার দ্বন্দ বৃদ্ধি পেল। দাওয়াতের মধ্যে বাড়িতে, পাহাড়ের পাদদেশে, দারুল আরকামে নিবিড় শিক্ষাদান পদ্ধতির পাশাপাশি তখন সামষ্টিক শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। ফলে, এটা স্থানান্তরিত হল কিছু সংখ্যক মানুষ যাদের মাঝে কল্যাণ (goodness) ছিল তাদের আহ্বান জানানোর পর্যায় থেকে সমগ্র মানষকে আহবান জানানোর পর্যায়ে। এই সামষ্টিক দাওয়াত ও গনসংযোগ পর্যায় কুরাইশদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করল। সুতরাং তাদের ঘৃণা ঘনীভূত হল এবং তারা ইসলাম নিয়ে ভীত হয়ে পড়ল। দাওয়াতকে বিরোধিতা করবার জন্য তারা ভয়ংকর সব পরিকল্পনা আটতে থাকল; এ পর্যায়ের আগে তারা রাসূলুল্লাহ (সা) এর দাওয়াতকে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেনি। সুতরাং মানুষিক ক্লেশ ও জুলুম বাড়তে লাগল। তবে এই সামষ্টিক দাওয়াত এর নিজের উপরে অনেক প্রভাব বিস্তার করল। এর কারণে অনেকে ইসলামের কথা শুনবার সুযোগ পেল এবং আল্লাহর দ্বীনের কথা মক্কাবাসীর কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভবপর হল। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করল। সামষ্টিক দাওয়াতের কারণে এর কলেবর বাড়ানোর সুযোগ হল। যদিও এ কারণে দাওয়াত বহনকারীদের দূর্ভোগ, অত্যাচার ও নির্যাতন বাড়িয়ে দিল। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) কুরাইশদের অন্যায়, নিষ্ঠুরতা, মক্কার সমাজের দাসত্ব, কাফেরদের করুণ অবস্থা ও কর্মকান্ডের মুখোশ উন্মোচন করছিলেন তখন তারা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। সব পর্যায়সমূহের মধ্যে এ পর্যায়টি রাসূলুল্লাহ (সা) ও তার সাহাবীদের জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল।

চিন্তা বিকাশের পর্যায় থেকে গনযোগাযোগ পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পর্যায়টি খুব স্পর্শকাতর একটি বিষয়, কারণ এর জন্য প্রজ্ঞা, ধৈর্য, চিন্তার যথার্থতা অপরিহার্য। তবে গনযোগাযোগ পর্যায়টি ছিল সবচেয়ে কঠিন। এর জন্য একজনকে সাহসী, স্পষ্টভাষী এবং ফলাফল বা প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনায় না নিয়ে চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মানসিকতা নিয়ে আসতে হবে। এ ধাপে মুসলিমদের দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এ পর্যায়ে ঈমান ও দূর্ভোগ সহ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি বিকশিত হয় এবং সংঘাতের সময়গুলোতে ঐকান্তিকতা গড়ে উঠে।

একইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবাদের (রা) নিয়ে এমনভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন যাতে তারা অত্যাচার, দূর্ভোগ ও নির্যাতন সহ্য করতে পারে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবিসিনিয়াতে হিজরত করেছেন, কেউ দ্বীন নিয়ে পালিয়েছেন, কেউ নির্যাতনের কারণে মারা গেছেন এবং কেউ কেউ অত্যাচার সহ্য করেছেন। মক্কার সমাজকে পরিবর্তনের জন্য তাঁরা যথেষ্ট সময় নিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তবুও অত্যাচারের ভয়াবহতা সফলতার পথে বাধা হয়ে দাড়িয়েছিল। আরবদের অনেকে দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। কারণ তখন তারা ঈমান গ্রহণ করে কুরাইশদের চটাতে চায়নি। তৃতীয় ধাপে অর্থাৎ ইসলামকে বাস্তবায়নের স্তরে দাওয়াত মক্কার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সা) নুসরা ও সুরক্ষা পাবার জন্য গোত্রসমূহের কাছে যাওয়া শুরু করেন-যাতে করে তিনি তার প্রভূ যা নাজিল করেছেন তা লোকদের কাছে স্পষ্ট করতে পারেন।

## রাসূলুল্লাহ (সা) কতৃক গোত্রসমূহকে ইসলামের দিকে আহ্বান

যখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর চাচা আবু তালিব ও বিবি খাদিজা (রা) একই বছরে ইন্তেকাল করলেন তখন তাদের মৃত্যুর কারণে তার ভাগ্যাকাশে দূর্যোগের মেঘ আরও ঘনীভূত হল। চাচার মৃত্যুর পর কুরাইশগন রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর নির্যাতনের খড়গহস্ত আরও কঠিনভাবে চালাতে উদ্যত হল। এ ব্যাপারে তিনি (সা) বলতেন,

**'আবু তালিবের মৃত্যুর পর কুরাইশগন যত ঘৃণিত কাজ করেছিল ততটা আর কখনওই করেনি।'** (সীরাতে ইবনে হিশাম)

আবু তালিবের মৃত্যুর পর নিজের ও তাঁর লোকদের সুরক্ষা ও নুসরার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) তায়েফ গিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি বানু সাকিফ গোত্রের কিছু নেতৃস্থানীয় লোকের সাথে দেখা করেছিলেন। তিনি তাদের সাথে ইসলামকে সমর্থন করা ও এর পাশে দাঁড়ানোর জন্য কথা বলেন, তার গোএের যে কেউ তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবার জন্য বললেন। তারা এ আহ্বান প্রত্যাখান করেছিল এবং বারণ করা সত্ত্বেও তাদের সাথে যোগাযোগের বিষয়টি গোপন না রেখে প্রকাশ করে দিয়েছিল। বিশেষ প্রহরা ছাড়া মুহম্মদ (সা) মক্কায় প্রবেশ করতে পারেননি।

রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন গোত্রের দরজায় দাঁড়িয়ে আহ্বান জানিয়ে বলতেন,

**'হে অমুক গোত্র! আমি তোমাদের কাছে প্রেরিত আল্লাহর রাসূল। তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। এইসব মূর্তি থেকে যে কোন কিছু গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুন ও ঈমান আনুন। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে রক্ষা করুন যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা লোক সামনে তুলে ধরছি।'** (সীরাত ইবনে হিশাম)

রাসূলুল্লাহ (সা) এর চাচা আবু Lahab ছায়ার মত তাঁর পেছনে লেগে থাকত এবং তিনি যা বলতেন তার জবাব দিত ও প্রত্যাখান করত। কেউ তার কথা গ্রহণ করত না, তারা সাধারণত বলত, 'তোমার লোকেরা যারা তোমাকে আরও ভাল জানে তারাই তোমাকে অনুসরণ করে না।'

তারা কথা বলত ও তর্ক করত। অন্যদিকে তিনি তাদের সাথে কথা বলতেন এবং আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাতেন এই কথা বলে,

**"হে আমার প্রভু , যদি তোমার ইচ্ছা থাকত! তারা এটা অপছন্দ করত না। "**

সীরাত ইবনে হিশামে উল্লেখ আছে, আয-জুহরী বর্ণণা করেন যে, মিনাতে রাসূলুল্লাহ (সা) বানু কিন্দা গোত্রের কাছে তাদের আবাসস্থলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি নিজেকে উপস্থাপন করেছেন ও প্রত্যাখাত হলেন। তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বানু কা'ব গোত্রের কাছে যান এবং প্রস্তাব দেন। কিন্তু আগের মতই প্রত্যাখাত হন। তারপর তিনি বানু হানিফা গোত্রের কাছে গিয়ে একইভাবে প্রস্তাব দেন এবং তাদের প্রত্যাখান ছিল আরবদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। তিনি বানু আমির বিন বানু সা'সা' এর কাছে গিয়েছিলেন এবং তাদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন ও নিজেকে উপস্থাপন করেন। বহাইরা বিন ফিরাস নামে তাদের মধ্যকার একজন বলল,

'আল্লাহর কসম, আমি যদি কুরাইশের এই তরুণকে নিতে পারতাম তাহলে পুরো আরবদের পরাজিত করতে পারতাম।' সে রাসূলুল্লাহ (সা) কে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি মনে কর, যদি আমরা তোমাকে অনুসরণ করি এবং স্রষ্টা তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমাকে বিজয় দান করে তবে তোমার পরে আমাদের হাতে ক্ষমতা আসবে?' নবী (সা) উত্তর দিলেন,

*'ক্ষমতার মালিক আল্লাহ এবং তিনি যাকে খুশী তাকে তা দান করেন।'*

বহাইরা উত্তর দিল, 'আমরা তোমাকে রক্ষা করবার জন্য আরবদের কাছে আমাদের গলা উন্মুক্ত করে দেব আর যখন তুমি বিজয়ী হবে তখন ক্ষমতা চলে যাবে অন্য কারও হাতে! তাহলে তোমার ক্ষমতার আমাদের প্রয়োজন নেই!'

রাসূলুল্লাহ (সা) এরকমই করে যেতে থাকলেন। যখন হজ্জের মৌসুমে লোকেরা জমায়েত হত, তিনি (সা) সেখানে উপস্থিত হতেন এবং তাদের আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাতেন। তিনি (সা) নিজেকে উপস্থাপণ করতেন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা ও রহমত তুলে ধরতেন। যখনই রাসূলুল্লাহ (সা) জানতে পারতেন যে কোন স্বনামধন্য ও সম্মানিত আরব এসেছেন তখনই তিনি কালবিলম্ব না করে তাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দিকে আহ্বান জানাতেন ও তাঁর প্রতি নাজিলকৃত বাণীসমূহ উপস্থাপন করতেন।

ইতিবাচক সাড়া না দিলেও রাসূলুল্লাহ (সা) যে সব গোত্রের সাথে দেখা করেছিলেন, ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং নিজেকে তাদের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন তারা হল: ১) বানু আ'মির বিন সা'সা' ২) মুহারিব বিন খাসফাহ ৩) ফাজারাহ ৪) ঘাসান ৫) মুরাহ ৬) হানিফাহ ৭) সুলায়েম ৮) আবাস ৯) বানু নাদর ১০) বানু আল বুকা ১১) কিন্দা ১২) কা'ব ১৩) আল হারিস বিন কা'ব ১৪) উজরাহ ১৫) আল হাদারিমাহ

ইবনে সাদ এর 'আত তাবাকাত' শীর্ষক বই অনুসারে এই তালিকা উল্লেখ করা হল।

## দাওয়াতের আহ্বানে মদীনাবাসীর প্রতিক্রিয়া

রাসূলুল্লাহ (সা) গোত্রসমূহকে প্রতিবছর মাজান্না, উ'কাজ এবং মিনায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও তার নিজের প্রতি ক্রমাগতভাবে আহ্বান জানাচ্ছিলেন-যাতে করে তিনি তাঁর রবের বাণী নিরাপদে মানুষের দ্বারে পৌঁছে দিতে পারেন এবং এর প্রতিদানে তারা জান্নাত অর্জন করতে পারে। আরবের একটি গোত্রও তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি এবং তিনি নির্যাতিত ও চরিত্র হননের অপচেষ্টার শিকার হয়েছিলেন যতক্ষণ না আল্লাহর ইচ্ছায় দ্বীন বিজয়ী হওয়া, প্রভূর মদদপুষ্ট হওয়া ও প্রতিশ্রুতি

বাস্তবায়িত হওয়ার সময় এসেছিল। অত:পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা) কে আনসারদের একটি গোত্রের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি (স:) এমন একটি দলের সাথে বসলেন যারা তাদের মাথা মুন্ডন করছিলেন । রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের সাথে বসেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আহ্বান করেন এবং তাদের কোরআন তেলাওয়াত করে শোনান। তারা খুব দ্রুত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সা) এর ডাকে সাড়া দেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনেন। Then they went to Madinah and invited their people to Islam; henceforth people started to embrace Islam.

পরের বছর হজ্জের মওসুমে মদীনার আওস ও খাজরাজ গোত্রের বারজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে আল আকাবা নামক স্থানে দেখা করেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন। এটা ছিল আকাবার প্রথম সাক্ষাৎ-যেখানে বায়াতুন নিছা বা নারীদের শপথ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মুসয়াব বিন উমায়ের (রা) কে মদীনায় প্রেরণ করেন। তিনি (সা) মুসায়েব (রা) কে সেখানে কুরআন পাঠ করবার, মদীনাবাসীকে ইসলাম ও দ্বীন শিক্ষা দেয়ার নির্দেশ দেন। তিনি আল মুকরী (তেলাওয়াতকারী) হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং আসাদ বিন জুরারাহ-এর সাথে থাকতেন। অতপর উসায়েদ বিন হাদায়ের ও সাদ বিন মুয়া'জ ঈমান আনেন। তারা ছিলেন মদীনায় নেতৃস্থানীয়। যখন পরেরজন ইসলাম গ্রহণ করল তখন তিনি তার জনগনের উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমাদের মাঝে আমাকে তোমরা কিভাবে দেখ?' তারা প্রত্যুত্তরে বলল, 'আমরা তোমাকে আমাদের অভিভাবক এবং প্রাজ্ঞব্যক্তি মনে করি এবং সত্য পথে একজন নেতা ভাবি।' তিনি বললেন, 'তোমাদের পুরুষ এবং নারীগন ততক্ষণ আমার সাথে কথা বলতে পারবে না যতক্ষণ তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর।' বিকেলের মধ্যে আবদুল আশ-শাল এর বাড়ীতে এমন একজন পুরুষ ও নারী খুঁজে পাওয়া গেল না যে মুসলিম হয়নি।

## আল 'আকাবার শপথ

মুসায়েব (রা) মক্কায় ফিরে আসলেন। আনসারদের মধ্য থেকে কিছু মুসলিম তাদের তীর্থযাত্রী মুশরিক লোকদের সাথে হজ্জ করবার জন্য এল। তাশরীকের (১০ জিলহজ্জ থেকে শুরু করে ৪ দিন) মাঝামাঝি এক দিনে তারা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে শপথবদ্ধ হলেন। তাদের মধ্যে তেয়াত্তর জন পুরুষ ও দুইজন নারী ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে কেবল তার চাচা ছিলেন। আসাদ বিন জুরারাহ বলেন, ' রাসূলুল্লাহ (সা) এর চাচা আল আব্বাস সর্বপ্রথম কথা বললেন। তিনি বললেন, 'হে খাজরাজের লোকেরা! তোমরা মুহম্মদ(স:) সাথে দেখা করে তাকে আমন্ত্রন জানাচ্ছ। মুহম্মদ (সা) তার গোত্রের লোকদের মধ্য থেকে সবচেয়ে সম্মানিত। আল্লাহর কসম! আমাদের মধ্য হতে যারা তাকে বিশ্বাস করে অথবা না করে, সবাই তার সম্মান ও বংশীয় ধারার জন্য সুরক্ষা দিয়েছে। তোমাদের জন্য মুহম্মদ সবাইকে প্রত্যাখান করেছে। আপনারা যদি ক্ষমতাবান, ধৈর্যশীল, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হন এবং সব আরবদের ঐক্যবদ্ধ বৈরীতা ও শত্রুতা মোকাবিলায় প্রস্তত থাকেন, তাহলে আপনাদের সদিচ্ছার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিন এবং এর উপর দৃঢ় থাকুন। প্রকাশ্যে নিরঙ্কুশভাবে একমত পোষণ করবার পর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবেন না। কারণ সৎ সাক্ষী সর্বোৎকৃষ্ট সাক্ষী।

তারা বলল, 'আপনি যা বললেন, তা আমরা শুনলাম। কিন্তু হে রাসূলুল্লাহ (সা), আপনি আমাদেরকে আপনার ও আপনার রবের জন্য পছন্দ করুন এবং বলুন আপনার যা ইচ্ছা হয়।'

রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের সামনে বক্তব্য দিলেন, কুরআন তেলাওয়াত করে শুনালেন, লোকদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করলেন ও ইসলাম গ্রহণের জন্য উৎসাহী করলেন। তাঁর প্রভুকে উপাসনা করা ও তার সাথে কাউকে শরীক না করবার শর্ত দিলেন। তারপর তিনি বললেন, **'আমি আপনাদের সমর্থন প্রত্যাশা করছি যে, আমাকে সুরক্ষা দিন যেভাবে আপনারা আপনাদের নারী ও শিশুদের সুরক্ষা দিয়ে থাকেন।'** (সীরাত ইবনে হিশাম)

আসাদ বিন জুরারাহ আল বারাহ আরও বর্ণণা করেন যে, 'মা'রুর শপথ গ্রহণের জন্য তার হাত তুলে নিয়ে বললেন, 'অবশ্যই, সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে একজন সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আপনাকে আমরা সেভাবে রক্ষা করব যেভাবে আমাদের স্ত্রী ও সন্তানের সুরক্ষা প্রদান করি। হে রাসূলুল্লাহ, সুতরাং আমরা বাইআত প্রদান করলাম। আল্লাহর কসম, আমরা বংশ পরম্পরায় নেতা থেকে নেতাতে যোদ্ধা ও অস্ত্রচালনায় পারদর্শী।'

যখন আল বারা কথা বলছিল, তখন আবুল হায়সামি ইবনুল তাইহান তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের অন্য লোকদেও (ইহুদী) সাথেও সর্ম্পক রয়েছে। যদি আমরা তাদের প্রতি কঠোর হই এবং সম্ভবত সে সময় আল্লাহ যদি আপনাকে বিজয়ী করেন তাহলে কি আপনি আমাদের প্রত্যাখান করে নিজের লোকদের কাছে ফিরে আসবেন?' রাসূলুল্লাহ (সা) স্মীত হেসে উত্তর দিলেন,

**'না, রক্ত তো রক্তই; আর রক্তের বদলাও রক্তই। আমি তোমাদের জন্য আর তোমরাও আমার জন্য। তোমরা যাদের সাথে যুদ্ধ করবে আমিও তাদের সাথে যুদ্ধ করব আর তোমরা যাদের সাথে সন্ধি চাইবে আমার সন্ধিও তাদের সাথেই।'** (সীরাত ইবনে হিশাম)

আসাদ বিন জুরারাহ বর্ণণায় আরও উল্লেখ করেন, ''অতপর তারা বলল, 'সম্পদের ক্ষতি অথবা আমাদের মধ্যকার সম্ভ্রান্তগন উৎসর্গীকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমরা তাঁকে (সা) বাই'য়াত দিলাম। তারপর আল বারা বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ (সা), আপনার হস্ত প্রসারিত করুন।' এভাবে তিয়াত্তর জন রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাতের উপর হাত রেখে বাই'য়াত সম্পন্ন করল। যখন লোকেরা বাই'য়াত দিল এবং তা সুসসম্পন্ন হল তখন শয়তান আল আকাবায় চিৎকার করে বলে উঠল, 'হে আখাসীবের (কুরাইশ) লোকেরা, তোমরা কি মুহম্মদ ও তার সাহাবাগন (মুশরিকদের দৃষ্টিতে দ্বীনত্যাগী) কে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একত্র হওয়া পছন্দ কর?' রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, **'তোমাদের মধ্য হতে বারজন নেতা নিয়ে আস যারা তাদের লোকদের দায়িত্ব নিবে, যেমন ঈসা বিন মারিয়মের হাওয়ারীয়ন (শীষ্যগন) ; আর আমি আমার লোকদের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল।'** তারা দু'পক্ষ থেকে নুকাবা (নেতা) নির্বাচন করল। এভাবেই পূর্ণাঙ্গ ঈমানী পরিবেশে বাই'য়াত সুসম্পন্ন হল। এ বিষয়ে আল আব্বাস বিন উবাদা রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলেন, 'সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে একজন সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, যদি আপনার ইচ্ছা তাই হয় তাহলে আগামীকালই আমরা মীনাবাসীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে প্রস্তত।' রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

**'আমরা এ ব্যাপারে আদিষ্ট হইনি, সুতরাং তোমরা তোমাদের বাহন উটসমূহের কাছে ফিরে যাও।'** (সীরাত ইবনে হিশাম)

হজ্জের মৌসুম শেষ হতে চলল। মক্কার লোকদের কাছে যখন বাই'য়াত খবর পৌছাল তখন তারা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। ইবনে সা'দ তার 'আত তাবাকাত' গ্রন্থে উরওয়া'র বরাতে আয়েশা (রা) এর কাছ থেকে বর্ণণা করেন যে, তারা বলল, 'যখন সত্তর জন লোক রাসূলুল্লাহ (সা) কে ত্যাগ করল, তখন তিনি বুঝতে পারলেন আল্লাহ তাঁর জন্য সুরক্ষা, যোদ্ধা ও সমর্থন প্রদান করেছেন। তবে মুসলিমদের উপর পরীক্ষা বেড়ে গেল। এ ব্যাপারে সাহাবীগণ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে অভিযোগ করলেন এবং তিনি তাদের হিজরতের অনুমতি দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবা (রা) কে হিজরতের জন্য যে ভূমির কথা জানালেন তা হল ইয়াসরীব বা মদীনা এবং যে হিজরতে আগ্রহী তাকেই অনুমতি দিলেন। তিনি (সা) বললেন, **'আমি স্বপ্নে দেখলাম, মক্কা থেকে এমন এক ভূমিতে হিজরত করছি যেখানে খেজুর জাতীয় গাছ রয়েছে। আমার মন বলছিল আল ইয়ামা অথবা হাজারের কথা, কিন্তু এটা ছিল আল ইয়াসরীব।'** (বুখারী ও মুসলিম)

অবশ্যই গোত্রসমূহের কাছ থেকে নুসরাহ পাবার প্রচেষ্টা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় বায়াতের ঘটনা এসবই প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এমন ক্ষমতার অধিকার খুঁজছিলেন যা তাঁর দ্বীনকে সহায়তা এবং সুরক্ষা দিতে পারবে। বিষয়টি কেবলমাত্র দাওয়াত বহন বা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এর সাথে এমন এক ক্ষমতার বিয়য়টি বিজড়িত ছিল যার মাধ্যমে মুসলিমগন আত্মরক্ষা করতে পারবে। বরং এর কলেবর আরও বেড়ে যায়, এটি এমন একটি নিউক্লিয়াস ছিল যাকে কেন্দ্র করে ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, সমাজে ইসলাম বাস্তবায়িত হবে -যা মানবতার কাছে শাশ্বত বাণী বহন করে এবং সে ক্ষমতা লালন করে যা ইসলামকে সুরক্ষা দেয় এবং এর বিস্তারের পথে আরোপিত সব বস্তুগত প্রতিবন্ধকতাকে অপসারণ করে। এভাবে সম্পদ, স্বদেশ, স্ত্রী ও পরিবার ছেড়ে হিজরত সম্পন্ন হয়। মদীনার হিজরত আবিসিনিয়ার হিজরত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল।

আবিসিনিয়ায় হিজরত ছিল দ্বীন ও অত্যাচারের ভয়ে কিছু ব্যক্তির নিজ ভূমি থেকে পলায়ন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মক্কায় নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য এমন এক নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যাতে করে তারা নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত না হয়ে তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে এবং তাদের অন্তরাত্মাসমূহ পূণরায় শক্তিশালী ও দৃঢ়তার সাথে দাওয়াত বহনের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ পায়। এটা দাওয়াতের পদ্ধতির কোন ধাপ নয় যেখানে মুহাজিরনগণ প্রবাসে থেকে দাওয়াত বহন করতে পারে অথবা প্রবাসী শাসকদের সহায়তা নিয়ে তার মূল ভূমির শাসককে উৎখাত করতে পারে।

## মদীনায় হিজরত

মদীনায় হিজরত দাওয়াতের ক্ষেত্রে আলোচনা ও সহিষ্ণুতার পর্যায় থেকে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম বাস্তবায়নের পর্যায়ে উন্নীত হবার একটি ধাপ। এটা দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে উন্নিত হওয়া যা মদীনাতে রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ইসলাম বহন করেছিলেন। আর তা করা হয়েছিল ইসলাম দ্বারা শাসিত একটি রাষ্ট্রের মাধ্যমে। এ রাষ্ট্র ইসলামকে বাস্তবায়ন করে এবং এর দিকে দলিল প্রমাণসহ আহ্বান করে ও দাওয়াতকে ক্ষমতার সাথে বহন করে যাতে করে বাতিলের অত্যাচার ও ক্ষতির হাত থেকে একে সুরক্ষা দেয়া যায়।

যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনাতে পৌঁছলেন তখন সেখানকার অনেক লোক তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বপ্রথম একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এ মসজিদে সালাত আদায় করা হত, পরামর্শ করা হত, লোকদের বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা ও বিবাদ নিরসন করা হত। তিনি (সা) মদীনাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে লাগলেন। তিনি মদীনার বাইরে অভিযান পরিচালনা করেন ও তাদের নেতৃত্ব নির্ধারণ করে দেন। ইহুদীদের সাথে চুক্তি করেন। সাধারণভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনাতে একজন শাসকের ভূমিকা পালন করেন অর্থাৎ তিনি ছিলেন সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধান।

দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবার আগে রাসূলুল্লাহ (সা) এ কাজগুলো করেছিলেন। সুতরাং এ থেকে আমরা কী বাধ্যবাধকতার নির্দেশ পাই?

আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে পুরোপুরি অনুসরণ করতে বাধ্য এবং তিনি যেভাবে অগ্রসর হয়েছেন আমরাও একইভাবে অগ্রসর হতে বাধ্য। যেহেতু ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ফরয, সেহেতু এক্ষেত্রেও তাঁর (সা) পদাঙ্ক আমাদের অনুসরণ করতে হবে। তার(স:) ব্যাখ্যামুলক কার্যাবলীতে যে হুকুম পাই তা একই ব্যাখ্যামুলক বিষয়ের জন্য বাধ্যতামুলক হুকুম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ সম্পর্কে বললেন,

'বলে দিন: এই আমার পথ। আমি আল্লাহ্‌র দিকে বুঝে শুনে দাওয়াত দেই- আমি এবং আমার অনুসারীরা।' (সূরা ইউসুফ: ১০৮)

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা) এর সীরাত অনুসরণ করলে আমাদের কাজগুলোকে দুই ধাপে ভাগ করতে বাধ্য:

- ব্যক্তিত্ব গঠন ও (দল) প্রতিষ্ঠার ধাপ
- গণযোগাযোগ এবং সংগ্রামের ধাপ

প্রথম ধাপে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কর্মপন্থা আমরা অনুসরণ করতে বাধ্য। এ ধাপে যারা ইসলামী দাওয়াতের বোঝা বহন করবে তাদেরকে ইসলাম দিয়ে গভীরভাবে বিকাশের ব্যবস্থা ও বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্বে পরিণত করতে হবে। এটা সম্ভব হবে খুব ভাল ইসলামী আকলিয়া (মানসিকতা/ধ্যান-ধারনা) ও নাফসিয়া (ঝোঁক/প্রবণতা) গড়ে তুলবার মাধ্যমে। যা করতে হবে গভীরতাসমৃদ্ধ পাঠচক্র বা হালাকা প্রদানের মাধ্যমে, যা রাসূলুল্লাহ করেছিলেন। যার মাঝেই রাসূলুল্লাহ (সা) ইসলাম গ্রহণের উপযোগীতা দেখতে পেতেন, তার বয়স, পদমর্যাদা, লিঙ্গ, বর্ণ নির্বিশেষে তিনি তাকে আহ্বান করতেন এবং তাদের একটি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতেন। যতক্ষণ না পর্যন্ত ক্রমপ্রসারমান হিযবের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে উপরোক্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে:

-বিকাশের পরিণত অবস্থা, অর্থাৎ তাদের মনস্তত্ত্ব বা আকলিয়া এবং নাফসিয়াহ বা প্রবণতা গড়ে উঠেছে ইসলাম অনুসারে। সুতরাং তারা এখন সমাজের দূষিত চিন্তাগুলোর মোকাবেলা করার সক্ষমতা অর্জন করেছে।
-কেবলমাত্র নিজেদের মধ্যে গন্ডীভূত রাখবার জন্য তারা দাওয়াতকে গ্রহণ করবে না। সুতরাং তারা যাই জানে তাই ছড়িয়ে দিতে থাকবে। যার মধ্যেই তারা কল্যাণ (খায়ের) দেখতে পাবে তার কাছেই তারা এ দাওয়াত নিয়ে যাবে।
-লোকেরা দাওয়াতকে হৃদয়ঙ্গম করবে, এর উপস্থিতি ও সামষ্টিকতাকে অনুভব করবে।

যখন সাহাবীদের মত এ তিনটি বৈশিষ্ট্য কোন হিজবের মধ্যে দেখা যাবে, তখন সেটি দ্বিতীয় ধাপে অগ্রসর হবে ।

এ ধাপে রাসূলুল্লাহ (সা) এর মত দাওয়াতকে জনগনের কাছে নিয়ে যেতে হবে এবং বর্তমান সমাজের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে ও তাদের চিন্তা, ঐতিহ্য ও ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। তাদের চিন্তার দেউলিয়াত্বের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে এবং বিকল্প ইসলামী চিন্তা, ধারণা ও ব্যবস্থাকে উপস্থাপন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর মত জড়তাহীনভাবে, অসম সাহসিকতা ও শক্তিমতার সাথে লোকদের আহ্বান করতে আমরা বাধ্য। আমরা এ দাওয়াত পরিত্যাগ করব না ও আত্মসমর্পণও করব না। আমরা তোষামোদ বা আপোষ করব না এবং রীতিনীতি, ঐতিহ্য, ধর্ম, জীবনাদর্শ, শাসক অথবা জনতার ভয়কে উপেক্ষা করব। আমরা এমনভাবে দাওয়াহ বহন করব যাতে নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব ইসলামের জন্য হয়ে যায়। জনগন এর সাথে একমত বা দ্বিমত পোষণ করুক না কেন অথবা এটা তাদের ঐতিহ্যের সাথে যাক বা সাংঘর্ষিক হোক এবং জনগন গ্রহণ, প্রত্যাখান বা বিরোধিতা করুক। যতক্ষণ না আদর্শ অনুসারে কাঙ্খিতভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত এর সাথে সংযুক্ত থাকব এবং ধৈর্যধারণ করব। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা) এর মত এ সময়েও শাসকগন এ লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়াবে সেহেতু এ দলটিকে এই শাসকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। আর এটা তখনই সংঘটিত হবে যখন তাদের মুখোশ, দুরভিসন্ধি ও দালালি ও ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করে দেয়া হবে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর মত এসবকে চ্যালেঞ্জ করা হবে। যেভাবে পবিত্র কুরআন আবু লাহাবকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিল:

**'আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে।'** (সূরা লাহাব:১-৩)

বানু হাশিম গোত্রে সে সম্মানিত হওয়া সত্ত্বেও এ আয়াত নাজিল হয়েছিল। একইভাবে কুরআনে বানু মাখদুম আল ওয়ালিদ বিন মুগীরাকে হুশিয়ারি উচ্চারণ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**'যাকে আমি একা সৃষ্টি করেছি, তাকে একাকী আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি তাকে বিপুল ধন-সম্পদ দিয়েছি।'** (সূরা আল মুদ্দাসির:১১-১২)

অতপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**'আমি তাকে দাখিল করব প্রজ্জলিত জাহান্নামের আগুনে।'** (সূরা আল মুদ্দাসির : ২৬)

তার সর্ম্পকে সূরা ক্বলমে বলা হয়েছে:

**'কঠোর স্বভাব, তদুপরি কুখ্যাত'** (সূরা ক্বলম:১৩)

যখন তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আবু জাহেলের ব্যাপারে বলেন,

**'কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবই- মিথ্যাচারী, পাপীর কেশগুচ্ছ।'** (সূরা আলাক:১৫-১৬)

আমাদের দাওয়াতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) এর মত লোকদের নির্দেশনা দেয়ার মানসিকতা নিয়ে এগুতে হবে। এ ধাপে তিনি (সা) ইসলাম যাতে তাদের জীবনাদর্শ হয়ে যায় ও মুহম্মদ (সা) মিশন যাতে তাদের মিশন হয়ে যায়- সে জন্য সর্বাত্মকভাবে তাদের কাছে ইসলামী আদর্শ ব্যাখা করেছেন। অর্থাৎ আমরা যা বুঝাতে চাই তা যেন লোকেরা গভীর উপলদ্ধির সাথে গ্রহণ করে।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর মত আজকেও আমরা প্রত্যাখান, প্রতিবন্ধকতা, মিথ্যা অপবাদ, বিতাড়ন, প্রোপাগান্ডা, বয়কটের শিকার হতে পারি।

সাহাবাগন (রা) সেসময় অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন এবং তখন তিনি (সা) প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন,

**'আমি ক্ষমা করে দেবার জন্য আদিষ্ট হয়েছি; সুতরাং লোকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করো না।'**

একইভাবে নুসরাহ খুঁজে পাবার পূর্বে আমরা অস্ত্রধারণ ও ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকব।

রাসূলুল্লাহ (সা) যেমনিভাবে তৃতীয় ধাপে উন্নীত হবার জন্য নুসরাহর সন্ধান করেছিলেন তেমনিভাবে আমরাও ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শাসন করবার জন্য নুসরাহ বা বস্তুগত সমর্থন অনুসন্ধান করতে বাধ্য। এ ধাপ হল ক্ষমতা গ্রহণ ও শাসন করবার ধাপ।

## নুসরাহ বা বস্তুগত সমর্থন অনুসন্ধান

এবার আসা যাক পদ্ধতিগত নিয়মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান প্রসঙ্গে আর তা হল নুসরাহ বা বস্তুগত সমর্থন। এটা নিয়ে সাবধানতার সাথে বিশে- ষণ করে দেখা যাক আমাদের কী অনুসরণ করা উচিত, বিশেষ করে আমরা যখন দেখতে পাই যে, ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যারা কাজ করেন তারা নুসরাহর বিষয়টি অত্যন্ত কম গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন। তারা মনে করে এটি একটি side বিষয় বা এর ইসনাদ (বর্ণাার সূত্র) ততটা শক্তিশালী নয় বিধায় এটি গ্রহণ করবার প্রয়োজন নেই। তারা কেবল এখানেই থেমে থাকে না। বরং রাসূলুল্লাহ (সা) এর সবগুলো সীরাতে সামান্য কিছু ব্যত্যয় ছাড়া সুস্পষ্ট বর্ণাা থাকা সত্তেও এ বিধান ও যারা এর অনুসরণ করে তাদের কটাক্ষ করা হয়। যদিও সীরাতের এসব লেখকগণের কারোরই বর্তমানে অস্তিত্বশীল দলগুলোর সাথে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না।

পবিত্র কুরআন তাদের সর্ম্পকে বলেছে,

*‘সাহায্য সহায়তা দিয়েছে’* (সূরা আনফাল:৭২)

এবং তাদের আখ্যায়িত করেছে

*‘আনসার (সাহায্যকারী)’* (সূরা তাওবাহ: ১০০)

এ বর্ণণা ছিল অত্যন্ত প্রশংসার ও উন্নত আঙ্গিকের-যার মাধ্যমে তাদের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) এর সীরাত বিশে- ষণ করলে দেখতে পাব যে, তিনি ক্ষমতাধর নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছে নুসরাহ অনুসন্ধান করেছিলেন। একটির পর একটি গোত্রের কাছ থেকে তিক্ত অভিজ্ঞতা পাওয়া সত্তেও তিনি এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বারংবার নুসরাহ অনুসন্ধান করছিলেন এবং এ ব্যাপারে দমে যাননি। ইবনে সা’দ তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, যতগুলো গোত্রের কাছে তিনি (সা) গিয়েছিলেন তার সংখ্যা পনের এর কম নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) এর এই অধ্যাবসায় থেকে আমরা যা পাই তা হল, নুসরাহ অনুসন্ধান করা ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার পক্ষ থেকে নবী (সা) এর প্রতি একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা।

পবিত্র কোরআন এ সাহায্যকারীদের ‘আনসার’ বলে আখ্যা দিয়েছে, যা এর আরেকটি daleel। কোরআনে একাধিক জায়গায় তাদের প্রশংসা করা হয়েছে ও আল্লাহসুবহানাহু ওয়া তা’আলা তাদের ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। ‘মুহাজেরীন’ (অভিবাসী) দের পরেই তাদের অবস্থান।

নুসরাহ সর্ম্পকিত বর্ণণা থেকে বুঝা যায় যে, এটি একটি শরীয়াগত বাধ্যবাধকতা। সে কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

**‘হে অমুক ও অমুক গোত্র। আমি তোমাদের কাছে প্রেরিত আল্লাহর রাসূল (সা)। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা’আলা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন ইবাদত করবার ও তার সাথে কাউকে শরীক না করবার.....আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে ও আস্থা রাখবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে সমর্থন প্রদান করবে যতক্ষণ না আমি আল্লাহ প্রদত্ত হুকুমসমূহ লোকদের কাছে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরছি।’** (সীরাত ইবনে হিশাম) এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা ও রাসূলুল্লাহ (সা) পক্ষ থেকে প্রদত্ত একটি নির্দেশনা-যা শরীয় একটি হুকুম। আর এর বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ style অনুসরণ করতে হবে। এটা এমন কোন ঠুনকো বিষয় নয় যে, চাইলেই পরিবর্তন করা যাবে।

এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা) ও যাদের কাছে নুসরাহ অনুসন্ধান করা হয়েছিল তাদের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল অথবা দ্বিতীয় আকাবার শপথে তার (সা) ও বাই’য়াত প্রদানকারীদের মধ্যকার যে সংলাপ হয়েছিল-তা থেকে বুঝা যায় নবী (সা) একটি লক্ষ্যে এ কাজে (নুসরাহ অনুসন্ধান) অগ্রসর হয়েছিলেন ও এ কাজের উপর দৃঢ় ছিলেন; অর্থাৎ দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও এমন এক entity প্রতিষ্ঠার জন্য যা দ্বীনকে বাস্তবায়ন, সুরক্ষা প্রদান ও বিস্তারের কাজ করবে। সুতরাং কীভাবে আমরা এটিকে অবজ্ঞা করি যখন এর মাধ্যমে দাওয়াত একটি পর্যায় থেকে আরেকটি পর্যায়ে উন্নীত হয় ও একটি ভূমিতে একটি ব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন ও প্রসারের সুযোগ সৃষ্টি করে। তাহলে এ অবজ্ঞা কার স্বার্থে?

- কুফফারগণ বুঝতে পেরেছিল যে, এ কাজের পেছনে রয়েছে একটি অঙ্গীকার ও দ্বীন বিজয়ের বীজ। একারণে আমরা দেখতে পাই বানু আমীর গোত্র বুঝতে পেরেছিল এ বিষয়টি ক্ষমতার সাথে বিজড়িত। মক্কার কুফফারগণের কাছে যখন দ্বিতীয় আকাবার খবর পৌছায় তখন তারা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল। তারা বলেছিল, ‘হে খাজরাজের লোকেরা! আমাদের কাছে খবর আছে যে, তোমরা আমাদের সাথীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছ এবং তাকে আমাদের থেকে নিয়ে গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ করেছ।’ আমরা দেখতে পাই শয়তান সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বলেছিল, ‘হে আখাসীবের (কুরাইশ) লোকেরা, তোমরা কি মুহম্মদ ও তার সাহাবাগন (মুশরিকদের দৃষ্টিতে দ্বীনত্যাগী) কে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একত্র হওয়া পছন্দ কর?’

দ্বিতীয় আকাবার শপথের সময় আল বারা বলেন, ‘হে রাসূলুল্লাহ, সুতরাং আমরা বাই’আত প্রদান করলাম। আল্লাহর কসম, আমরা বংশ পরম্পরায় নেতা থেকে নেতাতে যোদ্ধা ও অস্ত্র চালনায় পারদর্শী ও সুসজ্জিত।’ আবুল হায়সামি ইবনুল তাইহান বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের অন্যদের লোকদেও (ইহুদী) সাথেও সর্ম্পক রয়েছে। যদি আমরা তাদের প্রতি কঠোর হই এবং সম্ভবত সে সময় আল্লাহ যদি আপনাকে বিজয়ী করেন তাহলে কি আপনি আমাদের প্রত্যাখান করে নিজের লোকদের কাছে ফিরে আসবেন?’ আসাদ বিন জুরারাহ বলেন, ‘আজ তাকে নেওয়া মানে সকল আরবের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করা, তোমাদের মধ্যকার সম্ভ্রান্তগন কতল হওয়া এবং তলওয়ারেরে তিক্ত স্বাদ নেওয়া।

এ বিষয়ে আল আব্বাস বিন উবাদা রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলেন, 'সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে একজন সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, যদি আপনার ইচ্ছা তাই হয় তাহলে আগামীকালই আমরা মীনাবাসীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে প্রস্তত।'

আল হায়সামীর প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তর দিলেন,

**'না, রক্ত তো রক্তই; আর রক্তের বদলা রক্তই। আমি তোমাদের জন্য আর তোমরাও আমার জন্য। তোমরা যাদের সাথে যুদ্ধ করবে আমিও তাদের সাথে যুদ্ধ করব আর তোমরা যাদের সাথে সন্ধি চাইবে আমার সন্ধিও তাদের সাথেই।'**

আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) সর্ম্পকে বলেন যে, তাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সাহায্য, ক্ষমতাশালী লোক, সমরাস্ত্র ও সমর্থন দিয়ে সন্তুষ্ট করেছিলেন।

ইবনে হিশাম রাসূলুল্লাহ (সা) এর নুসরাহ অনুসন্ধান নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'আল্লাহ যখন তার নবী (সা) কে শক্তিশালী ও দ্বীনকে বুলন্দ করতে চাইলেন তখন আনসারদের মধ্য হতে এই লোকগুলোকে দিয়ে সহায়তা করলেন।'

এসব মন্তব্য থেকে এই হুকুমের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায় এবং একজন ইসলামের দিকে আহ্বান করার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলে সে দ্বীনকে সমর্থন করল-এরূপ ব্যাখ্যা বা নির্দেশনার ভ্রান্তি থেকে মুক্ত রাখে। বাই'আত, ইজাহার উদ দীন (দ্বীনের বিজয় কবুল করা); নাসর (সমর্থন), যুদ্ধ; বিশিষ্টজনেরা হত্যার সম্মুখীন হবে; তলোয়ারের আঘাতে তারা ঘায়েল হবে; এটা সব আরবের বিরুদ্ধে যাবে; তাদের এমনভাবে সুরক্ষা দেয়া উচিত যেভাবে নারী ও শিশুদের দেয়া হয়- এসব অভিব্যক্তি থেকে বুঝা যায় কীভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) নুসরাহ অনুসন্ধান করেছিলেন। তিনি তা করেছিলেন সুরক্ষার খাতিরে এবং এমনকি প্রয়োজনে দ্বীন বহনের জন্য শক্তি প্রয়োগের নিমিত্তে ও এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যা দ্বীন ও এর অনুসারীদের রক্ষা করবে। সাথে সাথে এর হুকুমসমূহ বাস্তবায়ন ও বিশ্বের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেবার কাজ করবে।

এ বাস্তবতায় একজন বুঝতে পারবে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিম্নলিখিত কাজগুলো করেছিলেন:

- তিনি ব্যক্তির নিরাপত্তা ও দাওয়াতের সুরক্ষার জন্য সমর্থন অনুসন্ধান চেয়েছিলেন। এটা মুশরিকদের কাছ থেকে চাওয়া যায় যেমনিভাবে তার চাচা তাকে সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন অর্থাৎ তার উপর আপতিত যে কোন ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এটা মু'তীম বিন আদি'র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা তিনি (সা) তায়েফ থেকে আদি'র সহায়তায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। সুরক্ষার বিষয়টিকে মুসলিমদের দ্বীনের সাথে আপোষ করবার জন্য ব্যবহার করা যাবে না। দাওয়াতের গতি কিছুটা শ- থ করতে অনুরোধ করায় রাসূলুল্লাহ (সা) তার চাচাকে বলেছিলেন,

**'আল্লাহর কসম, হে আমার চাচা! যদি তারা দাওয়াতকে পরিত্যাগ করবার জন্য আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয়, তারপরেও আমি দ্বীনকে পরিত্যাগ করব না যতক্ষণ না আল্লাহ এ দ্বীনকে বিজয়ী করে বা এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমি নিহত হই।'** (সীরাত ইবনে হিশাম)

- রাসূলুল্লাহ (সা) সাধারণত নেতাদের সাথে যোগাযোগ করতেন এই কামনায় যে, তারা ঈমান আনলে তাদের অনুসরণকারী সাধারণ লোকেরাও ঈমান আনবে। দাওয়াত প্রসারণকে সহজতর করা ও গ্রহযোগ্য করবার জন্য তিনি এটা করেছিলেন। এটা দাওয়াতের জনপ্রিয়তার ভিত্তি (কাই'দাহ শাবিয়্যাহ, popular base) তৈরিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিল।
- রাসূলুল্লাহ (সা) ক্ষমতাধর লোকদের কাছে নুসরাহ অনুসন্ধান করেছিলেন এই শর্তে যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে-যে রকমটি ঘটেছিল আল আকাবার দ্বিতীয় শপথের ক্ষেত্রে।

নুসরাহ অনুসন্ধান করা হয়েছিল ক্ষমতাধর লোকদের কাছ থেকে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর সময় এমনসব ক্ষমতাবান লোকদের কাছে নুসরাহ সন্ধান করা হয়েছিল যাদের রয়েছে নেতৃত্ব ও জনপ্রিয়তা। সেসময় নেতারাই শাসক ছিল; তারা আবার সেনাবাহিনীর প্রধানও ছিল এবং তাদের মতামতের উপর জনগন আস্থাশীল ছিল।

আজকের দিনে শাসকেরা বলপ্রয়োগে ক্ষমতায় আসীন হয় এবং তারা অজনপ্রিয়। আবার অনেকসময় জনপ্রিয়তা যা দেখা যায় তা প্রকৃত চিত্র নয়। এক্ষেত্রে আমাদের তাই করতে হবে যা রাসূলুল্লাহ (সা) করেছিলেন। সুতরাং আমরা সমাজে প্রভাবশালী এমনসব লোকদের সাথে যোগাযোগ করব যাদের মাধ্যমে তাদের অনুগামী অন্য লোকদের কাছে পৌঁছানো সহজতর হয়-যাতে করে জনপ্রিয়তার ভিত্তিমূল অর্জিত হয়। আর রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হবার লক্ষ্যে ক্ষমতাশালী লোকদের কাছে নুসরাহ অনুসন্ধান করব, যেমন: সামরিক বাহিনীর অফিসার। তাছাড়া যখন দলের সদস্যদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায় তখন তাদের বন্ধু

ও আত্নীয়স্বজনদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা দোষণীয় নয় এই শর্তে যে এর ফলে দাওয়াকারীর ঈমান কোনরূপ চাপ বা আপোষের সম্মুখীন হবে না। এভাবে বর্তমান বাস্তবতাকে বিবেচনায় এনে রাসূলুল্লাহ (সা) কে অনুসরণ করতে হবে।

আর এটাই হল রাসূলুল্লাহ (সা) এর পদ্ধতি এবং আমরা তাকে অনুসরণ করতে এই পদ্ধতি গ্রহণে বাধ্য। অর্থাৎ আমরা নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করব:

১. (দলের) শাবাবদের এমনভাবে প্রস্তত করা যাতে তাদের হাতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের হাতে মোহাজেরীনদের গড়ে তুলেছিলেন-যারা মক্কায় দাওয়াতের কাজ করেছিলেন এবং নবী (সা) এর সাথে ইসলামিক রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করেছিলেন এবং তারপরে উম্মাহকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
২. সাধারণ সচেতনতার ভিত্তিতে চিন্তার পক্ষে জনমত তৈরী করা অর্থাৎ এমন জনপ্রিয় ভিত্তি যা শাসনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কিছুকে গ্রহণ করতে চায় না ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ামাত্র একে বরণ করে নেবার ইতিবাচক প্রবণতা দেখায়। আর এ অবস্থা পুরোপুরি মদীনার জনগনের মতই যখন তারা ইসলাম দাবী করেছিল এবং এটাকে সুরক্ষা দেবার জন্য এগিয়ে এসেছিল।
৩. ক্ষমতাধর লোকদের কাছ থেকে নুসরাহ অনুসন্ধান, যার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তগত করা যায়।

যখন উপরোক্ত বিষয়গুলো সুসম্পাদিত হবে তখন আমরাও সে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারব যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) করেছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি শরী'য়াহ আকড়ে ধরবার কারণে বিশ্বাসীদের বিজয় দান করবেন। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

***'মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।'* (সূরা রূম:৪৭)**

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন,

*'আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহ্র সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, শক্তিধর।'* (সূরা হজ্জ:৪০)

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন,

*'তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে,তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না।'* (সূরা নূর:৫৫)

# তরীকাহ (পদ্ধতি) এবং উসলূব (ধরন)

এখন যে প্রশ্নটি উত্থিত হয়, তা হল, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় যা বলেছিলেন এবং করেছিলেন তা কি ওহী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিনা এবং একারণে এটা মানতে আমরা বাধ্য অথবা এমন কোন কাজ বা কর্ম করেছেন কিনা যা ওহী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং যেগুলো একজন অনুসরণ করতে বাধ্য নয়?

এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই পদ্ধতি, উপকরণ ও ধরনের প্রশ্ন আসে।

আরেকটি প্রশ্ন উত্থিত হয়, তা হল, পদ্ধতি (যা হল কিছু শরীয় হুকুমের সমষ্টি কিন্তু উপকরণ নয়) নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো যাবে কিনা এবং যদি পরীক্ষার পর এটা কোন ফল দেয় তাহলে এটা সঠিক, অন্যথায় নয়?

## প্রথম বিষয়টির ক্ষেত্রে

আমরা নিম্নোক্তভাবে বলতে পারি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিমদের রাসূলুল্লাহ (সা) কে অনুসরণ করতে বলেছেন অর্থাৎ তিনি যা বলেছেন এবং করেছেন। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

***'এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কোরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়।'* (সূরা আন নাজম: ৩-৪)**

এবং তিনি বলেন,

" রাসূল তোমাদেরকে যা ('মা') দেন তা গ্রহণ কর এবং যা ('মা') তিনি নিষেধ করেন তা বর্জন কর "  (আল কুরআন, ৫৯:৭)

এখানে 'মা' শব্দটি সাধারণ অর্থে (সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ রাসূল (সা) আমাদের জন্য কোন কিছু নিয়ে এসেছেন কিন্তু তা আমাদের পালন করা লাগবে না এমন কিছুই নেই; যতক্ষণ না শারী'আহ কোন ব্যতিক্রম নির্দেশ করে।

নির্দিষ্ট রকমের কিছু কথা এবং কাজের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে যেসব ক্ষেত্রে রাসূল(সা) কে অনুসরণ না করলেও চলে বলে প্রমাণ রয়েছে। যেমনঃ

- রাসূলুল্লাহ (সা) নিম্নের হাদীসঃ

**'দুনিয়াবি বিষয়ে তোমরা আমার চেয়ে বেশী জ্ঞান রাখ।'**

সুতরাং দুনিয়াবি বিষয়, যেমনঃ কৃষি, উৎপাদন, আবিষ্কার, চিকিৎসাশাস্ত্র ও প্রকৌশল ইত্যাদি বিষয়ক technical জ্ঞান ওহীর অর্ন্তভুক্ত নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) এর মাধ্যমে আমাদের বুঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, এসব ক্ষেত্রে তিনি যে কোন সাধারণ মানুষের মতই। খেজুর গাছের পরাগায়ন সম্পর্কিত তাঁর ঘটনাটির মধ্য দিয়েই বিষয়টি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

-কিছু কাজ রয়েছে যেগুলো একান্তভাবেই তাঁর জন্য এবং অন্য কেউ এ ব্যাপারে অংশীদার নয়। যেমন, তাহাজ্জুদ পড়া তাঁর উপর ফরয ছিল, রাতের বেলাতেও রোযা অব্যাহত রাখা এবং চারের অধিক বিয়ে করবার অনুমতি ছিল। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) কে অনুসরণ করা **অনুমোদিত নয়**।

-যেসব কাজ মানুষ হিসেবে তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল, যেমনঃ দাঁড়ানো, বসা, হাটা, খাওয়া, পান করা ইত্যাদি। এটা নিঃসন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, এসবই উম্মাহর জন্য মুবাহ (অনুমোদিত) হিসেবে পরিগণিত।
– বিভিন্ন শরঈ হুকুম বাস্তবায়নের জন্য রাসূল (সা) উপযুক্ত ধরন(উসলূব) এবং উপকরণ(ওয়াসিলা) ব্যবহার করতেন। শরঈ হুকুম হচ্ছে আল্লাহর হুকুম অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু এই শরঈ হুকুম কিভাবে অর্থাৎ কোন ধরন এবং উপকরণের সাহায্যে বাস্তবায়ন করতে হবে তা একজন মানুষ হিসেবে রাসূল (সা) এর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়; যাতে সে ধরন ও উপকরণ বাস্তবসম্মত হয় এবং যদি কোন হারামের দিকে পরিচালিত না করে।
উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ (সুওতা) যখন বলেনঃ

***"অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরোয়া করবেন না।"* [সূরা আল হিজরঃ ৯৪]**

একটি শরঈ হুকুম যাকে অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু কিভাবে তা বাস্তবায়ন করতে হবে সে বিষয়টিকে শরীয়া স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করেনি। আল্লাহর (সুওতা) হুকুমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাসূল (সা) প্রকাশ্যে ঘোষণার কাজটি সম্পাদন করেছিলেন, কারণ এই হুকুমের বিরুদ্ধে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলনা। কিন্তু যে উপায়ে তিনি (সা) প্রকাশ্যে ঘোষণার কাজটি সম্পাদন করেছিলেন সেটা তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক ছিলনা। অতএব ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাসূলকে (সা) অনুসরণকারী দলের জন্যও এই কাজটি বাধ্যতামূলক নয়। রাসূল (সা) সাফা পাহাড়ের উপরে উঠে লোকদের আহ্বান করেছিলেন, লোকজনকে খাবারের দাওয়াত দিয়েছিলেন, মুসলিমদেরকে সাথে নিয়ে দুটো সারিতে করে কাবা প্রদক্ষিণ করেছিলেন–এগুলো ছিল মূলত শরঈ হুকুম বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত কিছু ধরন অর্থাৎ এগুলো ছিল প্রকৃত (আসল) হুকুম **'প্রকাশ্যে ঘোষণা দান'** এর সাথে সম্পর্কিত কিছু সহায়ক কাজ। নীতিগতভাবে এ জাতীয় ধরনসমূহ অনুমোদিত। বিষয়টিকে শরীয়া স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত না করে দলের হাতে ছেড়ে দিয়েছে যাতে তারা সবচেয়ে উপযুক্ত ধরনসমূহকে বেছে নিতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) যখন বলেন :

***"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে যাতে আল্লাহ এবং তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পার।"* [সূরা আনফালঃ ৬০]**

তখন প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য তাঁর এই নির্দেশ হচ্ছে একটি শরঈ হুকুম যার আনুগত্য করতে হবে অর্থাৎ বিষয়টি ফরয এবং এর বিরুদ্ধে যাওয়া হারাম। এই আয়াতে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার ইল- াহ(শরঈ কারণ) হচ্ছে শত্রুদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা। কিন্তু উপকরণের(ঘোড়া) বিষয়টি এখানে বাধ্যতামূলক নয়। যেকোন উপকরণ যা এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবে সেটাই এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে। জিহাদের জন্য উপযুক্ত উপকরণ যুগের সাথে সাথে পরিবর্তিত

হয়ে আসছে। এজন্য শরঈ হুকুম বাস্তবায়নের জন্য সবচেয়ে কার্যকর উপকরণ বেছে নিতে হবে। জিহাদের জন্য বা আল্লাহর শত্রু এবং মুনাফিকদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য বর্তমান সময়ে প্রয়োজন হচ্ছে আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের (শরীয়া নির্ধারিত সীমার মধ্যে)। অতএব শরঈ হুকুম হচ্ছে আল্লাহর হুকুম অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিষয়টিতে আল্লাহর সরাসরি মন্তব্য রয়েছে বলে এটিই হচেছ প্রকৃত(আসল) হুকুম। আর ধরন(উসলূব) হচ্ছে প্রকৃত(আসল) হুকুমকে বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত আংশিক হুকুম। এ বিষয়টি হচ্ছে মুবাহ এবং উপযুক্ত ধরনকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত আমাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

উপকরণ হচ্ছে সেই বস্তু যার সাহায্যে শরঈ হুকুম বাস্তবায়ন করা হয়। নীতিগতভাবে বিষয়টি মুবাহ(অনুমোদিত) এবং উপযুক্ত উপকরণ বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত আমাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

অতএব উপরোক্ত ব্যতিক্রমসমূহ এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয় ছাড়া মতাদর্শ বা শরঈ হুকুম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অন্য যেকোন বিষয় যা রাসূল (সা) এর সাথে সম্পর্কিত সেটা মক্কায় নাযিল হোক অথবা মদীনায়, সেটা আক্বীদার সাথে সম্পর্কিত হোক অথবা ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত সবকিছুকেই ওহী হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং এগুলোকে তা'সী(অনুসরণীয়) বিষয় হিসেবে মেনে নিতে হবে।

যদি কেউ রাসূল (সা) এর মক্কী জীবনের দাওয়াতকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাহলে দেখতে পাবে তিনি শরঈ হুকুম হিসেবে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করেছিলেন যেগুলোকে বর্তমানে বাদ দেওয়ার কোন সুযোগ নেই বরং এগুলোকে অবশ্যই আদায় করতে হবে। অনুরূপভাবে তিনি(সা) এমন অনেক কাজ করেছেন যেগুলোকে উসলুব বা ধরনের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করা যায়। পাশাপাশি তিনি (সা) শরঈ হুকুম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উপযুক্ত উপকরণও ব্যবহার করেছেন। অতএব কোন বিষয়গুলো পদ্ধতি(তরীকাহ) এবং কোন বিষয়গুলো ধরন (উসলূব) বা উপকরণ(ওয়াসিলা)– এ দু'ধরণের বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝা প্রয়োজন, যাতে দল বুঝতে পারে কোন বিষয়টি তাকে আবশ্যই পালন করতে হবে এবং কোন বিষয়টি তার সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

পুরো পদ্ধতিকে (তরীকাহ) ধরন হিসেবে গণ্য করার কোন সুযোগ নেই যার ফলে মনে হবে পরিস্থিতির আলোকে দল যেকোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কারণ এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির ফলে পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত শরঈ হুকুমকে তাচ্ছিল্য করা হবে এবং শরঈ হুকুমকে মনগড়া কার্যক্রম দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হবে। বিষয়টিকে আরো ভালভাবে পরিষ্কার করার জন্য নিচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো:

– আল্লাহ (সুওতা) বলেন:

***"অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয়"*** **[সূরা আল হিজর: ৯৪]**

প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়া- আল্লাহর তরফ থেকে রাসূল (সা) এর প্রতি একটি নির্দেশ। এই নির্দেশটি দুটো শরঈ হুকুমকে উপস্থাপন করছে। প্রথমটি হচ্ছে এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশ্য দাওয়াতের অনুপস্থিতি এবং দ্বিতীয়টি হচেছ এই আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে প্রকাশ্য দাওয়াতের সূচনা। প্রকাশ্যে দাওয়াতের ঘোষণা দেওয়া বা না দেওয়ার বিষয়টিকে রাসূল (সা) এর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি। বরং প্রকাশ্যে দাওয়াতের ঘোষণা দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মান্য করা ছিল রাসূল (সা) এর জন্য বাধ্যতামূলক। এটিই হচ্ছে শরঈ হুকুম-যা শরী'আহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। এই কাজটি করার সিদ্ধান্ত রাসূল (সা) তাঁর নিজস্ব ইচ্ছার কারণে গ্রহণ করেননি, অতএব এই কাজের অনুসরণ করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। আল্লাহ(সুওতা)র এই কথা *"যা আপনাকে আদেশ করা হয়"* এর মাধ্যমে বুঝা যাচ্ছে বিষয়টি আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে।

– আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

***"তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ (যুদ্ধ করা থেকে) এবং সালাত কায়েম কর"*** **[সূরা আন নিসা: ৭৭]**

আবার কাফিরদের দুর্ব্যবহারের জবাবে অস্ত্রের মাধ্যমে তাদের মোকাবেলা করার অনুমতি প্রার্থনা করলে আব্দুর রাহমান বিন আল-আওফ(রা)কে রাসূল(সা) বলেন,**"প্রকৃতপক্ষে আমি ক্ষমার জন্য আদিষ্ট অতএব তোমরা লোকজনের সাথে যুদ্ধ করোনা।"**[ইবনে আবি হাতিম,আন-নাসাঈ এবং আল-হাকিম থেকে বর্ণিত]।

পরবর্তীতে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় আল্লাহর তরফ থেকে ওহী নাজিল হয়,

*"যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফিররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে(মুমিনদেরকে) সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।"*[সূরা হজ্জ:৩৯]

উপরোক্ত দলিলগুলো থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে প্রথমে যুদ্ধের অনুমতি ছিলনা, কিন্তু পরবর্তীতে তা দেওয়া হয়; যেহেতু এই অনুমতি আল্লাহর তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে, সেহেতু এটি একটি শরঈ হুকুম যার আনুগত্য করা আবশ্যক। স্বেচ্ছায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে রাসূল (সা) সশস্ত্র পন্থা অবলম্বন করা থেকে বিরত ছিলেন–বিষয়টি এরকম কিছু ছিলনা বরং বিষয়টি ছিল ওহীর মাধ্যমে নির্ধারিত যার আনুগত্য করা ছিল আবশ্যকীয় কর্তব্য। রাসূল (সা) যেভাবে একাজ করা থেকে বিরত ছিলেন ঠিক তেমনিভাবে তাঁর অনুসরণে নিজেদেরকে বিরত রাখাটা আমাদের জন্যও বাধ্যতামূলক।

- অনুরূপভাবে রাসূল (সা) যখন বিভিন্ন গোত্রের নিকট নুসরাহ (খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত সাহায্য) খুঁজতে যেতেন তখন তিনি (সা) বলতেন :

**"হে অমুক এবং অমুক গোত্র, প্রকৃতপক্ষে আমি আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত একজন রাসূল। তিনি তোমাদেরকে আদেশ করছেন যাতে তোমরা তাঁর ইবাদত কর এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না কর, তোমরা তাঁকে ব্যতীত অন্য যেসব মূর্তির পূজা কর সেগুলোকে পরিত্যাগ কর, আমার উপর তোমরা ঈমান আন এবং আমাকে তোমরা সুরক্ষা প্রদান কর (অন্য এক বর্ণনায় 'সমর্থন কর') যাতে আল্লাহ আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তা আমি পৌঁছে দিতে পারি।'** [সীরাতে ইবনে হিশাম]

এই হাদীসের মাধ্যমে রাসূল(সা) পরিষ্কার করে দিচেছন যে বিষয়টি ছিল আল্লাহর তরফ থেকে একটি হুকুম; অর্থাৎ এক্ষেত্রে রাসূল(সা) ওহীর অনুসরণ করছিলেন মাত্র। গোত্রগুলোর কাছ থেকে অসংখ্যবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরও এবং অত্যন্ত রূঢ় ও কর্কশ ব্যবহার পাওয়া সত্ত্বেও নুসরাহ খোঁজার ক্ষেত্রে রাসূল(সা) এর অটল থাকাটাই প্রমাণ করে যে, এ বিষয়টি ছিল আল্লাহর তরফ থেকে একটি হুকুম।

এগুলো হচ্ছে পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত শরঈ হুকুমের কিছু উদাহরণ। যেসব উপকরণ এবং ধরনের সাহায্যে শরঈ হুকুম বাস্তবায়ন করা হয় সেগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে অনুসরণ করার ব্যাপারে নীতিগতভাবে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বরং এক্ষেত্রে শরঈ হুকুম বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত ধরন এবং উপকরণ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমরা স্বাধীন।

সুতরাং দাওয়াতী কাজের উপযুক্ত লোক করে গড়ে তোলার জন্য রাসূল(সা) মুমিনদেরকে নিয়ে দারুল আরকামে অথবা তাঁদের কারো বাসায় অথবা উপত্যকায় গিয়ে বসতেন এবং তাঁদেরকে ইসলামের শিক্ষায় দীক্ষিত করতেন। একটি শরঈ হুকুম হিসেবে আমাদেরকেও অবশ্যই এই দায়িত্বটি পালন করতে হবে। এবং এ কাজের জন্য উপযুক্ত ধরন প্রয়োগ করতে হবে। এজন্য উপযুক্ত ধরন হিসেবে একদল লোক অথবা কোন পরিবারকে বেছে নিতে হবে যাতে তাদেরকে ইসলামের সুষ্ঠু শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যায়। তাদের জন্য সাপ্তাহিক একটি সময় নির্ধারিত করতে হবে এবং সেই নির্দিষ্ট সময়ে পরিবার অথবা দলটির নির্দিষ্ট লোকজনকে একত্রে জড়ো হতে হবে। দাওয়াতী কাজে নিযুক্ত তরুণদের মনে যাতে ইসলামের শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে গেঁথে দেওয়া যায় সেজন্য উপযুক্ত ধরন বেছে নিতে হবে। এ সমস্ত বিষয়গুলো নির্ধারণের দায়িত্ব আমাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দাওয়াতী কাজের উপযুক্ত লোক করে গড়ে তোলার শরঈ হুকুমের বাস্তবতার আলোকে আমরা এ বিষয়গুলো নির্ধারণ করব যাতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাসূল (সা) নিজেকে এবং তাঁর দাওয়াতকে মক্কার বাজারে প্রকাশ্যে উপস্থাপন করতেন। এ কাজটি করার সময় আমাদেরকে উপযুক্ত ধরন বেছে নিতে হবে; যেমন যথার্থ বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে অথবা বিভিন্ন সামাজিক সমাবেশ, উৎসব বা আনন্দ-বেদনার সময় জনগণের কাছে নিজেদের ধ্যান-ধারণাগুলোকে ছড়িয়ে দিতে হবে। বই,ম্যাগাজিন, লিফলেট,ক্যাসেট অথবা সরাসরি কথা বলার মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন করা যায়–এসমস্ত ধরন বা উপকরণের প্রত্যেকটিই জায়েয।

অনুরূপভাবে রাসূল (সা) যখন নুসরাহ খোঁজার জন্য তায়েফে গিয়েছিলেন তখন তিনি পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন, নাকি ঘোড়ার পিঠে চড়েছিলেন নাকি অন্য কোন উপায় অবলম্বন করেছিলেন সেগুলোর অনুসরণ করাটা আমাদের জন্য আবশ্যক কিছু না। এ জাতীয় উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে শরীয়া কোন স্পষ্ট নির্দেশনা না দিয়ে বরং আমাদের সিদ্ধান্তের উপর তা ছেড়ে দিয়েছে।

আমাদের জানা আবশ্যক যে রাসূল(সা) এর তরীকাহ ছিল মূলত ওহী দ্বারা নির্ধারিত অনেকগুলো শরঈ হুকমের সমষ্টি যা থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলনা। শরঈ হুকুমের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে যে বিষয়গুলো পরিবর্তিত হয় সেগুলো হল ধরন বা উপকরণ। এ বিষয়গুলোকে নির্ধারণ করা যেমন রাসূল(সা) এর সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, বর্তমানে ঠিক তেমনিভাবে এ বিষয়গুলোকে নির্ধারণ করাটা আমাদের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে দারুল ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা একটি শরঈ হুকুম। এমন অনেক লোক আছে যারা ভাবে যে দারুল ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার তরীকাহ ব্যাপারটি ধরনের অর্ন্তভুক্ত এবং এজন্য তারা যেকোন ধরনের কাজ করার ব্যাপারে স্বাধীন। উদাহরণস্বরূপ দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবে তারা গরীবদেরকে সাহায্য করে, মানুষের আখলাক ঠিক করার কথা বলে, হাসপাতাল বা স্কুল তৈরি করে, ভাল কাজ করার কথা বলে, কেউ শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দেয় আবার কেউ

বিদ্যমান শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের দাবী তোলে। এ সমস্ত কাজের প্রত্যেকটাই হচ্ছে খিলাফত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লাহর সরাসরি নির্দেশনার মাধ্যমে পরিচালিত রাসূল(সা) এর কর্মকাণ্ডের অনুসরণ থেকে সুস্পষ্ট বিচ্যুতি। আল্লাহর হুকুমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাসূল(সা) যেভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণাদানের কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন ঠিক তেমনিভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণাদানের কাজ করাটা আমাদের জন্যও ফরয;যদি তা না করি তাহলে আমরা পথভ্রষ্টদের অর্ন্তভূক্ত হব। রাসূল(সা) যেভাবে অস্ত্র ব্যবহার করা থেকে বিরত ছিলেন এবং মুসলিমদেরকে অস্ত্র বহনের অনুমতি দেননি ঠিক তেমনিভাবে আমাদেরকেও তা মেনে চলতে হবে। পরিস্থিতি যদি ভিন্নও হয় তবু আমাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে নুসরাহ খুঁজতে হবে যেমনভাবে রাসূল(সা) তা খুঁজেছিলেন। সাধারণভাবে বলা যায় পদ্ধতির ধাপসমূহ যেভাবে আল্লাহ(সুওতা) তাঁর রাসূলকে নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন সেগুলো আমাদের জন্যও অপরিবর্তিত থাকবে। সেগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক কাজ করা অথবা সেগুলোর অনুসরণ না করা হবে শরঈ হুকুমের লঙ্ঘন।

তরীকাহর ব্যাপারে নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন সুযোগ আমাদেরকে দেওয়া হয়নি। উদ্দেশ্য কি হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্য তরীকাহ কি হবে–দুটো বিষয়ই শরীয়া নির্ধারিত করে দিয়েছে; অতএব এসব বিষয়ে আনুগত্য করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন বিকল্প নেই।

পদ্ধতির ধাপসমূহ নির্ধারণ করার এখতিয়ার কেবলমাত্র শরঈ দলীলসমূহেরই (কুরআন ও সুন্নাহ) রয়েছে। এ ধাপসমূহ নির্ধারণ করার জন্য আমরা নিজেদের মন, পরিস্থিতি অথবা জনস্বার্থকে বিবেচনা করার অধিকার রাখি না।

মানুষের খেয়াল-খুশী বা ইচ্ছা-অনিচ্ছা থেকে নয়,বরং শরঈ দলীলসমূহের অর্থ বুঝতে হয় তার ভাষাগত নির্দেশনা থেকে। আমাদের ইচ্ছাগুলোকে শরঈ হুকুমের অনুসরণে সাজাতে হবে; কারণ বাধ্যতামূলকভাবে সেগুলো অনুসরণের মধ্য দিয়েই কেবল আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারব।

রাসূল (সা) এর তরীকাহকে বুঝা, এ তরীকাহ নিয়ে তিনি(সা) যেভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন তার পুরো আনুগত্য করা এবং তাঁর কাজের ধাপসমূহকে এবং প্রত্যেকটি ধাপে কৃত কাজগুলোকে সঠিকভাবে আদায় করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক।

সুতরাং দল গঠনের পর্যায়ে রাসূল(সা) বিভিন্ন কাজ সম্পাদন (ব্যক্তিগতভাবে লোকজনের সাথে দেখা করা, তাঁর উপর যারা ঈমান আনতেন তাঁদেরকে গোপনে একত্রে জড়ো করে তাঁদের চিন্তা-চেতনা গঠনের দিকে মনোযোগ দেয়া) করেছিলেন। এ সমস্ত কাজের ভিত্তিকে(আসল) অনুসরণ করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। কারণ শরঈ হুকুম হিসেবে তা আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে। পাশাপাশি এ সমস্ত কাজ বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত ধরন এবং উপকরণ আমাদেরকে বেছে নিতে হবে।

একইভাবে জনমত গঠনের পর্যায়ে রাসূল(সা) বিভিন্ন কাজ সম্পাদন (প্রকাশ্যে দাওয়াতের ঘোষণাদান, কুফরী চিন্তা এবং প্রথার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক শতশত আয়াত নাযিল হওয়া, নাম সহকারে অথবা পরোক্ষ বর্ণনার মাধ্যমে কুরাইশ নেতাদেরকে আক্রমণ(মৌখিকভাবে) করা এবং বিভিন্ন গোত্রের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করা) করেছিলেন। এক্ষেত্রেও শরঈ হুকুম হিসেবে এসব কাজের ভিত্তিকে(আসল) অনুসরণ করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদেরকে প্রথম পর্যায় অর্থাৎ দল গঠনের পর্যায়ের কর্মকাণ্ডের সাথে আরো নতুন কিছু কর্মকাণ্ড যোগ করতে হবে, যেমন বুদ্ধিবৃত্তিক এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের সূচনা করা, ইসলামের ভিত্তিতে উম্মাহর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে জোরালো অবস্থান গ্রহণ, ঔপনিবেশিক বা সাম্রাজ্যবাদী কাফির শক্তিসমূহ এবং তাদের আস্থাভাজন দালাল শাসকদের ষড়যন্ত্রগুলোকে উম্মাহর সামনে তুলে ধরা প্রভৃতি। কারণ রাসূল(সা) ঠিক এরূপই করেছিলেন। এ সমস্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য তখন আমরা প্রয়োজনীয় ধরন ও উপকরণ বেছে নিব।

প্রকৃতপক্ষে, খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে রাসূল(সা) এর মক্কী জীবনের(শরঈ তরীকাহর) অনুসরণ করতে হবে। রাসূল(সা) যখন তাঁর এই তরীকাহর সূচনা করেছিলেন এবং এই তরীকাহর আলোকে কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলেন তখন তিনি অনেক অপমান, দুর্বলতা, সন্ত্রাস এবং ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তবুও তিনি দৃঢ় সংকল্পের সাথে অবিরাম কাজ করে গিয়েছিলেন। রাসূল(সা) এর নিকট আল্লাহ(সুওতা) এর হুকুম আসত এবং তা বাস্তবায়নের জন্য তিনি কঠোর সংগ্রাম করতেন। কোন ব্যক্তি নবীর(সা) সঠিক পথের অনুসরণ থেকে অনেক দূরে সরে যায় যখন আল্লাহ(সুওতা) এর এই আয়াত সে শুনে–

***“অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয়”* [সূরা আল হিজর: ৯৪]**

যেখানে আল্লাহ(সুওতা) তাঁর রাসূলকে(সা) নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তিনি শুধুমাত্র আল্লাহ(সুওতা) এর আদেশ অনুযায়ী প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন এবং সেই ব্যক্তি দেখে যে রাসূল(সা) তাঁর নিজের ইচ্ছানুসারে নয় বরং আল্লাহ(সুওতা) এর আদেশ অনুযায়ী প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন; তারপরও সে বলে:“এই তরীকাহর অনুসরণ করাটা বাধ্যতামূলক কিছুনা।” যদি এই তরীকাহর অনুসরণ করাটা বাধ্যতামূলক কিছু না-ই হতো তবে রাসূল(সা) কেন সে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন যেখানে তিনি(সা) কাফিরদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এবং তাদের উপাস্য দেব-দেবীদের,তাদের নেতৃবৃন্দের,তাদের প্রথার এবং তাদের চিন্তাসমূহের বিরোধিতা প্রকাশ্যে করেছিলেন যার প্রতিটা বিষয়ই কুরআনের নির্দেশনার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে। অথচ তিনি চাইলে তোষামোদের মাধ্যমে শাসকদের সন্তুষ্ট করতে পারতেন অথবা বিদ্যমান প্রথায় নিজেকে সমর্পণ করতে পারতেন যার

ফলে তাদের কাছ থেকে তিনি মর্যাদা লাভ করতে পারতেন। যদি তিনি(সা) তা করতেন তাহলে প্রকৃতপক্ষে তিনি(সা) তাঁর রবের হুকুমের অবাধ্য হতেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে কুরআন নাযিল হত এবং রাসূল(সা) নিজেকে তার মধ্যে সমর্পণ করতেন। আল্লাহ(সুওতা) বলেনঃ

***"উঠুন এবং সতর্ক করুন!"* [সূরা আল মুদ্দাসির:২]।**

তিনি(সা) নেতৃবৃন্দকে আক্রমণ(মৌখিকভাবে) করলেন যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

***"আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে!"* [সূরা লাহাব :১]**

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে রাসূলের (সা) পক্ষাবলম্বন করলেনঃ

***"আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আপনি পাগল নন।"* [সূরা আল কলমঃ ২]**

কুরআনে কাফিরদের মানসিক অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছেঃ

***"তারা চায় যদি আপনি নমনীয় হন তবে তারাও নমনীয় হবে।"* [সূরা আল কলমঃ ৯]**

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন এবং উম্মুল-কুরা অর্থাৎ মক্কা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকজনকে সতর্ক করেন। পাশাপাশি তিনি(সুওতা) তাঁর রাসূলকে(সা) এবং যাঁরা তাঁর(সা) সাথে ছিলেন তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন দাওয়াতের কাজে অস্ত্র বহন না করতে। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে তখন কুরআন নাযিল হচ্ছিল এবং রাসূল(সা) সে অনুযায়ী আমল করছিলেন মাত্র। যে বলে এই তরীকাহর অনুসরণ করাটা বাধ্যতামূলক কিছু না তার জন্য কি এর চেয়ে বেশি প্রমাণের প্রয়োজন আছে?

কেউ যদি বলে এই তরীকাহর অনুসরণ করাটা বাধ্যতামূলক কিছু না বরং ঐচ্ছিক তাহলে তার মানে দাঁড়াবে আল্লাহ(সুওতা) নাযিলকৃত আয়াতের মাধ্যমে যা কিছু হুকুম করছিলেন রাসূল(সা) সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে সেসব আয়াতের অবাধ্য হয়েছিলেন। কারণ সেক্ষেত্রে যা কিছু নাযিল হচ্ছিল তিনি তাঁর অনুগত ছিলেন না। অতএব তখন বিষয়টি আমাদের জন্যও ঐচ্ছিক বলে বিবেচিত হবে যে, আমরা কি রাসূল(সা) এর তরীকাহ অনুসরণ করব নাকি অন্য কোন তরীকাহ? প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি যা রাসূল(সা) এর কর্মকাণ্ড এবং তাঁর সমাজ পরিবর্তনের পদ্ধতির সঠিক উপলব্ধি থেকে অনেক দূরে।

## আজকাল কিছু মুসলিম তরীকার সাথে ধরনকে (উসলুব) গুলিয়ে ফেলে

এ ধরনের সন্দেহ কিছু মুসলিমের মধ্যে সৃষ্টি হবার কারণ হল তারা মনে করে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর সময় থেকে বর্তমান পরিস্থিতি ভিন্নতর। রাসূলুল্লাহ (সা) এর সময় সমাজের বিভক্তি ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের, অর্থাৎ বংশ এবং গোত্র। আজকে এ বিভক্তি আরও জটিল ও পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। একটি রাষ্ট্রের সাথে আগের গোত্র সমূহের তুলনা করা চলে-যার জনসংখ্যা ছিল হাজার হাজার। এখন এ সংখ্যা মিলিয়ন মিলিয়ন। তখন দাওয়াত ছিল লোকদের কুফর থেকে ইসলাম গ্রহণের জন্য। আর আজকে দাওয়াত করা হয় মুসলিমদের ইসলামী জীবনধারা পুণপ্রবর্তনের জন্য। রাসূলুল্লাহ (সা) এর সময় সুপার পাওয়ার পারস্য ও রোমানরা মক্কায় তার দাওয়াতে হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু আজকের দিনে শাসকেরা পশ্চিমাদের আজ্ঞাবহ ও পুতুল মাত্র। এখন সুপার পাওয়ারগুলোই ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে....ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিভ্রান্ত লোকেরা আরও বলে, 'আমরা কীভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) কে মানবো যখন অনেক বাস্তবতা পরিবর্তিত হয়ে গেছে? যদি পরিবর্তিত না হই তাহলে সেটা হবে কঠোরতা ও অনমনীয়তা। আমরা এভাবে কিছু গ্রহণ করতে বাধ্য নই। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল দাওয়াতের বৃহত্তর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখা, অর্থাৎ ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা দ্বারা এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং আল্লাহর দাসত্ব বা উবুদিয়্যাহ উপলব্ধি করা।'

এই ইস্যুটিকে কীভাবে দেখতে হবে তা ব্যাখ্যা করতে হবে এভাবে- শরীয় হুকুম নাজিল হয়েছিল বিভিন্ন বাস্তবতায় পরিপ্রেক্ষিতে। যখন বাস্তবতা পরিবর্তিত হয়ে গেছে তখন এর সাথে বিজড়িত হুকুম পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যদি বাস্তবতা পরিবর্তিত না হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে শরীয় হুকুম অপরিবর্তিত থাকবে। বাস্তবতার ক্ষেত্রে এর বাহ্যিক দিকে খেয়াল না রেখে এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সমাজ হল কিছু লোকের সমষ্টি যাদের রয়েছে সাধারণ ধারণা, এ সাধারণ ধারণা হতে কিছু আবেগ ও এর সাথে একমত সবকিছুকে সমর্থন করার বিষয় উৎসারিত হয়, এবং এ সাধারণ ধারণা হতে কিছু ক্ষোভের বিষয় উৎসারিত হয় যখন কোন কিছু এর বিরুদ্ধে যায়। অতপর একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় যা এই চিন্তা বা ধারণাকে বাস্তবায়ন করে এবং এর কোনরকম

ব্যাত্যয়কে প্রতিহত করে। সুতরাং লোকেরা এমনভাবে জীবনযাপন করে যে তারা পুরো বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছে এবং এ ব্যাপারে তারা সন্তুষ্ট।

সমাজের বাস্তবতা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। এটা হতে পারে প্রাথমিক পর্যায়ের বা জটিল। কিন্তু প্রত্যেক জনসমষ্টিই একটি সাধারণ চিন্তা ও আবেগের ভিত্তিতে একত্রিত হয় এবং শাসিত হয় এমন একটি ব্যবস্থা দ্বারা যা ঐ চিন্তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। হতে পারে এ জনসমষ্টি একটি রাষ্ট্র বা গোত্র এবং সংখ্যায় হাজার হাজার বা মিলিয়ন মিলিয়ন। রাষ্ট্র বা গোত্র নির্বিশেষে এটি একটি সমাজ। কারণ উভয়ক্ষেত্রেই সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি রয়েছে এবং এটি পরিবর্তিত হয়নি।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইসলামিক চিন্তা, আবেগ ও ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছিলেন। ইসলামিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি শরীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। তার সমস্ত কর্মকান্ড সেদিকেই লক্ষ্য করে ঠিক করা হয়েছিল। মদীনাতে তিনি প্রত্যেকটি বিশ্বাসী ব্যক্তিকে গড়ে তুলেছিলেন। তাদের মনের ভেতরে তিনি ইসলাম সর্ম্পকে মৌলিক চিন্তা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন-যা একটি সুষম আবেগের সৃষ্টি করেছিল। তিনি সেখানে হিজরত করলেন ও ইসলামিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করলেন এবং এভাবে ইসলামিক সমাজ কায়েম হল। শুরুতে এটি সহজ অবয়বে ছিল এবং তারপর একটি সমাজে রূপান্তরিত হয়-যা পরিচালনার জন্য একটি রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়োজন পড়ে।

এখন ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুপার পাওয়ারগুলো যেভাবে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে আগে সেভাবে হস্তক্ষেপ করেনি -এর জবাবে আমরা বলতে চাই, একারণে পদ্ধতির কোন পরিবর্তন হতে পারে না। তবে এটা পদ্ধতির অনুসরণকে আরও কঠিনতর করে ফেলেছে। এর জন্য প্রয়োজন বর্তমান বাস্তবতা বিবেচনায় এনে অতিরিক্ত বিকাশ প্রক্রিয়া ও নিবিড় দাওয়াত চালু রাখা। একারণে দলটি এখন আর্ন্তজাতিক রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং তাদেরকে মোকাবেলা করবার জন্য সুপারপাওয়ারগুলোর পরিকল্পনা ও পুতুল শাসকগুলোর মাধ্যমে যে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে চায় তা বুঝতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কাতে কেবলমাত্র ঈমান ও সামান্য কিছু শরীয় আহকাম ব্যাপারে আহ্বান করেছিলেন -এ দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে চাই, সামান্য কিছু হলেও তিনি শরীয় আহকাম ব্যাপারে আহ্বান করেছিলেন। এছাড়াও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মক্কায় দাওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম গ্রহণের জন্য লোকদের আহ্বান। কিন্তু আজকে মুসলিমদের দাওয়াত দেয়া হচ্ছে যাদের রয়েছে ইসলামিক আক্বীদা এবং নাজিলকৃত সব শরীয় হুকুম। সেকারণে মুসলিমগন আজ আল্লাহর কাছে কেবলমাত্র ঈমান নয় পূর্ণাঙ্গ ইসলামের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। সুতরাং মক্কার একজন মুসলিম তার মৃত্যুর আগে সে পর্যন্ত নাজিল হওয়া হুকুমের জন্য দায়িত্বশীল। আজকে যে মুসলিম মারা যাচ্ছে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে পুরো ইসলামের ব্যাপারে জবাবদিহীতার সম্মুখীন হবে। সে কারণে আজকের আহ্বান হতে হবে পূর্ণাঙ্গ এবং ইসলামিক জীবনধারা পূণরায় শুরু করবার জন্য, কেবলমাত্র ঈমানের দাওয়াত নয়। কারণ এটা কোন নতুন দ্বীনের আহ্বান নয়।

এছাড়া মুসলিম উম্মাহর দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে যে কেউ বুঝতে পারবে যে, আক্বীদা থেকে বিচ্যুত হওয়া এখন মুসলিম উম্মাহর সমস্যা নয়, বরং সমস্যা হল এই আক্বীদার সাথে জীবনের চিন্তা ও আইনী ব্যবস্থার সম্পর্ক উপলদ্ধি করতে না পারা। এভাবে আক্বিদা তার প্রাণশক্তি হারিয়ে বসেছে। এসবই সম্ভব হয়েছে মুসলিমদের উপর পশ্চিমা চিন্তার প্রভাব বিস্তার করবার কারণে। পশ্চিমা কাফের রাষ্ট্রগুলো নতজানু শাসকদের ক্ষমতায় বসানো, শিক্ষা ব্যবস্থা ও মিডিয়ায় প্রচারণার মাধ্যমে এসব চিন্তার বিস্তার ঘটায়, সংরক্ষণ করে এবং এগুলো বলবৎ ও এর প্রতি আকর্ষণ বজায় রাখবার জন্য কাজ করে।

সুতরাং আমাদের দাওয়াতে ইসলামকে সঠিকভাবে, পূর্ণাঙ্গরূপে ও সমন্বিতভাবে উপস্থাপন করতে হবে যার আক্বীদা ও ঈমান মৌলিক চিন্তা হিসেব আবির্ভূত হবে, যা হতে হুকুম উৎসারিত হয় ও যার উপর ভিত্তি করে জীবন সর্ম্পকে দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারিত হয়। তারপর আক্বীদার মাধ্যমে জীবনের চিন্তাসমূহকে ব্যাখ্যা করতে হবে। এটা সম্ভব হবে তখনই যখন আমরা আহ্বান করব আল্লাহসুবহানহুতায়ালাই একমাত্র স্রষ্টা ও আল মুদাব্বির (সব বিষয়ের পালনকর্তা), বিচার দিবসের মালিক এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সব বিষয়ের জন্য তার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এভাবে যখন ঈমান ও হুকুম সমুহ মুসলিমদের জন্য অবশ্য কর্তব্য তা ব্যাখ্যা করা হয় তখন সত্যের ক্ষমতা ও এর প্রাণশক্তি তাদের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠে, এবং ইসলাম বুঝা ও এর আহ্বান করার কাজে দাওয়াতকারী দলের শক্তিমত্তা এবং দলের পরিবর্তনের সক্ষমতা সবার কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

সেকারণে আজকে দাওয়াত হল ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুসলিমদের ইসলামিক জীবনধারায় ফিরে আসার জন্য আহ্বান করা। এ দাওয়াতের ভিত্তি হবে ইসলামিক আক্বীদা, এবং এর রাজনৈতিক চিন্তার উপস্থাপন করতে হবে যাতে মুসলিমরা আল্লাহর নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী এটিকে জীবনের সব কাজের নিয়ন্ত্রক হিসেবে গ্রহণ করে।

সুতরাং যা পরিবর্তিত হয়েছে তা হল বাহ্যিক রূপ। মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সুতরাং ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বাস্তবায়নের হুকুম এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজের পদ্ধতির হুকুম মোটেও পরিবর্তিত হয়নি।

# শরীয় হুকুমসমূহ কী নিরীক্ষামূলক?

দ্বিতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রেঃ

কিছু লোক আছে যারা ইসলামিক রাষ্ট্র বাস্তবায়নের কাজকে নিরীক্ষামূলক হিসেবে নিয়েছে এবং এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নিরীক্ষামূলক পরিকল্পনা থেকে উদ্ভূত দাওয়াতের মাধ্যমে এগুবে বলে মনে করে। কিন্তু প্রশ্ন হল এ বিষয়ে এভাবে চূড়ান্ত কিছু বলা কী সমীচীন?

পদ্ধতিকে নিরীক্ষামূলক বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা অপাংক্তেয়। এর অর্থ 'শারী'য় পদ্ধতি' এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ইসলামে যে কোন কাজের পদ্ধতি শরীয় হুকুম দ্বারা স্বীকৃত যা এর দলিলের বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে। দলটি শরীয়া গ্রহণে যেমনি বাধ্য তেমনি এইসব দলিল গ্রহণের ক্ষেত্রেও রয়েছে বাধ্যবাধকতা এবং প্রমাণিত কোন শরীয় হুকুম থেকে চ্যুত হওয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ তাদের নেই। সুতরাং এটা লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূণ নিরীক্ষামূলক (যদি পরীক্ষামূলকভাবে কার্যসম্পাদনের পর সাফল্য পাওয়া যায় তবে সেটাই পদ্ধতি এবং অন্যথায় অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে) কোন বিষয় নয়।

শরীয় যে কোন হুকুমের ধারক হল শরীয় পদ্ধতি-যা ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল লক্ষ্য অর্জন করা। আর তা হল ইসলামিক জীবনধারা পূণপ্রবর্তন। এই হুকুম দলিলের শক্তিমত্তার উপর নির্ভর করে। এগুলো গ্রহণ ও আস্থাভাজন থাকবার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপাসনা করে থাকে। ঐ ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে পরিবর্তন করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য শক্তিশালী দলিল আছে বলে সুনিশ্চিত হওয়া যায়।

একজনকে অবশ্যই শরীয়াগত পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ (সা) কে অনুসরণ করতে হবে। বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ করা এবং  শরীয় পদ্ধতিতে কাজ করা কখনওই এক বিষয় নয়। ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা থেকে নেয়া সমাধানে লোকজন যে কোন কাজকে সাফল্য বা ব্যর্থতা অথবা লক্ষ্য অর্জন হওয়া বা না হওয়ার ভিত্তিতে উপলব্ধি করে থাকে।

গ্রহণের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা এমন যে, কোনটিই তাদের জন্য চূড়ান্ত সমাধান নয়। এর জন্য প্রয়োজন অবিরত পরিবর্তন ও বিবর্তন। যে কোন পদক্ষেপই তারা গ্রহণ করুক না কেন সেটা নিরীক্ষামূলক। অবশ্য পশ্চিমা সব আইনই নিরীক্ষামূলক। তাদের জন্য একটি পদক্ষেপ সঠিক বা ভুল তা যাচাইয়ের একমাত্র পদ্ধতি হল তা বাস্তবায়নের পর লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য বা বিফলতার উপর। এ বাস্তবতা ইসলামের সাথে এ প্রকৃতির কারণেই সম্পূর্ণরূপে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। ইসলামের পদ্ধতি আল্লাহ প্রদত্ত -যিনি আল আলীম(সবজান্তা) এবং আল খাবীর(সর্বসচেতন)। যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়া দলিলের উপর নির্ভর করে ততক্ষণ পর্যন্ত এটি নির্ভূল ও পূর্ণাঙ্গ। এর নির্ভূলতা উৎসারিত হয় শরীয় দলিলের নির্ভূলতা এবং ইসতিদলাল (সংশে- ষণ) থেকে। কোনক্রমেই ফলাফলের উপর এটি নির্ভরশীল নয়। অতএব দলিলের প্রতি আনুগত্য হচ্ছে ভিত্তি, যে ভিত্তি থেকে কাজের মূল্যায়ন হয়। কাজের পদ্ধতির ক্ষেত্রে ফলাফল বলতে বুঝায় ক্ষমতা গ্রহণ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠা। আর এ বিষয়টি সর্ম্পকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

***'তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববতীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না।'*** **(সূরা নূর:৫৫)**

***'হে বিশ্বাসীগণ। যদি তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন।'*** **(সূরা মুহম্মদ:৭)**

যদি ফলাফল না পাওয়া যায়, তাহলে একজন কোনক্রমেই এ পদ্ধতিকে অবজ্ঞা করতে পারবে না বা এটিকে অন্য কোন কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে পারবে না বা এটাকে ব্যর্থ ঘোষণা করতে পারবে না। বরং পদ্ধতির হুকুমটি আরও study and review করে দেখা উচিত। কোন শরীয় হুকুমকে পরিত্যাগ করা যাবে না যদি না দলটি বুঝতে পারে তারা হুকুমটি বুঝতে ভুল করেছিল। যদি দলটি ভুল না পায় তাহলে ঐ বিশেষ হুকুমের ব্যাপারে তাদের নিজস্ব মতামতের উপর দৃঢ় থাকতে হবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত সবর করতে হবে যতক্ষণ না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিজয় দান করেন। অথবা বিষয়টি এমন হতে পারে যা 'বিজয়ের বিলম্ব' সুএের কারনে প্রলম্বিত হচ্ছে, যা থেকে নবীরা পর্যন্ত রেহাই পাননি। এ সর্ম্পকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

***'এমনকি যখন পয়গম্বরগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন যে, তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌছে।'*** **(সূরা ইউসুফ:১১০)**

অবশ্যই এ কাজটি ব্যাপক ক- ান্তিকর ও কষ্টকর ও ব্যাপক প্রচেষ্টা সাপেক্ষ। দলটি যে শাসকদের মুখোমুখি হচ্ছে তার চেয়ে দলটির ক্ষমতা অনেক কম। কাজের সাফল্য কখনওই সময়সাপেক্ষ নয় যে, একটি নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর সাফল্য না আসলে আমরা ধরে নেই যে এটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বরং এটি চিন্তার পরিশুদ্ধতা, চিন্তাধারণকারীদের দৃঢ়তা এবং জনগনের গ্রহণের সার্বজনীনতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। যখন এই পূর্বশর্তগুলো পূরণ হবে তখন একজন ধরে নিতে পারে যে দলটি রাসূলুল্লাহ (সা) এর মত নুসরা অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিজয়ী হবে। এ ব্যাপারে মূল্যায়ন হল যে, বিজয় কেবলমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে আসে। দলটি মূল্যায়ন করবে হুকুম ও দলিলের শক্তিমত্তার সম্ভাব্যতার ব্যাপারে।

যদি বিজয়ের শর্তসমূহ পূরণ করা যায়, তাহলে এটা আসবে। অন্যথায় এটা প্রলম্বিত হবে। বিজয় আসবার ক্ষেত্রে বিলম্ব বিফলতার নামান্তর নয়। হতে পারে যে, প্রস্তুতি ও তৎপরতার মাত্রা সন্তোষজনক নয় এবং তা বাড়াতে হবে। দল বা দলের শাবাবদের জন্য এ প্রলম্বন একটি পরীক্ষা হতে পারে যে, কেউ কি এ কারণে ভগ্নমনোরথ হয়ে পরিত্যাগ করে প্রতিশ্রুতি থেকে দূরে সরে এসেছে নাকি দৃঢ় থেকেছে? যে কোন পরিস্থিতিতে পূর্ণমূল্যায়ন করতে হবে। যদি পদ্ধতি পরিবর্তন করবার মত কোন যুক্তিসংগত কারণ দলটি খুজে না পায়, তাহলে কেবলমাত্র বিলম্বজনিত কারণে পদ্ধতি পরিবর্তন করা যাবে না। দলটিকে এর ধরন ও উপকরণকে বারংবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আর অনুমোদিত এবং সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ধরন ও উপকরণকে গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং বিজয়ের বিলম্ব মানে বিফলতা নয়। তাছাড়া এমন কোন শরীয় বিধান নেই যে, একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে উদ্দেশ্য হাসিল করতে হবে।

অবশ্যই পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট হুকুম ও চিন্তার সঠিকতার বিষয়টিতে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। এ চিন্তা দিয়েই শাবাবগন ও উম্মাহ প্রস্তত হবে। যদি দলটি এই চিন্তা ও হুকুমসমূহকে বিশুদ্ধ মনে করে সঠিক ধরন ও উপকরণকে গ্রহণ করে ধৈর্য্যের উপর দৃঢ় থাকে, তাহলে বিলম্বের জন্য চিন্তা ও হুকুম পরিবর্তন অনুমোদিত নয়।

পরিবর্তনের বিষয়টি ব্যক্তি নয় উম্মাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত। একজন ব্যক্তিকে পরিবর্তনের চেয়ে সমাজ পরিবর্তনের কৌশল অনেক জটিল। সুতরাং এর গতি শ- থ এবং সহজে অনুধাবন করা যায় না। তবে সে অনুধাবন করতে পারে যার রয়েছে দূরদৃষ্টিমূলক চিন্তা এবং সঠিক পৃষ্টপোষকতা। এর অর্থ এই নয় যে, যখন কোন ব্যক্তি লক্ষ্যটাকে মাথায় নিয়ে কাজ করবে তখন তার মনোবৃত্তি এই হবে যে, সে সাফল্য অর্জন করতে পারবে না অথবা সাফল্য অর্জিত হবে ভবিষ্যত প্রজন্মের হাতে। বরং তাদেরকে এই মনোবৃত্তি পোষণ করতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ও তার সাহাবী (রা) এর মত তাদের হাতেই ইনশাআল্লাহ খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তারা এর সাক্ষী হবে। একজন ব্যক্তির জীবন সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ হতে পারে। সুতরাং বিজয়ের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির জন্য নয় বরং পুরো দলের জন্য। তারা সেই বিশ্বাসীদের দল যাদের পৃথিবীতে ইসতিখলাফ বা সাফল্যের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ কাজের সময় একজন ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু হতে পারে, দলের আমীর মারা যেতে পারেন, কেউ কেউ এ পথ থেকে ছিটকে যেতে পারেন; কিন্তু প্রতিশ্রুতি ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত দলটি আল্লাহর নির্দেশ পালনে তৎপর থাকবে। বিজয় বিলম্বিত হোক বা না হোক, এ দলের কাছে বিজয়ের বিষয় আসবে। এ বিষয়ের জ্ঞানের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছাড়া আর কেউ দায়িত্বশীল নয়। কিন্তু দলটি কেবলমাত্র সঠিক পদ্ধতি গ্রহণের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।

সুতরাং কারওর বলা ঠিক হবে না শরীয় হুকুম এমন একটি নিরীক্ষামূলক বিষয় যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লক্ষ্য অর্জনের বিষয়টি অনুভূত না হলে আমরা একে ব্যর্থতা বলে গন্য করব এবং অন্য একটি নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি দ্বারা এটিকে প্রতিস্থাপন করব। যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয় দলিল দ্বারা পদ্ধতিটি সুপ্রমাণিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ এ ধরনের কথা বলবার এখতিয়ার রাখেন না। তবে ধরন ও উপকরণের ক্ষেত্রে নিরীক্ষা চালানো সঠিক।

# ৫

# যেসব পদ্ধতি শরী'য়া পদ্ধতির সাথে সাংঘর্ষিক

আমরা ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কর্মপদ্ধতি, তা অনুসরণ করা ও এ পথ থেকে বিচ্যুত না হওয়ার গুরুত্ব উপস্থাপন করেছি। তবে আমরা দেখতে পাই কিছু ইসলামিক দল ও চিন্তাবিদগন এ পদ্ধতি ব্যতিরেকে অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করছেন। যাইহোক যারাই এসব পদ্ধতি গ্রহণ করছেন, আমাদেরকে সে বিষয়ে অবশ্যই আলোচনা করতে হবে। দ্রুত পরীক্ষা করে এ বিষয়ে এমনভাবে অজ্ঞানতার পর্দাকে উন্মোচন করতে হবে যাতে মুসলিমগণ অবিরতভাবে হতবুদ্ধি না হয় এবং গোলকধাঁধায় হারিয়ে না যায় অথবা দাওয়াত বহনের ক্ষেত্রে সন্দিহান না থাকে। নিম্নে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি উপস্থাপন করব।

## কিছু মুসলিম বলে যে, খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার কাজের বাধ্যবাধকতা কেবলমাত্র শাসক ও তাদের পারিষদবর্গকে আহবানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত

মালা'আ হল একটি জনগোষ্ঠীর প্রধান। তাদের হাতে জনগনের সব বিষয় থাকে এবং তারা সব সময় শাসকদের চারপাশে থাকে। যদি তাদের ক্ষেত্রে দাওয়াত সফল হয় তাহলে ইসলামের সুবিধা হবে, সমাজকে সহজেই পরিবর্তন করা সম্ভব হবে। যে বিষয়টি দাওয়াত কেবলমাত্র শাসকশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবার উপলব্ধি তৈরি করেছে তা হল, সাধারণ জনগনকে দাওয়াত প্রদান করবার মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজ করা শুরু করলে তা তাদের জন্য শাসক কতৃক লাঞ্ছণা বয়ে নিয়ে আসবে। তারা এমন বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে যাবে-যা বহনে তারা অক্ষম এবং মুসলিমদের এ অবস্থায় পর্যবসিত হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

**'মুসলিমদের নিজেদের খর্ব করা উচিত নয়।'** যখন তাঁকে (সা) জিজ্ঞেস করা হল, **'কীভাবে একজন নিজেকে খর্ব করে?' তিনি (সা) বলেন, 'নিজেকে এমন ক্লেশের মধ্যে ঠেলে দিয়ে-যা বহনে সে অক্ষম।'** (আহমেদ, তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ)

কেউ যদি যে পরিবেশে সমাজ পরিবর্তনের দাওয়াতের উত্থান ঘটে সে বাস্তবতা অধ্যয়ন করে, তাহলে দেখতে পাবে যে, তা এমন একটা সময়ে হয় যখন সমাজে থাকে অবিচার, নৈতিক অবক্ষয়, ধ্বংস, দূর্দশা এবং প্রতিকূলতা। সমাজে এসবই হয়ে থাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ও তাঁর সার্বভৌমত্বের প্রতি ঈমানের অভাবের কারনে, এজন্য অতীতে নবীরা এবং আমাদের মহান রাসূল(স:) প্রথমেই দাওয়াত দিতেন ঈমান ও আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) ইবাদতের প্রতি।

অতীতে এবং আজকেও সমাজ শাসক ও তাদের পারিষদবর্গের দ্বারা পরিচালিত হয়। তারা নিজের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মনগড়া আইন ও মিথ্যা আক্বীদাভিত্তিক চিন্তা ধারণ করে। নিজের স্বার্থ ও সামাজিক মর্যাদার জন্য তারা এসব মিথ্যা বিশ্বাসকে রক্ষা করে। এ কারণে ইসলামের দাওয়াতের কথা প্রথমবার শুনবার পর একজন বিচক্ষণ বেদুইন নিম্নের গভীর ও সঠিক মন্তব্যটি করেছিল যে,'অবশ্যই এটা এমন একটি বিষয় যা শাসকদের বিরাগভাজন হওয়ার কারণ।' সমাজের লোকেরা নিজেদের সমাজের শাসক ও তাদের পারিষদগবর্গের কাছে সমর্পন করে। একটি প্রতিক্রিয়া তৈরির বদলে তারা প্রভাবিত হয়। ঘৃণা করা সত্তেও তারা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য করে। কারণ তারা জানে শাসকদের এ অবিচারের মূলোৎপাটন করা সহজসাধ্য নয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যখন কোন নবী বা রাসূল প্রেরণ করেন তা হয় তাদের লোকদের সত্য পথ নির্দেশ করবার জন্য। যারা এ ব্যাপারে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং নবী রাসূলদের বিপক্ষে অবস্থান নেয় তারা হল এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ শাসক ও তাদের পারিষদবর্গ। মালা'আ গণ শাসকদের সাহায্যকারী। তারা স্বার্থলিপ্সু, ধনী ও অমিতব্যয়ী। তারা জনগনের নেতা ও প্রধান-যারা শাসকদের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বাহক হয়ে উঠে। শাসকগণ তাদের উপর নির্ভর করে ও সাহায্য প্রার্থনা করে। তারা এমনসব লোক যাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, যারা আল্লাহর নবীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তাদের মধ্যে তারা সম্মুখে থাকবে। কারণ তাদের হৃদয় টাকা ও পদমর্যাদার প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং স্বার্থের সাথে তাদের পদমর্যাদা সম্পর্কিত। সেকারণে যখনই আল্লাহসুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি দাওয়াতের কথা আসে তখনই তারা চিন্তা করে যে, এটা তাদের স্বার্থ ও পদমর্যাদার পথে অন্তরায়। তারা দাওয়াতের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং শাসকদের দাওয়াতকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও নির্মূল করতে প্ররোচিত করে। পাপ ও পঙ্কিলতার কারনে শাসক তাদের উপদেশ গ্রহণ করে। এ কারণে অবধারিতভাবে আল্লাহর নবীগণ ও মা'লার পাশে থাকা শাসকদের সাথে সংঘাত হয়েছে। আল্লাহর নবী, শাসক ও তাদের পারিষদবর্গদের মধ্যে সাধারণ লোকদের হৃদয় জয় করবার জন্য রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার প্রতিযোগিতা হত। নবীগণ সত্য দিয়ে লোকদের আহ্বান করতেন। কিন্তু তারা ছিলেন দূর্বল, অরক্ষিত। কেবলমাত্র সত্য

উচ্চারণের ক্ষমতা দিয়ে মানুষের হৃদয় মন জয় করে নিয়েছিলেন। শাসক ও তাদের পারিষদবর্গ প্রথমদিকে এ আহ্বানের বিরুদ্ধে অসত্য যুক্তি উপস্থাপন করে বলত- এগুলো জাদুকরী মন্ত্র, পৌরাণিক গল্প, সত্য ধারণকারীরা মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসীরা বোকা অথবা হীন মানসিকতাসম্পন্ন। যখন এ পদ্ধতি কাজ না করত তখন নির্যাতন, বিতাড়ন, গ্রেফতার ও হত্যার পথ বেছে নেয়া হত। নবী ও তাঁর অনুসারীদের সাথে শাসক, তাদের পারিষদবর্গ ও রাজার ধর্ম অনুসারীদের মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত। কুরআন বারংবার এ বিষয়টিকে একটি আইন বলে উল্লেখ করেছে।

সেকারণে আমরা দেখতে পাই যে, সাইয়্যিদিনা নুহ (আ) যখন লোকদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন সর্বপ্রথম বাধা এসেছিল এই পারিষদবর্গের কাছ থেকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

***'নিশ্চয় আমি নুহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্যে একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি। তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল: আমরা তোমাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়, আমি কখনও ভ্রান্ত নই; কিন্তু আমি বিশ্ব প্রতিপালকের রাসূল।'*(সূরা আ'রাফ:৫৯-৬১)**

সাইয়্যিদিনা হুদ (আ) তার কওম আ'দকে আহ্বান করেছিলেন। লোকদের মধ্যে নেতাগন সর্বপ্রথম এ দাওয়াতকে প্রত্যাখান করেছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

***'আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হুদকে। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল: আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।'* (সূরা আ'রাফ: ৬৫-৬৬)**

সাইয়্যিদিনা সালেহ (আ) তার কওম সামুদকে আহ্বান করেছিলেন। লোকদের মধ্যে নেতাগন সর্বপ্রথম এ দাওয়াতকে প্রত্যাখান করেছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

***'সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহ্‌কে। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই......।'* (সূরা আ'রাফ: ৭৩)**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন,

***'তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দাররা ঈমানদার দরিদ্রদেরকে জিজ্ঞেস করল: তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সালেহ্‌কে তার প্রতিপালক প্রেরণ করেছেন? তারা বলল: আমরা তো তার আনীত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী। দাম্ভিকরা বলল: তোমরা যে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তাতে অস্বীকৃত।'* (সূরা আ'রাফ: ৭৫-৭৬)**

একইভাবে সাইয়্যিদিনা শোয়াইব (আ) মাদাইনের লোদের যখন আহ্বান করেছিলেন তখন নেতৃস্থানীয় লোকেরা অত্যন্ত ঔদ্ধ্যতের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

***'আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নাই...।'* (সূরা আ'রাফ: ৮৫)**

এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

***'তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দাররা বলল: হে শোয়ায়েব, আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে শহর থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে।'* (সূরা আ'রাফ: ৮৮)**

যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সাইয়্যিদিনা মুসা (আ) কে ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে প্রেরণ করলেন, তখন তারা তাকে প্রত্যাখান করল ও মুসার সঙ্গীদের ভয় পেল এবং তাঁকে হত্যা করবার জন্য পরামর্শ দিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

***'অতঃপর আমি তাদের পরে মূসাকে পাঠিয়েছি নিদর্শনাবলি দিয়ে ফেরাউন ও তার সভাসদদের নিকট। বস্তুত ওরা তার মোকাবেলায় কুফরী করেছে। সুতরাং চেয়ে দেখ, কি পরিণতি হয়েছে অনাচারীদের।'* (সূরা আ'রাফ: ১০৩)**

এবং আল্লাহ বলেন,

*‘ফেরাউনের সাঙ্গ-পাঙ্গরা বলতে লাগল, নিশ্চয় লোকটি বিজ্ঞ- যাদুকর।’* **(সূরা আ'রাফঃ ১০৯)**

*‘ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল, তুমি কি এমনি ছেড়ে দেবে মূসা ও তার সম্প্রদায়কে। দেশময় হৈ-চৈ করার জন্য এবং তোমাকে ও তোমার দেব-দেবীকে বাতিল করে দেবার জন্য।’* **(সূরা আ'রাফঃ ১২৭)**

*‘আর কেউ ঈমান আনল না মূসার প্রতি তার কওমের কতিপয় বালক ছাড়া- ফেরাউন ও তার সর্দারদের ভয়ে যে, এরা না আবার কোন বিপদে ফেলে দেয়। ফেরাউন দেশময় কর্তৃত্বের শিখরে আরোহণ করেছিল। আর সে তার হাত ছেড়ে রেখেছিল।’* **(সূরা ইউনুসঃ ৮৩)**

রাসূলুল্লাহ (সা) এর সীরাত অন্যান্য নবী রাসূল (সা) এর চেয়ে ব্যতিক্রম কিছু ছিল না। দাওয়াতের গতিকে মন্থর এবং লোকদের দাওয়াত শোনা ও গ্রহণের ব্যাপারে বিতস্পৃহ করবার জন্য ব্যাপক নির্যাতন ও বিশ্বাসীদের উপর অত্যাচার চালানো হয়। বিশ্বাসীরা ভাবত ঈমানের জন্য নিজের লোকদের দ্বারা অত্যাচারিত হতে হবে। যে বিশ্বাস স্থাপন করতে চাইত সে ভেবে নিত যে, পূর্বের বিশ্বাসীদের মতই তার অবস্থাও করুণ হবে। বিশ্বাসী ও মা'লা নেতৃত্বাধীন তাদের অনুসারীদের মধ্যকার বিবাদ পর্যায়ক্রমিক সফলতার মাধ্যমে চলত। অতপর একসময় তাগুতের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেল। পরবর্তীতে দাওয়াত বহনকারীরা ক্ষমতার লাগাম টেনে ধরে।

ইবনে মাসউদের বরাত গিয়ে সহীহ বুখারীতে বলা হয়েছে:

*‘যখন রাসূলুল্লাহ (সা) সিজদারত অবস্থায় তখন একদা কুরাইশের লোকেরা তার চারপাশে ছিল। এমতাবস্থায় উকবা বিন আবি মু'ইত উটের নাড়িভূড়ি নিয়ে এল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর নিক্ষেপ করল। নবী (সা) তাঁর মাথা উঠালেন না। ফাতিমা (রা) দৌড়ে এলেন এবং নবী (সা) এর পিঠ থেকে উটের নাড়িভূড়ি সরালেন এবং যারা এ কাজটি করেছে তাদের অভিসম্পাত করলেন। নবী (সা) বললেন, ‘হে আল্লাহ! কুরাইশদের নেতা (মা'লা) আবু জাহেল বিন হিশাম, উতবা বিন রাবিয়্যাহ এবং উমাইয়্যা বিন খালাফ.....কে উঠিয়ে নাও।’* ইবনে মাসুদ অন্য একটি বর্ণণায় বলেন, *‘আমি তাদের বদরের দিন নিহত হতে দেখেছি এবং কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।’*

মক্কায় কেবল একজন নেতা ছিল না, অনেক মা'লা ছিল। এই লোকগুলো রাসূলুল্লাহ (সা) এর দাওয়াতকে বিরোধিতা করেছিল এবং লোকদের এ পথ থেকে বিভ্রান্ত করবার অপচেষ্টা করেছে।

অন্যান্য নবীদের কেবলমাত্র তাদের লোকদের কাছে প্রেরণ করা হত, কিন্তু মুহম্মদ (সা) এর দাওয়াত গোটা মানবতার জন্য।

কুরাইশদের পারিষদবর্গ দাওয়াতের কাজে ব্যাপক প্রত্যাখান ও বাধা সৃষ্টি করা শুরু করা সত্তেও দাওয়াত কেবলমাত্র তাদের মাঝেই পরিগ্রহ করেনি। দাওয়াতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) কোন বৈষম্য করেননি। গরীব-ধনী, প্রভূ-ক্রীতদাস কারও ক্ষেত্রে তিনি ভেদাভেদ করেননি। তারপরেও ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) এর মত একজন অন্ধ দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি ভ্রুকুঞ্চিত করবার কারণে তাঁকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে সতর্ক করা হয়েছে। তিনি নেতাদের কাছে দাওয়াত নিয়ে যাবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন এই আশায় যে, তারা ঈমান গ্রহণ করলে তাদের অনুসারীরাও ঈমান গ্রহণ করবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কতৃক রাসূলুল্লাহ (সা) কে সতর্ক করা সত্ত্বেও নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি দাওয়াত বন্ধ হয়নি। কারণ এ তিরষ্কার ছিল বৈষম্যের বিরুদ্ধে। আহ্বানের দৃষ্টিভঙ্গিতে নেতাদের প্রতি দাওয়াত ও সাধারণ জনগনের প্রতি দাওয়াত একইরকম।

সীরাত থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নেতা ও প্রধানদের কাছে কেবলমাত্র তাদের পদমর্যাদার কারণে দাওয়াত নিয়ে যাননি, বরং তারা বিশ্বাসী হলে তাদের অনুসারীরাও বিশ্বাসী হবে-এ আশা থেকে তিনি (সা) দাওয়াত দিয়েছিলেন। এ কারণে দাওয়াতের আওতার মধ্যে সবাই অর্ন্তভুক্ত।

এছাড়াও এমন লোক দাওয়াত গ্রহণ করেছিল যারা লোকদের নেতা ছিল না, যেমন: বিলাল, আম্মার (রা) এবং তাঁর মা ও বাবা। একই কথা শোয়াইব ও সালমান (রা) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; কারণ তারা কেউ কুরাইশ নেতা ছিলেন না। আবার আমীর বিন ফুহাইরা, উম্মে আবিস, জুনাইরাহ, আন নাহদিয়্যা ও তাঁর কন্যা এবং বানু মু'মিল এর ক্রীতদাসী এর ক্ষেত্রেও এ কথা খাটে। কারণ আবু বকর (রা) ও প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারীরা তাঁদের সবাইকে দাসত্ব মুক্ত করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) প্রাথমিকভাবে তাদেরই দাওয়াত দিয়েছিলেন যাদের মধ্যে খায়ের ছিল। অতপর তিনি সবার কাছে গিয়েছিলেন। তরুণ ও বৃদ্ধরা সাধারণত সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। সাধারণ ও সম্মানিত লোকেরাও সাড়া দিয়েছিল।

দাওয়াতের পাত্র অনুসন্ধান করবার ক্ষেত্রে কোন সীমাবদ্ধতা নেই। এর মধ্যে সব ধরনের লোকেরাই থাকবে। আর পদ্ধতি হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা) এর পদ্ধতির কোন বিকল্প নেই-যার মাধ্যমে তিনি দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

## কিছু মুসলিম মনে করে, ইবাদত (আনুষ্ঠানিক ইবাদত) করাটাই হলো প্রয়োজনীয় কাজ; ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা নয়

তারা আরও বলে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছেন, কিন্তু ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে নয় অথবা আল্লাহর প্রতি ইবাদত হল কেন্দ্রীয় ইস্যু, ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নয়; কিংবা ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা জরুরী নয় যতটা জরুরী আল্লাহর ইবাদত করা। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তারা এ জাতীয় আরো কিছু কথা বলে থাকে ।

এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অবশ্যই ইবাদতের বাস্তবতাকে সংজ্ঞায়িত করব এবং দেখাব কীভাবে তা অর্জন করতে হয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মানুষকে সৃষ্টির অর্ন্তনিহিত উদ্দেশ্য হল ইবাদত করা। 'লা ইলাহা ইল- াাহু' এর অর্থ হল, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। আর এ কথার ব্যতিক্রম যে কোন কিছুই মিথ্যা ও অবশ্যই পরিত্যাজ্য এবং মানুষ এ ব্যাপারে অবশ্যই সাক্ষ্য দেবে। æMuhammad rasoolullah", means that the worship and obedience should be according to what only Muhammad (SAW), the Rasool of Allah, has brought and man must testify to this.

সুতরাং, ইবাদাহ বা উপাসনা হল কেবলমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য। আর এটা ততক্ষণ পর্যন্ত করা যাবে না যতক্ষণ না আল্লাহ সে ব্যাপারে নির্দেশনা দিচ্ছেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তা প্রদর্শন করেছেন। আর এ বাণীটি আমাদের জীবনে যে কোন কথা ও কাজে মনে রাখতে হবে।

যখন একজন মুসলিম তার বাস্তবতায় নিজের কোন চাহিদা মেটাবার জন্য বা কোন মূল্যবোধের তাগিদে কোন কাজ করে তখন সে কেবলমাত্র তার চাহিদা ও প্রবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করবার উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হয়, এবং যা সম্পন্ন করা যায় একাধিকভাবে।

শরীয়াগত পদ্ধতিতে এ চাহিদা পূরণ করা এবং এ সীমার মধ্যে অবস্থান করা ও এ কাজকে আল্লাহর বিশ্বাসের সাথে সর্ম্পকযুক্ত করার নামই হল ইবাদত।

প্রতিটি কাজের পিছনে কাজ করে ইচ্ছা ও চাহিদার সন্তুষ্টি, আর মানুষের প্রয়োজন নানাদিকের সাথে সম্পর্কযুক্ত, এটা সহজাত যে তার এ ক্রিয়াকলাপ জীবনের সবদিকই আচ্ছাদিত করে।

সুতরাং ইবাদত হল সে কাজ যা মানুষ আল্লাহসুবহানাহু ওয়া তা'আলার আদেশ ও নিষেধ মেনে করে থাকে এবং এটা কেবলমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি ঈমানের ভিত্তিতে হতে হবে। আর এর মাধ্যমেই ইবাদতের পূর্ণাঙ্গতা নিশ্চিত হয় এবং এ ইবাদত মানুষের সব কাজকে বেষ্টন করে।

কাউকে 'আল্লাহর উপাসনা' করতে বলার অর্থ কেবলমাত্র সালাত আদায়, যাকাত প্রদান, হজ্জ সম্পাদন বা ফকীহগন যেগুলোকে ইবাদত বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন সেগুলো করা বুঝায় না, বরং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলার নামই হল্ ইবাদত।

সুতরাং যে কোন কাজের মূল হল আল্লাহর প্রতি ঈমান। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দিকে সব কাজকে ধাবিত করার জন্যই ইবাদত। সুতরাং পুরো দ্বীন হল ইবাদাহ এবং ইবাদাহ অর্থ হল সমর্পণ করা। আর আল্লাহর কাছে মানুষকে সমর্পণ করবার অর্থ হল তার ইবাদত করা, তার আদেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, তাকে সর্বজ্ঞ ও সর্বসচেতন হিসেবে মেনে নেয়া, সন্তুষ্টির সাথে সর্বান্তকরণে তার কাছে আত্মসমর্পণ করা।

সেকারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদত করা ও তাঁকে মান্য করবার অংশ হল সালাত আদায়, যাকাত প্রদান ও কি্রয়াম বা রাত জেগে ইবাদত করবার পাশাপাশি সৎ কাজের আদেশ প্রদান করা ও অসৎ কাজে নিষেধ করা, কুফর ও নিফাক (মুনাফেক) এর বিরুদ্ধে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণ করা, মুসলিমদের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করা, সব লোকদের কাছে দাওয়াতের প্রসার ঘটানো এবং মুসলিমদের সুরক্ষা প্রদান করা।

আল্লাহর প্রতি উপাসনার মধ্যে মানুষের সব কাজই অর্ন্তভুক্ত-যা মানুষ তার বাস্তবতা অনুসারে পালন করে থাকে। যদি এমন হয় কোন মুসলিম সালাত আদায় করছে না, তাহলে তখন সালাতের দিকে আহ্বান করা হল ইবাদত। একইভাবে সাওম পালনের জন্য আহ্বান করা ইবাদত, শরী'আহ অনুযায়ী ক্রয় বিক্রয় করবার আহ্বান জানানোর নামও ইবাদত। আল্লাহর প্রতি ঈমানই হল সব ইবাদতের মূল। সেকারণে কাউকে যখন সালাত আদায় বা সাওম পালনের দিকে আহ্বান জানানো হয় তখন যাকে আহ্বান করা হয় তার ঈমানী চেতনাকে আগে জাগ্রত করতে হবে এবং এই ঈমানকে কাজের প্রতিশ্রুতি ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে পরিণত করতে হবে।

একইভাবে লোকদের ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা দিয়ে শাসন করবার দিকে আহ্বান করাও আল্লাহর নির্দেশ এবং এগুলো আমাদের মানতে হবে। এগুলো সে-ই পালন করবে যে আল্লাহসুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। সে কারণে এগুলোর দিকে আহ্বান করার আগে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করতে হবে। এভাবে এ ব্যাপারে আল্লাহসুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদত উপলব্ধি হবে।

মুসলিমরা আজকাল কুফরী ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করে-যার হুকুমসমূহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছ থেকে উৎসারিত নয় এবং এর মধ্যে থেকে তারা ইসলামী জীবনব্যবস্থা চর্চা করতে পারে না। এমতাবস্থায় দ্বীন প্রতিষ্ঠার আহ্বান অবশ্যই আল্লাহর ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেয়া বুঝায় এবং এ দিকেই মনোযোগ আকর্ষণ করা ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

সুতরাং আমাদের যুগের সমস্যার সাথে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বানকে সর্ম্পকযুক্ত করতে হবে। আর এটি প্রতিফলিত হয় যখন ইসলামিক জীবনধারা পূণপ্রবর্তনের দিকে কেউ আহ্বান করে। কেবলমাত্র তখনই আল্লাহর ইবাদত পূর্ণাঙ্গরূপে করা সম্ভবপর হবে। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্র বাস্তবায়নের দিকে আহ্বানের অর্থ হল দ্বীন প্রতিষ্ঠার দিকে আহ্বান করা-যা একটি ইবাদত এবং এ দাওয়াতও একটি ইবাদতের দিকে আহ্বান। কারণ এটি আল্লাহসুবহানাহু ওয়া তা'আলার একটি হুকুম-যার প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আল্লাহর ইবাদতের ব্যাপারে আত্মতুষ্টি থেকে কোন মুসলিম এটাকে অবহেলা করে।

সুতরাং বিভিন্ন লোক কতৃক এ বিষয়টি যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তা সঠিক নয়। কারণ তারা এমনভাবে উপস্থাপন করেছে যে, খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা আল্লাহর ইবাদতের সাথে সাংঘর্ষিক। আর এ ধরনের মন্তব্য করা বা দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা কুরআনের একটি অংশের উপর আক্রমণের নামান্তর এবং এটা করা হারাম।

## কারও কারও মতে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সীরাতের যথার্থতা যাচাই করা হয়নি

এর অর্থ হল, যে বিষয়ের দলিল প্রমাণিত নয় সেটি মানতে আমরা বাধ্য নই। ফলে আমরা সে অনুযায়ী কাজও করতে পারি না। তারা মনে করে, খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য মক্কী জীবনে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাজকে অনুসরণ না করবার ব্যাপারে তাদের মতামতের পক্ষে এটি একটি দলিল।

এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিক্রিয়ায় আমরা বলতে পারি, সীরাত হল বর্ণণা ও ঘটনার সংগ্রহ- যে ব্যাপারে নিরীক্ষা ও দালিলিক প্রমাণ অত্যাবশ্যকীয়। যেহেতু এটা রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাজের সাথে সর্ম্পকযুক্ত সেহেতু তা ওহীর অংশ। সুতরাং মুসলিমদের মুস্তফা (সা) এর সীরাতের ব্যাপারে এমনভাবে সচেতন থাকতে হবে যেভাবে তারা কোরআন ও হাদীসের ব্যাপারে সচেতন থাকে। সীরাতে মক্কী জীবনের কাজ বলতে রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে অবস্থানকালে যা করেছিলেন তাকেই বুঝায়-যখন তিনি মদীনাতে দার-উল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাজ করেছিলেন। যাদের সীরাতের যথার্থতা নিয়ে কাজ করবার সক্ষমতা আছে, যদি তারা তা না করে অথবা অন্যদের এ ব্যাপারে উৎসাহ না দেয় তাহলে তারা গোনাহগার হবে।

এটা খুবই অদ্ভুত যে, যারা এরকম দাবী করে তারা সবাই হাদীস গবেষক ও নিরীক্ষক। এমনভাবে এ দৃষ্টিভঙ্গিকে উপস্থাপন করে যেন দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ থেকে তারা দায়মুক্ত। অবস্থা এমন যেন, তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণকারী উপসংহারে উপনীত হয়েছে।

এ মুসলিমগন কি ভুলে গেছে যে, অন্যান্য মুসলিমদের মতই তারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দায়িত্বশীল? এটা তাদেরকে সীরাত অধ্যয়ন ও নিরীক্ষণকে বাধ্যতামূলক করেছে। যদি বাস্তবতা তাদের আংশিক শরীয়া বিষয়গুলোর ব্যাপারে

হাদীস পরীক্ষা করতে প্রচেষ্টা চালাতে উদ্বুদ্ধ করে, (এর জন্য তারা ধন্যবাদ পাবে, এ বিষয়ে তারা জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং এ পথে অনেক সময় ব্যয় করেছে), তাহলে দ্বীন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অনুধাবন করার পর তারা কী পরিমাণ গবেষণা ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে বাধ্য?
যদি সীরাতের কোন বর্ণণার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দালিলিক প্রমাণ না থাকে তাহলে এমন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে না যে, বিশেষ কোন সীরাত গ্রন্থের সব বর্ণণা গ্রহণ করা যাবে না।

ইতিহাসের যে শাখায় সীরাত লেখকগন কাজ করেছেন সেখানে মুহাদ্দীসীনদের পদ্ধতির মত সাবধানতা অবলম্বন করেননি। এমনকি বর্ণণাকারী বা সংগ্রাহকের বিশ্বস্ততা, বর্ণিত বিষয়ের যথার্থতা, বাহুল্যতা এবং সঞ্চারণে বীতস্পৃহা সর্ম্পকে সাবধানতা অবলম্বন করা হয়নি। এটা হাদীস বিশারদ ও সীরাতের যাচাইমূলক কাজের সাথে জড়িত যারা তাদের আত্নপ্রসাদপূর্ন করে তুলে।

আসল ব্যাপারটি হল, মুহাদ্দিসগন ও হাদীস বিশেষজ্ঞগন নিজেরা যে তথ্যনুসন্ধান এবং সঞ্চারন (transmit) করেন তা-ই হাদীস বিজ্ঞানের (science of hadith) জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়। সীরাত বিজ্ঞান একটি দিক থেকে এ জিনিসটি (বর্ণণার বিশুদ্ধতা) দাবী করে, আর সেটা হলো রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবী (রা) এর জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিবরণ। অপরদিকে, যে বিষয়টি রাসূল(সঃ) এবং তাঁর সাহাবা(রাঃ)গণের সাথে সম্পৃক্ত নয় সে বিষয়ে নমনীয়তা এ সর্ম্পকিত জ্ঞান কে ক্ষুন্ন করে না।

ঘটনাপ্রবাহ অনেক বেশী এবং অনেক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। সেকারণে সীরাত লেখক ও ঐতিহাসিকগন মুহাদ্দিসীগণের পদ্ধতির উপর নির্ভর করলে এত ঘটনাকে বেষ্টন করতে পারবে না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা) এর সীরাত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান- যে ব্যাপারে মুসলিমদের সচেতন থাকা উচিত। কারণ এতে রয়েছে তাঁর উক্তি, কাজ, সম্মতি ও বৈশিষ্ট্য। এসবই কোরআনের মত আইনের অংশ। নবীর সীরাত আইনের একটি উপাদান বিধায় হাদীসের অংশ। নবী (সা) এর পক্ষ থেকে যা দালিলিক প্রমাণসহ পাওয়া যায় তাই শরীয় হুকুম। কারণ এটি সুন্নাহ থেকে নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা) কে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

***'তাদের জন্যে রসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।'* (সূরা আল আহযাবঃ ২১)**

সুতরাং সীরাতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা ও গুরুত্ব প্রদান করা শরীয়া বিষয়।

পূর্বে সীরাত সরবরাহের পদ্ধতি হিসেবে কেবলমাত্র বর্ণণার উপর নির্ভর করা হত। ঐতিহাসিকগন মৌখিভাবে তা সঞ্চালিত করা শুরু করলেন। যে প্রথম প্রজন্ম রাসূলুল্লাহ (সা) কে প্রত্যক্ষ করেছে ও তার ব্যাপারে শুনেছে তারা অন্যদের কাছে এ ব্যাপারে তথ্য সঞ্চালিত করেছে। পরের প্রজন্মের কেউ কেউ এগুলো মিশ্রভাবে লিখে সংরক্ষণ করেছিল-যেগুলো আমরা এখন হাদীস গ্রন্থ হিসেবে পাই। দ্বিতীয় শতাব্দীতে আমরা দেখতে পাই কেউ কেউ সীরাত বিষয়ক কিছু বর্ণণা সংকলন করে একীভূত করেন। সংকলনের সময় তারা হাদীসের মত সঞ্চালক এবং এসব সঞ্চালকগণ যাদের থেকে সংগ্রহ করেছেন তাদের নামও উল্লেখ করেন। সেকারণে হাদীসবেত্তা ও ইসনাদ (বর্ণণাকারীদের ধারাবাহিকতা) নিরীক্ষকগণ গ্রহণযোগ্য ও প্রামাণিক সীরাত বর্ণণা থেকে বর্ণণাকারী ও বর্ণণাকারীদের ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে দূর্বল ও প্রত্যাখানযোগ্য অংশগুলো খুজে বের করেন। প্রামাণিক সীরাত থেকে এভাবে বর্ণণার সময় নির্ভর করা হয়। নতুন কোন বিষয়ের অবতারণা করা প্রধান ইস্যু নয়, বরং রাসূলুল্লাহ (সা) এর কথা ও কাজের বর্ণণার নির্ভূলতা ও সঠিকতা নিরূপণ করা অতি প্রয়োজনীয়। তবে কিছু সচেতন মানুষ সীরাত পরীক্ষা করে দেখেছে। সুতরাং যে দল বা সংগঠনটি রাসূলুল্লাহ (সা) এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদের অবশ্যই প্রামাণ্য দলিল নির্ভর সীরাত পরখ করে দেখতে হবে।

তাছাড়া, সীরাতের বইগুলোতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অমত সত্তেও হাদীসের গ্রন্থ ও কুরআনের মত দাওয়াতের বিভিন্ন পর্যায় ও কর্মকান্ডের বর্ণণায় অভিন্নতা রয়েছে। মহাগ্রন্থ আল কুরআন দাওয়াতের অনেক বিষয় বিস্তারিতভাবে আমাদের সামনে এমভাবে তুলে ধরেছে যে, এ বিষয়ে একটি সঠিক চিত্র পাওয়া যায়। কুরআন প্রয়োজনীয় অনেক কিছু সুস্পষ্ট ও সঠিকভাবে উপস্থাপন করেছে।

উদাহরণস্বরূপ, রাসূলুল্লাহ (সা) মিথ্যা বিশ্বাস, মূর্তিপূজা, নাস্তিক্যবাদ, ইহুদীবাদ, জাদুবিদ্যা, গোত্রবাদকে আক্রমণ করেছিলেন। কন্যা সন্তান জীবন্ত পুতে ফেলা, ঊসীলা হিসেবে মাদী উট চারণভূমিতে ছেড়ে দেওয়া, কোন প্রানীর জমজ বাচ্চা হলে মুর্তির উদ্দেশ্যে কোরবানী দেওয়া, শরনিক্ষেপ করা ইত্যাদির বিরুদ্ধে কথা বলে তিনি (সা) তাদের ঐতিহ্য ও রীতিনীতিকে আক্রমণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) শাসকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং তাদের নাম উল্লেখ করে বর্ণণা দেন ও দাওয়াতের ব্যাপারে তাদের ষড়যন্ত্র উন্মোচন করেন। দলটিকে অবশ্যই এগুলো গ্রহণ করতে হবে। গ্রহণের সময় কাজের মৌলিকতা এবং এর সাধারণ অর্থের দিকে খেয়াল খেয়াল করতে হবে, বিস্তারিতভাবে উপকরণ বা ধরণ নয় । সেকারণে দলটি

ভুল চিন্তা, অসঠিক ধারণা ও ইসলাম বিরোধী ঐতিহ্য ও রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ করবে। এটা শাসকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে, তাদের মুখোশ ও ষড়যন্ত্র উন্মোচন করবে, ইসলামের চিন্তা ও হুকুমসমূহকে পরিষ্কার করে তুলে ধরবে, লোকদের এদিকে আহ্বান করবে ও তাদের জীবনে এগুলো বাস্তবায়নের জন্য আমন্ত্রণ জানাবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) নিরস্ত্র ও প্রতিরক্ষাহীন অবস্থায় এগুলো মোকাবেলা করেছেন এবং তখন কোন পক্ষ অবলম্বন করেননি, কারও প্রতি নতজানু হননি এবং কোন আপোষ করেননি। তিনি সব লোভনীয় প্রস্তাব ও হুমকিকে অবজ্ঞা করেছেন এবং ধৈর্য্যের সাথে তার প্রভূর পথের উপর অটল ছিলেন। কোরআন আমাদের এ ব্যাপারে অবহিত করেছে এবং এ কারণে দলটি যখন কাজ করবে তখন এ নির্দেশনা মেনে চলবে।

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি আল্লাহ নাজিল করেন,
*"অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয়"* আয়াত থেকে নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, এর আগে দাওয়াত প্রকাশ্য ছিল না, বরং তা ছিল গোপনীয়-যা প্রকাশ্য দাওয়াতের পূর্বের ধাপ।

এবং তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,
***'যাতে আপনি মক্কাবাসী ও পার্শ্ববর্তীদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন।'* (সূরা আল আনআম : ৯২)**
এ আদেশ মক্কার বাইরে দাওয়াকে বিস্তৃত করবার নির্দেশনা প্রদান করে। পবিত্র কোরআন মোহাজেরীনদের হিজরত ও আনসারদের নুসরার ব্যাপারে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছে।

সুতরাং কুরআন হল প্রথম নির্দেশিকা। মক্কীযুগে মুসলিমদের বর্ণণার বিষয়ে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বুখারী 'কীভাবে নবী (সা) এবং তাঁর অনুসারীদের সাথে মক্কার মুশরিকরা আচরণ করেছিল'-শিরোনামে আলোচনা করেছেন। তিনি খাব্বাব বিন আল আরাতের (রা) হাদীস বর্ণণা করেন যখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে প্রার্থনা করবার অনুরোধ নিয়ে এসেছিলেন যাতে মুসলিমগন বিজয় লাভ করে। তিনি কুরাইশ নেতাদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) এর দোয়ার কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন নবী (সা) কীভাবে তায়েফের লোকদের দ্বারা নির্মম আচরনের শিকার হয়েছিলেন। আমরা হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থেও এরকম বর্ণণা পাই। অতএব আমরা এমন কোন বিষয়ের হুকুম পালন করছি পারি না যার পক্ষে কোন বর্ণনা নেই।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সব সীরাত রচয়িতারা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য যা অন্যান্য চিন্তাবিদদের দ্বারা সমর্থিত।

- ইবনে ইসহাক (৮৫-১৫২ হিজরী) 'আল মাগাজী' (সামরিক অভিযান) নামে একটি বই লিখেন। আয জুহরী তার সর্ম্পকে বলেন, 'যে ব্যাক্তি মাগাজী (সামরিক অভিযান) সর্ম্পকে জানতে চায় সে যেন ইবনে ইসহাক পড়েন। শা'ফেঈ তার সর্ম্পকে বলেন, 'কেউ যদি মাগাজীর উপরে একজন বিশেষজ্ঞ হতে চান তিনি পুরোপুরি মুহম্মদ বিন ইসহাকের উপর নির্ভর করতে পারেন।' বুখারী তাকে তার তারিখ গ্রন্থে উল্লেখ করেন।
- ইবনে সাদ (১৬৮-২৩০ হিজরী) ও তার বই আত তাবাকাত (প্রজন্ম)। আল খতীব আল বাগদাদী তার সর্ম্পকে বলেন, 'আমাদের জন্য মুহম্মদ বিন সা'দ একজন বিশ্বাসভাজন লোক। কেননা বর্ণণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকেন বলে তার হাদীসসমূহ বিশ্বাসযোগ্য।' ইবনে খালি- কান বলেন, 'তিনি সৎ ও বিশ্বস্ত।' ইবনে হাজার তার সর্ম্পকে বলেন, 'তিনি ছিলেন অন্যতম একজন মহান ও নির্ভরযোগ্য হুফফাজ (যারা হাদীস মুখস্থ করেন) এবং সমালোচক।'
- আত তাবারী (২২৪-৩১০ হিজরী) লিখিত বইয়ের নাম 'রাসূলগণ ও রাজাদের ইতিহাস' (তারিখ আর রুসুল ওয়াল মুলুক)-যার মাধ্যমে তিনি ইসনাদ (বর্ণণার ধারাবাহিকতা) এর পদ্ধতি বিধৃত করেন। আল খতীব আল বাগদাদী তার সর্ম্পকে বলেন, 'তিনি সুনান(হাদীস), তাদের বর্ণণার ধারবাহিকতা, জাল হাদীস থেকে সহীহ হাদীস পৃথকীকরণ, লোকদের ইতিহাস ও খবারখবরের বিষয়ে ভাল জ্ঞান রাখতেন।' অধিকাংশ হাদীসের ক্ষেত্রে মুহাদ্দীসীনদের পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি তারিখ লিখেন। তিনি হাদীসের একটি বই সংকলন করেন, যার নাম 'তাহজীবুল আতাহার ওয়া তাফসীল আস সাবিত'আন রাসূলুল্লাহি (সা) মিনাল আখবার' (রাসূলুল্লাহ (সা) সর্ম্পকিত বর্ণণার পর্যালোচনা এবং প্রামাণিক তথ্যাদির বিস্তারিত আলোচনা)। ইবনে আসাকীর এ সর্ম্পকে বলেন, 'এটি একটি অসাধারণ বই, যেখানে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রত্যেকটি প্রামাণিক হাদীস নিয়ে লিখেছেন।'
- একইভাবে ইবনে কাসীর এবং আয জাহাবীকে হাদীসের উপর বিশেষজ্ঞ ভাবা হয়।

## কিছু মুসলিম ভাবে, এখনকার শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাই হচ্ছে পরিবর্তনের পদ্ধতি যা অনুসরণ করতে আমরা বাধ্য

তারা দলিল হিসেবে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন না করলে 'অসৎ শাসক'দের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) এর অস্ত্রধারণ করবার নির্দেশনার কথা উল্লেখ করেন।

এ অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় বলতে চাই যে, অমত পোষণ করলেনও এ ধরনের চিন্তা যারা পোষণ করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এটুকু বলব যে, আলোচ্য হুকুমের মানাত (যে বাস্তবতার জন্য হুকুমটি এসেছে) বুঝতে পারলে হাদীসটি হৃদয়ঙ্গম করাও সহজতর হবে। এ হাদীসটি মূলত দার উল ইসলামের ইমাম এর বিষয়ে-যাকে আইনগতভাবে শরঈ বায়া'আত দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মুসলিমদের বায়া'আতের মাধ্যমে তিনি একজন ইমাম হয়েছেন। আর এই ইমাম যে ভূমিকে শাসন করেন তাকে দার উল ইসলাম বলা হয়। অর্থাৎ এ ভূমি ইসলাম দ্বারা শাসিত হয় এবং এর নিরাপত্তা কেবলমাত্র মুসলিমদের হাতেই ন্যস্ত। মুসলিমগণ তাকে অনুসরণ করতে বাধ্য। যদি সে শাসক আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা দিয়ে শাসন করবার ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করেন এবং প্রকাশ্যে কুফর আইন দিয়ে জনগনকে পরিচালনা করতে থাকেন-এমনকি যদি সেটি একটিও হুকুম হয় যে ব্যাপারে সুবহাত দলিলও বা শারী'য় দলিলের সাথে সাদৃশ্য খুজে পাওয়া না যায়-তখন প্রয়োজনে মুসলিমদের অস্ত্র ধারণ করে তাকে উৎখাত করতে হবে। নিম্নে বর্ণিত এ হাদীসটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে আমাদের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। এটি বর্ণণা করেছেন আউফ বিন মালিক আল আসযা'য়ী, যিনি বলেন,

'আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, **'শাসকদের মধ্যে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ যাদের তোমরা ভালবাস ও যারা তোমাদের ভালবাসে; যাদের জন্য তোমরা প্রার্থনা কর ও যারা তোমাদের জন্য প্রার্থনা করে এবং সবচেয়ে মন্দ শাসক হল তারাই যাদের তোমরা অভিশাপ দাও ও যারা তোমাদের অভিশাপ দেয়।' তারা বললো,' ইয়া রাসূলুলণ্ডাহ! আমরা কি তরবারীর বলে তাদেরকে অপসারন করব না?' তিনি বললেন-'না। যতক্ষন পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে সালাত কায়েম রাখবে।"** (মুসলিম)

এখানে সালাত কায়েম করা বলতে পুরো শারীয়া বাস্তবায়নকেই বুঝায়- 'বাব তাসমিয়াতুল কুল বি ইসমিল জু'ঝা' (একটি অংশ বুঝানোর মাধ্যমে পুরো জিনিসটিকে বুঝানো)।

দার উল কুফরের শাসকদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন বাস্তবতা। সে শাসক মুসলিমদের ইমাম নয়। কারণ সে শরীয়া পদ্ধতি অনুসারে শাসক হিসেবে আসীন হয়নি। বাধ্যবাধকতা হওয়া সত্তেও সে কখনোই ইসলামী আইন তাদের জীবনে বাস্তবায়ন করবার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনি।

যখন আমরা বাস্তবতার দিকে তাকাই, তখন বুঝতে পারি এখন পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় অস্ত্র ধারণ করা যথেষ্ট নয়। এটা এখন কেবল শাসকদের পরিবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা ইসলাম দ্বারা শাসন করার বিষয়। সুতরাং কে এই দায়িত্ব পালন করবে? এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্র পরিচালনায় দক্ষ ব্যক্তি ও একটি ইসলামী রাজনৈতিক মাধ্যম। ইসলাম দিয়ে শাসন করবার বিষয়টি এত সহজ নয় যে, এ দায়িত্ব কোন সেনাপ্রধান বহন করতে পারবেন, তিনি সামরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত দক্ষ হলেও ও ইসলামের দিক দিয়ে আন্তরিক হলেও। এর জন্য দরকার অভিজ্ঞতা, উপলদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ এবং স্বাতন্ত্রমন্ডিত শরীয়ার জ্ঞান।

কেবল রাসূলুল্লাহ (সা) এর পদ্ধতি নীচের সব কিছু নিশ্চিত করে:

- ইসলামী রাষ্ট্র বাস্তবায়নের আগে আসাধারণ মুসলিম রাজনীতিবিদ ও নেতৃত্ব সৃষ্টি করে, যাদের রয়েছে দীর্ঘদিনের দাওয়াতের অভিজ্ঞতা। যিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে অপরাজেয় থাকবার জন্য কূটকৌশল ও সূক্ষ্ণ চিন্তার অধিকারী হয়ে উঠেন। তখন তিনি রাষ্ট্রটিকে রক্ষা করবার সক্ষমতা অর্জন করতে পারবেন ও বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে পথপ্রদর্শক ও পথপ্রদর্শিত, নব্যুয়তের আদলে খোলাফায়ে রাশেদীন হিসেবে পরিগণিত করতে পারবেন।

-এ পদ্ধতি আন্তরিক শাবাব তৈরি করে যারা রাষ্ট্র কায়েমের আগে দাওয়াতের বোঝা বহন করবে। দাওয়াতের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল অন্যান্য মুসলিমদের সাথে নিয়ে এই ইসলামী রাজনৈতিক মাধ্যম (Islamic political medium) থেকে এমন লোক তৈরি করবে যাদের মধ্য থেকে ওয়ালী (গভর্ণর), আমীরুল জিহাদ, প্রতিনিধি এবং অন্য রাষ্ট্রে ইসলাম নিয়ে যাবে এমন দাওয়াত বহনকারী হবেন।

- এটা এমন জনপ্রিয় ভিত্তি তৈরি করবে যারা ইসলাম ও রাষ্ট্রকে গ্রহণ (embrace) করবে এবং রক্ষা করবে।

- এটা সুপ্রশিক্ষিত ক্ষমতাধর লোক তৈরি করবে। সাধারণ জনগন বিরুদ্ধাচরণ না করে তাদের সাথে থেকে শক্তি বৃদ্ধি করবে। কেননা তারা (জনগন) বুঝতে পারবে শাসক, শাসনযন্ত্র এবং যে ক্ষমতার উপর তারা (শাসক) নির্ভর করে তা তাদের (জনগন) জন্য একটি শক্তি এবং এ এমন এক দায়িত্ব যা ইসলাম প্রয়োগ ও দ্বীনকে বুলন্দ করবার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশ।

তাছাড়া সশস্ত্র আন্দোলনের জন্য দরকার টাকা, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ। এটা আন্দোলনের জন্য অতিরিক্ত বোঝা হয়ে যাবে- যা অন্যদের উপর নির্ভরশীল হতে প্ররোচিত করবে। এটাই ব্যর্থতার প্রথম সোপান। মুসলিমগন এ পথে প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং নিজেদের অনেক ক্ষতিসাধন করেছে। এটা আর উল্লেখের প্রয়োজন নেই যে, 'চেষ্টা করে দেখা যাক' (ætry out'' ) একটি ভ্রমাত্মক অভিব্যক্তি।

যখন আমরা বলি অস্ত্রধারণ করা শরীয় পদ্ধতি নয়, তখন মোটেও সেইসব শাসকদের ছাড় দেয়া হয় না যারা মুসলিমদের তোয়াক্কা করে না। বরং আমরা দ্বীনের ভেতর কিছু আন্তরিক ভাইদের তাদের বর্তমান কাজকে পরিত্যাগ করতে বলি যাতে তাদের প্রচেষ্টাকে শরীয়া কাজে একীভূত করতে পারি। আমরা তাদের মক্কীযুগে কিছু সাহাবীর অস্ত্র ধারণ করা বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিষেধাজ্ঞা মনে করিয়ে দিতে চাই, যখন তিনি (সা) বলেছিলেন,

**'আমি ক্ষমা করবার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, সুতরাং যুদ্ধ করো না।'** (সীরাত ইবনে হিসাম)

এছাড়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কোরআনে নাজিল করেন যে,

*'তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দিতে থাক? অতঃপর যখন তাদের প্রতি জেহাদের নির্দেশ দেয়া হল,..... ।'* (সূরা নিসা:৭৭)

একইভাবে আমরা আরও শক্তিশালী শরীয় দলিল দেখাতে পারব যার মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে বলা সম্ভব যে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) এর পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এর সাথে কোন কিছু যুক্ত করা, বাদ দেয়া, পরিবর্তন করা, সংশোধন দাওয়াত, দল ও ইসলামিক উম্মাহের উপর কুপ্রভাব ফেলবে। নবী (সা) এর সুন্নাহকে পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের জন্য এ কারণে শরী'আর সঠিক অধ্যয়ন ও রাসূলুল্লাহ (সা) এর পদ্ধতির আনুগত্য করার উপর আমরা গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। এটা কেবলমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য যিনি আমাদের সঠিক পথ দেখান।

# ৬

# আহকাম (হুকুম) বুঝবার জন্য ইসলামের পদ্ধতি

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সাথে সর্ম্পকিত সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ সংক্রান্ত দায়িত্ব বহন শরী'আহ সর্ম্পকিত প্রয়োজনীয় জ্ঞানভিত্তিক হতে হবে। এটি একারণে যে, আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি জ্ঞান ছাড়া কোন কাজের মূল্য নেই এবং জ্ঞান ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আন্তরিক সদিচ্ছা ছাড়া কোন ইবাদতের মূল্য নেই।

সুতরাং দলের জন্য প্রয়োজনীয় শরীয়া জ্ঞানের সীমা কতটুকু? কোন বিকাশ প্রক্রিয়ার (culturing process) মাধ্যমে দলটি গঠিত হবে এবং কিসের ভিত্তিতে এর শাবাবগন ও উম্মাহ তৈরি হবে?

উপযুক্ত শরীয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজের নিষেধ সংঘটিত হয়-যা দলটিকে গ্রহণ করতে হবে। যদি দলটি এমন কিছু গ্রহণ করে যা শরী'আর সাথে সাংঘর্ষিক, তাহরে সে ব্যাপারে সদুপদেশ দিতে হবে। যদি বিচ্যুত হয় তাহলে সংশোধন করতে হবে। যে শরীয় বাধ্যবাধকতা দলটির জন্য বাধ্যতামূলক তা অন্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মূল বিষয় হল গ্রহণ ও অনুসরণ, বিচ্যুতির কোন সুযোগ নেই। উপদেশ প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রত্যেকের জন্য আসা উচিত।

এ পর্যায়ে এটা বলে রাখতে হবে যে, যে কোন শরীয় হুকুম বের করবার জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি-এটা হতে পারে দাওয়াত, ইবাদত (উপাসনা), মু'আমালাত (লেনদেন), উকুবাত (শাস্তি), মাত'উমাত (খাদ্যদ্রব্য), মালবুসাত (পরিচ্ছদ) অথবা আখলাক (নৈতিকতা).....

মুসলিমদের প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিদীপ্ততার জন্য নয়, বরং ইসলাম এবং এর প্রকৃতির দ্বারা এই সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিটি নির্দেশিত হয়েছে। এটা এ কারণে যে, ইসলামী আক্বীদার নির্দেশ হচ্ছে, একজন মুসলিম শরীয়ার বাইরে থেকে একটিমাত্র হুকুমও গ্রহণ করবে না। কিতাবের (shariah texts) সিদ্ধান্তঅনুযায়ী যে সীমারেখা টানা আছে তাকে অবশ্যই সে সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করতে হবে। সুতরাং ইসলামের এমন পদ্ধতি থাকা দরকার যা এই নির্দেশনাকে সুরক্ষা দিবে, উপলদ্ধিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রন করবে যাতে যা নাজিল হয়েছে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, যাতে এর আক্বীদার দৃষ্টিভঙ্গি ফিকহের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং এর শর্তসমূহ হচ্ছে সমন্বিত।

ইজতিহাদের এই সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, তা দলের বিকাশের (culturing process) সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকা উচিত। এই পদ্ধতি আইন অবরোহনের ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান করে। যদি অবরোহণের পদ্ধতি সঠিক হয় তাহলে এমন শরীয়া হুকুম পাওয়া যাবে যেখানে সবচেয়ে কম সন্দেহ থাকবে এবং একজন এর জন্য পুরস্কৃত হবে। অন্যথায় সঠিক শরীয়া পদ্ধতির ভিত্তিতে গড়ে না উঠা মতামত শরীয়া মতামত বিবেচিত হতে পারে না-যদিও বা কেউ ভুলভাবে একে শরীয়া মতামত বলে আখ্যা দিতে পারে। এর কারণ হলো, বিবেচ্য বিষয় নাম নয়, বরং বাস্তবতা। সুতরাং এটা বাধ্যতামূলক।

অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে আজকে এ পদ্ধতির অনুসরণ করা বড়ই প্রয়োজন। এটা মুসলিমদের পশ্চিমা চিন্তাধারা ও এর পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে বিরত রাখবে। এটা এ সময়ের একটি ব্যধি যা দ্বারা অনেকে আক্রান্ত হয়েছে। আর এদের একটি অংশ হল উলেমাগণ। এ কারণে তাদের ইজতিহাদ ও ফতওয়া মূল নিয়ন্ত্রক (dawaabit (regulators)) থেকে অনেক দূরে-যেখানে তারা ঐশী নির্দেশনার দাসত্ব না করে পশ্চিমা খেয়ালখুশীর দাসত্ব করে।

সুতরাং শরীয়ার দৃষ্টিতে ইজতিহাদের একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে এবং এর উপর মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে যদিও তাদের ইজতিহাদ ভিন্ন হতে পারে। এখানে আমরা বিষয়টি সার্বজনীনভাবে উপস্থাপন করব। এটা সালাফ বা পূর্ববর্তীদের পদ্ধতি ছিল, একই ধারায় ক্বিয়ামতের আগ পর্যন্ত খালাফ বা পরবর্তীদেরও এবং তার পরবর্তীদেরও পদ্ধতি হিসেবে থাকবে।

## মানাত (বাস্তবতা) উপলদ্ধি

আহকাম বুঝবার জন্য ইসলামিক পদ্ধতির ভিত্তি হলঃ সমস্যাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা, এর মর্মোদ্ধার করা, সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় শরীয়া দলিল এবং সবশেষে এই শরীয়া দলিল থেকে হুকুম বের করে নিয়ে আসা।

সুতরাং পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করা একটি দলের উপস্থিতি এটি যে বাস্তবতায় আছে তার সাথে সর্ম্পকযুক্ত। কেননা এ বাস্তবতার নিরীখেই দলটিকে ঐ বাস্তবতা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় শরীয়া হুকুম বের করতে হবে।

আর কোন বিষয়ের বাস্তবতা বুঝতে হলে একজনকে ঐ বিষয়টি গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে।

শরী'আহ বুঝতে হলে প্রথমেই এর উৎস সুনির্দিষ্ট করতে হবে এবং উসুল ও মূলনীতি গ্রহণ করতে হবে যার ভিত্তিতে হুকুসমূহ বের করে আনতে হবে। হুকুম আহরণের এই প্রক্রিয়া সম্পন্নের জন্য একজন মুজতাহিদ প্রয়োজন-যিনি যে কোন হুকুমকে তার বাস্তবতা অনুসারে প্রয়োগ করতে পারবেন এবং ইল- াত বা ঐশী কারণ অনুসারে কার্যকর করতে পারবেন।

সুতরাং একটি দল বা হিজবের উত্থান বাস্তবতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। দলটি বাস্তবতা পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে। সে কারণে এর চিন্তা ও পরিবর্তনের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। সে কারণে দলকে বাস্তবতা গভীরভাবে ও সুনির্দিষ্টভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং যে সমস্যা সমাধান করা হবে তা খুঁজে বের করতে হবে। অগণিত সমস্যা রয়েছে। সেকারণে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যকার পার্থক্য অনুধাবন করতে পারতে হবে। একজনকে যেমনি মূল সমস্যা বুঝতে হবে তেমনি মূল সমস্যা থেকে উদ্ভুত শাখা সমস্যাগুলোও বুঝবার মত সক্ষমতা থাকতে হবে। এর মাধ্যমে একটি সমস্যা ও এর আপাত উপস্থিতির মধ্যকার পার্থক্য প্রতীয়মান হবে অর্থাৎ অসুস্থতার মূল কারণ ও সেকারণে সৃষ্ট উপসর্গের মধ্যকার পার্থক্য বুঝা যাবে। মূল কারণ সনাক্ত হবার পর একজন এর প্রতিকারের জন্য প্রচেষ্টা চালাবে।

এখানে আমরা একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ ডাক্তারের সাথে তুলনা করতে পারি-যিনি রোগের মূল কারণ উপলব্ধি না করে উদ্ভুত উপসর্গ দ্বারা প্রতারিত হন না। যেমন: কোন লোকের পেটের অসুখ আছে এবং একারণে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তার চামড়ায় ফুসকুড়ি সহ জ্বর হল। যদি সে ডাক্তার কেবলমাত্র চামড়ায় ফুসকুড়ি সহ জ্বরের চিকিৎসার জন্য ঔষধ প্রদান করেন কিন্তু পেটের অসুখের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, তাহলে এ চিকিৎসা নিশ্চিতভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে যাচ্ছে। সে কারণে চিকিৎসককে প্রথমে মূল সমস্যার প্রতিবিধান করতে হবে, অর্থাৎ পেটের ব্যাধি। যদি তা করা হয় তাহলেই কেবলমাত্র উপসর্গসহ মূল অসুখের প্রতিকার করা হবে। মূল চিকিৎসার পরে ডাক্তার উদ্ভুত উপসর্গগুলোর জন্য প্রয়োজনে চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নেবে। তবে স্বাভাবিকভাবে উদ্ভুত উপসর্গগুলো মূল সমস্যার সাথে সাথে উপশম হয়ে যাবার কথা। আর না হলে পরবর্তীতে এগুলো চিকিৎসা করা যাবে। যদি সেটার প্রয়োজন হয় তাহলে সেটা হবে একটি আংশিক কাজ।

একই কথা আমরা যে বাস্তবতায় বাস করি সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমরা জানি, বাস্তবে কিছু মৌলিক সমস্যা রয়েছে এবং এসব সমস্যা থেকে কিছু উদ্ভুত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। একটি বড় মৌলিক সমস্যা যা আজকে উম্মাহকে ক্লিষ্ট করে তুলেছে তা হল মুসলিমদের জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অনুপস্থিতি। এটি থেকে অনেক উদ্ভুত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, যেমন: অবিচার থেকে উদ্ভুত দারিদ্রতা, অজ্ঞানতা, অনৈতিক কাজের বিস্তৃতি এবং অবৈধ সম্পর্কের প্রাধান্য। এর মূল কারণ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কোরআনে বলেন,

'যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে।' (সূরা ত্বোয়াহা: ১২৪)

এই আংশিক সমস্যাসমূহ মূল একটি সমস্যা বা বাস্তবতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। যদি এই বাস্তবতার পরিবর্তন না হয় তাহলে এক্ষেত্রে টেকসই ও মৌলিক পরিবর্তন সংঘটিত হবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বর্ণিত কুপ্রভাব থেকে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত বের হতে পারবে না যতক্ষণ না আল্লাহর আদেশ নিষেধের ভিত্তিতে ইসলামিক আক্বীদাকে রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করে জীবনধারা পূণপ্রবর্তন হবে।

সুতরাং শিক্ষা, নৈতিকতা বা অর্থনৈতিক সংকট মৌলিক সমস্যা নয়। মুসলিমদের অধিকার পুণরুদ্ধার বা তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাকে শক্তিশালী করাও মৌলিক সমস্যা নয়। বরং আক্বীদা ও বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মৌলিক সমস্যা হল আল হাকিমিয়্যাহ বা সার্বভৌমত্ব। এই সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য। সে কারণে আমাদেরকে ইসলামের সমাধানের উপর মুসলিমদের ভেতরে আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে হবে। আমরা অবশ্যই তাদের হৃদয়ে হৃত আক্বীদা, আক্বীদা থেকে উদ্ভুত ব্যবস্থা জীবনে ফিরিয়ে আনবার জন্য সদিচ্ছা ফিরিয়ে আনবার জন্য প্রচেষ্টা চালাব যাতে করে তারা জান্নাত লাভ, জাহান্নামকে ভয় করে ও এর শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করে, ইসলামিক আক্বীদার ভিত্তিতে মুসলিমদের বর্তমান করুণ অবস্থা তথা পুরো মানবতা সম্পর্কে সচেতন হয়।

এ উপলব্ধি থেকে দলটি মৌলিক সমস্যাকে সংজ্ঞায়িত করবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে জানবে যখন এ রোগের চিকিৎসা হবে তখন সব উদ্ভুত উপসর্গ দূরীভূত হবে। সুতরাং বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতনতার গুরুত্ব এখন সুস্পষ্ট।

একে উসুলী চিন্তাবিদগন মানাত বলে থাকেন। শারীয়া প্রমাণাদি নিয়ে আসবার আগে মানাত বা বাস্তবতাকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করা বাধ্যতামূলক।

বাস্তবতা সর্ম্পকে সচেতন হওয়া এবং তা বুঝা এর সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুমের চেয়ে কঠিন। এর জন্য দরকার যথার্থতা। কারণ যদি আমরা বাস্তবতা বুঝতে ভুল করি এবং এই ভ্রান্তি মনের উপর কোন ছাপ ফেলে তাহলে স্বভাবতই আমরা এমন দলিল উপস্থাপন করব যা হৃদয়নিবেশিত ভাবরাশিতে থাকা চ্যুত বাস্তবতাকে উপস্থাপন করবে। কখনওই আসল বাস্তবতাকে নয়। অর্থাৎ আমরা এমন দলিল উপস্থাপন করব যা বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

বাস্তবতা বুঝার জন্য চিন্তার ব্যবহার অপরিহার্য। বাস্তবতাকে চিন্তার উৎস হিসেবে নির্ধারণ করা অনুমোদিত নয়। এমন কোন সমাধান গ্রহণ করা অনুমোদিত নয় যা বাস্তবতা থেকে উদ্ভুত। সেকারণে বাস্তবতাকে এর মত করেই বুঝতে হবে।

## শরী'য়াহ উপলদ্ধি করা

চিন্তাকে ব্যবহার করে বাস্তবতাকে প্রকৃতভাবে বুঝবার পর শরীয়া দলিল থেকে উৎসারিত শরীয় হুকুম বাস্তবতায় প্রয়োগের জন্য উদ্ভুত হয়। চিন্তাকে সমাধান বের করবার জন্য উৎস হিসেবে গ্রহণ করা অনুমোদিত নয়। এখানে চিন্তার কাজ হল শরীয়া দলিলে থাকা শরীয়া সমাধান উপলদ্ধি করা।

শরীয়া বুঝতে হলে আমাদেরকে জানতে হবে দলটি কোন উৎস থেকে শরীয়া এবং উসুলী মূলনীতি গ্রহণ করে এবং কিসের দ্বারা দলটি মন্দ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চায়। এভাবে, জনগনের সামনে নিয়ে যাবার জন্য বাস্তবতা সর্ম্পকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করবে এবং ইজতিহাদি প্রক্রিয়ার যথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ অবরোহণের প্রক্রিয়া সর্ম্পকিত জ্ঞান রাখবে।

## শরী'য়াহর উৎস

যেহেতু প্রতিটি হুকুমকে একটি সঠিক উৎস থেকে আসতে হবে সেহেতু উৎস অধ্যয়ন করবার পর সে সর্ম্পকে যথার্থ উপলদ্ধি তৈরির পরই তা গ্রহণ করতে হবে। এটা সর্বজনবিদিত যে, ইসলামিক আইনের প্রধান উৎস হল কুরআন ও সুন্নাহ- যেগুলোর ব্যাপারে কোনরূপ মতানৈক্য নেই। লব্ধ উৎসসমূহ হল- ইজমা, ক্বিয়াস, ইসতিহসান (আইনগত প্রাধান্য), মাজহাব আস সাহাবা (সাহাবীদের মতামত), শা'রা মান কাবলানা (পূর্ববর্তীদের শরীয়াহ)-এ সবগুলোর ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে । উৎস সর্ম্পকে অর্ন্তনিহিত দৃষ্টিভঙ্গি দলের শরীয়া গ্রহণ সর্ম্পকে একটি ধারণা দেয়।

এটা সর্বজনবিদিত যে, লব্ধ উৎসসমূহ নির্ভর করে সুনির্দিষ্ট প্রমাণাদির উপর। সুতরাং, যদি কোন কিছু চূড়ান্তভাবে শরীয়ার উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়, তাহলে এটাকে কোরআন ও সুন্নাহ থেকে আসতে হবে। অন্য কথায়, দু'টি প্রধান উৎস অন্য একটি বিশেষ উৎসকে গ্রহণের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। শরীয়া উৎস তাক্বলীদের মাধ্যমে গ্রহণ করা যথেষ্ট নয়। শরীয়া উৎস মৌলিক বিষয়, এবং একারণে এগুলোকে চূড়ান্ত হতে হবে এবং আমরা জানি তাক্বলীদ নিশ্চয়তার দিকে পরিচালিত করে না।

উৎস সুনির্ধারিত হবার পর আমরা বুঝতে পারব জলের কোন ধারা থেকে তারা পান করতে পারবে এবং পারবে না। উৎসকে সংজ্ঞায়িত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা উৎস নির্ধারণে একটি ভুল হলে পুরো হুকুমের মধ্যে গলদ চলে আসবে। শরীয়া উৎস সংজ্ঞায়িত হবার পর দলটি তার কাজের সাথে বিজড়িত শরীয়া হুকুম অবরোহণ করবে। শরীয়া উৎস নির্ধারণ না করে দাওয়াতের কাজ করা যে কোন দলের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।

ভাল মনে করে সব লব্ধ শরীয়া উৎস গ্রহণ করাও গ্রহণযোগ্য নয়। যদি দলটি এরকম কিছু করে তাহলে তারা ভাল ও মন্দ দু'টোই গ্রহণ করবে। এতে করে শরী'আহ বাস্তবতা, মানুষের মন, প্রবৃত্তি, আবেগ ও স্বার্থের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় দলিল সমূহ কেবলমাত্র এইসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যই ব্যবহার করা হয় এবং শরী'য়াহর দাবীর বিপরীতে অবস্থান নেয়।

নীতিগতভাবে, বাস্তবতা পরিবর্তনের জন্য মতামত প্রদানের আগে দলটিকে অবশ্যই উৎসসমূহ সুনির্দিষ্ট করা উচিত। উৎসের ক্ষেত্রে কখনওই বাস্তবতা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া চলবে না। বরং উৎসসমূহকে প্রতিষ্ঠা অথবা ভুল প্রমাণ করবার জন্য কেবলমাত্র নাজিলকৃত ওহী ও এদের চূড়ান্ত নির্দেশনা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত। তাছাড়া যেসব উৎসকে দলটি প্রতিষ্ঠিত করবে সেগুলোকে তার নিজের জন্য উসুল হিসেবে গ্রহণ করবে এবং অন্যদের এ ব্যাপারে বাধ্য করবে না। বরং তারা অন্যদের সাথে প্রমাণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে তাদের কাছে চূড়ান্ত বলে বিবেচিত মতামত নিয়ে আলোচনা করবে। যদি দলটি নিজেদের উৎসকে অন্যদের জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে, তাহলে সেটি তাদের এবং অন্যদের সমস্যার কারণ হবে।

## শরী'য়াহ বুঝার নিয়মসমূহ

দলটি শরী'য়াহ'র উৎস সুনির্দিষ্ট করবার পর কীভাবে এসব উৎস থেকে শরী'য়াহ গ্রহণ ও এগুলোকে ব্যবহার করবে তা উপলব্ধি করবে। অন্য কথায়, এটি এমন নীতিমালা (কাওয়া'ইদ) বুঝার দিকে মনোনিবেশ করবে যেগুলোর মাধ্যমে একজন উৎস থেকে আহকাম বের করে নিয়ে আসতে পারে। এটা নিঃসন্দেহাতীত যে, যখন একজন ইসলামী চিন্তাবিদ একটি শরী'য়া হুকুম বের করবার জন্য মনস্থির করে তখন তার মনে উসুলের নীতিমালাসমূহ থাকে যেগুলোর ভিত্তিতে সে একটি হুকুম প্রণয়ন করে। এমন কোন জ্ঞান নেই যার কোন মূলনীতি নেই, হতে পারে সেটি লিখিত অথবা অলিখিত।

শরীয়া যে কোন বর্ণণা হতে পারে আম বা সার্বজনীন, খাস বা সুনির্দিষ্ট, মুজমাল বা সংক্ষিপ্ত, মুফাসসাল বা বিস্তৃত, মুতলাক বা চূড়ান্ত, মুক্বায়েদ বা সীমিত, আওয়ামীর বা নির্দেশ, নাওয়াহী বা নিষেধাঞ্চা, মাফহুম আল মুয়াফাক্বাহ বা সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ, মাফহুম আল মুখালাফাহ বা বিপরীতার্থক অর্থ, মানতুক বা প্রকাশিত অর্থ, মাফহুম বা অপ্রকাশিত অর্থ, বর্ণিত বিষয়ের মা'কুল বা যুক্তি, খবর আল ওয়াহিদ বা একক বর্ণণা এবং কখন তা দলিল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে আর কখন যাবে না ও এরকম অনেককিছু। দলটি তার আইনগত মূলনীতিকে চূড়ান্ত করবে, গ্রহণ করবে এবং অন্যদের কাছে উপস্থাপন করবে।

উল্লেখিত উসুলের মূলনীতিসমূহের অধিকাংশই বিতর্কিত। এটা সর্বজনবিদিত যে, প্রতিটি মূলনীতির আবার অনেক শাখা প্রশাখা রয়েছে। যেহেতু এগুলো বিতর্কিত সেহেতু এগুলোকে বিতর্কিত অবস্থা থেকে দূরে রাখতে হবে। দলটি যা সঠিক মনে করে এর ভিত্তিতেই এগুলো করতে হবে। উসুলের মূলনীতি বুঝবার পর শাখাসমূহ মূলনীতি অনুসারে উপলব্ধি করা যায়।

উসুল ও এর মূলনীতি সর্ম্পকে জানবার পর দলটি শরীয়াকে এর উৎস থেকে বুঝবার মত সক্ষমতা অর্জন করবে। এর পর ইজতিহাদের পরিচিত পদ্ধতি ব্যতিরেকে আর কিছু গ্রহণের কোন সুযোগ দলটির নেই। এটিই দলটিকে অন্যদের থেকে আলাদা করবে। আর এটাকে দলটি তার শাবাবদের বিকশিত (culturing) করবার মাধ্যমে লোকদের কাছে নিয়ে যাবে। আর এটিই প্রথম জিনিস যার উপর দলটি প্রতিষ্ঠিত হবে।

অবশ্যই একজন মুজতাহিদের কাজ অনেকটা ডাক্তারের মত। প্রথমে তাকে রোগীর হাল-তবিয়ত সর্ম্পকে জানতে হবে এবং তার অবস্থা বর্ণণা করতে হবে। অতপর তিনি রোগীর ভাষ্য অনুসারে মৌলিক অসুস্থতা নির্ণয় করবেন এবং এক্ষেত্রে অন্যান্য উপসর্গ দ্বারা বিভ্রান্ত হবেন না। অতপর তার শিক্ষা অর্জনের সময়কার জ্ঞানের শরণাপন্ন হবেন এবং এমন বইপত্রের দ্বারস্থ হবেন যেগুলো তাকে সমাধান বের করবার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে। এরপরই তিনি সমাধান তথা ঔষধ দিবেন। অন্য কথায়, তিনি বর্ণিত বিষয়ের সাহায্য নিয়ে সমাধানটি বিধৃত করবেন।

যদি কোন দল পরিবর্তন চায় এবং এটি ইসলামী হয় তাহলে অবশ্যই তারা ইসলামের ভিত্তিতে পরিবর্তনের জন্য কাজ করবে। পরিবর্তন অবশ্যই শরীয়া দলিলের ভিত্তিতে হতে হবে এবং কোন ব্যক্তিগত খেয়ালখুশী, মতামত, যৌক্তিকভাবে প্রাপ্ত সুবিধাদি, বাস্তবতা বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নয়। বরং একমাত্র শরী'য়াহই হবে যা দলের জন্য হুকুম শরীয়াহকে নিয়ন্ত্রন করবে। মুসলিমদের স্বার্থ শরী'আহ দ্বারা সংজ্ঞায়িত; কারণ শরীয়াহ একে সংজ্ঞায়িত করেছে। একারণে মাসলাহাহ বা স্বার্থের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

## আল মাসলাহাহ (জনস্বার্থ)

মাসলাহাহ মানে হল কোন উপযোগিতা অর্জন করা বা ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকা। এটা মনের ভিত্তিতে হতে পারে আবার শরী'আহ দ্বারা ঠিক করা হতে পারে। যদি মানুষের মনকে এ ব্যাপারে দায়িত্ব দেয়া হয় তাহলে মানুষের পক্ষে সত্যিকারের উপযোগিতা খুজে বের করা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে যাবে। কারণ আমাদের মন সীমিত। মানুষের মন তার সব প্রয়োজন ও বাস্তবতাকে ধারণ করতে পারে না। সেকারণে সে তার জন্য সঠিক উপযোগিতা নির্ধারণ করতে সক্ষম নয় যেহেতু কোন একটি জিনিস উপকারী না ক্ষতিকর এ বিষয়ের বাস্তবতাকে মানুষ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। স্রষ্টা ব্যতিত আর কেউ মানুষের বাস্তবতা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখে না। কোনটা কীভাবে হলে মানুষের স্বার্থ রক্ষিত হবে তা মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ সুবহনাহানাহুতায়ালা ব্যতিত আর কেউ নির্ধারণ করতে পারে না। মানুষ হয়ত কোন একটি জিনিসকে তার জন্য উপকারী বা ক্ষতিকর মনে করতে পারে কিন্তু এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত জ্ঞানলাভ করতে পারবে না। সেকারণে অনুমাননির্ভরতার উপর ভিত্তি করে কোনটি উপকারী-এ ব্যাপারে মনের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া হলে তা বিপজ্জনক এবং মানুষের জন্য তা ধ্বংস নিয়ে আসে। কোন কিছুকে হয়ত সে ক্ষতিকারক ভাবতে পারে কিন্তু পরে এটি তার জন্য উপকারী প্রমান হতে পারে। সেক্ষেত্রে সে একটি ভাল জিনিসকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখল। আবার কোন কিছুকে হয়ত সে ভাল ভাবতে পারে এবং পরে এটি ক্ষতিকারক

বলে আবির্ভূত হতে পারে এবং এভাবে সে নিজের জন্য ক্ষতি বয়ে নিয়ে আসে। আজকে মন যে জিনিসটাকে ক্ষতিকারক ভাবে আগামীদিন সেটিকেই উপকারী বলে রায় দিতে পারে। অনুরূপে, আজকে যে জিনিসকে ক্ষতিকারক মনে হচ্ছে গতকাল হয়ত সেটি উপকারী ভাবা হয়েছিল। এ ধরনের পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত দেয়া ঠিক নয়। আর ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থায় এ ধরনের পরিস্থিতি একটি স্বাভাবিক বিষয়। আইন প্রণেতা হিসেবে মানুষ তার নিজের জন্য ভাল কিছু করার চেষ্টা করে। সে কারণে আমরা দেখি সমস্যার সমাধানকল্পে ব্যবস্থার ক্রমাগত উন্নয়ন সাধনের জন্য পরিবর্তন ও সংশোধন হতেই থাকে। কারণ হল বাস্তবে তারা কোন জিনিস বা কাজের ক্ষেত্রে এমন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না যা চূড়ান্ত ও সঠিক । সে কারণে যাদের ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও স্থির তাদেরকে তারা এর জন্য দোষারোপ করে। কাফেরদের এ প্রবণতা দ্বারা আমরা মুসলিমদের আক্রান্ত হতে দেখি। নিজেদের এবং দ্বীনের ব্যাপারে তখন তারা আত্মরক্ষামূলক হয়ে উঠে এবং ইসলামের প্রকৃতির ব্যাপারে তাদের চিন্তা সঠিক উপলব্ধি থেকে অনেক দূরবর্তী হবার কারণে তারা ইসলামের শত্রুদের চিন্তার প্রক্রিয়াকে ধারণ করে ক্রমান্বয়ে তাদের নিকটবর্তী হতে থাকে।

স্রষ্টাই একমাত্র সত্তা যিনি মানুষের বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনতে পারেন এবং জৈবিক চাহিদা ও প্রবৃত্তি থেকে উদ্ভুত সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারেন এবং সঙ্গতভাবে এগুলো মেটাবার ব্যবস্থাপনা প্রদান করতে পারেন। যেহেতু মানুষের এসব বাস্তবতা সুনির্দিষ্ট এবং সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় না সেহেতু সমাধানও অপরিবর্তনীয় ও সুনির্দিষ্ট। একজন পুরুষ মানুষকে স্বাভাবিক প্রবণতার কারণেই একজন নারীর দ্বারস্থ হতে হয়। যেহেতু মানব মানবীর অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তাগুলো পরিবর্তনশীল নয় সেহেতু তাদের মধ্যকার সর্ম্পকও অপরিবর্তনীয়। এটা কখনওই গ্রহণযোগ্য হবে না যদি আমরা মানব মানবীর সর্ম্পকের ক্ষেত্রে একটি ব্যবস্থাপনা প্রদান করি এবং একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার পর উন্নয়নের সাথে সাথে তাদের বাস্তবতা পরিবর্তিত না হওয়া সত্তেও সে ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন করি।

যেমন, মদের বাস্তবতা একই রকম আছে এবং এতে কোন পরিবর্তন হয়নি। তাহলে এ ব্যাপারে হুকুম পরিবর্তন করা হবে কেন?
জুয়া খেলার বাস্তবতাও একই রকম ও অপরিবর্তনীয় আছে। তাহলে এ ব্যাপারে হুকুম পরিবর্তন করার কারণ কি? এ ধরনের আরও অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

সেকারণে 'ক্রমউন্নয়ন', 'উদারতা' এবং 'আধুনিকতা'-এগুলো হল মানবরচিত ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য-যা সত্যের দিকে ধাবিত করে না। তারা একটি পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে ক্রমাগত যেতে থাকে-যা একটি সঠিক ব্যবস্থার দিকে মানুষ নিজেকে পরিচালিত করবার যে ব্যর্থতা বা অক্ষমতা তাকেই প্রকাশ করে। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া একটি নিশ্চিত অক্ষমতা হওয়া সত্তেও তারা একে ক্রমবিবর্তন বলে অভিহিত করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ঐ মূলনীতিটি প্রত্যাখ্যান করা উচিত যা মানুষ শরীয়া থেকে উদ্ভুত বলে দাবী করে, যাতে বলা হয় "সময় এবং স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে হুকুমেরও পরিবর্তন ঘটবে"। এ মূলনীতিটি অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

সুতরাং কোন একটি বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হুকুম একটিই এবং তা একাধিক হতে পারে না। যদি এর বাস্তবতা পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে বাস্তবতার পরিবর্তনের সাথে সাথে ঐ হুকুমও পরিবর্তিত হয়ে যায়। সেকারণে আঙ্গুর অনুমোদিত, কিন্তু যখন স্বীয় বাস্তবতা পরিবর্তিত হয়ে তা মদে রূপান্তরিত হয়, তখন এ সম্পর্কিত হুকুম পরিবর্তিত হয়ে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আবার যখন অ্যালকোহল ভিনেগারে রূপান্তরিত হয়, তখন তা অন্য একটি হুকুমে পরিবর্তিত হয়- অর্থাৎ অনুমোদিত হয়। সুতরাং এখানে সময় বা স্থানের কোন বিবেচনা নেই। এরকম কিছু নেই যা এক জায়গায় অনুমোদিত এবং অন্য জায়গায় নিষিদ্ধ অথবা উল্টো করে বললে কোন জায়গার নিষিদ্ধ কিছু অন্য এক জায়গায় অনুমোদিত হতে পারে না। শরীয়া হুকুমের উপর সময় ও স্থানের কোন প্রভাব নেই।

অতীতে যে ঘটনাগুলো ঘটে গেছে, বর্তমানে যে সমস্যাসমূহ দেখা দিচ্ছে বা ভবিষ্যতে যে সমস্যাগুলো হতে পারে ইসলামী শরী'আহ-এর মধ্যে তার সবগুলোর সমাধানই রয়েছে । এমন কোন ঘটনা ঘটতে পারে না বা সমস্যা হতে পারে না-যে বিষয়ে শরী'আহ'র কোন হুকুম নেই। ইসলামী শরী'আহ মানুষের সব কাজকে পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিকভাবে বেষ্টন করে। এ সর্ম্পকে তিনি ( সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

'আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যাতে রয়েছে প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা' (সূরা নাহল: ৮৯)

সুতরাং শরী'আহ একটি বিষয় বা কাজের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে দলিলাদি দিয়েছে অথবা এ বিষয়ে আইনের জন্য ইল- াহ বা ঐশী কারণ বিধৃত করেছে। এ ইল- াহ শরীয়াগত এবং কখনওই ইল- াহ আকলিয়া বা প্রবৃত্তিপ্রসূত নয়। এখানে আমাদের শরীয় ক্বিয়াস এবং আকলিয়াগত ক্বিয়াসের মধ্যে পার্থক্য উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

# ক্বিয়াস আক্বলী (যুক্তির ভিত্তিতে ক্বিয়াস নির্ধারণ)

**আক্বল** সাদৃশ্যতাপূর্ণ ও তুলনীয় বস্তু সর্ম্পর্কে একই ধরনের নিয়ম প্রদান করে। সেকারণে এমন দু'টি বিষয়ের মধ্যে স্বরূপতা আনা হয় যেগুলোর মধ্যে সাদৃশ্যতা রয়েছে। এবং **আক্বল** ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন হুকুম প্রদান করে।

এ অবস্থা ক্বিয়াস শরী'আহ এর সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ শরী'আহ একই ধরনের বিষয়ে ভিন্ন ধরনের হুকুম প্রদান করেছে এবং ভিন্ন ধরনের বিষয়ে একই হুকুম প্রদান করেছে। শরী'আহ একই বিষয়কে দু'ভাবে দেখেছে, যেমন:দু'টি ভিন্ন সময়কে। লাইলাতুল ক্বদরকে অন্যান্য রাতের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। একই ধরনের স্থানকে ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করেছে, মক্কাকে মদীনার উপর এবং মদীনাকে অন্যান্য স্থানের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সালাতের ক্ষেত্রে চার রাকাআত এর নামাজ ও তিন রাকাআতের মধ্যে পার্থক্য করেছে - শরী'আহ চার রাকআতকে ছোট করে দুই রাকআত করবার অনুমতি দিলেও তিন বা দুই রাকআতকে সংক্ষিপ্ত করবার অনুমতি দেয়নি। **আক্বল** এ ধরনের তুলনা করতে সক্ষম নয়। বীর্য স্খলনের ক্ষেত্রে শরী'আহ গোসলের বিধান দিয়েছে যদিও এটা পবিত্র। অন্যদিকে মাজিহ বা বীর্য স্খলনপূর্ব তরল অপবিত্র হওয়া সত্তেও এর নিঃসরণের পর ওযুর বিধান প্রদান করেছে-যদিও বীর্য ও মাজিহ একই স্থান হতে নিঃসৃত হয়। তালাকপ্রাপ্ত নারীদের জন্য ইদ্দত বা অপেক্ষমান সময় তিন মাসিক চক্র করেছে, অন্যদিকে বিধবা নারীর জন্য তা চারমাস দশদিন-যদিও এক্ষেত্রে জরায়ুর অবস্থা একই থাকে। পরিষ্কারের দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা পানি ও ধুলাকে একই মর্যাদা প্রদান করেছে-যদিও পানি ধুলা পরিষ্কার করে। এটা ব্যভিচার, ধর্মত্যাগ ও হত্যার বদলে মৃত্যুদন্ড দিয়েছে যদিও তিনটি ভিন্ন ধরনের অপরাধ।

এছাড়াও শরী'আহ এমন সব বিষয়ে হুকুম প্রদান করেছে যে বিষয়ে **আক্বলের ভিত্তিতে** কিছু বলার নেই। যেমন: এটা স্বর্ণের দ্বারা স্বর্ণ বিক্রিকে নিষিদ্ধ করেছে, যদি সমভাবে অথবা বাকীতে না হয়। এটা ছেলেদের স্বর্ণ পরিধান করতে নিষেধ করেছে, কিন্তু মেয়েদের অনুমতি দিয়েছে। একই কথা রেশমী কাপড়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এটা সুদকে হারাম করেছে এবং ব্যবসাকে করেছে হালাল। এটা অসিয়তের সাক্ষী হিসেবে কাফেরদের অনুমোদন দিয়েছে কিন্তু আবার প্রত্যাহারকৃত তালাকের ক্ষেত্রে এ শর্ত জুড়ে দিয়েছে যে সাক্ষী হতে হবে মুসলিম।

এ কারণে আলী (রা) বলেছেন, 'যদি দ্বীন কোন ব্যক্তির মতামতের ভিত্তিতে করা হত, তাহলে মাসহ করবার ক্ষেত্রে পায়ের উপরের চেয়ে নীচের অংশটিই বেশী পছন্দনীয় ছিল।'

সুতরাং যে দলটি ইসলামিক জীবনধারা ফিরিয়ে নিয়ে আসবার জন্য কাজ করছে তাদের অবশ্যই এই মূলনীতিগুলোকে বুঝতে হবে। দলটি কীভাবে বাস্তবতা অনুধাবন করবে এবং তা তুলে ধরবে-এটা অবশ্যই দলটি বিকাশ প্রক্রিয়ার মধ্যে উপস্থাপন করবে যাতে সদস্যগন বুঝতে পারে। এটা অবশ্যই শরীয়া উৎস ও উসুলী মূলনীতিগুলোকে সংজ্ঞায়িত করবে এবং গ্রহণ করবে ও শাবাবদের এর ভিত্তিতে বিকশিত করবে। কারণ এসব মূলনীতির উপর ভিত্তি করে তাদের মনস্তত্বকে গঠন করতে হবে। এটা বিকাশ প্রক্রিয়ারও অংশ হবে। একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও উসুলী বিকাশ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা অপরিহার্য- যা ওহীর বিশুদ্ধতা ও চিন্তার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে এবং এমন বাহুল্যতাকে দূরীভূত করবে যা ওহীকে অস্পষ্ট করে তোলে, যেমন: এরকম মূলনীতি, 'এটা পরিত্যাজ্য নয় যে, সময় ও পাত্রভেদে হুকুম পরিবর্তন হয়' এবং এর সার্বিক অর্থ যা দাঁড়ায় তা হলো 'প্রয়োজন হারামকে জায়েয করে' এবং 'দ্বীন উদার ও বিবর্তনযোগ্য' কিংবা 'যেখানে সুবিধা পরিলক্ষিত হয় সেটাই হলো আল্লাহর বিধান।'

কাজের সাথে সর্ম্পকযুক্ত শরীয়া হুকুম গ্রহণ ও পালন, এগুলোকে নির্দেশনা ও আলোকিত চিন্তা হিসেবে গ্রহণের পূর্বে অবশ্যই দলটি তার নিজস্ব উসুলের মধ্যে এগুলোকে গ্রহণ করবে-যা এর দৃষ্টিভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রন করবে ও শরী'আহকে হৃদয়ঙ্গম করতে সহায়তা করবে এবং সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সুনিশ্চিত করবে।

একটি ইস্যুতে একাধিক ইজতিহাদ থাকতে পারে। বিতর্কিত ইস্যুগুলো থেকে দলিলের বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে দলটি তার জন্য শরীয় হুকুম গ্রহণ করবে এবং এগুলোর সাথে স্থির থাকবে। এরপর দলটি তার উসুলী মূলনীতি ও ফুরু বা শাখা সম্বন্ধীয় মূলনীতি ঘোষণা করবে। এর মাধ্যমে শাবাবদের বিকশিত করবে, জীবনকে এগিয়ে নিবে এবং এটা ব্যবহার করে আলোচনা করবে। নিজে গ্রহণ করেছে বিধায় এটি দলিল ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে অন্যদের তা গ্রহণের জন্য হৃদয় জয় করবে। বিকাশ প্রক্রিয়া অনুসারে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করবে; অন্যথায় সে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে এবং পথিমধ্যে দিক হারিয়ে ফেলবে।

সমাজ পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় শরীয়া হুকুম জানার আগে এ বিষয়ে শরীয়ার উৎস ও উসুল অধ্যয়ন করতে হবে । দলটি তার কাজ পরিচালনার সময় অনেক দূর্ভোগ ও জটিলতার সম্মুখীন হবে। যদি এটা শক্তিশালী দলিলের ভিত্তিতে নিষ্ঠার সাথে কোন উসুল গ্রহণ না করে, তাহলে এটি দোদুল্যমান হবে এবং গৃহীত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ক্রমাগত পরিবর্তনের ভেতর

দিয়ে যাবে। তারা বর্তমান দূষিত শাসনব্যবস্থার ভেতরে গিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে-যা কিনা ছিল দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা ও প্রতিবন্ধক। যখন তারা গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে তখন বর্তমান ব্যবস্থার সাথে ইসলামী শুরা ব্যবস্থার সাদৃশ্যতা খুজে পায়। 'পূর্ববর্তী নবীদের শরী'আহ তাদের জন্যও শরী'আহ'-এ যুক্তিতে তারা পূর্ববর্তী নবীদের শরী'আহ থেকে গ্রহণ করে বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করে। সঠিক শরীয়া পদ্ধতি অনুসরণ না করবার কারণে এভাবে ক্রমাগত পরিবর্তনের মত জটিলতায় উপনীত হয়। অথবা দলটি এমনও দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহন করতে পারে যে, বিভিন্ন সংস্থা গঠন করে তারা বাস্তবতা পরিবর্তনের সুযোগ পাবে, ফলে পদ্ধতির বদলে উপায়ের চিন্তায় তাদের মন আচ্ছন্ন থাকে। অথবা এমনকি তারা শরীয়া পদ্ধতির অনুসরণ না করে অস্ত্রধারণ করতে পারে; কারণ বাস্তবতা তাদের সেদিকে ধাবিত করে।

সুতরাং উসুল ও উৎস গ্রহণ, এবং ইজতিহাদের নির্ধারিত পদ্ধতির অনুসরণের মাধ্যমে দলটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাঙ্খিত পথে অটল থাকবে এবং বাস্তবতা, পরিস্থিতি কিংবা স্বার্থ যেদিকে উদ্দীপিত করে সেদিকে ধাবিত হবে না।

এভাবে দলটি আইনগত চিন্তার পদ্ধতিকে সংজ্ঞায়িত করবার পর এর কাজের পদ্ধতিকে সংজ্ঞায়িত করবে। অন্যথায় এটি বহুপথে বিচ্যুত হয়ে যাবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়ে ধ্বংস ডেকে আনে আল্লাহসুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের প্রতি সুদৃষ্টি দেন না।

দলটি এর বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের উৎসকে সুনির্দিষ্ট করবার পর এইসব উৎস ও গৃহীত উসুলের ভিত্তিতে বিকাশের চিন্তাগুলোকে সংজ্ঞায়িত করবে।

উৎস ও উসুল অধ্যয়নের ক্ষেত্রে দলটি অবশ্যই সুনিশ্চিত করবে যে, শরী'আহ উপলব্ধির ক্ষেত্রে দলটি অবিশুদ্ধ চিন্তা ও অন্য চিন্তার সাথে গুলিয়ে ফেলার মত ভুল থেকে মুক্ত। ওহীকে অবিশুদ্ধ করে এমন সব কিছুকে দূরীভূত করবার জন্য এটা প্রচেষ্টা চালাবে এবং শরী'আহ বোঝার ক্ষেএে খেয়াল খুশীর অনুগামী না হবার জোর প্রচেষ্টা চালাবে এবং মনকে বিধি বিধান নিয়ন্ত্রনের কোন অনুমতি দিবে না। উসুল এবং উৎস অধ্যয়ন ছাড়া দলীয় বিকাশের চিন্তাগুলোর চর্চা সম্ভব নয়।

এরপর দলটিকে ফিরতে হবে ও অনুশীলন করতে হবে সেই বাস্তবতার প্রতি যেখানে উম্মাহ বসবাস করে, যা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এইভাবে এটা বর্তমান চিন্তা, আবেগ, ও ব্যবস্থা নিয়ে অধ্যয়ন করবে, যাতে বুঝতে পারে, এ সমস্ত চিন্তা ও ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগনের গ্রহনযোগ্যতা ও প্রতিক্রিয়া কতটুকু। উম্মাহ কুফর চিন্তা দ্বারা আকর্ষিত, যেগুলোকে কাফেররা উম্মাহর স্বাস্থ্যের পূনরুদ্ধারের শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছে। রাজনৈতিকভাবে উম্মাহ পুতুল শাসক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যাদেরকে উপনিবেশবাদীরা মুসলিমদের উপর চাপিয়েছে, যাতে করে উম্মাহর সম্পদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করা যায় এবং যে কোন আন্তরিক কর্মকান্ড যা তাদের উপনিবেশবাদীতাকে হুমকির মুখে ফেলবে তার প্রতিহত করা যায়। অধ্যবধি পশ্চিমা কাফির উপনিবেশবাদীরা সচেতন যে কোন সামষ্টিক আন্দোলনের ব্যপারে যা তাদের অস্তিত্বকে হুমকির মুখোমুখি করবে, তাই সে জনগনের মধ্যে সামষ্ঠিক বা দলীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে দূরে রাখার চিন্তা ছড়ায়। পরিবর্তে সে উৎসাহ প্রদান করে সমিতি মূলক কর্মকান্ডে যা চাক্রিক সমস্যার সমাধান দেয় যেমন দারিদ্র নিরসন ও মন্দ নৈতিকতা।

পশ্চিমা কাফিররা মুসলিমদের তাদের দীনই মানুষের সমস্যার একমাত্র সমাধান সেসম্পর্কে আত্মবিশ্বাসকেও সন্দিহান করে তুলেছে, যখন তারা (পশ্চিমা কাফিররা) আকীদাকে (মুসলিমদের) জীবন থেকে পৃথক করেছে, এই পৃথকীকরন তাদের উপর বল প্রয়োগ করে চাপিয়ে দিয়েছে এবং তাদেরকে এ ব্যবস্থা বিলুপ্ত করার ক্ষেত্রেও বাধা দিচ্ছে।

এজন্যই দলটি গভীর ও সুনির্দিষ্ট সুস্পষ্ট উপায়ে বিরাজমান বাস্তবতা, চিন্তা, আবেগ এবং ব্যবস্থাসমূহ অধ্যয়নে বাধ্য। এটা এই কারনে যে, যে ভূমির উপর সে দাড়িয়ে আছে সেই ভূমিটির প্রকৃতি, কেমন করে এর উপর সে হাটবে ,বাধা দূর করার ক্ষেত্রে কি কি হাতিয়ার প্রয়োজন, আর উর্বরতার জন্য কি কি জিনিস দরকার অথবা উর্বরতা ফিরিয়ে আনার জন্য কোন উপাদান প্রয়োজন, তা উপলব্ধি করার জন্য। তাই অবশ্যই প্রথমে একজনকে বাস্তবতা বুঝতে হবে। এটা দলটির সংস্কৃতির (culture) গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে, কারন এটা দলটির নিকট পরিস্কার থাকতে হবে এবং এটা অবশ্যই শাবাব এবং জনগনের নিকট পরিস্কার থাকতে হবে যাতে তারা এ প্রসঙ্গে অজ্ঞ না থাকে, এবং তারা এরপরে এর সমাধানের সঠিকতা ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে।

যে বাস্তবতায় উম্মাহ রয়েছে তার বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনেতিক এবরং সামাজিক বাস্তবতা অনুধাবনের পর, দলটিকে পূর্বেলি- খিত উৎস ও উসুল অনুসরন করে চিন্তা, মতামত এবং শরীয়া বিধানের দিকে অগ্রসর হতে হবে। যে পদ্ধতিতে দলটি এ চিন্তা, মতামত ও শরীয়া বিধানে (method) পৌছেছে তা শাবাব এবং জনগনের কাছে পরিস্কার থাকতে হবে। কারণ এটাই দলটির শাবাবদের মধ্যে দৃঢ়বিশ্বাস, সচেতন মনোভাব এবং ইসলামী ব্যক্তিত্ব তৈরী করবে গভীরভাবে, যা সাধারনভাবে উম্মাহর মাঝেও তৈরী হবে।

# ৭

# দলের বিকাশ প্রক্রিয়া (culture)

উম্মাহর দরকার হচ্ছে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তনের, আর পরিবর্তনের জন্য আবশ্যক হল ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোনো রাজনৈতিক কাঠোমোর মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। সুতরাং কাঠামোটির সঠিক বৈশিষ্ট্য ও গাঠনিক উপাদানগুলোর বিষয়ে এবং পূর্ববর্তী কাঠামোগুলোর সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা অপরিহার্য, যাতে সেসবের ব্যর্থতার কারণ বুঝা সম্ভব হয় এবং তা এড়িয়ে চলা যায়। এজন্য কাঠামোগত দিকটি পর্যবেক্ষন করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই দিকটি কায়দা বা ধরনের (style) অন্তর্গত একটি বিষয়। কায়দা বা ধরনের বিষয়টি মূলত মুসলিমদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যাতে কাজের যথার্থতা ও উপযুক্ততা অনুযায়ী তারা তা নির্ধারণ করে। এই বিষয়টি দলীয় কৃষ্টির বা সংস্কৃতির একটি অংশ।

- যে সমাজে মুসলিমরা বাস করে তাতে যেহেতু বিভিন্ন চিন্তা, আবেগ ও ব্যবস্থার মিশ্রণ রয়েছে সেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজ; এর বাস্তবতা, উপাদান, এতে প্রভাব সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহ এবং একে পরিবর্তন করার উপায় নিয়ে কথা বলতে হবে যাতে চিন্তা, আবেগ ও ব্যবস্থার দিক দিয়ে সুসংহত ইসলামী সমাজ নির্মাণ করা যায়।

- যেহেতু ব্যক্তির বাস্তবতা থেকে সমাজের বাস্তবতা ভিন্ন, সেহেতু ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত গাঠনিক বিষয়াদি সমাজের গাঠনিক বিষয়াদি থেকে ভিন্ন। অতএব ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত শর'ঈ হুকুম সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত শর'ঈ হুকুম থেকে ভিন্ন।

- যেহেতু সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে দলটির কর্মকাণ্ড জড়িত সেহেতু এই বাস্তবতায় কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় চিন্তা ও শরঈ হুকুম দলটিকে  বিস্তারিতভাবে গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি এ কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত হুকুমসমূহকে গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে সে ব্যক্তিসাধারণ এবং জনগণকে নির্দেশনা দিবে। গ্রহণকৃত এসব হুকুম তার জন্য সামষ্টিক দায়িত্ব হতে পারে যেগুলোর অবজ্ঞা করার কোনো অজুহাত তার নেই অথবা এগুলো তার ব্যক্তিগত দায়িত্বও হতে পারে, যেগুলোর আনুগত্য করতে দল তাকে আহ্বান করছে যেমন: লেনদেন, ইবাদত এবং নৈতিকতা যেগুলো ইসলামী আক্বীদাহ থেকে উৎসারিত এবং তার দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা।

- মুসলিমদের চিন্তার ব্যবহার যেহেতু বর্তমানে পাশ্চাত্য দ্বারা প্রভাবিত এবং চিন্তার সাহায্যেই তারা স্বার্থ নির্ধারণ করছে সেহেতু রাসূল (সা)-এর সর্বোত্তম অনুসরণ এবং শরীয়াহ'র সবচেয়ে সঠিক আনুগত্যের জন্য চিন্তা ও এর উপাদান নিয়ে আমাদেরকে চিন্তাভাবনা করতে হবে যাতে আক্বীদাহ, শরঈ আহকাম অথবা বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা করার ক্ষেত্রে চিন্তা ব্যবহারের সীমা কতটুকু এবং কীভাবে তা ব্যবহার করতে হবে সেটি আমরা জানতে পারি।

- যেহেতু আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয়াদি দিয়ে শাসন এবং দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বিষয়টি সম্পর্কিত সেহেতু মক্কায় রাসূল (সা) কীভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং কোন কোন কর্মকাণ্ডের ফলে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সম্পর্কিত জ্ঞান আমাদেরকে অর্জন করতে হবে। এ জ্ঞান অর্জনের পর আমাদের অবশ্যই তা দ্বারা পরিচলিত হতে হবে। রাসূল (সা)-এর কর্মকাণ্ডকে যথার্থরূপে অনুসরণের জন্য পদ্ধতি সংক্রান্ত হুকুম এবং ধরন ও উপকরণ সম্পর্কিত হুকুমের পার্থক্য আমাদেরকে ভালোভাবে বুঝতে হবে।

- যেহেতু দলের  কাজ হচ্ছে আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয়াদি দিয়ে পরিচালিত হয় এমন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং বিদ্যমান শাসনব্যবস্থাকে পরিবর্তন করা, সেহেতু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শাসকদের কর্মকাণ্ডকে, শাসকদের বাস্তবতাকে এবং শাসকদের সাথে তাদের মিত্রদের সম্পর্কের প্রকৃতিকে বোঝা আমাদের জন্য অপরিহার্য। শাসকদের কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণকারী পরাশক্তিসমূহের গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ এবং তাদের পরিকল্পনাগুলোকে জনসমক্ষে প্রকাশ করাটাও আমাদের জন্য জরুরী।

- যেহেতু মুসলিম ভূখণ্ডসমূহ পাশ্চাত্য ব্যবস্থা বিশেষত পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবস্থাসমূহ দ্বারা পরিচালিত সেজন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের মতাদর্শ, আক্বীদাহ এবং এগুলোর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা  চিন্তা ও ব্যবস্থা নিয়ে আমাদেরকে পর্যালোচনা করতে হবে।

- ইসলামের বাস্তবায়ন এবং একে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া যেহেতু শরীয়াহ'র উদ্দেশ্য সেহেতু শাসনব্যবস্থা, ইসলামী রাষ্ট্র, এর গঠনতন্ত্র ও প্রকৃতি, এর স্তম্ভসমূহ, সংবিধান এবং ইসলামী রাষ্ট্রে যেসব বিষয় বাস্তবায়িত হবে তার উপরে একটি সাধারণ ধারণা অর্জন করা অত্যাবশ্যক। আমাদেরকে বিদ্যমান শাসনব্যবস্থাসমূহের গঠনতন্ত্রও পরীক্ষা করতে হবে যাতে এগুলো থেকে নিজেদেরকে আমরা পৃথক করতে পারি এবং তা দ্বারা প্রভাবিত না হই। পাশাপাশি আমাদেরকে পরীক্ষা করা প্রয়োজন যার উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে আছে।

এভাবে দলটিকে এর বিকাশ প্রক্রিয়ার (culture) উপকরণসমূহ (topics) চিহ্নিত করবে এবং যাতে সেগুলো অনুযায়ী কাজ করা যায় এবং জনসাধারনকে এ কাজের প্রতি জরুরীভাবে আহবান করে ইসলামিক জীবনব্যবস্থা পুন:প্রচলন এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা যায়। খিলাফত রাষ্ট্র ইসলাম দিয়ে মুসলিম ও অমুসলিমদেরকে শাসন করবে এবং দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে এর বার্তা বিশ্বের নিকট পৌঁছে দিবে।

## আক্বীদাহ'র গুরুত্ব

যেহেতু ইসলামী আক্বীদাহ হচ্ছে দলটির কাজের প্রেরণা এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয়াদি দিয়ে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা এর উদ্দেশ্য সেহেতু দলটির জন্য বাধ্যতামূলক নিজের বিকাশক্রিয়া (culture) কে এমনভাবে গ্রহণ করা যার সঙ্গে আক্বীদাহ'র জোরোলো সম্পর্ক থাকবে। যার লক্ষ্য হবে দলের কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, উদ্বেগ, আন্তরিকতা, তীব্র ভালোবাসা, আগ্রহ এবং ত্যাগের মানসিকতা গড়ে তোলা। এটি মুসলিমদের মধ্যে চলার পথে দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতাও জাগিয়ে তুলবে । দাওয়াত বহনকারীকে এটি এমনভাবে গড়ে তুলবে যাতে সে লোকজনের প্রশংসার জন্য বসে থাকবে না বরং সে তার রব ও সেইদিনের ভয় করবে যেদিন দুশ্চিন্তায় মানুষের চেহারা বিমর্ষ হবে। রবের সন্তুষ্টি ও আখিরাতের পরম সুখ লাভের জন্য সে পার্থিব যন্ত্রণা গ্রহণ করতে এবং দুনিয়ার সুখ ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে প্রস্তুত থাকবে। বিকাশক্রিয়ার ভিত্তি হিসেবে আক্বীদাহ'কে গ্রহণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকজনের মধ্যে পরিবর্তন সূচিত করতে আক্বীদাহ'কে ব্যবহার করা এবং এক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে কৃত অত্যাচারের বিরুদ্ধে জন্মানো ঘৃণা, অবজ্ঞা থেকে মুক্তি অথবা পরিস্থিতিকে উন্নত করার মানসিকতাকে ব্যবহার না করা। বরং যে বিষয়টি মুসলিমদেরকে দাওয়াত দিতে এবং অন্যান্য মুসলিমদেরকে তা গ্রহণ করতে চালিত করবে তা হচ্ছে তাদের ঈমানের চিন্তা এবং এটাই ইসলামের প্রকৃত পথ।

উপরন্তু ঈমানের চিন্তাসমূহকে (পরিবর্তন সূচিত করার জন্য যা দলটি ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে) এবং দলের গ্রহণকৃত বিকাশক্রিয়াকে (culture) এমনভাবে পৌঁছে দিতে হবে যাতে উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভব হয়।

আক্বীদাহ'কে এমনভাবে পৌঁছাতে হবে যাতে তা এই উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হয়।

গ্রহণকৃত শরঈ হুকুমকে এমনভাবে পৌছাতে হবে যাতে এগুলোর উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়।

বাস্তবতা সম্পর্কিত জ্ঞান এমনভাবে পৌঁছাতে হবে যাতে উদ্দেশ্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে তা সহায়ক হয়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে দলের বিকাশ প্রক্রিয়াকে ইসলামী আক্বীদাহ'র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে। শরীআহ'র দলীলাদি দ্বারা এগুলো সমর্থিত হতে হবে এবং এমনভাবে পৌঁছাতে হবে এগুলোকে যাতে এরা শরঈ উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। আর তা (শরঈ উদ্দেশ্য) হল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাস্তবে আল্লাহর দাসত্বের অনুভূতি অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি প্রদান। আর দলের শাবাবদেরকে এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই গড়ে তুলতে হবে।

যেহেতু ইসলামী আক্বীদাহ'র দৃষ্টান্ত হচ্ছে শরীরের জন্য মাথাস্বরূপ এবং অঙ্গসমূহের মধ্যে হৃদপিণ্ডস্বরূপ ; যেহেতু এটি হচ্ছে সমস্ত বিষয়ের ভিত্তিস্বরূপ এবং এর উপরেই সবকিছু নির্ভরশীল সেহেতু একে এমনভাবে পৌঁছাতে হবে যাতে তা নিম্নোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে পারে:

- আল্লাহকে ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র সত্তা হিসেবে এবং বিধানের উৎস হিসেবে মেনে নিতে তা মানুষকে পরিচালিত করবে। তিনি বাদে অন্য কারো এই অধিকার নেই। তিনিই একমাত্র রব এবং একমাত্র খালিক (সৃষ্টিকর্তা)। তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞাত ও বিধানদাতা যিনি সমস্ত বিষয়কে পরিচালনা করেন। যেহেতু প্রকৃতিগতভাবে মানুষ নিজেকে দুর্বল, সীমাবদ্ধ, চাহিদাসম্পন্ন এবং নির্ভরশীল বলে অনুভব করে সেহেতু সে তাকে সঠিকপথে পরিচালিত করার জন্য এবং গভীর অন্ধকার থেকে

আলোতে নিয়ে আসার জন্য এই ইলাহের নিকট আত্মসমর্পণ করে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন এবং বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁকে (সা) মনোনীত করেছেন যিনি তাঁর রবের ইচ্ছানুযায়ী তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন। তিনি (সা) তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা কিছু আমাদেরকে পৌঁছে দেন তার আনুগত্য করতে আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি (সা) নিষ্পাপ, যার প্রতি আল্লাহ পুরো মানবজাতির জন্য একটি বার্তা হিসেবে কুরআন নাযিল করেছেন। এটি এসেছে অন্তরসমূহের জন্য পথনির্দেশনা, আলোকবর্তিকা, রহমত, তিরস্কার এবং নিরাময়কারী হিসেবে। যারা ঈমান আনে ও আনুগত্য করে তাদের জন্য তিনি (আল্লাহ) অনন্তসুখের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং যারা প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ (সা) যে বার্তা নিয়ে এসেছেন সে অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদাত করার জন্যই কেবল মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

- জীবনের পূর্বে কী ছিল- সেই বিষয়টি মুসলিমদের কাছে পরিষ্কার করতে হবে কারণ এর মাধ্যমে ইসলাম মানবজাতিকে একটি বন্ধনে আবদ্ধ করে- যা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা এবং সমস্ত বিষয়ের পরিচালনাকারী হিসেবে আল্লাহর উপরে ঈমান। জীবনের পরে কী আছে তার মাধ্যমেও তাকে ঈমানের বন্ধনে আবদ্ধ করে যা হচ্ছে বা'থ (পুনরুত্থান), নুশূর (একত্রিতকরণ), হিসাব, সাওয়াব এবং ইকাব (শাস্তি)। এ বিষয়গুলো এমনভাবে পৌঁছাতে হবে যাতে এগুলোর মধ্যকার সম্পর্কটি উপস্থাপিত হয়। এই বন্ধনকে যে ছিন্ন করে এবং আলাদা করে ফেলে তার মন্তব্য কোনো স্পষ্ট প্রমাণ বা তথ্যের উপরে ভিত্তিশীল থাকবেনা। বরং এগুলো হবে কুফরী মন্তব্য।

- একে এমনভাবে পৌঁছাতে হবে যাতে তা উম্মাহকে পুনর্জাগরিত করে এবং বিশ্বে ইসলাম ছড়িয়ে দিতে তাকে চালিত করে।

–সমসাময়িক কুফর চিন্তাসমূহের মোকাবেলায় এই চিন্তার যথার্থতা মুসলিমদের কাছে বুঝাতে হবে। পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদ, অথবা দেশাত্মবোধ থেকে জন্ম নেওয়া বর্তমান চিন্তাসমূহের ভ্রান্তি উন্মোচন করার মাধ্যমে এটি অর্জিত হবে। ইসলাম ও এসব চিন্তার মধ্যকার পার্থক্য বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে এটা সম্ভব হবে; ফলে আমরা দুটো বিষয় অর্জন করতে পারব: প্রথমত; এসব চিন্তা ও এগুলোর উপরে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকা অন্যসব চিন্তার খণ্ডন এবং দ্বিতীয়ত; এই বিষয়টিকে তুলে ধরা যে ইসলাম হচ্ছে পুরো মানবজাতির জন্য একমাত্র উপযুক্ত সমাধান (এর আক্বীদাহ ও ব্যবস্থার সার্বজনীন প্রকৃতির কারণে)। পরবর্তীতে সেই রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে আমরা ইসলামের সঠিকত্ব প্রমাণ করতে পারব যা ইসলামকে উপস্থাপন করবে। এক্ষেত্রে কাফেরদের বিভিন্ন শে- াগান, চমকপ্রদ প্রপাগাণ্ডা ও বিলবোর্ড এবং কাফের ঔপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক মুসলিমদের মনে স্থাপিত ভ্রান্ত দাবীসমূহকে দূর করার জন্য দলটি কাজ করবে। উদাহরণস্বরূপ কিছু শে- াগান তুলে ধরা হল: 'চিন্তা ও সংস্কৃতির স্বাধীনতা', 'সীজারের প্রাপ্য সীজারকে দাও এবং সৃষ্টিকর্তার প্রাপ্য সৃষ্টিকর্তাকে', 'আমাদের মাতৃভূমি সবসময় সত্যের উপরেই থাকে', 'নির্যাতনকারী হোক অথবা নির্যাতিত- নিজের ভাইকে সাহায্য কর' (প্রাক ইসলামী যুগের ধারণা অনুসারে) প্রভৃতি। মুসলিমদের মন ও জীবন থেকে পাশ্চাত্য চিন্তাসমূহের প্রভাবকে দূর করতে হবে। এজন্য 'শরীআহ'র উন্নয়ন', 'শরীআহ'র আধুনিকায়ন', 'যুগের চাহিদা পূরণে শরীআহ'র নমনীয়তা' (পাশ্চাত্যের ধারণা অনুযায়ী) এবং 'জীবন থেকে দ্বীনের পৃথকীকরণ', 'দ্বীনের মধ্যে কোনো রাজনীতি নেই,' 'এই বিষয়টি প্রত্যাখ্যাত নয় যে, সময় ও স্থানের সঙ্গে হুকুম পরিবর্তিত হয়' প্রভৃতি ধারণার ভিত্তিতে গড়ে উঠা চিন্তাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে উদ্দেশ্য অর্জন করতে হবে। এসমস্ত শে- াগান দূর করার পাশাপাশি দলটিকে বিকল্প চিন্তাভাবনা প্রোথিত করতে হবে যেগুলো 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল' এর ভিত্তিতে এবং এ থেকেই উৎসারিত।

শরীয়াহ থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল' এই কথাটি জ্ঞান ও কর্মের দিকে দিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত বিশুদ্ধ হবেনা যতক্ষণ না অন্যসব চিন্তাকে পরিত্যাগ করা হচ্ছে। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেন;

***"যারা গোমরাহকারী তাগুতদেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙ্গবার নয়।"* [আল-কুরআন ২:২৫৬]**

প্রথমে আল্লাহ তাগুতের সঙ্গে কুফর (অস্বীকার) করতে বললেন, যাতে কুফর বা শিরকের কোনো ছাপ অন্তরে না থাকে এবং তারপরে বিশুদ্ধ অবস্থায় অন্তরে ঈমান আসে যাতে তার অবস্থা এমন হয়- যে ব্যক্তি কোনো বিশ্বস্ত হাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছে। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেন:

*"জেনে রাখুন (হে মুহাম্মাদ), আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।"* **[আল-কুরআন: ৪৭:১৯]**

*'কোনো ইলাহ নেই'* এর অর্থ হচ্ছে জ্ঞানার্জন ও চিন্তাভাবনার মাধ্যমে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে ইলাহ কেবলমাত্র একজনই রয়েছেন যার একক আনুগত্য করতে হবে। এছাড়া তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) যখন বলেন:

*'আল্লাহ ছাড়া'* তখন এর মানে হচ্ছে ইলাহ হিসেবে একমাত্র আল্লাহকে মেনে নেওয়া। এটি এককভাবে আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মেনে নিতে এবং অন্য সবাইকে প্রত্যাখ্যান করতে বলে। আরবি ভাষায় এটি হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী ধরনের দৃঢ়তাসূচক বাক্য যাকে এখানে 'সীমিত করা' অর্থে বুঝানো হয়েছে। ফলে সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধের চিন্তা আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না অথবা এগুলো কোনো সঠিক চিন্তাও নয়। বরং এগুলো হচ্ছে নষ্ট ও ভ্রান্ত চিন্তা। এগুলো মানুষের শান্তি নিশ্চিত করতে পারে না বরং দুর্দশা বয়ে আনে। আল্লাহর দ্বীন ও শরীআ'হ ব্যতীত হিদায়াত, আলোকিত পথ ও নিরাময়কারী অন্যকিছু নেই।

দলের কর্মীদেরকে ইসলামী ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে সঠিক ইসলামী বৈশিষ্ট্য (criteria) শেখাতে হবে, শরীআহ'র আনুগত্যের প্রতি ভালোবাসা এবং এর সঙ্গে বিরোধপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ঘৃণা দ্বারা এদের অন্তরকে পূর্ণ করতে হবে এবং কোনো সিদ্ধান্তের জন্য এর দিকে ফিরে আসার প্রতি ভালোবাসা এবং অন্যকিছুর দিকে ফিরে যাওয়ার প্রতি ঘৃণা দ্বারা এদের অন্তরকে পূর্ণ করতে হবে। ফলে কোনো বিষয় বুঝার ক্ষেত্রে তারা যেন শরীয়াহ'র বৈশিষ্ট্য (criteria) ও চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাদের প্রবৃত্তিসমূহ ইসলামের অনুগামী হয়। ইসলাম যা পছন্দ করে তারা যেন তা পছন্দ করে এবং ইসলাম যা ঘৃণা করে তারা যেন তা ঘৃণা করে।

এই বিকাশক্রিয়ার (culture) দ্বারা শাবাবদেরকে গড়ে তোলার জন্য দলটিকে বিভিন্ন পাঠচক্র আয়োজন করতে হবে যাতে এর শাবাবরা নেতৃত্বের জন্য এবং বাস্তবিক ক্ষেত্রে দাওয়াতের জন্য প্রস্তুত হতে পারে যার ফলে লোকজন সেসব চিন্তাকে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হবে। দলটি চিন্তার সাহায্যে বাস্তবতাকে বুঝবে এবং শাবাবদের কাছে সেই বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করবে যার মাধ্যমে সে চিন্তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে। এটা তখন শাবাবদের জন্য পথনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে- কীভাবে বাস্তবতা নিয়ে ভাবতে হয় এবং কীভাবে বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক সংজ্ঞা যেগুলো বাস্তবতার ব্যাখ্যাদানকারী এবং মানাত যার উপরে শরঈ হুকুম প্রযোজ্য হবে সেগুলো নির্ধারণ করা যায়। দলটি যখন চিন্তা, প্রবৃত্তি, জৈবিক চাহিদা, পুনর্জাগরণ, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রভৃতি বিষয়কে সংজ্ঞায়িত করে তখন সে তা এজন্য করে যাতে সে এগুলোর বাস্তবতা বুঝতে পারে, কারণ এসব বিষয়ের সঙ্গে অনেক শরঈ হুকুম জড়িত।

শর'ঈ দলীল থেকে শর'ঈ হুকুম বের করার জন্য দলটি প্রচেষ্টা নিবে। বাস্তব সমস্যার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন বিষয় সে বের করবে এবং সেগুলোর সমাধান দিবে। এজন্য দলটিকে সেসব বিষয়ের প্রত্যেকটাই গ্রহণ করতে হবে যেগুলোর মাধ্যমে সে শর'ঈ গ্রন্থসমূহ বুঝতে এবং দলটি নিজের জন্য প্রয়োজনীয় আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার হুকুম বুঝতে সক্ষম হবে। ইসতিদলাল (হুকুম বের করা) এর পদ্ধতি স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে দলটিকে যাতে এর শাবাব ও মুসলিমগণ তা শিখতে পারে এবং শরীয়াহ'কে বোঝা ও আহকাম বের করার সঠিক ইসলামী পদ্ধতি তারা অনুধাবন করতে পারে।

গ্রহণকৃত বিকাশক্রিয়া (culture) শাবাবদের কাছে পৌঁছানোর জন্য দলটিকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে যাতে বিষয়টি যেন ব্যবহারিকভাবে বাস্তবায়িত হয়। কারণ নিছক জ্ঞানার্জন, তথ্যবহুল হওয়া অথবা শাবাবদেরকে প্রচণ্ড শিক্ষিত করে তোলা এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য নয়। বরং এসব চিন্তাভাবনার উদ্দেশ্য হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের সূচনা করা এবং উম্মাহর মধ্যে এসব চিন্তাকে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করা যাতে এগুলোকে উপস্থাপনকারী একটি কর্তৃপক্ষ সে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

এসব বিকাশক্রিয়াকে (culture) বিস্তারিত ও ব্যবহারিকভাবে যথার্থ উপায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দলটিকে চেষ্টা করতে হবে। কথা ও কাজের মধ্যে গরমিল করা যাবে না। কারণ দলটি যদি সত্যের শিক্ষা দেয় কিন্তু বিপরীত কাজ করে তাহলে তাতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার ক্রোধের উদ্রেক ঘটাবে।

গ্রহণকৃত বিকাশক্রিয়ার (culture) আলোকে শাবাবদেরকে গড়ে তুলতে হবে এবং এসব চিন্তা তাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দিতে হবে। ইসলামের মৌলিক চিন্তাসমূহ গ্রহণ করার পরে উম্মাহর মধ্যে এগুলোকে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে ওয়াঈ আম (সাধারণ সচেতনতা) এর ভিত্তিতে ফিকরাহ (চিন্তাভাবনা ও ধ্যানধারণা)-এর জন্য রায় আম (জনমত) গড়ে ওঠে। আক্বীদাহ'র

চিন্তাভাবনাসমূহ এবং উম্মাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত শর'ঈ হুকুমের মৌলিক নীতিমালাসমূহ এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে দলটিকে যাতে তা উম্মাহকে একটি লক্ষ্যের উপরে এক করে যা হচ্ছে আল্লাহর শরীআহ'র সার্বভৌমত্ব। এভাবেই উম্মাহ সঠিক পথে যাত্রা শুরু করবে এবং নিজের ব্যক্তিত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য পুনরায় অগ্রসর হবে যা সে অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছে।

এসব মৌলিক চিন্তা এবং শরঈ হুকুমের মৌলিক নীতিমালার ফলে আইন প্রদান ও ইবাদাতের বিষয়টি কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই সংরক্ষিত হবে এবং অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকার কেবলমাত্র রাসূল (সা)-এর জন্যই সংরক্ষিত হবে। এসব মৌলিক বিষয় লোকজনের মধ্যে জান্নাতের আগ্রহ ও জাহান্নামের ভয় সৃষ্টি করবে এবং তাদেরকে এটা বুঝতে সাহায্য করবে যে ইসলামের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অন্যতম একটি ফরয হচ্ছে- ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা; কারণ এর উপরে অনেকগুলো ফরয নির্ভরশীল। এতে উম্মাহ বুঝতে পারবে যে অন্যসব লোকের বাইরে তারা একটি উম্মত এবং কোনো বংশ বা রাষ্ট্রের সীমানা তাদেরকে পৃথক করতে পারেনা। মুসলিমরা একটি ভ্রাতৃত্বন্ধনে আবদ্ধ যাকে কোনো জাতীয়তাবাদী বা দেশাত্মবোধক বন্ধন ছিন্ন করতে পারে না। আল্লাহর শরীয়াহ'র প্রতি অবহেলার ফলেই মুসলমানরা বর্তমানে অপমানিত ও লজ্জিত অবস্থায় রয়েছে। মুসলিমদেরকে তাদের রবের শরীয়াহ'র আনুগত্য করতে হবে এবং দলীল না জেনে তাদের পক্ষে কোনো কাজ করা উচিত হবেনা।

ইসলামী হুকুমতের অস্তিত্বে আসা এবং তাতে ফলধারণের জন্য এসব চিন্তা উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে।

যেসব বিষয় আমরা উল্লেখ করেছি তার সবগুলোই দলের বিকাশক্রিয়ার(culture) অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। শরীয়াহ'র নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে একটি উপযুক্ত রাস্তা তৈরি করা যাতে আমরা চিন্তাভাবনাগুলোকে নির্ধারণ করতে পারি এবং সেই ভিত্তি ঠিক করতে পারি যার আলোকে এসব বিকাশ প্রক্রিয়াসমূহ (culture) গ্রহণ করা হবে।

যথেষ্ট শক্তিশালী চিন্তা, মতামত ও শর'ঈ হুকুম দলটিকে নির্ধারণ করতে হবে যাতে সে নিজেকে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য নিয়ে যেতে পারে এবং দাওয়াতের দায়িত্ব বহনকারীদের মধ্যে পূর্ন মনোযোগের সৃষ্টি করতে পারে। উম্মাহর মধ্যে জনমত গড়ে তোলার জন্যও এসব চিন্তাও প্রয়োজনীয়। দলটি যে ফিকরাহ (ধারণা)-এর উপরে প্রতিষ্ঠিত তা উম্মাহকে গ্রহণ করাতে এগুলো কাজে লাগবে।

উল্লিখিত পরিকাঠামো দলটিকে বজায় রাখতে হবে। এই বিষয়গুলো নির্ধারণ করতে যদি দলটি সমর্থ হয় তাহলে মৌলিক বিষয়ের শাখা-প্রশাখা থেকে উদ্ভূত কম গুরুত্বপূর্ণ হুকুমসমূহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সে কিছু ভুল করলে, অথবা অন্যান্য দলের সঙ্গে সে মতভেদ করলে অথবা অন্যান্য দল তার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করলে তা তেমন ক্ষতিকর হবেনা। কারণ এটি একটি অপরিহার্য এবং অনিবার্য বিষয়।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার শরীআহ'র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করা এবং বিশ্বের বাকি অংশে দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য অর্জনের জন্য এসমস্ত বিকাশক্রিয়া (culture) দলটির জন্য অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষে সফলতা দেয়ার মালিকতো কেবলমাত্র আল্লাহ সুবহানাাহু তায়ালা।

# ৮

# দলের জন্য প্রয়োজনীয় চিন্তাভাবনাসমূহ গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা

যেকোনো ধরনের দল হলেই চলবে- এমন ধারণা শরীআ'হ দেয় না। বরং শরীয়াহ এমন একটি দল প্রতিষ্ঠার দাবী করে যার উদ্দেশ্য হবে একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশ বাস্তবায়ন করা। নিচের দলীলটি আমাদেরকে এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেয়। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেন;

**" আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকবে যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম। " [আল-কুরআন ৩:১০৪]**

ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে এমন একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করতে শরীয়াহ আমাদেরকে বাধ্য করে যে দলটি তাকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অর্থাৎ ইসলামের আধিপত্য ও প্রতিষ্ঠালাভ এবং ক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় চিন্তা ও শরঈ হুকুম বহন করবে। নিছক দল গঠনের জন্যই দল গঠন করতে বলা হয়নি বরং দলের উদ্দেশ্য- যা হচ্ছে দাওয়াত এবং সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ তা বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে। একইভাবে কেবল দাওয়াত ও সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের জন্যই তা করতে বলা হয়নি বরং যে উদ্দেশ্যে দাওয়াত ও সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্বটি সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে তা হল আধিপত্য ও ক্ষমতা অর্জন এবং তা সুসংহতকরণ।

রাসূল (সা) বলেছেন;

**"পৃথিবীর যেকোনো অংশে যদি তিনজন লোক থাকে, তাহলে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমির (নেতা) নিযুক্ত না করে থাকাটা তাদের জন্য বৈধ হবে না।"** [আহমাদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত] যেকোনো সামষ্টিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা একজন আমীরের নেতৃত্বে তা সম্পাদন করে। যেসমস্ত লোকের উপরে, যেসব বিষয়ের জন্য তিনি আমীর নিযুক্ত হয়েছেন সেসব বিষয়ে তার আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক। আমীরের নির্দেশ মতো দলটিকে চলতে হবে যাতে সামষ্টিক কাজের একটি শরীয়তসম্মত পরিণতি অর্জন করা যায়।

- যেহেতু মুসলিমদের উপরে আল্লাহ এমন অনেক দায়িত্ব ফরয করেছেন যেগুলো কেবলমাত্র খলিফাই সম্পাদন করতে পারেন সেহেতু এসব ফরয আদায়ের জন্য একজন খলিফা নিযুক্ত করা অপরিহার্য। আবার যেহেতু কোনো দল ছাড়া খলিফার নিয়োগ ও খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না, সেহেতু এমন একটি দল যার উদ্দেশ্য হবে খলিফা ও খিলাফত প্রতিষ্ঠা তার অস্তিত্ব অপরিহার্য। কারণ শরীয়াহ'র একটি মৌলিক নীতিমালা হচ্ছে:

"কোনো ওয়াজিব পালন করতে যা প্রয়োজন তা নিজেও ওয়াজিব।"

আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হলো যে নির্দিষ্ট শর'ঈ উদ্দেশ্যের সঙ্গে দলটির অস্তিত্ব অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। অতএব নিছক ইসলামের দাওয়াত বহন করে অথবা কেবল বার্তাবহনের জন্যই তা বহন করে এমনকোনো দলের কথা বলা হয় নি। বরং দল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে মুসলিমদের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। কারণ ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ের সমস্ত ইসলামী হুকুম বাস্তবায়নের শরঈ পদ্ধতি হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র। অতএব এমন একটি দলের অস্তিত্ব অপরিহার্য যা তার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য পূরণ করবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত দলটি তার প্রয়োজনীয় দায়িত্বগুলো পূরণ করতে সক্ষম না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে নিচের বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে:

-দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় চিন্তা, শরঈ হুকুম ও মতামত দলটিকে গ্রহণ করতে হবে এবং কথা, কাজ ও চিন্তায় সেগুলোর অনুসরণ করতে হবে। এসব বিষয় গ্রহণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে দলের ঐক্য রক্ষা করা। যদি প্রতিষ্ঠিত দলটির

সদস্যগণ ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ও ইজতিহাদ গ্রহণ করে তাহলে দলটি ভাঙনের মুখে পড়বে এবং তা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে যদিও তারা সাধারণভাবে নিজেদের উদ্দেশ্য ও ইসলামের ব্যাপারে একমত থাকে। এমনকি এসব খণ্ডদলের ভিতরে আরো অনেক উপদল তৈরি হবে। ফলে তখন ফরয দায়িত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যদের নিকট দাওয়াত পৌঁছানোর পরিবর্তে তারা নিজেদের মধ্যে দাওয়াতের সূচনা করবে। তারা একে অন্যের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবে এবং প্রত্যেকটা উপখণ্ডই চাইবে তাদের চিন্তা পুরো দলের নেতৃত্ব দিক। এজন্য নির্দিষ্ট চিন্তা গ্রহণ এবং এর বৈধতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। দলের ঐক্য বজায় রাখা শরীয়াহ'র দৃষ্টিতে একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। এক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত চিন্তা গ্রহণ এবং সেগুলো মেনে চলতে শাবাবদেরকে বাধ্য করা ছাড়া অন্যকিছুর মাধ্যমে দলের ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব না। সুতরাং 'কোনো ওয়াজিব পালন করতে যা প্রয়োজন তা নিজেও ওয়াজিব' এই নীতির আলোকে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে গ্রহণ করতে হবে।

দলটি তার দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য যেসব প্রয়োজনীয় চিন্তা, হুকুম ও মতামত গ্রহণ করে সেগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তসম্মত হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত দলের উপরে শাবাবদের আস্থা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন কাজের চিন্তাসমূহ মেনে নেওয়ার জন্য শাবাবদের বাধ্য করা একটি বৈধ বিষয়, কারণ মুসলিমদের জন্য এই বিষয়টি বৈধ যে, সে নিজের মতামত ত্যাগ করে অন্যের মত অনুযায়ী কাজ করতে পারবে। এজন্যই উসমান বিন আফফান (রা) এই শর্তে খলিফা হিসেবে বাইয়াত নিয়েছিলেন যে তিনি নিজস্ব ইজতিহাদ পরিত্যাগ করবেন এবং আবু বকর ও উমর (রা)-এর ইজতিহাদ গ্রহণ করবেন যদিও সেগুলো তার ইজতিহাদের সঙ্গে না মিলে। এই বিষয়টি সাহাবীগণ (রা) মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁরা তাঁকে বাইয়াত দিয়েছিলেন। তবে এই বিষয়টি ফরয নয় বরং মুবাহ, যা আলী (রা) এর ঘটনাটি দ্বারা প্রমাণিত। কারণ তিনি আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর ইজতিহাদ গ্রহণের বিনিময়ে নিজের ইজতিহাদ পরিত্যাগ করতে রাজি না হওয়া সত্ত্বেও কোনো একজন সাহাবীও এতে আপত্তি করেননি। এছাড়া আশ-শাবী কর্তৃক সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, আবু মুসা (রা) আলী (রা)-এর মতের জন্য নিজের মত, যাইদ (রা) উবাই বিন কাব (রা)-এর মতের জন্য নিজের মত এবং আবদুল্লাহ (রা) উমর (রা)-এর মতের জন্য নিজের মত পরিত্যাগ করতেন। একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে আবু বকর (রা) এবং উমর (রা) নিজেদের মত পরিত্যাগ করতেন আলী (রা)-এর মতের জন্য। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে , অন্যকোনো মুজতাহিদের প্রতি আস্থার কারণে তার মত গ্রহণ করে নিজের মত পরিত্যাগ করা কোনো মুজতাহিদের জন্য অনুমোদিত। দলের শাবাবদেরকে অবশ্যই এই দুটো ধারণা মেনে চলতে হবে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগগত দিক থেকে একটি দেহের মতো আচরণ করতে হবে।

-দলের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য যেভাবে সে প্রয়োজনীয় শরঈ হুকুম গ্রহণ করে, সেগুলোকে সম্পাদন করার জন্য ঠিক তেমনিভাবে অবশ্যই তাকে ধরন (style)সম্পর্কিত হুকুমও নির্ধারণ করতে হবে। ধরন (style) বলতে সেই উপায়কে বোঝানো হচ্ছে যার মাধ্যমে শর'ঈ হুকুম বাস্তবায়িত হয়। এটি একটি হুকুম যা এমন কোনো মৌলিক হুকুমের সঙ্গে সম্পর্কিত যার স্বপক্ষে দলীল বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, রাসূল (সা)-এর অনুসরণে দলের শাবাবদের চিন্তা-চেতনাকে খুব ভালোভাবে গড়ে তুলতে হবে। এটি হচ্ছে একটি শর'ঈ হুকুম যা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। কিন্তু কোন উপায়ে? কীভাবে এই শরঈ হুকুম বাস্তবায়িত হবে? একটি নির্দিষ্ট ধরনের সাহায্যে এই শরঈ হুকুম পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে হালাকাহ (পাঠচক্র) অথবা উশার (পরিবার) প্রভৃতি হতে পারে প্রয়োজনীয় ধরন (style)।

অতএব, যুক্তিসম্মত উপায়ে ধরন (style) নির্ধারণ করতে হবে যাতে এর সাহায্যে সর্বোত্তম উপায়ে শরঈ হুকুম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। মূলনীতি অনুযায়ী এই হুকুমটি হচ্ছে মুবাহ। শরীয়াহ আদেশ করেছে শর'ঈ হুকুমটির ব্যাপারে কিন্তু তা বাস্তবায়নের ধরনটি (style) ছেড়ে দিয়েছে মুসলিমদের উপরে।

কোনো একটি হুকুমের জন্য যেহেতু বিভিন্ন ধরন (style) রয়েছে সেহেতু একটি নির্দিষ্ট ধরন (style) গ্রহণ করতে এবং দলটি শাবাবদেরকে সে অনুযায়ী পরিচালিত করবে । অতএব দলটিকে একটি ধরন গ্রহণ করতে হবে যার মাধ্যমে সে শর'ঈ হুকুম বাস্তবায়ন করবে। এক্ষেত্রে মূল কাজটি যে পর্যায়ের হুকুম, ধরনটির (style) হুকুমও তাই হবে। অন্যভাবে বলা যায়, শরঈ হুকুমটি যে পর্যায়ের বাধ্যবাধকতা ধরনটিও (style) সে পর্যায়ের বাধ্যবাধকতা।

যখন দলটি উত্তমরুপে বিকশিত চিন্তা-চেতনা (culture) গড়ে তোলার জন্য হালাকাহকে একটি ধরন (style) হিসেবে গ্রহণ করবে, তখন অবশ্যই একে একটি বাধ্যবাধকতা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। ধরনটিকে (style) গ্রহণ করার সময় দলটিকে অবশ্যই এর উদ্দেশ্যের দিকে নজর দিতে হবে যা হচ্ছে উত্তমপন্থায় বিকাশক্রিয়াকে(culture) গড়ে তোলা। অতএব, ধরন হিসেবে হালাকাহকে গ্রহণ করলে এর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ই গ্রহণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, হালাকাহতে কত লোক থাকবে তা হালাকাহ'র উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। যদি লোকসংখ্যা বেশি হয় তাহলে

উত্তমভাবে চিন্তা-চেতনা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি লোকসংখ্যা কম হয় তাহলে অনেক বেশি হালাকাহ হয়ে যাওয়ার ফলে তা উদ্দেশ্যের জন্য বোঝা এবং বাধাস্বরূপ হবে। কোনোরকম সংখ্যাধিক্য বা অপর্যাপ্ততা না রেখে লোকসংখ্যা এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে তা চিন্তাভাবনা গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। সুতরাং লোকসংখ্যা নির্ধারণের বিষয়টি যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে হালাকাহ'র সময়কাল এমন হতে হবে যাতে চিন্তাগুলোকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য ছাত্ররা নিজেদের মনোযোগ ধরে রাখতে পারে, অন্যথায় বোঝার বিষয়টি অপর্যাপ্ত থেকে যাবে। সময় খুব সংক্ষিপ্ত হলে চিন্তাগুলোকে পুরোপুরি উপস্থাপন করা সম্ভব হবেনা। কতদিন পরপর হালাকাহ নিতে হবে? এটা কি প্রতিদিনই হবে, সপ্তাহে একবার হবে নাকি দুসপ্তাহে একবার হবে ? দাওয়াতের ব্যবহারিক বিষয়ের পথে যেন হালাকাহ বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। শাবাব যেন দাওয়াত বাদ দিয়ে কেবল শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে ব্যস্ত না হয়ে পড়ে। শরঈ হুকুম বাস্তবায়নের জন্য এভাবে উপযুক্ত ধরন বেছে নিতে হবে যাতে সেগুলো শরঈ হুকুম বাস্তবায়নের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। ধরনের ব্যাপারে যে বিষয়গুলো এখানে বলা হলো সেগুলো উপকরণের বেলায়ও অনেকটাই প্রযোজ্য। কাজের চাহিদা অনুযায়ী আমীর চাইলে ধরন ও উপকরণ পরিবর্তন করতে পারেন।

- দলটি যেহেতু বিশাল বিস্তৃত ভূখণ্ডে কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং অনেকগুলো দেশে পৌঁছাবে সেহেতু এর কর্মকাণ্ডের পরিধির দাবি অনুযায়ী একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রয়োজন, যার মাধ্যমে দলটি দাওয়াত পরিচালনা করবে এবং কাজের সমস্ত উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করবে। এই প্রশাসনিক ব্যবস্থাটি দাওয়াতের আন্দোলনকে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করবে। এটি শাবাবদেরকে গড়ে তোলার বিষয়টি দেখাশোনা করবে এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি সাধারণ ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। এটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনকে সংগঠিত করবে। উম্মাহ্‌র কাছে দলটি এমন একটি সত্তা হিসেবে আবির্ভূত হবে যা তার দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অতএব, একটি সুসংগঠিত কাঠামোর প্রয়োজন অপরিহার্য যা তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। ফলে কাজের অগ্রগতিকে সে পর্যবেক্ষণ করবে এবং অর্জিত সাফল্যকে ধরে রাখবে।

অতএব দলটিকে একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা অথবা একটি সুসংগঠিত কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যা সফলতার সঙ্গে দাওয়াত পরিচালনার মাধ্যমে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তাকে সাহায্য করবে।

দলটিকে কিছু প্রশাসনিক নিয়মকানুন গ্রহণ করতে হবে যার মাধ্যমে দলের সদস্যবৃন্দকে এবং দল কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনকে সংগঠিত করা যাবে। এতে আমীরের ক্ষমতা, সে কীভাবে দল পরিচালনা করবে এবং কীভাবে নির্বাচিত হবে সেসব বিষয় নির্ধারিত থাকবে। বিভিন্ন এলাকা এবং প্রদেশের দায়িত্বশীলদেরকে কে বা কারা নিয়োগ দিবে এবং তাদের ক্ষমতা কতটুকু থাকবে-এ বিষয়গুলো এতে বর্ণিত থাকতে হবে। নির্দিষ্ট নিয়মকানুন হিযবের সমস্ত কাজের প্রশাসনিক বিষয়কে সংগঠিত করবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের চূড়ান্ত ক্ষমতাকে নির্ধারিত করবে।

কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত শর'ঈ হুকুম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ধরন ও উপকরণ সম্পর্কিত হুকুম থাকতে হবে এসব নিয়মকানুনের মধ্যে। গ্রহণকৃত প্রশাসনিক ব্যবস্থার আনুগত্য করা ততক্ষণ পর্যন্ত বাধ্যতামূলক যতক্ষণ পর্যন্ত আমীর এগুলোকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, কারণ আমীরের আনুগত্য করা ওয়াজিব।

- গ্রহণকৃত বিষয়ের আনুগত্য করতে প্রত্যেকেই বাধ্য। অতএব কেউ তা লঙ্ঘন করলে দল তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিবে? এই লঙ্ঘনের জন্য কি তাকে তিরস্কার করা হবে, নাকি কোনো প্রশাসনিক শাস্তি দেয়া হবে?

যারা গ্রহণকৃত হুকুম লঙ্ঘন করে অথবা নির্ধারিত শর'ঈ পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের ব্যাপারে প্রশাসনিকভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দলটি বাধ্য। আমীরের অবাধ্যতার জন্য এ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বৈধ। শরঈ হুকুম অনুযায়ী যেহেতু আমীর থাকা বাধ্যতামূলক সেহেতু তার আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক এবং যেসব দায়িত্বের জন্য সে আমীর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে সেসব ব্যাপারে তার অবাধ্য হওয়া নিষিদ্ধ ; অন্যথায় দলের আমীর থাকার কোনো মানে হয় না।

রাসূল (সা) বলেন;

***"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল এবং যে আমাকে অমান্য করল সে যেন আল্লাহকে অমান্য করল। যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল সে যেন আমার আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি আমীরকে অমান্য করল সে যেন আমাকে অমান্য করল।"*** *[মুসলিম থেকে বর্ণিত]*

আন্দোলনরত প্রত্যেক সদস্যই আমীরের প্রশাসনিক শাস্তির আওতাধীন থাকবে, এমনকি যদি সে একেবারে কনিষ্ঠ সদস্যও হয়। এসব শাস্তি দেয়া হবে গ্রহণকৃত বিষয়ের লঙ্ঘনের ফলে। গ্রহণকৃত শরঈ হুকুম অথবা ধরনকে যে লঙ্ঘন করে অথবা প্রশাসন বা প্রশাসনিক নিয়ম যে অমান্য করে অথবা নিজের ক্ষমতার সীমালঙ্ঘন করে তাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

এভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামোর সঙ্গে একটি সুশৃঙ্খল সাংগঠনিক কাঠামো যুক্ত করতে হবে যা পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড ও হুকুমের চিন্তাগুলোকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবে। সাংগঠনিক বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত না করার কারণে অনেক ইসলামী এবং অনৈসলামিক সংগঠনকে আমরা ব্যর্থ হয়ে যেতে দেখেছি।

যদি গ্রহণ করার (adoption) বিষয়ের দিকে দলটি যথার্থ মনোযোগ দেয় না তাহলে দলের মধ্যে মহামারী আকারে মতানৈক্য ছড়িয়ে পড়বে, সে বিশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হবে এবং বৃত্তাবদ্ধ হয়ে পড়বে, দলের জবাবদিহিতা থাকবে না। এই বিষয়টি লক্ষ্য অর্জনের পথে দলের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

যদি বৈধ এবং স্থির শর্তসাপেক্ষে দলের সদস্য এবং দায়িত্বশীল লোক নিয়োগ না করে বরং বিভিন্ন কারণ যেমন কার সঙ্গে কার সম্পর্ক আছে অথবা কার সামাজিক মর্যাদা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে তার উপরে ভিত্তি করে নিয়োগ দেওয়া হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই দায়িত্বের বন্টন হবে ত্রুটিপূর্ণ এবং সদস্যগণ বিশেষ অবস্থান পাওয়ার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে।

এট স্বাভাবিক যে, যদি একটি সাধারণ গঠনতান্ত্রিক নিয়ম না থাকে যা প্রত্যেক সদস্যের জন্য প্রযোজ্য, তাহলে জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি হবে এবং সমতা ও নিরপেক্ষতা হারিয়ে যাবে।

স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণকৃত বিষয়ের বড় ধরনের লঙ্ঘন এবং ছোট ধরনের লঙ্ঘনের মধ্যে পার্থক্য রেখে যদি গঠনতন্ত্রে শাস্তির বিধান না থাকে , তাহলে কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে অবাধ্যতা দেখা দিবে এবং ভুলের পরিমাণ বেড়ে যাবে।

অতএব, কার্যকরী আন্দোলনের জন্য সাংগঠনিক দিক এবং সঠিকভাবে দল গঠন প্রক্রিয়ার দিকে যথার্থ মনোযোগ দিতে হবে যাতে দাওয়াতের চিন্তাসমূহকে এবং শাবাবগণকে ঠিকভাবে সংগঠিত করা যায় এবং কার্যক্রম পরিচালনায় বেশি সুবিধা হয়। যে উদ্দেশ্যে দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সঙ্গে দলের সাংগঠনিক কাঠামো পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

দলের সাংগঠনিক দিকটিকে গৌণ বিবেচনা করলে চলবেনা বরং এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দল যদি সুসংগঠিত না হয় এবং প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন গ্রহণ না করে অথবা গ্রহণকৃত নিয়মকানুনগুলোকে বাধ্যতামূলক হিসেবে মেনে না নেয় তাহলে যে সাফল্য দল অর্জন করবে তা হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে।

উপরন্তু দলের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কিছু অর্থনৈতিক দায়িত্ব বহন করা দলটির জন্য বাধ্যতামূলক। কারণ কিছু শাবাবকে দলের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষভাবে নিয়োগ দিতে হবে- যেগুলো পালন করতে গেলে পরিবহন খরচ, প্রিন্টিং খরচ অথবা দাওয়াতের প্রয়োজনে অন্যান্য খরচ লাগবে। এসব খরচ দলকে অর্থাৎ দলের শাবাবদেরকেই বহন করতে হবে। দাওয়াতের জন্য যে স্বয়ং নিজেকে উৎসর্গ করেছে তার জন্য এটা অধিকতর সহজ যে, এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ আর্থিক সহায়তা সে প্রদান করবে।

দলের বাইরে যাতে হাত প্রসারিত করতে না হয় সেদিকে দলকে দৃষ্টি রাখতে হবে- চাই সে কোনো ব্যক্তির নিকট হোক বা দলের কোনো নিকট বা কোনো সরকারের নিকট। এভাবেই দলকে অগ্রসর হতে হবে। দাওয়াতের শত্রুরা অর্থের প্রয়োজনকে কাজে লাগিয়ে দলকে ব্যবহার করার চেষ্টা করতে পারে, এজন্য তারা প্রথমে আপাতঃ দৃষ্টিতে নির্দোষ আর্থিক সাহায্য দিতে শুরু করে। কিন্তু খুব দ্রুতই এই সাহায্যদান কোনো উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়।

# ৯

# একাধিক ইসলামী দল বা আন্দোলন থাকা কি বৈধ?

এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে কোনো আন্দোলন বা দলের কর্মসূচীর জন্য একটি সামগ্রিক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করতে আমরা চেষ্টা করেছি। বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা একে ভারাক্রান্ত করে তুলিনি বরং যেসব মৌলিক বিষয় অবশ্যই মেনে চলতে হবে সেগুলো আমরা বর্ণনা করেছি এবং বিস্তারিত বর্ণনার বিষয়টি দল ও এর মুজতাহিদগণের উপর ছেড়ে দিয়েছি। বর্তমানে এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে এমন অনেক কর্মপ্রচেষ্টা বিদ্যমান, যেগুলো কোনো সঠিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত না। অনেক দলের ক্ষেত্রে বলা যায় যে তারা শরীআ'হ'র প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ পূরণ করেনি। আংশিক কাজ করতে ইচ্ছুক এমন কিছু মুসলিমের সমষ্টি ছাড়া তারা আর কিছুই না। এমনকি তারা আংশিক সমস্যাসমূহের সমাধানও করতে পারে না এবং শরীয়াহ'র সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ধারণ করতেও ব্যর্থ। ফলে তারা ইসলামকে এমনভাবে বহন করেনা যা ইসলামী উম্মাহর দৈনন্দিন জীবনে ইসলামকে ফিরিয়ে আনবে। এ ধরনের দল এতটা ব্যাপকমাত্রায় বিদ্যমান যে কোনো একটি দেশে হয়ত এরকম শতশত দল রয়েছে। তারা হাটবাজারের মতো গড়ে উঠছে যেখানে লোকজন তাদের শক্তি খরচ করছে এবং এভাবে তারা সঠিক দিকনির্দেশনা ও কর্মকাণ্ড থেকে লোকজনকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এরকম অসংখ্য দৃষ্টি আকর্ষণকারী দলের (সংস্থা) মধ্যে কেবলমাত্র কয়েকটি দলের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, তারা ইসলামের উদ্দেশ্যসমূহ এবং সেগুলো অর্জনের প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। যেসব দল আমাদের দৃষ্টিতে হাটবাজারের মতো গড়ে উঠেছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে সেগুলো বাদ দিয়ে যদি আমরা সেসব বৃহৎ দলের কথা চিন্তা করি যারা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং দায়িত্বপালনে স্বয়ংসম্পূর্ণ তাহলে অবশ্যই একটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে হয়; শরীয়াহ কি একটিমাত্র দলের নির্দেশ দেয়, যা প্রয়োজনীয় সকল বিষয়কে অনুধাবন করে এবং সেগুলোকে সম্পাদন করে? নাকি শরীয়াহ একাধিক দলের অনুমতি দেয় যারা শরীয়াহ'র নীতির অধীনে পরিবর্তন আনার জন্য কাজ করবে? আংশিক কর্মকাণ্ড এবং পরিপূর্ণ ও সুষম কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী? আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক প্রচেষ্টাসমূহের ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী?

এক বা একাধিক ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে এবং বিপক্ষে প্রচুর মতামত তৈরি হয়েছে। অনেকেই মনে করেন, পরিবর্তন সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় ইসলামী কর্মকাণ্ড একক হওয়া বাধ্যতামূলক, আবার অনেকে মনে করেন একাধিক দল থাকার বিষয়টি অনুমোদিত। যদি এই আলোচনার গৌণ বিষয়গুলোকে আমরা ভিত্তির আলোকে চিন্তা করি, তাহলে শরঈ প্রমাণাদি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক মতামতকে আমরা পৃথকভাবে চিনতে পারব যেভাবে আমরা গম থেকে তুষকে পৃথকভাবে চিনি।

যারা মনে করেন 'ইসলামী কর্মকাণ্ড একক হওয়া বাধ্যতামূলক' তারা মূলত দুটো কারণে তা মনে করেন।

**প্রথমত**, ইসলামী কর্মকাণ্ডের ঐক্য একটি ফরয বিষয়।

**দ্বিতীয়ত**, ইসলামী কর্মকাণ্ডের ঐক্য একটি সাংগঠনিক অপরিহার্যতা।

১– নিম্নোক্ত দলীলসমূহের আলোকে তারা একে একটি শরঈ বাধ্যবাধকতা বলে মনে করেন:

**ক)** প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মুসলিম এবং উম্মাহকে এক থাকতে হবে। কারণ আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

***"নিশ্চয়ই তোমাদের এই উম্মত হচ্ছে একটিই উম্মত এবং আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব (একমাত্র) আমারই ইবাদাত কর।"*** [আল কুরআন ২১:৯২]

তিনি আরো বলেন:

***"এবং নিশ্চয়ই তোমাদের এই উম্মত হচ্ছে একটিই উম্মত এবং আমি তোমদের পালনকর্তা, অতএব আমাকেই ভয় কর।"*** **[আল কুরআন ২৩:৫২]**

**"পারস্পরিক ভালোবাসা এবং সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির দিক থেকে মুমিনগণ একটি দেহের মতো। যদি কোনো অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাহলে পুরো দেহ নিদ্রাহীনতা ও জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ে।"** [বুখারী, মুসলিম ও আহমাদ থেকে বর্ণিত]

**খ)** প্রকৃতপক্ষে আমাদের ঐক্যের ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে এবং বিচ্ছিন্নতাকে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

***"আর তাদের মতো হয়োনা, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শনসমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে- তাদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব।"*** [আল কুরআন ৩:১০৫] তিনি আরো বলেন:

***"নিশ্চয়ই যারা স্বীয় দ্বীনকে খণ্ড বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের সাথে (হে মুহাম্মাদ) আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয়টি আল্লাহ তাআলার নিকট সমর্পিত। অতঃপর তিনি বলে দিবেন যা কিছু তারা করে থাকে।"*** [আল কুরআন ৬:১৫৯]

**গ)** প্রকৃতপক্ষে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন দলে বিভক্ত না থেকে জামাতবদ্ধ হয়ে থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, রাসূল (সা) বলেন;

**"এমন একটা সময় আসবে যখন প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং কোনো বিষয়ে উম্মাহ একত্রিত হয়ে যাওয়ার পর যদি অন্য কেউ তাদেরকে বিভক্ত করতে আসে তাহলে তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত কর; সে যে-ই হোকনা কেন।"** [মুসলিম থেকে বর্ণিত] রাসূল (সা) আরো বলেন:

**"রাসূল (সা) আমাদেরকে ডাকলেন এবং আমরা তাকে বাইআত দিলাম। তিনি আমাদের কাছে এই মর্মে বাইআত দিতে বললেন যে আমরা দুঃখ-কষ্টের দিনে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর কথা শুনব ও তাঁকে মান্য করব এবং আমরা কর্তৃত্বশীল লোকজনের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত বিবাদে লিপ্ত হবনা যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এমন প্রকাশ্য কুফরে লিপ্ত হচ্ছে যার ব্যাপারে আমাদের নিকট আল্লাহর তরফ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে।"** [মুসলিম থেকে বর্ণিত] তিনি (সা) বলেন–

**"জামাআত হচ্ছে রহমত এবং বিভক্তি হচ্ছে আযাব।"** [ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত] তিনি (সা) বলেন–

**"জামাআতের সাথে আছে আল্লাহর হাত।"** [তিরিমিযি এবং নাসাঈ হতে বর্ণিত]

২) সাংগঠনিক এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে ঐক্যবদ্ধ থাকার বহুবিধ প্রয়োজন রয়েছে:

ক) ইসলামী পরিবর্তন একটি কঠিন কাজ, কারণ বিদ্যমান জাহেলি শক্তিগুলোকে তাদের অবস্থান থেকে উপড়ে ফেলা কোনো সহজ ব্যাপার না। সামাজিক চিন্তা, কর্মকাণ্ড এবং ব্যবস্থার উপরে ইসলামের কর্তৃত্বের জন্য বিভিন্ন দলকে বিচ্ছিন্ন না রেখে একটি একক সত্তায় রূপান্তরিত করতে আমরা বাধ্য।

খ) ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রের দুষ্কর্মের আতাঁত আমাদেরকে বাধ্য করে ঐক্যবদ্ধভাবে অবস্থান নিয়ে তাদের মুখোমুখী হতে । যেহেতু, বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন শক্তিসমূহ পরস্পরকে সাহায্য করছে এবং নিজেদের সামরিক শক্তিকে এক করছে সেহেতু তাদের সহজ শিকারে পরিণত না হওয়ার জন্য এবং বিচ্ছিন্ন ও পদদলিত না হওয়ার জন্য মুসলিম বিশ্বের ইসলামী শক্তিগুলোকে ঐক্যের দিকে ডাকাটা কি অধিক কল্যাণকর হবেনা?

আদর্শিকভাবে যদি ইসলামী কর্মকাণ্ডসমূহের ঐক্য একটি শরঈ বাধ্যবাধকতা না হতো তাহলেও তা এজন্য বাধ্যতামূলক হতো যাতে ইসলামের ভবিষ্যৎ রক্ষা পায় এবং দমন, নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞ থেকে ইসলামী কর্মকাণ্ড রক্ষা পায়।

গ) মুসলিম বিশ্বে বিদ্যমান বিভিন্ন ইসলামবিদ্বেষী স্থানীয় শক্তি ও দলসমূহ শক্তিশালী জোট গঠন করছে। এসমস্ত জোট সমস্ত পর্যায়ে গবেষণা, পর্যবেক্ষণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রস্তুতি গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। এই বাস্তবতার আলোকে চিন্তা করলে কোন বিষয়টি মুসলিমদের জন্য অধিক যুক্তসঙ্গত হবে–ইসলামী শক্তিসমূহের খণ্ড-বিখণ্ড ও বিক্ষিপ্ত থাকা? নাকি তাদের ঐক্য ও সংহতিকে নষ্ট করতে চায় যেসব বিষয় ও কারণ সেগুলোর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নেওয়া?

এসব বিষয় এবং এরকম অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করলে এমন একটি বৈশ্বিক আন্দোলন যা সমস্ত পর্যায়ে চিন্তা, সাংগঠনিক কার্যক্রম, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষেত্রে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারবে তা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোনোরকম সন্দেহ, অনিচ্ছা বা দ্বিধার বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকেনা।

এসমস্ত প্রমাণ ও যুক্তির আলোকেই এরূপ দাবি করা হয়ে থাকে যে, ইসলামী কর্মকাণ্ডের ঐক্য একটি বাধ্যবাধকতা এবং বিভিন্ন দলে বিভক্তি হওয়া নিষিদ্ধ। এসব প্রমাণাদি বাস্তবতার আলোকে কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা বোঝার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই ইসলামের নির্ধারিত ইজতিহাদের পদ্ধতি অনুযায়ী অগ্রসর হতে হবে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মুসলিমরা বর্তমানে যে বাস্তবতায় বসবাস করছে তা হচ্ছে দারুল কুফর এবং একে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত করা মুসলিমদের জন্য ফরয। আমরা এ-ও আলোচনা করেছি যে এই বিষয়টি উপলব্ধি করে এমন একটি দল থাকা অপরিহার্য যা তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে রাসূল (সা)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।

এই মতটিকে যারা ধারণ করে তাদের উপস্থাপিত প্রমাণাদির ব্যাপারে বিস্তারিত শরঈ আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা সেই দলটির বাস্তবতা আলোচনা করতে চাই যা এই কাজে জড়িত হবে। এটি কি পুরো মুসলিম সম্প্রদায় নাকি মুসলিম সম্প্রদায়ের অংশবিশেষ? অন্যভাবে বলতে গেলে এটি কি মুসলিমদের মধ্য থেকে বের হওয়া একটি দল?

বিষয়টি বোঝার জন্য আমরা বলে থাকি যে, আল্লাহ মুসলিমদের উপরে বিভিন্ন বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন যেগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা বাধ্য। এসব বাধ্যবাধকতাসমূহের মধ্যে কিছু হচ্ছে ব্যক্তিগত যেগুলো পালন করতে প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিগতভাবে বাধ্য এবং এগুলো পালন না করার আগ পর্যন্ত কোনো মুসলিম অপরাধ থেকে মুক্ত নয়। অন্যকিছু বাধ্যবাধকতা আছে যেগুলো পালন করার জন্য দলের প্রয়োজন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি দ্বিতীয় ধরনের বাধ্যবাধকতা। আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত করা এমন একটি ফরয–যা কোনো ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে করা সম্ভব না বরং এর জন্য প্রয়োজন লোকজনের একত্রিত হওয়া এবং গণমানুষের ইচ্ছাকে এক করা।

নিম্নোক্ত মূলনীতি অনুযায়ী বিষয়টি বুঝা যায়:

"কোনো ওয়াজিব পালনের জন্য যা প্রয়োজন তা নিজেও ওয়াজিব।"

ফরযে কিফায়াসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম একটি ফরয এবং একে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যে ব্যক্তি একে অবহেলা করবে সে বড় ধরনের গোনাহে লিপ্ত হবে। যাইহোক, বিষয়টির প্রকৃতিই এরকম যে একে প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত মুসলিমের প্রয়োজন নেই বরং মুসলিমদের মধ্য হতে একটি দল যারা এ কাজটি আদায়ের মতো সামর্থ্য রাখে তারাই এ কাজের জন্য পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হবে। এই ফরযটি আদায়ের লক্ষ্যে যে দলটি কাজ করবে তার সদস্যরা গোনাহ থেকে মুক্ত থাকলেও যারা কাজটি আদায় করবেনা তারা গোনাহ থেকে মুক্ত থাকবে না।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলিমদের মধ্য থেকে দলটি বের হয়েছে সেই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য অর্থাৎ খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য দলটি সংগ্রাম করবে এবং এজন্য দলটিকে নিজেদের কর্মকাণ্ডের জন্য গ্রহণকৃত প্রয়োজনীয় চিন্তা ও আহাকামের ভুল বা যথার্থতার জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

পুরো মুসলিম উম্মাহ এই দলটির অন্তর্ভুক্ত নয়, কারণ এমন অনেক মুসলিম আছে যারা এর সাথে সম্পৃক্ত না। হতে পারে, যে তারা অন্যকোনো দলের সাথে সম্পৃক্ত (একাধিক দলের বৈধতা সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব) অথবা কোনো দলের সাথেই সম্পৃক্ত না।

এই দলটি খলিফা নয় এবং খলিফার স্থলাভিষিক্ত হতেও পারে না। খলিফার জন্য নির্ধারিত আহকাম দলটির জন্য প্রযোজ্য না এবং খলিফার হাতে ন্যস্ত দায়িত্বসমূহ বাস্তবায়ন করার অধিকারও নেই দলটির।

বরং এটি কেবলমাত্র মুসলিমদের মধ্য থেকে বের হওয়া একটি দল এবং সামগ্রিকভাবে পুরো ইসলামী উম্মত হচ্ছে মুসলিম সম্প্রদায় (জামা'আতুল মুসলিমীন) যার অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে বিভিন্ন দল, ব্যক্তিবর্গ এবং খলিফা।

ইসলামী উম্মত বলতে বোঝানো হয় মুসলিম সম্প্রদায়কে যারা শরঈ হুকুমের মাধ্যমে নয় বরং ইসলামী আক্বীদাহ'র মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ। মুসলিমরা ফুরু (মৌলিক হুকুমের সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক হুকুমসমূহ) এর ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করতে পারে এবং এতে তাদের ভ্রাতৃত্ববোধে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়ে না। আহকাম যদি ভ্রাতৃত্ববোধের কারণ হতো তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই হতো না। ব্যক্তিগতভাবে অথবা দলীয়ভাবে যদি মুসলিমরা ইসলামী

আক্বীদাহ'কে পরিত্যাগ করে তাহলে তাদেরকে ইসলামী উম্মতের বাইরের লোক হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং তাদের পরিণতি হবে আগুন। রাসূল (সা)-এর হাদিসে এই বিষয়টিই বোঝানো হয়েছে:

**"যে ব্যক্তি দ্বীন পরিত্যাগ করে এবং নিজেকে জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।"** [বুখারী ও মুসলিম থেকে বর্ণিত] অর্থাৎ এখানে মুসলিম সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন বলে বোঝানো হয়েছে। রাসূল (সা)-এর নিম্নোক্ত হাদিসটিতেও একই বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে;

**"আমার উম্মত ৭৩ ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একটি দল বাদে বাকি সবাই জাহান্নামে যাবে।" তারা জিজ্ঞাসা করলেন: "সেই দলটি কারা, ইয়া রাসূলুল্লাহ?" তিনি (সা) বললেন: "আমি এবং আমরা সাহাবারা যার উপরে আছি (তার উপরে যারা থাকবে)।"** [আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ এবং ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত]

মুসলিম সম্প্রদায় হচ্ছে ইসলামী উম্মত যারা অন্যসব লোকের বাইরে আলাদা একটি উম্মত। মুসলিমদের রক্ত এবং সম্পদ হচ্ছে একটি একক বিষয়। জ্ঞান ও ইজতিহাদের দিক থেকে এদের মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও এরা পরস্পর সহাবস্থান করে এবং অন্যদের বিরুদ্ধে একটি একক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

অতএব, জামাআতুল মুসলিমীন (মুসলিম সম্প্রদায়) এবং মুসলিমদের মধ্যকার একটি দলের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। মুসলিম সম্প্দ্রায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট দলীলগুলোকে মুসলিমদের মধ্যকার কোনো দলের উপর আরোপ করা বিভ্রান্তিকর।

এজন্যই আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেন:

***"নিশ্চয়ই তোমাদের এই উম্মত হচ্ছে একটিই উম্মত এবং আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব কেবলমাত্র আমারই ইবাদাত কর।"*** [আল কুরআন ২১:৯২] তিনি আরো বলেন:

***" নিশ্চয়ই তোমাদের এই উম্মত হচ্ছে একটিই উম্মত আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমাকেই ভয় করো।"*** [আল কুরআন ২৩:৫২] রাসূল (সা) বলেন:

**"পারস্পরিক ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিতে মুমিনগণ একটি দেহের মতো। যদি শরীরের কোনো অংশ ব্যথা পায় তবে পুরো দেহই নিদ্রাহীনতা এবং জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ে।"** [বুখারী, মুসলিম ও আহমাদ থেকে বর্ণিত]

এসমস্ত আয়াতে মুসলিমদের মধ্যকার কোনো দলকে বুঝানো হয়নি বরং পুরো ইসলামী উম্মতকে বোঝানো হয়েছে। যদি কোনো দল মনে করে যে তার কর্মকাণ্ড হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর কর্মকাণ্ড তাহলে সেটা হবে তার অদ্ভূত চিন্তা এবং স্পষ্ট বিভ্রান্তি; ফলশ্রুতিতে যে তার সাথে কাজ করবেনা তাকে সে নিজের ভাই বলে গণ্য করবে না; বরং দ্বীন পরিত্যাগকারী, মুসলিমদের জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন এবং জাহান্নামের পথযাত্রী বলে মনে করবে এবং এসব চিন্তা মোটেই সামান্য কোনো ব্যাপার না।

একাধিক দলের উপস্থিতিকে যারা নিষিদ্ধ বলে মনে করে তারা মূলত নিচের দলীলগুলোকে উপস্থাপন করে থাকে:

***"আর তাদের মতো হয়ো না যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পরও বিরোধিতা শুরু করেছে- তাদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব।"*** [আল কুরআন ৩:১০৫]

***"নিশ্চয়ই যারা স্বীয় দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে তাদের সাথে (হে মুহাম্মাদ) আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয়টি আল্লাহ তাআলার নিকট সমর্পিত। অতঃপর তিনি বলে দিবেন যা কিছু তারা করে থাকে।"*** [আল কুরআন ৬:১৫৯]

এই দলীলগুলোও সেই বাস্তবতায় প্রয়োগ করা হয়নি যার জন্য এগুলো এসেছে।

দল সম্পর্কিত বিষয়ে এই আয়াত দুটোর কিছুই বলার নেই। শরঈ আহকামের সাথে এই আয়াতদ্বয়ের কোনো সম্পর্ক নেই বরং সম্পর্ক হচ্ছে আক্বীদাহ'র সাথে। 'তাদের মতো হয়োনা যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পরও বিরোধিতা শুরু করেছে'এর তাফসীরে বলা হয়েছে বিশুদ্ধ আক্বীদাহ ও স্পষ্ট প্রমাণের কথা। এখানে ইহুদী এবং খ্রিস্টানদেরকে বোঝানো হয়েছে:

***"তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।"*** ইমাম আল বাইদাবী এই আয়াত সম্পর্কে বলেন:

***'তাদের মতো হয়োনা যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।'*** এর অর্থ হচ্ছে ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের মতো যারা তাওহীদের ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেছিল.................................................................. যেমনটি বলা হয়েছে

*'স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পরেও।'* সত্যকে উপস্থাপনকারী নিদর্শন ও প্রমাণের ব্যাপারে অবশ্যই একমত থাকতে হবে। এই বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে উসূল (বিশ্বাস) এর ক্ষেত্রে বিভক্তি নিষিদ্ধ, ফুরু (আহকাম)-এর ক্ষেত্রে নয়; যা রাসূল (সা)-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি থেকে বুঝা যাচ্ছে:

**"কেউ যদি সঠিক ইজতিহাদ করে তাহলে সে দুটো সওয়াব পাবে আর কেউ যদি ভুল করে তাহলে সে একটি সওয়াব পাবে।"** এবং

*'তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব'* এই আয়াতটি হচ্ছে তাদের জন্য ভীতিপ্রদর্শন যারা বিভক্ত হয়েছে এবং এদেরকে যারা অনুসরণ করে তাদের জন্য সতর্কবাণী।"

অন্যভাবে বলতে গেলে, যে দলটি পরিবর্তনের জন্য কাজ করছে সে অন্যান্য দল থেকে শরঈ আহকামের দিক থেকে স্বতন্ত্র। এটি অন্যদের থেকে পৃথক এবং অন্যরা এর থেকে পৃথক কেবলমাত্র শরঈ আহকামের দিক থেকে। এটি মুসলিমদের একটি দল যার আক্বীদাহ হচ্ছে ইসলামিক। অন্যান্যদের সাথে এর পার্থক্য আক্বীদাহ'র ক্ষেত্রে নয় বরং আহকামের ক্ষেত্রে। অতএব, এই আয়াত অনুযায়ী একজন লোক তখনই দ্বীন থেকে বের হয়ে যায় যখন সে মুসলিমদের আক্বীদাহ'র বিরুদ্ধে চলে যায় কিন্তু আহকামের ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করলে তা হবেনা। অতএব, ইজতিহাদের ভিন্নতার ব্যাপারে এ আয়াতের কিছুই বলার নেই।

কেউ যদি বলে যে, আয়াতটি আম (সার্বজনীন) এবং এজন্য 'সুনির্দিষ্ট কারণের পরিবর্তে অর্থের সার্বজনীনতাকে বিবেচনা করতে হবে', তাহলে জবাবে আমরা বলব 'সার্বজনীনতা কখনো সে বিষয়ের বাইরে যায়না যে বিষয়ের জন্য আয়াতটি নাযিল হয়েছে।' কেবলমাত্র ভিন্ন আক্বীদাহ'র ব্যাপারেই আয়াতটির সার্বজনীনতা প্রযোজ্য। এটি আলোচনার একটি দিক। অন্য একটি দিক হচ্ছে তাদের এই মত সেসব হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক যেগুলো ইজতিহাদী মতভেদকে অনুমোদন করে। তৃতীয় দিকটি হচ্ছে তাদের এই মতের অর্থ হবে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মানে দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া।

দ্বিতীয় আয়াত

***"নিশ্চয়ই যারা স্বীয় দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে তাদের সাথে (হে মুহাম্মাদ) আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয়টি আল্লাহ তাআলার নিকট সমর্পিত। অতঃপর তিনি বলে দিবেন যা কিছু তারা করে থাকে।"*** [আল কুরআন ৬:১৫৯] এর ব্যাপারে ইবনে কাছীর বর্ণনা করেন; [মুজাহিদ, কাতাদাহ, আদ-দাহ্হাক এবং আস সুদ্দী বলেন: 'আয়াতটি ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।' আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে রাসূল (সা) তাকে বলেছেন:

**"তারা বিদআতের অনুসারী এবং তারা হচ্ছে শিয়া (সম্প্রদায়)"** অর্থাৎ এসব সম্প্রদায় হচ্ছে মিলাল (ভিন্ন ধর্ম) ও নিহাল (ভিন্ন আক্বীদাহ) এবং খেয়াল-খুশী ও পথভ্রষ্টতার অনুসারী। হামযা ও আল কাসাই থেকে জানা যায় যে, আয়াতটির ব্যাপারে আলি বিন আবু তালিব বলেন:

*'নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে'* এর অর্থ হচ্ছে নিজেদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা দ্বীনকে পরিত্যাগ করেছে এবং তারা হচ্ছে ইহুদী ও খ্রিস্টান;

*'তাদের সাথে (হে মুহাম্মাদ) আপনার কোনো সম্পর্ক নেই '* ] আল বাইদাবী বলেন: [অর্থাৎ তারা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তাদের কেউ ঈমান আনল, কেউ কুফরে লিপ্ত হল আর এভাবেই বিভক্তির সূচনা হলো ]

প্রকৃতপক্ষে, ফুরু (হুকুম) এবং আক্বীদাহ'র ক্ষেত্রে মতভেদ দুটো ভিন্ন বিষয়। আক্বীদাহ সংক্রান্ত এসব প্রমাণ এবং এরকম অন্যান্য প্রমাণের ক্ষেত্রে মতভেদ করা হারাম, যাতে আমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মতো না হয়ে পড়ি কারণ তারা

নিজেদের নবীদের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছিল, নিজেদের দ্বীনকে বিদআত ও পথভ্রষ্টতা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করেছিল এবং ভিন্ন সম্প্রদায় অর্থাৎ মিলাল ও নিহাল-এ পরিণত হয়েছিল। এই বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে:

*"কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে–তাদের কেউ ঈমান এনেছে এবং অন্যরা কাফির হয়ে গেছে।"*
**[আল কুরআন ২:২৫৩]**

অতএব, এটি ঈমান ও কুফরের বিষয়। দলীল ও এর অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে ভিন্নতার কারণে ফুরু (আহকাম)-এর ক্ষেত্রে সৃষ্ট মতভেদকে অনুমোদন করা হয়েছে এরকম প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে, তবে এর বাইরের অন্য কোনো বিষয়কে অনুমোদন করা হয়নি। মুসলিম উলেমাদের কাছে এই বিষয়টি known by necessity। শরঈ আহকামের ভিত্তিতে গঠিত একাধিক দলের উপস্থিতিকে নিষিদ্ধ করার জন্য আক্বীদাহ'র ক্ষেত্রে মতভেদ নিষিদ্ধ হওয়ার দলীলগুলোকে ব্যবহার করা খুবই সাদামাটা এবং ঠুনকো পর্যায়ের কাজ।

নিচের দলীলগুলোর বিষয়:

**"একসময় বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতি ছড়িয়ে পড়বে, সুতরাং কোনো বিষয়ে উম্মতের লোকজন একমত হয়ে যাবার পর যদি কেউ তোমাদেরকে বিভক্ত করতে আসে তাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত কর, সে যে-ই হোকনা কেন।"** এবং

**"যে বিভক্তির সৃষ্টি করে যে আমাদের কেউ না"** এবং

**"রাসূল (সা) আমাদেরকে ডাকলেন এবং আমরা তাঁর (সা) নিকট বাইআত দিলাম। তিনি আমাদের কাছ থেকে এই মর্মে বাইআত চাইলেন যাতে আমরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, কঠিন ও দুঃসহ পরিস্থিতিতে তাঁর (সা)-এর কথা শুনি ও তাঁকে (সা) মান্য করি এবং ততক্ষণ পর্যন্ত কর্তৃত্বশীল লোকদের সাথে বিবাদে না জড়াই যতক্ষণ না তাদেরকে এমন প্রকাশ্য কুফরে (কুফরে বুআহ) লিপ্ত হতে দেখি যার ব্যাপারে আমাদের নিকট আল্লাহর তরফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ আছে।"**

এই দলীলগুলো খলিফা, তার নিকট বাইআত, তার প্রতি আনুগত্য এবং প্রকাশ্য কুফরে লিপ্ত না হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার সাথে সম্পর্কিত।

কেউ যদি উম্মাহকে বিভক্ত করার ইচ্ছা নিয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে তাহলে তাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতে বলা হয়েছে সে যে-ই হোকনা কেন। মুসলিমদের মধ্যকার কোনো দলের সাথে এসব দলীলের দূরবর্তী বা নিকটবর্তী কোনো সম্পর্ক নেই। খলিফার জন্য প্রযোজ্য হুকুমসমূহ দলের জন্য প্রযোজ্য নয় এবং দল খলিফার স্থলাভিষিক্তও হতে পারে না বরং এটি কেবল খলিফাকে অস্তিত্বে আনতে এবং তাকে জবাবদিহি করার জন্য কাজ করে।

**"আল্লাহর হাত রয়েছে জামাআতের সাথে"** এবং

**"জামাআত হচ্ছে রহমত এবং বিভক্তি হচ্ছে আযাব"** একাধিক দলের উপস্থিতি নিষিদ্ধ হওয়ার সাথে এসব হাদীসের কোনো সম্পর্ক নেই। মুসলিম সম্প্রদায় অথবা কোনো মুসলিম দলের ছায়ায় থেকে মুসলিমরা আল্লাহর রহমতকে অনুভব করবে। বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি থাকলে শয়তান মুসলিমদের নিকটবর্তী হয়; এ ব্যাপারে রাসূল (সা) বলেন:

**"প্রকৃতপক্ষে, কোনো বিচ্ছিন্ন ভেড়াই নেকড়ের শিকারে পরিণত হয়।"** ফলে এর সাথে শাস্তির বিষয়টি জড়িত। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে ইসলামী কর্মকাণ্ডসমূহকে এক করে ফেলার জন্য কোনোরূপ নির্দেশনাই নেই হাদীসদ্বয়ের মানতুক (শব্দ) এবং মাফহুম (অর্থ)-এর মধ্যে।

একাধিক দলের উপস্থিতিকে নিষিদ্ধ বলে প্রমাণ করতে এসব শরঈ দলীলই ব্যবহৃত হয় অথচ এদের কোনোটাই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

এছাড়া একাধিক দল না রাখতে যেসব বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে এবং যেসব নেতিবাচক প্রভাবের কথা বিবৃত হয়েছে এদের কোনোটার জন্য কোনোকিছুকে প্রতিরোধ, নিষিদ্ধ বা বাধ্যতামূলক করা যাবে না। বরং কোনোকিছুকে প্রতিরোধ, নিষিদ্ধ বা বাধ্যতামূলক করে কেবল শরীআ'হ। খারাপ পরিস্থিতি এবং এর বি**স্তৃতি** ও প্রভাবকে যথার্থরূপে বুঝতে হবে এবং তারপরে

শরীয়াহ'র মধ্যে দলীল খুঁজতে হবে যেগুলো পরিস্থিতিকে সমাধান করার জন্য কোনোকিছুকে বাধ্যতামূলক বা নিষিদ্ধ করবে। অতএব, পরিস্থিতি থেকে কোনো শরঈ হুকুম গ্রহণ করার সুযোগ নেই।

## একাধিক দলের বৈধতা

এই বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে একাধিক দলের বৈধতাকে যেসব দলীলের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয় সেগুলোকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। তবে এর ফলে অন্যান্য যেসব মত একাধিক দলের উপস্থিতিকে অনুমোদন করে সেগুলোও বৈধ হয়ে যায়নি। কারণ কোনো বিষয় অবৈধ হলেই বিপরীত বিষয়টি বৈধ বলে প্রমাণিত হয়ে যায়না। এর জন্য এমনসব দলীলের প্রয়োজন যেগুলো ইসতিদলাল ও ইসতিনবাদের যথার্থতাকে প্রমাণ করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এক্ষেত্রে কী কী দলীল বিদ্যমান?

অসংখ্য দলীল রয়েছে যেগুলো ফুরু'র (আহকাম) ক্ষেত্রে মতভেদকে অনুমোদন করে, উসূলের (আক্বীদাহ) ক্ষেত্রে নয়। ফুরু সংক্রান্ত মতভেদকে অনুমোদনের ব্যাপারে সুন্নাহ'তে নির্দেশনা আছে। এজন্যই আমরা দেখি সাহাবীদেরকে (রা), তাবিঈন এবং সলফে-সালেহীন (পূর্ববর্তী সৎকর্মশীল) উলেমাদেরকে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করতে। মতভেদ নিষিদ্ধ হওয়ার দলীলগুলো এসেছে মূলত কাফিরদের মতভেদ সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থাৎ দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহে, ফুরু'র ক্ষেত্রে নয়। উদাহরণস্বরূপ, নবীগণ, পুনরুত্থান, জীবন, মৃত্যু এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের ব্যাপারে তাদের মতভেদ ছিল যার ফলে তারা ভিন্ন সম্প্রদায়, দল এবং মিলাল ও নিহালে পরিবর্তিত হলো। তাদের নবীদের নিকট আল্লাহ যে সত্য প্রেরণ করেছিলেন সেগুলো থেকে তারা অনেকদূরে সরে গিয়েছিল এবং নবীদের অনুসারীদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছিল। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেন:

***"অতঃপর তাদের মধ্যে দলগুলো পৃথক পৃথক পথ অবলম্বন করল। সুতরাং, মহাদিবস আগমনকালে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস।"*** [আল কুরআন ১৯:৩৭] এজন্য কাফিরদের অনুরূপ মতভেদের ব্যাপারে আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

পরিখার যুদ্ধের দিন সাহাবীদের ভিন্ন ভিন্ন মতকে রাসূল (সা) অনুমোদন করেছিলেন। তিনি (সা) বলেছিলেন:

**"যে শুনে এবং আনুগত্য করে, সে যেন বনী কোরাইযা না পৌঁছে আসরের সালাত আদায় না করে।"** [সীরাতে ইবনে হিশাম]

এই হাদিসটি থেকে নিচের বিষয়গুলো প্রতিপাদন করা যায়:

১) মুজতাহিদ ভুল করতে পারেন আবার সঠিক সিদ্ধান্তেও পৌঁছতে পারেন। অর্থাৎ মুজতাহিদ হওয়ার মানে এই না যে সে কোনো ভুল করতে পারবে না।

২) মুজতাহিদ কর্তৃক প্রতিপাদিত হুকুম হচ্ছে একটি শরঈ হুকুম, এমনকি যদি তা ভুলও হয়।

৩) মুজতাহিদ জেনেশুনে কোনো ভুল করেন না, তবে নিজের ভুল সম্পর্কে যদি জানতে পারেন তাহলে ভুলের মধ্যে থাকার কোনো সুযোগও তার নেই। নিজের দৃষ্টিতে তার সিদ্ধান্ত অন্যদের চাইতে শক্তিশালী বলে প্রতীয়মান হওয়াতেই তিনি ঐ মতটি পোষণ করেন।

৪) মুজতাহিদ আল্লাহ কর্তৃক পুরস্কৃত হবেন; তবে ভুল বা সঠিক হওয়ার কারণে পুরস্কার ভিন্ন হবে।

এ ব্যাপারে ইমামগণ একমত যে, ফিকহের কোনো সংশয়যুক্ত বিষয়ের শরঈ হুকুম প্রতিপাদনের ক্ষেত্রে ভুল হলে মুজতাহিদ গোনাহগার হবেন না।

আল কুরতুবী (র) তাঁর তাফসীরে বলেন; "ঐক্যবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন বিষয়ের হুকুমের ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ ছিল।" আল-বাগদাদী তার 'আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ' গ্রন্থে উমর বিন আব্দুল আযীয এর একটি মন্তব্য বিবৃত করেছেন: "মুহাম্মদ (সা)-এর আসহাব (রা) যদি মতভেদ না করতেন তাহলে আমি সন্তুষ্ট হতে পারতাম না, কারণ সেক্ষেত্রে আমাদের জন্যও (মতভেদ করার) সুযোগ থাকতনা।"

বিখ্যাত অনেক মুসলিম উলেমা তাদের গ্রন্থে মতভেদের কারণসমূহ বিবৃত করেছেন।

তাদের অন্যতম একটি হচ্ছে, কোনোকিছু বুঝার ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষমতা- মানবীয় বৈশিষ্ট্যের কারণেই মানুষে মানুষে ভিন্ন হয়। মানুষের ক্ষমতা ভিন্ন হওয়াতে তাদের সিদ্ধান্তেও ভিন্নতা আসে। এজন্যই সাহাবাদের (রা) যুগ থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন ইজতিহাদ এবং ভিন্ন ভিন্ন ইসতিম্বাত চলে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। এর অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে শরীয়াহ'র প্রকৃতি যার জন্য মানুষ ভিন্নমতে উপনীত হয় এবং এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর করুণা।

–কিরাআতের (পঠন পদ্ধতি) ভিন্নতার কারণেও সিদ্ধান্তে ভিন্নতা আসে। কোনো মুজতাহিদ যেভাবে পড়েছেন সে আলোকেই তিনি চিন্তা করবেন। এরূপ মতভেদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ওযু সংক্রান্ত একটি আয়াত যার আলোকে প্রশ্ন ওঠেছে পায়ের পাতা কি ধুতে হবে নাকি মুছে ফেললেই হবে?

–কিছু হাদীসের ব্যাপারে উলেমা এবং ফুকাহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হাদীসকে গ্রহণ বা বর্জন করার যে পদ্ধতি কোনো ইমাম প্রয়োগ করেন তার আলোকে কোনো হাদীস একজনের দৃষ্টিতে সহীহ হলেও তা অন্যজনের দৃষ্টিতে সেরূপ নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মুরসাল হাদীসের বিষয়টি দেখা যেতে পারে। এই উম্মতের ইমামগণের মধ্যে মুহাদ্দিস (হাদিস বিশেষজ্ঞ), উসূলী আলেম (আইনশাস্ত্রের ভিত্তি নিয়ে যারা আলোচনা করেন) এবং ফকীহদের (আইনজ্ঞ) মধ্যে মুরসাল হাদীসকে দলীল হিসেবে ব্যবহার করা নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ একে দলীল হিসেবে ব্যবহার করেছেন আর কেউ কেউ মুনকাতী হাদীস (যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের ধারার মধ্যে কোথাও ফাঁকা আছে) বলে একে ব্যবহার করেননি।

–মতভেদের অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে দলীলসমূহের পারস্পরিক সাংঘর্ষিক বিষয়াদি। উদাহরণস্বরূপ, কিছু দলীলে চিকিৎসাকার্যে নাজাস (অপবিত্র কিছু) এবং হারাম উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। যেমন:

**"প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ রোগ এবং এর প্রতিকার উভয়ই দিয়েছেন এবং প্রত্যেক রোগের জন্যই তিনি এর প্রতিকার দিয়েছেন। অতএব, হারাম কিছু দিয়ে প্রতিকার করো না।"** [আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত] অন্যদিকে কিছু দলীলে আবার নাজাস অথবা হারাম উপকরণ ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। যেমন:

**"রাসূল (সা) আব্দুর রহমান বিন আওফ এবং আয-যুবাইরকে সিল্ক পরিধানের অনুমতি দিয়েছিলেন কারণ তারা চর্মরোগে ভুগছিলেন।"** এছাড়া নিচের হাদীসটি

**"মুসলিমগণ ওষুধ হিসেবে উটের মূত্র ব্যবহার করতেন এবং এতে দোষের কিছু আছে বলে মনে করতেন না।"** [বুখারী থেকে বর্ণিত]

–যখন কোনো বিষয়ে স্পষ্ট দলীল থাকে না তখন সে বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাল- া হু তায়ালার হুকুম বের করার জন্য প্রয়োজন ইজতিহাদের এবং ইজতিহাদ হচ্ছে একটি অনুমানমুলক সিদ্ধান্ত যাতে মতভেদের সুযোগ থাকতে পারে।

–মতভেদের অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে অর্থের দিক থেকে আরবি ভাষার ব্যাপকতা। ইশতিরাক(ভিন্নার্থবোধক সমোচ্চারণ শব্দ), হাকীকাহ (আক্ষরিক অর্থ), মাজায (উপমা), মুতলাক (চরম) এবং মুকাইয়্যাদ (সীমিত), আম (সার্বজনীন) এবং খাস (সুনির্দিষ্ট) প্রভৃতি বিষয়ের উপস্থিতিই হচ্ছে এর প্রমাণ। কুরআন নাযিল হওয়ার ভাষা আরবির প্রকৃতিই হচ্ছে এরকম যে এর প্রকাশভঙ্গি এবং বাক্যপ্রকরণ (সিনট্যাক্স) এর কারণে তা বিভিন্ন অর্থ এবং বৈচিত্র্যময় নির্দেশনার জন্ম দেয়।

ফলে তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের ব্যাপারে আল্লাহর এই আয়াত:

***"আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন কুরু পর্যন্ত।"*** **[আল কুরআন ২:২২৮]** এখানে ব্যবহৃত কুরু শব্দটির অর্থ আরবিতে হতে পারে পবিত্র অথবা ঋতুস্রাবকালীন সময়। প্রশ্ন হচ্ছে এখানে কোন অর্থটিকে বোঝানো হয়েছে? এজন্য এই বিষয়টিতে ফুকাহাগণের মতভেদ করার অন্যতম একটি কারণ এটি।

সাধারণভাবে বলতে গেলে এটিই হচ্ছে এ সংক্রান্ত শরঈ আলোচনা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে তাদের কোনো একটিও কি আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে? অর্থাৎ শরঈ আহকামের ব্যাপারে মতভেদ করার যে সুযোগ শরীয়াহ অনুমোদন করেছে তার আলোকে সমাজ পরিবর্তনের জন্য কর্মরত একাধিক আন্দোলন বা দলের বিষয়টি কি অনুমোদিত হয়? নাকি এ বিষয়ের নিজস্ব কিছু সুনির্দিষ্ট প্রমাণাদি বিদ্যমান যেগুলো একে মূল নিয়ম থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে?

মৌলিক নিয়মসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বাদে শরঈ দলীলের অন্য যেসব জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই জ্ঞানকে অন্যান্য বিষয়ের শরঈ জ্ঞানের মতই ভিন্নভাবে বোঝার সুযোগ আছে। যেহেতু দলটি কর্তৃক গ্রহণকৃত শরঈ হুকুম হচ্ছে কিছু প্রতিপাদিত হুকুম সেহেতু সেগুলো ভুল বা সঠিক দুটোই হতে পারে। কোনো মুসলিম যদি দেখে যে একটি দলের চিন্তায় প্রচুর ভুল রয়েছে তাহলে সেই দলের সাথে কাজ করা তার জন্য উচিত হবে না। বরং তখন দলটিকে উপদেশ দিতে হবে এবং এমন একটি দলের খোঁজ করতে হবে যার সাথে কাজ করার মাধ্যমে সে আল্লাহর নিকট নিজেকে গোনাহমুক্ত রাখতে পারে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে মানবীয় প্রকৃতি, উলেমাগণের ভিন্নমত এবং শরীয়াহ ও আরবি ভাষার প্রকৃতি থেকে বোঝা যায় যে ভিন্নমতে পৌঁছার বিষয়টি অনুমোদিত। আর এ কারণেই একাধিক দল অস্তিত্বে আসতে পারে। তবে এই বিষয়টি ততক্ষণ পর্যন্ত দোষের কিছু না যতক্ষণ পর্যন্ত তা শুধুমাত্র জ্ঞানের ক্ষেত্রে মতভেদ সংক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রে যে দলটি সত্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী তার সাথে কাজ করা ফরয।

এছাড়া নিচের আয়াতটি:

*"আর তোমাদের মধ্য থেকে একটি দল বের হোক যারা মানুষকে খায়র (ইসলাম) এর দিকে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজের নিষেধ করবে। আর এরাই হচ্ছে সফলকাম।"* **[আল কুরআন ৩:১০৪]**

এই আয়াতটি কমপক্ষে এমন একটি দল প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিচ্ছে যার কাজ হবে: খায়র (ইসলাম)-এর দিকে ডাকা, সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজের নিষেধ করা। এই আয়াতটি কেবলমাত্র একটি দলের উপস্থিতিকে বুঝাচ্ছে না; যদি তাই হতো তাহলে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলতেন: 'উম্মাহ ওয়াহিদা (এক উম্মত)'। বরং এখানে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে কাজের ধরন সম্পর্কে- যা হচ্ছে দাওয়াত দেওয়া, সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজের নিষেধ করা। এটি ফরযে কিফায়া যা বাস্তবায়নের জন্য কমপক্ষে একটি দলের প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তের কারণে একাধিক দল সৃষ্টি হলে তাতে দোষের কিছু নেই। এই ধরনের নির্দেশনা শতশত আয়াত ও হাদীসে বিদ্যমান আছে। উদাহরণস্বরূপ নিচের হাদীসটি;

**"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো মুনকার সংঘটিত হতে দেখে তাহলে সে যেন নিজের হাত দিয়ে তা পরিবর্তন করে দেয়..."**
যা কোনো একটি মুনকারকে বুঝাচ্ছে না বরং মুনকারের ধরন সম্পর্কে বুঝাচ্ছে।

Abu al-A'la al-Mawdudi (may Allah have mercy on him) mentioned the following in his book 'Islamic concepts regarding religion and state' under the chapter on: The obligation of enjoning the *ma'roof* and forbidding the *munkar*; "What is apparant from the partative in the ayah;
***'আর তোমাদের মধ্যে থেকে বের হোক একটি দল যারা মানুষকে খায়র (ইসলাম)-এর দিকে ডাকবে।'*** তার অর্থ এই না যে, ইসলামের দিকে ডাকা, সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎকাজের নিষেধ করার ফরয দায়িত্বটি কেবলমাত্র একটি দলের এবং এই দলের বাইরের মুসলিমদের জন্য এই কাজগুলো ফরয না। বরং এর মানে হচ্ছে উম্মাহর মধ্যে কমপক্ষে এমন একটি দল সবসময়ই থাকা ফরয যা হক্ব ও খায়র-এর আলোকবর্তিকাকে রক্ষা করবে এবং অন্যায় ও বিভ্রান্তির অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। যদি উম্মাহর মধ্যে এরকম কোনো একটি দলও বিদ্যমান না থাকে তাহলে মানবজাতির জন্য উত্থানকৃত সর্বোত্তম উম্মত আল্লাহর অভিশাপ ও ভয়ঙ্কর শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না।"

পূর্বে আমরা যা বর্ণনা করেছি তার আলোকে বলা যায়:

–আমাদেরকে এই বিষয়টি খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে যে শরীয়াহ যা অনুমোদন করেছে তা হচ্ছে আমাদের জন্য অনুগ্রহস্বরূপ। যদি এটি কোনো বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তা কেবল মুসলিমদের ভুল বোঝার পরিণতি, অন্য কিছু না। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, দুজন মহান ইমামের উন্নত ফিকহ আমাদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত। 'শুযূর আয-যাহাব' (স্বর্ণখণ্ড)-এ বর্ণিত আছে, ইমাম শাফেঈর ছাত্ররা একদিন তার নিকট এসে অভিযোগ করল তিনি কিভাবে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের সাথে দেখা করেন যেখানে ইমাম হাম্বলের ছাত্ররা তাদের সাথে ভিন্নমতের বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়। এ ব্যাপারে শাফেঈ বলেন:

"তারা বলল; 'আহমাদ আপনার সাথে দেখা করে এবং আপনি তার সাথে দেখা করেন',

আমি বললাম, 'তার গৃহে কল্যাণ আছে। যদি তিনি আমার সাথে দেখা করেন তাহলে তাকে ধন্যবাদ আর যদি আমি তার সাথে দেখা করি তাহলে সেটা তারই বদান্যতা। উভয়ক্ষেত্রেই প্রশংসা তার।' "

একই ধরনের ঘটনা ইমাম আহমাদ এবং তার ছাত্রদের মধ্যে ঘটেছিল। ইমাম আহমাদ তখন তার ছাত্রদেরকে বললেন;

"যদি আমাদের বংশ ভিন্ন হয় তাহলে যে জ্ঞানটি আমাদেরকে এক করবে তা হচ্ছে আমরা একই পিতা থেকে এসেছি; যদি আমরা ভিন্ন সমুদ্রের পানি হই, তাহলে বুঝতে হবে যে আমরা একই উৎস থেকে নিঃসৃত বিশুদ্ধ পানি।"

–শরীয়াহ'র প্রকৃতি এবং মানবীয় প্রকৃতির বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে যদি কেউ মনে করে যে, সে কোনো কাজের ব্যাপারে সমস্ত মুসলিমকে এক করে ফেলবে তাহলে তাকে আমরা সেই কথাটি বলতে চাই যেই কথাটি ইমাম মালিক হারুনুর রশীদকে বলেছিলেন, যখন হারুনুর রশীদ মালিকের জ্ঞান ও মাযহাবকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, একে লোকজনের উপরে বাধ্যতামূলক করতে চেয়েছিলেন এবং অন্যদের জ্ঞানকে নিষিদ্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন; "লোকজনের জন্য সংকীর্ণ করে দিওনা, যখন আল্লাহ তাদেরকে প্রশস্ততা দিয়েছেন।"

–যখন কুফর রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রযন্ত্র দেখতে পায় কোনো এক বা একাধিক দল আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করছে এবং পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করছে ও জোরালো প্রচারণা চালাচ্ছে তখন তারা চায় এসব দলকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে দিতে অথবা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন দল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সঠিক দলগুলোকে ব্যর্থ করে দিতে। যদি আমরা ধরে নিই যে একাধিক দলের বিষয়টি অনুমোদিত নয় তাহলে সঠিক দলটিকে অন্যান্য দলের সাথে এক হয়ে যেতে হবে এবং ফলে ভালো ও খারাপের সংমিশ্রণ ঘটবে। কিন্তু শরীয়াহ'র নির্দেশ হচ্ছে বিপরীত অর্থাৎ আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে খারাপকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে এবং উত্তমকে সাথে রাখতে যাতে লোকজন উপকৃত হয়।

–যেহেতু এই প্রস্তাবনাটি (ইসলামী কর্মকাণ্ডসমূহকে এক করে ফেলার বাধ্যবাধকতা এবং একাধিক দলের উপস্থিতিকে নিষিদ্ধ করা) শরীয়াহ, মানবীয় প্রকৃতি এবং যে ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে তার প্রকৃতিগত বাস্তবতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সেহেতু এই প্রস্তাবনাটি বাস্তবায়ন করা অসম্ভব। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে থাকলে আমরা এর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ খিলাফত প্রতিষ্ঠা থেকে দূরে সরে থাকব। মুসলিমরা যতক্ষণ এক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সাহায্য করবেন না– এই মন্তব্য ভিত্তিহীন এবং অগ্রহণযোগ্য। বরং আল্লাহ মুসলিমদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করেন না যতক্ষণ না তারা শরীয়াহ'র আনুগত্য করছে, আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরছে এবং তাঁর (সুবহানাহু তায়ালার ) নির্দেশগুলো পূরণ করছে। এক্ষেত্রে যদি তারা সংখ্যায় অল্প হয় তবুও তাদেরকে আল্লাহ সাহায্য করবেন। কারণ সত্যের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিশীল একজন লোকই অনেক বেশি বলে গণ্য এবং বিপরীতে ভ্রান্ত পথের অনুসারী অনেক হলেও তারা সমুদ্রের ফেনার মতো বলে বিবেচিত।

এই বিষয়ে একটি কথা না বললেই নয় যে, খলিফা এবং ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে মুসলিমদেরকে এক করার সবচেয়ে বড় দিক এবং এটি ছাড়া কোনো একত্রীকরণ সম্ভব না। ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত থাকতে পারে কিন্তু আমরা খলিফার আনুগত্য করতে নির্দেশপ্রাপ্ত। ইমাম কোনো হুকুম গ্রহণ করে এবং গ্রহণকৃত হুকুমের সাহায্যে মুসলিমদের মধ্যকার বিবাদ নিষ্পত্তি করে কিন্তু তিনি ভিন্নমতকে প্রতিরোধ বা নিষিদ্ধ করেন না। মুসলিমরা তার নির্দেশ প্রকাশ্যে এবং গোপনে মানতে বাধ্য। কোনো দলের আমীরের নির্দেশ দলের ভিতরের সবাই মানতে বাধ্য এবং তিনি বৃহৎ পরিসরে সমস্ত মুসলিমের সমস্যার সমাধান না করলেও দলের সদস্যদের মধ্যকার বিবাদ নিষ্পত্তি করেন।

## আন্দোলন কি আঞ্চলিক হবে নাকি বৈশ্বিক?

যেহেতু সমগ্র পৃথিবীর জন্য ইসলাম একটি দ্বীন হিসেবে এসেছে এবং মুহাম্মাদ (সা) পুরো মানবজাতির জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন সেজন্য কিছু মুসলিম প্রস্তাব করে যে ইসলামী আন্দোলনকেও বৈশ্বিক হতে হবে। এছাড়া বাস্তবতা বিবেচনা করলেও দেখা যায় ইসলামী আন্দোলনকে বৈশ্বিক বিভিন্ন আন্দোলনের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। উপরন্তু, ইসলামী পরিবর্তন সূচিত করার লক্ষ্যে যে বিশাল কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন সেজন্যও প্রয়োজন বৈশ্বিক আন্দোলন। যারা এরূপ ধারণা পোষণ করে তারা প্রমাণ হিসেবে কুরআনের এ আয়াতগুলো উদ্ধৃত করে:

***"এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে এবং রাসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্যে।"*** [আল কুরআন ২:১৪৩]

***" বলে দিন (হে মুহাম্মাদ): 'হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ প্রেরিত রাসূল।"*** [আল কুরআন ৭:১৫৮]

***"আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানেনা।"*** [আল কুরআন ৩৪:২৮] এজন্যই আমরা দেখি রাসূল (সা) পুরো মানবজাতি, প্রত্যেকটা শক্তি ও দল এবং রাজার নিকট তাঁর

দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন। তিনি নাজ্জাশী(আবিসিনিয়ার রাজা), হিরাক্লিয়াস(রোমের সম্রাট), মুকাওকিস(মিশরের সম্রাট) এবং কিসরা(পারস্যের সম্রাট) সবার নিকট পত্র পাঠিয়েছিলেন। এজন্য ইসলামী কর্মকাণ্ডকে কোনো একটি দোকান বা মাঠে বিচ্ছিন্নভাবে রেখে দেয়া যায়না। যার ফলে ইসলামী কর্মকাণ্ড কেবল একটি উপত্যকা থেকে উঠে আসা আর্তচিৎকার বলে মনে না হয়।

প্রকৃতপক্ষে, আক্বীদাহ এবং ব্যবস্থার দিক থেকে ইসলাম একটি বৈশ্বিক দ্বীন।

মূল্যহীন তরল (শুক্রাণু) থেকে সৃষ্ট এবং দুর্বল ও চাহিদাসম্পন্ন মানবজাতি অবশ্যই ফিরে যাবে সেই মহান সত্তার নিকট যিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, সমস্ত বিষয়ের পরিচালনাকারী এবং সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞাত। আল্লাহই মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই পুরো মানবজাতির রব। পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের সাথে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য জড়িত, যা হচ্ছে আল্লাহর ইবাদাত। জীবনের পরের ঘটনাসমূহ অর্থাৎ পুনরুত্থান, জান্নাত, জাহান্নাম এবং ঈমান ও কুফর, আনুগত্য ও অবাধ্যতার প্রতিদান প্রভৃতি বিষয়ের সাথেও তার অস্তিত্ব জড়িত। আক্বীদাহ'র সত্যতার প্রমাণ অবশ্যই সঞ্চালিত হতে হবে এবং সকলের নিকট তা পৌঁছাতে হবে;

***"যাতে যেসব লোক নিহত হওয়ার ছিল তারা (ঈমান প্রত্যাখ্যানের ফলে) নিহত হয় প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর এবং যাদের বাঁচার ছিল তারা বেঁচে থাকে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পরে।"*** [আল কুরআন ৮:৪২]

ইসলামী আক্বীদাহ থেকে উৎসারিত যে জীবনব্যবস্থা আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন সেটা বর্ণ, গোত্র বা অবস্থানের উর্ধ্বে সমস্ত মানুষের জন্যই প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম হচ্ছে একটি বৈশ্বিক জীবনব্যবস্থা। অতএব, ইসলামকে প্রতিষ্ঠার যে বীজ বপন করা হবে তা যেন হয় একটি বৈশ্বিক বীজ- সেজন্য ইসলাম আমাদেরকে বাধ্য করে। ইসলাম দলটিকে বাধ্য করে যাতে সে এই দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। ফলে দলটি নিজেদের কর্মকাণ্ডকে সংকীর্ণরূপে দেখতে পারে না অথবা কোনো একটি দেশে এর কর্মকাণ্ডকে সে সীমিতও করতে পারে না। কোনো গোঁজামিল দেওয়া অথবা ক্রমান্বয়িক প্রস্তাবনাও সে গ্রহণ করতে পারে না যার ফলে সত্যকে আংশিকভাবে গ্রহণ করবে এবং সত্যের চরম রূপ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে। বরং দলটিকে এটা এভাবে দেখতে হবে যে সে কুফরের নষ্টামি এবং শিরকের বিভ্রান্তি থেকে মানবজাতিকে একক সত্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অতীতে লোকজন মনে করত যে, মূর্তি মানুষের মঙ্গল করে এবং মঙ্গল-অমঙ্গলের বিষয়টি মূর্তির হাতেই নিহিত। বর্তমানে কিছু নির্দিষ্ট চিন্তাকে মানুষ কল্যাণ আনয়নকারী বলে মনে করে এবং অন্য চিন্তাকে ক্ষতিকর বলে মনে করে। এসমস্ত বিষয় বিবেচনায় রেখে দলটিকে প্রয়োজনীয় চিন্তাভাবনা গ্রহণ করতে হবে- যার উপর ভিত্তি করে নিজেদের কর্মকাণ্ড এবং চলার পথ তাকে স্থির করতে হবে। যেকোনো পরিস্থিতিতে যদি দলটি ধৈর্য্যের সাথে এবং কোনোরূপ বিচ্যুতি প্রদর্শন না করে, দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় পথ না চলে, আপোষ না করে এবং নমনীয়তা প্রদর্শন না করে, তাহলে আল্লাহ দলটিকে সেরকমভাবে প্রস্তুত করবেন যা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে এই দায়িত্বকে বৈশ্বিকভাবে পালন করতে সক্ষম হয়। চিন্তার দিক থেকে দলটি বৈশ্বিক, কিন্তু কাজের দিক থেকে বাস্তবিকভাবে চিন্তা করতে গেলে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সে খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে এবং এর বাইরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব না। অতএব, এই বিশাল দায়িত্বটি খিলাফত রাষ্ট্রের কাজ।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। বর্তমানে মুসলিমরা যেসব ভূখণ্ডে বাস করছে সেগুলোকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত করা হয়েছে এবং এসব ভূখণ্ডের মুসলিমরা প্রায় একইরকম পরিবেশে আছে। ফলে কোনো সুসংগঠিত কর্মকাণ্ড যদি এসব ভূখণ্ডে বিস্তার লাভ করতে চায় তাহলে এর পদ্ধতি পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই, যদিও এসব রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। দলটির বিস্তৃতি একে শক্তিশালী করে তুলবে, এর সচেতনাকে বৃদ্ধি করবে এবং একে আরো কার্যকর করে তুলবে। কোনো ভূখণ্ডে খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রের বিস্তৃতির জন্যও তা সহায়ক হবে। ফলে খিলাফত প্রতিষ্ঠার পরের দায়িত্ব বহন করতে দলটির জন্য তা সহায়ক হবে এবং রাষ্ট্রের জন্য বৈশ্বিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ সহজতর হবে। উভয় পরিস্থিতিতেই দলটিকে নির্ভর করতে হবে আল্লাহর সাহায্যের উপরে।

## কর্মকান্ড কি আংশিক হবে নাকি ব্যাপক এবং ভারসাম্যপূর্ণ হবে?

কিছু মুসলিম কর্মী আছেন যারা ইসলামী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সমন্বিত এবং সুষম পদক্ষেপ গ্রহণ করার একটি ধারণা উপস্থাপন করেন আবার অনেকে আংশিক কর্মকাণ্ড জোরালোভাবে পরিচালনা করার কথা বলেন।

সমন্বিত পদক্ষেপ বলতে বুঝানো হয় অন্যান্য বিষয় ও দিক বাদ দিয়ে কেবল কোনো একটি আংশিক বিষয় বা দিকের উপরে কর্মকাণ্ডকে সীমিত না করা। ইসলামী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে ইবাদাত সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক

ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। নবুয়্যতের যুগে ইসলামের প্রথমদিককার কর্মকাণ্ড ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। রাসূল (সা) তখন ইসলামের সমস্ত দিকের অনুসরণ করছিলেন। কর্মক্ষেত্রে অথবা নৈতিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে, তিনি ছিলেন একজন মুরব্বী, শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি ছিলেন শিক্ষক, জিহাদের ময়দানে ছিলেন নেতৃত্বদানকারী, পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ছিলেন উপদেষ্টা। ইসলামী কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বত্র রাসূল (সা)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে আমরা বাধ্য এবং এক্ষেত্রে তাঁর (সা) অনুসরণ করা বা না করার বিষয়টি আমাদের ইচ্ছার উপরে নির্ভরশীল না।

অন্যদিকে ইসলামী কর্মকাণ্ডের আংশিক দিক হচ্ছে ইসলামের কোনো একটি দিকের মধ্যে নিজেদেরকে সীমিত রাখা। তারা শুধুমাত্র এরই অনুসরণ করে, একে অতিক্রম করেনা। তারা শুধুমাত্র এই আংশিক কাজের উপরেই আস্থা রাখে, অন্যকিছুর উপরে না। আংশিক কর্মকাণ্ডের ফলে বিভিন্ন দল সৃষ্টি হয়, কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিভক্তি আসে এবং লোকজনের কর্মপ্রচেষ্টা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। বনী ইসরাঈলের আংশিক কর্মকাণ্ডকে কুরআন প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেন:

***"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনো পথই নেই। কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেওয়া হবে।"*** **[আল কুরআন ২:৮৫]** এই বিষয়ের পক্ষালম্বনকারীরা আরো বলে থাকে যে, জাহিলিয়্যিাতের ঐক্যবদ্ধ চ্যালেঞ্জ আমাদেরকে বাধ্য করে সমন্বিত কর্মকাণ্ড গ্রহণ করতে।

মুসলিম কর্মীদের এই দলটি মনে করে ইসলামী কর্মকাণ্ডের সমস্ত দিককে গুরুত্ব অনুযায়ী সুষম ও সমন্বিতভাবে পালন করতে হবে, না হলে কিছু বিষয়ে অপর্যাপ্ততা থেকে যাবে এবং অন্যান্য বিষয়ে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। এই সমন্বিতকরণের ক্ষেত্রে প্রাধান্যদানের যুক্তি বিবেচনা করতে হবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, সমন্বিতকরণের ধারণাটি পুরো ইসলামের সাথেই জড়িত। এজন্য দলটির কর্মকাণ্ডকেও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। সুতরাং সমন্বিতকরণের বিষয়টি আমাদের কাছে দাবী করে প্রত্যেকের নিজস্ব গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুযায়ী সমস্ত বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়া। এক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত কিছু করার প্রয়োজন নেই তাহলে তা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, আবার কোনো বিষয় অপর্যাপ্ত থাকলে সেটাও ত্রুটিপূর্ণ হবে।

সমন্বয় ও সুষমকরণের নিয়মসমূহ বিভিন্ন বস্তু ও কাজের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। মুসলিম-অমুসলিম সবাই এই নিয়মসমূহকে প্রত্যক্ষ করেছে। ফলে তারা নিজেদের জীবনে এসব নিয়মের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং এগুলোকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করে, যাতে কাঙ্ক্ষিত পরিণতি অর্জন করা যায়।

যাই হোক, কেউ লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে, বস্তুর সমন্বয় ও ভারসাম্য আনয়নের সিদ্ধান্ত মনের উপরে নির্ভরশীল কিন্তু কাজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি এর বিপরীত অর্থাৎ এটি শরীয়াহ'র উপরে নির্ভরশীল।

কারণ, বস্তুর বাস্তবতা ও বাস্তবতার উপাদানসমূহ এবং এদের নির্দিষ্ট অনুপাত-এগুলো মন উপলব্ধি করতে পারে। এই বিষয়টি বিশেষজ্ঞগণ ভালো বুঝতে পারেন; এক্ষেত্রে রাসূল (সা) এর নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রযোজ্য:

**"দুনিয়ার ব্যাপারে তোমরা আমার চাইতে অধিক জ্ঞানী।"** [মুসলিম থেকে বর্ণিত]

অতএব, কৃষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং মেকানিক প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রের নিয়ম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। প্রত্যেকেই এই সমন্বয় ও সুষমকরণের নিয়মগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করে।

কিন্তু কাজের বিষয়টি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এবং এক্ষেত্রে রাসূল (সা)-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রযোজ্য,

**"যেকোনো কাজ যা আমাদের বিষয়ের (দ্বীনের) মধ্য থেকে না, সেটা প্রত্যাখ্যাত।"** [বুখারী ও মুসলিম থেকে বর্ণিত]

নিম্নোক্ত শরঈ মূলনীতিটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য:

'প্রকৃতপক্ষে, কাজের আনুগত্য করতে হবে শরঈ হুকুম অনুযায়ী।' কারণ কোনো কাজ হাসান (ভালো) নাকি কুবহ্ (তিরস্কারযোগ্য) সেটা খোদ কাজ থেকে নয় বরং কাজের ব্যাপারে মানুষের ধারণার সাহায্যে ঠিক করা হয়। কোনো মুসলিম যেসব চিন্তায় বিশ্বাস করে সেগুলোর সাহায্যে সে তার কাজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। যদি আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ

অনুযায়ী কাজটি সম্পাদিত হয় তাহলে সেটা হাসান (ভালো), অন্যথায় কুবহ্ (তিরস্কারযোগ্য)। শরীয়াহ মূলনীতি অনুযায়ী: 'শরীয়াহ যাকে হাসান সাব্যস্ত করেছে সেটাই হাসান এবং শরীয়াহ যাকে কুবহ্ সাব্যস্ত করেছে সেটাই কুবহ্।

ফলে কোনো মুসলিম যখন বস্তুর সমন্বয় ও ভারসাম্য আনয়নের চিন্তা করে তখন সে অন্যান্য মানুষের মতোই নিজের মনের উপরে নির্ভর করে। কিন্তু যখন কাজের ব্যাপারে প্রশ্ন আসে, তখন সেটা অবশ্যই শরঈ হুকুম অনুযায়ী হতে হবে।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন–কাজের সমন্বয় ও সুষমকরণের জন্য কোনোরকম বাড়াবাড়ি ছাড়াই শরঈ দিক থেকে কাজের বিশালত্ব আগে বুঝতে হবে। এজন্য নিচের বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করতে হবে;

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা এবং সমস্ত মুসলিম অর্থাৎ ইসলামী উম্মতকে পুরো ইসলামের দায়িত্ব নিতে হবে।

ব্যক্তি, দল এবং খলিফার সমন্বয় হচ্ছে ইসলামী উম্মত। এদের প্রত্যেকের জন্যই নির্দিষ্ট হুকুম রয়েছে।

ফলে ব্যক্তিগতভাবে মুসলিমরা সেসব দায়িত্ব পালন করে যেগুলো শরীয়াহ তার উপরে ন্যস্ত করেছে। দল তার নিজস্ব দায়িত্ব পালন করে। খলিফা সেসব দায়িত্ব পালন করে যেগুলোর জন্য সে খলিফা হিসেবে নির্দেশপ্রাপ্ত।

দল এবং খলিফার মতো মুসলিমগণও যদি ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের পালনীয় কর্তব্যসমূহ পূরণ করে, তাহলে কাজ পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হবে। বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে যদি (ব্যক্তি, দল বা খলিফার) কেউ কোনোরকম শৈথিল্য প্রদর্শন করে, তাহলে দায়িত্ব পালনে অবহেলাকরী হিসেবে সে অপরাধী হবে।

খলিফা ছাড়া পুরো ইসলাম পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকতে পারেনা। যেহেতু দ্বীনের অনেক হুকুম খলিফার অস্তিত্বের উপরে নির্ভরশীল, সেহেতু তার অস্তিত্বে থাকা এবং তাকে অস্তিত্বে আনার জন্য কাজ করা ফরয। ফলে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুরো দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ করতে হবে দলটিকে। একে বলা হয় ইসলামী জীবনব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করার কাজ। দলটির কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে এটিই শরীয়াহ প্রত্যাশা করে এবং এটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন নয়, পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের কাজ সে বাস্তবায়ন করতে পারে না এবং এই দায়িত্বটি তার উপরে ন্যস্তও না। বরং এমন অনেক হুকুম রয়েছে যেগুলো বাস্তবায়ন করা এর জন্য হারাম। উদাহরণস্বরূপ, হুদুদ এমন একটি বিষয়। অতএব, দলটি খলিফার ভূমিকা পালন করতে পারে না বরং খলিফা যাতে নিজের দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে সেজন্য সে খলিফাকে অস্তিত্বে আনার জন্য কাজ করে।

**"জনগণের জন্য আমীর হচ্ছে মেষপালকের মতো যে তার পালের জন্য দায়িত্বশীল।"** [মুসলিম থেকে বর্ণিত]

**"...প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।"** [মুসলিম থেকে বর্ণিত]

একটি বিষয়ের দিকে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, মুসলিমরা পুরো ইসলামের উপরে বিশ্বাস করে, এবং এর দিকে সাধারণভাবে ডাকে। তবে সে শুধুমাত্র সেসব বিষয়ই পালন করে যেগুলো ব্যক্তি হিসেবে তার কাছ থেকে শরীয়াহ দাবী করে এবং যে দলের সাথে সে কাজ করে সেই দলটি তার কাছ থেকে যা দাবী করে। এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে পালন না করলে আল্লাহ তাকে জবাবদিহি করবেন। অনুরূপভাবে ব্যক্তি হিসেবে খলিফার কাছ থেকে শরীয়াহ যা দাবী করে সেগুলো সে পালন করবে। অতএব তাকে সালাত আদায় করতে হবে, সিয়াম পালন করতে হবে, হজ্জ পালন করতে হবে, যাকাত দিতে হবে, মা-বাবার দেখাশোনা করতে হবে এবং ব্যভিচার, সুদ, মিথ্যা বলা ও প্রতারণা থেকে বিরত থাকতে হবে। খলিফা হিসেবে শরীয়াহ তার কাছ থেকে যা দাবী করে সেগুলোও তাকে পালন করতে হবে। ফলে তিনি আইন জারি করবেন, জিহাদ ঘোষণা করবেন, মুসলিমদেরকে রক্ষা করবেন, আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয়াদি দিয়ে শাসন করবেন এবং হুদুদ প্রয়োগ করবেন। এসমস্ত বিষয়ে কোনোরকম শৈথিল্য প্রদর্শন করলে আল্লাহ তাকে জবাবদিহি করবেন।

উল্লিখিত বাস্তবতার জন্যই শরঈ হুকুমসমূহ এসেছে। এই বিষয়টি দলের নিকট স্পষ্ট থাকা উচিত, যাতে সে বুঝতে পারে কোন কাজটি তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে কোন কাজটি দায়িত্বের মধ্যে পড়েনা। অতএব, খলিফার জন্য যেসব কাজ রয়েছে সেগুলো দল সম্পাদন করতে পারে না। দল যদি নিজের বাস্তবতাকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারে তাহলে সে তার দায়িত্বগুলো নির্ধারণ করতে পারবে এবং সেগুলোর জন্যই তাকে জবাবদিহি করতে হবে। সমন্বিতকরণের বিষয়টি চিন্তা করলে আমাদেরকে এরূপ সিদ্ধান্তেই আসতে হবে।

নিজের দায়িত্বসমূহ নির্ধারণ করার পরে যদি দলটি নির্ধারিত কাজসমূহের কোনো একটির মধ্যে নিজেকে সীমিত রেখে অন্যগুলোকে বাদ দিয়ে দেয় অথবা কোনো একটি বিষয়ের দিকে তীক্ষ্ণ নজর দেয় এবং অন্যগুলোকে তেমন গুরুত্ব না দেয় অথবা দায়িত্বসমূহের মধ্যে প্রাধান্যদান না করে তাহলে সে দায়িত্বসমূহের মধ্যে সুষমকরণে ব্যর্থ হবে। তবে এক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে প্রাধান্যদানের বিষয়টি মন নয় বরং শরীয়াহ নির্ধারণ করে। অতএব, দলটির কাজ হচ্ছে রাজনৈতিক এবং সে ঐ মতাদর্শকে ইসলামী উম্মতের উপরে বাস্তবায়িত করতে চায় যার আলোকে সে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দাওয়াতের ক্ষেত্রে আক্বীদাহ'র অবস্থান হচ্ছে সর্বাগ্রে, কারণ এটিই সেই ভিত্তি যা থেকে প্রত্যেকটা শাখা বের হয়েছে এবং সমস্ত শরঈ আহকাম এর সাথে সম্পৃক্ত। খিলাফত প্রতিষ্ঠার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার গুরুত্ব অনেক বেশি কারণ, এর উপরে প্রচুর আহকাম নির্ভরশীল এবং এজন্য এটি 'ফরযসমূহের মুকুট' হিসেবে পরিচিত।

অতএব, দলটি যদি এই দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে গিয়ে সমন্বয় ও ভারসাম্য আনয়নের জন্য সংগ্রাম করে তাহলে সে এমনকিছুর জন্য নিজেকে চালনা করবে যা আল্লাহ নির্ধারণ করেননি। তখন সে অপর্যাপ্ততা এবং অসমতার অভিযোগ করবে যেমনভাবে সে একাধিক দল থাকার বিষয়ে অভিযোগ করে। তখন সে এমন একটি দলে পরিণত হবে যে অভিযোগ করে ও হতাশা ব্যক্ত করে এবং নিজের পথ হারিয়ে ফেলে, কারণ সে নিজের দিক নির্দেশনার কম্পাস হারিয়ে ফেলেছে।

ইসলামী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য যদি হয় ইবাদাতের পদ্ধতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সামরিক ব্যবস্থা প্রভৃতির সমন্বয় তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় এসব ব্যবস্থার সাথে দলটির সম্পর্ক কী? দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। যখন আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত হবে তখন বিভিন্ন ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ভূমি ও মালিকানা, উৎপাদন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কিত শরঈ আহকাম রয়েছে। অন্যান্য হুকুমের পাশাপাশি এসব হুকুমসমূহ বিধানদাতা খলিফার হাতে ন্যস্ত করেছেন। এসমস্ত বিষয় দেখাশোনা করার দায়িত্ব দলের নয় বরং খলিফার।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাপারে বলতে গেলে বলতে হয় যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় শরীয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা এবং স্তম্ভসমূহের উপর ভিত্তি করে; যেমন: খলিফা, মুওয়ায়িন (সহযোগী) থেকে শুরু করে ওয়ালি (গভর্ণর), কাজী (বিচারক), প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং মজলিস আল উম্মাহ (উম্মাহ কাউন্সিল) পর্যন্ত। খলিফা, মুওয়ায়িন এবং ওয়ালী প্রত্যেকেরই কিছু নির্দিষ্ট ক্ষমতা আছে। সেনাবাহিনী এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার নিজস্ব কর্মক্ষেত্র রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে এসমস্ত বিষয়ে দলের কি করার আছে?

ইসলামী সেনাবাহিনী ও এর প্রস্তুতিকে অবশ্যই বিশ্বের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে হবে, কারণ এর জন্যই একে গঠন করা হয়েছে। এর প্রস্তুতি কেবলমাত্র কৌশলগত দিক- যেমন কীভাবে মেশিনগান ঠিকঠাক করতে হবে, ব্যবহার করতে হবে অথবা কীভাবে গ্রেনেড ছুঁড়তে হবে–এতটুকু পর্যায়ে থাকলে চলবেনা বরং একে অবশ্যই বৈশ্বিক পর্যায়ে থাকতে হবে। কিছু অস্ত্র আছে যেগুলো ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করা যাবে আবার কিছু অস্ত্র আছে যেগুলো কেবলমাত্র রাষ্ট্র ব্যবহার করতে পারবে। এজন্য প্রশিক্ষণকে সর্বাধুনিক পর্যায়ে রাখতে ট্যাংক, সাঁজোয়া বাহিনী, বিমান বাহিনী এবং পারমাণবিক প্রযুক্তি ও মহাশূন্যযান প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণদান অপরিহার্য। গবেষণাগার, অস্ত্রকারখানা, বিমানবন্দর, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রভৃতি এবং এগুলোর বাইরেও আরো অনেককিছু নির্মাণ করতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে এসমস্ত বিষয়ে দলের কী করার আছে? রাসূল (সা) যখন সাহাবাগণকে (রা) প্রস্তুত করতেন ও প্রশিক্ষণ দিতেন তখন তিনি কোনো একটা দলের দায়িত্বশীল হিসেবে তা করেননি বরং একটা রাষ্ট্রের শাসক হিসেবে এগুলো করেছেন। অতএব, এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই এক্ষেত্রে রাসূল (সা)-কে অনুসরণ করতে হবে।

এসমস্ত ব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন করা নিজের দায়িত্ব বলে মনে করা দলটির জন্য উচিত নয়; বরং দলটির কাজ হচ্ছে খলিফাকে অস্তিত্বে আনা যিনি নিজের দায়িত্ব হিসেবে এগুলোকে বাস্তবায়ন করবেন। উম্মাহ যদি খলিফাকে অস্তিত্বে আনার কাজকে অবহেলা করে এবং খলিফার কাজগুলোকে নিজেরা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে তাহলে এর মাধ্যমে শরীয়াহ'কে বিকৃত করা হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা যদি দলটিকে তৌফিক দেন তাহলে তারা যেসব আহকামের মাধ্যমে লোকজনের উপরে এসব ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে ইচ্ছুক সেগুলোকে বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে গ্রহণ করতে দলটি বাধ্য। এ লক্ষ্যে দলটি ইসলামী ব্যবস্থার কাঠামো এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানের রূপরেখা নির্ধারণ করবে। জনগণের নিকট ইসলামী আহকামের একটি সাধারণ চিত্র

উপস্থাপন করবে দলটি, যাতে জনগণ এসব সমস্যা সমাধানে দলের সামর্থ্যকে অনুভব করে। তখন তারা বিশুদ্ধ শরঈ আহকাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাতের দিকে অগ্রসর হবে এবং আল্লাহর রহমতকে অনুভব করবে।

এবার তাদের ব্যাপারে আসা যাক, যারা শরীয়াহ'র ক্ষুদ্র একটি অংশ নিয়ে কাজ করার পক্ষপাতী। যদি তারা কোনো দাতব্য সংস্থা হয় অথবা নৈতিক সংগঠন হয় অথবা এমন কোনো সংগঠন হয় যারা কোনো একটিমাত্র শরঈ হুকুম যেমন কুরআন শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত সংগঠন হয় তাহলে এগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে যতক্ষণ পর্যন্ত এর সদস্যগণ কোনো একটি শরঈ হুকুমের ভিত্তিতে এক থাকে। তবে যদি তারা এরূপ দাবী করে যে তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলব যে তারা পরিকল্পিত শরঈ তরীকাহ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তখন তাদের এই আংশিক কর্মকাণ্ড অবশ্যই বর্জনীয় হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার নাযিলকৃত আহকাম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে যে দলটি কর্মরত তাকে অবশ্যই তার প্রয়োজনীয় কর্তব্যসমূহ পালন করতে হবে; যেমন সে খলিফার দায়িত্বসমূহ গ্রহণ করবে না। অথবা ব্যক্তিবিশেষের হুকুমসমূহকে নিজের জন্য গ্রহণ করবেনা অথবা নিজেকে পুরো ইসলামী উম্মত বলেও মনে করবেনা বরং নিজেকে মুসলিম উম্মতের মধ্যকার একটি দল বলে মনে করবে এবং আল্লাহর আহকাম প্রতিষ্ঠিত করা ও ইসলামী জীবনব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করাকে নিজের উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করবে। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তখন সে প্রয়োজনীয় সবকিছু গ্রহণ করবে; যেমন: সে ইসলামী আক্বীদাহ'র সঠিক রূপটিকে এবং এর সাথে সম্পর্কিত চিন্তাগুলোকে গ্রহণ করবে এবং গ্রহণকৃত আক্বীদাহ'র আলোকে এর শাবাবদেরকে গড়ে তুলবে। উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি, জনগণকে শাসন করার জন্য নির্দিষ্ট সংবিধান এবং মুসলিমদের মধ্যে বিদ্যমান ভ্রান্ত চিন্তাসমূহের ভ্রান্ততা দূর করে শুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় চিন্তাসমূহ দলটিকে গ্রহণ করতে হবে। দলের সাথে যারা কাজ করে তারা যেন নিজেদের ব্যক্তিগত বিষয়াদি যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে একজন পরহেযগার মুসলিম হতে পারে সে বিষয়টিও দলের নজরে থাকতে হবে। যার ফলে আক্বীদাহ, ইবাদাত, সামাজিক লেনদেন এবং নৈতিকতা প্রভৃতি বিষয়ে সে প্রয়োজনীয় সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার উপরে দলটিকে focus করতে হবে যার সমস্ত সম্পর্ক হবে ইসলামের ভিত্তিতে এবং যার নিরাপত্তা রক্ষিত হবে খিলাফত রাষ্ট্রের মাধ্যমে। শাসকশ্রেণী এবং তাদের প্রভুদের কর্মকাণ্ড দলটিকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যাতে সে বুঝতে পারে মুসলিমদের জন্য কোন কোন ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। দলটিকে এসব বিষয় জনগণের সামনে উন্মোচন করতে হবে এবং উম্মাহর জন্য যা কল্যাণকর অর্থাৎ শরঈ আহকাম -তা নিজস্ব অবস্থান থেকে দলটিকে গ্রহণ করতে হবে। এসব তাগুত যারা মুসলিমদের সাথে নিষ্ঠুরভাবে আচরণ করে তাদের কাছ থেকে সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতা দখল করে নেওয়ার জন্য দলটিকে কাজ করতে হবে। যদি এসব বিষয় যথাযথভাবে দলটি পালন করে তাহলে সে তার দায়িত্ব পরিপূর্ণ করবে।

দলটির চিন্তাভাবনাসমূহ বিস্তৃত হতে হবে এবং এর কর্মক্ষেত্র হতে হবে প্রসারিত। এজন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই দলটিকে সম্পাদন করতে হবে এবং বাস্তবে এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে অনেক বিষয়। প্রয়োজনীয় সমতা বিধান করে দলটিকে এর কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে হবে; অতএব সে শরীরচর্চা বা নৈতিক বা অর্থনৈতিক কোনো সংগঠন হবেনা ... বরং অবশ্যই এটি এর রাজনৈতিক পদক্ষেপ এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে অব্যাহত রাখবে। অতএব, এর চিন্তাভাবনাসমূহ হবে উম্মাহর বিষয়সমূহ দেখাশোনা করা এবং উম্মাহর স্বার্থসমূহ সংরক্ষণ করা।

অতএব, পূর্ববর্ণিত উপায়ে আংশিক কার্যক্রম অবশ্যই পরিত্যাজ্য। দলের জন্য নির্ধারিত এবং অনির্ধারিত সমস্ত কর্মকাণ্ডকে ব্যাপকভিত্তিতে বাস্তবায়নের চিন্তাও একটি ভুল চিন্তা যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

# ১০

# ক্রমাণ্বয়ে ইসলামের বাস্তবায়ন

ক্রমাণ্বয়ে বা ধাপে ধাপে ইসলামকে বাস্তবায়নের যে দূষিত চিন্তাটি সমাজে বিদ্যমান সেটি এবং তা থেকে উদ্ভূত অন্যসব দূষিত চিন্তা যেমন বিদ্যমান ব্যবস্থাসমূহে অংশগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে আমরা এখানে আলোকপাত করতে চাই, সেগুলোর প্রতি ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করতে চাই এবং এসব চিন্তার ভ্রান্তি সম্পর্কে উম্মাহকে সচেতন করতে চাই। সমাজ পরিবর্তনের জন্য প্রচেষ্টারত কিছু দলের লোক মানুষের মনে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য এরকম একটি দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে থাকে যে, ইসলাম থেকে গণতন্ত্র এসেছে ।এর কারণ হচ্ছে তাদের কর্মকাণ্ডের সাথে এ জাতীয় চিন্তার জোরালো সম্পর্ক রয়েছে।

অতএব প্রথমেই আমাদের বোঝা দরকার, ধাপেধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন বলতে কি বোঝায়? যারা এই চিন্তাকে ধারণ করে তাদের মতে এতে কোন কোন বিষয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে? এই চিন্তাকে ধারণ করার পেছনে কি যুক্তি রয়েছে? এবং এ ব্যাপারে শরঈ হুকুম কি?

যখন মুসলিমরা আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ল, বস্তুগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতার দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ল এবং রাজনৈতিকভাবে অধ:পতনের চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে পৌঁছাল তখন এই অধ:পতিত অবস্থার ছাপ তাদের চিন্তার মধ্যেও ফুটতে শুরু করল। যারা তখন ইসলামের আনুগত্যের দাবী করত তাদের চিন্তার মধ্যে ইসলামের সত্যতা এবং জীবন সম্পর্কে ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির কোন প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যেতনা; বরং তাদের চিন্তার মধ্যে ইসলামের সত্যতা এবং জীবন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ভুল এবং দুর্বল ধারণার প্রতিফলন দেখা যেত। কাফির সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ যখন মুসলিমদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হল তখন নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী মুসলিমদেরকে পরিবর্তন করার এবং নিজেদের কুফরী ধ্যান-ধারণা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার সামর্থ্য অর্জন করল। তারা তাদের বিজাতীয় চিন্তাসমূহ মুসলিমদের অন্তরে প্রোথিত করে দিল যেগুলো ভিন্ন স্বাদের ফল বহন করে এবং ইসলামের শত্রুদের মুখে সুন্দর শোনায় ও তাদের জিহ্বার মিষ্টতা বাড়ায়। ফলাফল যায় কাফিরদের পক্ষে এবং এই ঘটনার জন্য ইসলাম দায়ী ছিলনা বরং দায়ী ছিল ইসলামের অনুসারীদের স্পষ্ট আনুগত্য ও সঠিক জ্ঞানের অভাব। যেসব মুসলিম এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করছিল তারা একদিকে বাস্তবতার দ্বারা এবং অন্যদিকে পার্থিব স্বার্থ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। যাইহোক তাদের এসব ভুল প্রচেষ্টা এবং খোঁড়া পদক্ষেপ দ্রুতই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল এবং কুফরের নিকট চরমভাবে আত্মসমর্পণ করল। ফলে আমাদের ভূমিগুলোতে কোনরকম প্রতিবন্ধকতা অথবা প্রতিরোধ ছাড়াই কুফর অবাধে বিচরণ করতে লাগল। এখন প্রশ্ন হল কাফির সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ কিভাবে ইসলামকে আক্রমণ করল? এবং তখন মুসলিমদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

কাফির সাম্রাজ্যবাদীরা এই বলে ইসলামকে আক্রমণ করল যে ইসলাম যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং জীবনের সমস্যাসমূহের সমাধান দিতে সক্ষম নয়। জবাবে মুসলিমরা এমনসব সমাধান বের করতে শুরু করল যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেহেতু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তি এবং ইসলামের ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে সাংঘর্ষিক সেহেতু তারা এই বৈপরীত্যকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করতে লাগল। নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে তারা বিভিন্ন ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল যা থেকে পরবর্তীতে আরো অনেক ভুল ধ্যান-ধারণা এবং বৈশিষ্ট্য জন্ম নেয়। সেসব ভুল ধ্যান-ধারণা এবং বৈশিষ্ট্যসমূহকে তখন ইসলামী শরীয়াহর উপর আরোপ করা শুরু হল যার উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ও পুঁজিবাদের সামঞ্জস্যতা বিধানের মাধ্যমে এটা প্রমাণ করা যে ইসলাম যুগের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। ফলাফল দাঁড়াল এরূপ যে এসব সমাধানকে ইসলামী চিন্তা, মৌলিক নীতিমালা এবং বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ করা হলো ;এগুলো ব্যবহার করে ইসলামকে বোঝার চেষ্টা করা হতে লাগল যদিও এসব চিন্তাকে গ্রহণ করার মানে হচ্ছে বাস্তবে ইসলামকে পরিত্যাগ করা এবং পুঁজিবাদের অনুসরণ করা। সামঞ্জস্যতা বিধান এবং এ চিন্তা দ্বারা আক্রান্ত যেকোন ধ্যান-ধারণার দিকে আহ্বান ছিল প্রকৃতপক্ষে কুফরের গ্রহণ এবং ইসলামের বর্জন। এর মাধ্যমে মুসলিমদেরকে আহ্বান করা হয় যাতে তারা কুফরী চিন্তাসমূহকে গ্রহণ করে এবং ইসলামের প্রকৃত দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে।

অতএব অধ:পতনের যুগে উম্মাহর পুনর্জাগরণের জন্য গৃহীত এসব চিন্তা পরিস্থিতিকে আরো খারাপ করে তুলল। ফলে উম্মাহকে চূড়ান্ত অধ:পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে তারা ব্যর্থ হল কারণ তারা নিজেরাই সেই অধ:পতিত অবস্থায় নিমজ্জিত ছিল।

ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে হোক অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে লোকজনের মুখে এমনসব কথা শোনা যেতে লাগল যা ছিল ইসলামী শরীয়ার জন্য লজ্জাজনক। তারা দাবী করতে লাগল রাসূল (সা) এর চৌদ্দশত বছর পরে সেই সনাতন মানসিকতা নিয়ে ইসলামকে ব্যখ্যা করা নিস্প্রয়োজন। তাদের মতে আমাদের উচিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য নিজেদেরকে এমনভাবে আধুনিকায়ন করা যাতে ইসলাম আবারো নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে। তারা বলতে লাগল ইসলামকে আধুনিকভাবে সজ্জিত করতে হবে এবং এর মধ্যে আধুনিক চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে যাতে অন্তর আবারো এতে আস্থা ফিরে পায়। একে অস্পষ্টতা থেকে এবং লোকজনের অভিযোগ থেকে বের করে আনতে হবে। ফলে ইসলামের পুরানো চেহারা আর জীবিত রইলনা।

যাইহোক এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিছু মুসলিম বিভিন্ন নতুন চিন্তার উদ্ভাবন শুরু করল। তারা নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক নীতিমালা উদ্ভাবন করল, এগুলোকে সংজ্ঞায়িত করল এবং জীবনকে নতুন পথে পরিচালিত করল। এগুলোই হচ্ছে অধ:পতিত যুগের চিন্তা যেগুলোর জন্ম হয়েছে আমাদের ভূখণ্ডগুলোতে পাশ্চাত্যের নষ্ট চিন্তাসমূহের উত্থানকালে। তখনকার মুসলিমরা ভাবতে লাগল যে ইসলাম যাতে যুগের চাহিদা পূরণ করতে পারে সেজন্য যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলা এবং পাশ্চাতের আধিপত্য বিস্তারকারী চিন্তাসমূহ থেকে সুবিধা গ্রহণ করা তাদের জন্য একটি শরঈ দায়িত্ব।

এই নতুন বিন্যাসকে ধারণকারী অনেক চিন্তা সামনে আসতে শুরু করল যেমন; "ধর্ম হচ্ছে একটি নমনীয় এবং পরিবর্তনশীল বিষয়", "গ্রহণ কর এবং চাহিদা পূর্ণ কর", "সেসব বিষয় গ্রহণ কর যেগুলো শরীয়তসম্মত অথবা যেগুলো শরীয়ার সাথে সাংঘর্ষিক নয়", "সেটি গ্রহণ কর যেটি তুলনামূলকভাবে কম খারাপ বা কম ক্ষতিকর", "যদি পুরো বিষয়টিকে গ্রহণ করতে না পার তাহলে এর অধিকাংশকে ছুঁড়ে ফেলোনা", "ইসলামকে ক্রমান্বয়ে গ্রহণ কর", "এই বিষয়টি প্রত্যাখ্যাত নয় যে সময় এবং স্থানভেদে হুকুমের পরিবর্তন হয়" "যেখানে সুবিধা বিদ্যমান সেটিই হচ্ছে আল্লাহর শরীয়াহ"। আধুনিক ইসলামী পুনর্জাগরণের জন্য যারা আহ্বান করত এসব চিন্তা এবং এজাতীয় চিন্তাসমূহ ছিল তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান বা মৌলিক নীতিমালা। বিশ্বব্যাপী এসব চিন্তা ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রদূত ছিল freemason জামালউদ্দিন আফগানী এবং শায়খুল ইসলাম নামে পরিচিত তার ছাত্র freemason মুহাম্মাদ আবদুহু।

অন্তরে খারাপ ইচ্ছা এবং কুপরিকল্পনা নিয়ে লোকজন এসব কথা বলতে লাগল যাতে তারা মুসলিমদেরকে তাদের শক্তির উৎস থেকে দূরে সরিয়ে ফেলতে পারে, তাদেরকে দুর্বল করে ফেলতে পারে এবং এভাবে আবারো আল্লাহর হুকুমকে প্রতিষ্ঠিত করা থেকে বিরত রাখতে পারে।

অন্তরে সদুদ্দেশ্য এবং ভাল পরিকল্পনা নিয়েও কিছু লোক এসব কথা বলছিল কারণ তারা ভাবছিল উম্মাহর অধ:পতনের ফলে মুসলিমদের অসুস্থতার আরোগ্যকারী ওষুধ হিসেবে এসব চিন্তা কাজ করবে।

সদুদ্দেশ্যে বলা হোক অথবা অসদুদ্দেশ্যে এসব চিন্তার ফলাফল ছিল একই রকম। যাই হোক আমরা দ্বীনের বিরুদ্ধে কাফিরদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মুসলিমদেরকে সচেতন করে দিতে চাই এবং তাদেরকে উপদেশ দিতে চাই এসব দূষিত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দেয়ার জন্য যেগুলোর ভ্রান্তি বাস্তবে প্রমাণিত। কারণ এগুলো কোন মঙ্গল বয়ে আনতে পারেনা এবং কোন অমঙ্গলও দূর করতে পারেনা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ আমাদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধতম জাতিতে পরিণত করেছেন কারণ আমাদের প্রয়োজনীয় সবকিছুই ইসলামে আছে যার বাইরে অন্যকিছুর দরকার নেই আমাদের। ইসলামের প্রকৃতিই আমাদেরকে একটি পদ্ধতির সন্ধান দেয় এবং বাধ্য করে সে অনুযায়ী বিধিবিধান নেয়ার জন্য। জীবনের সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য আল্লাহ দ্বীন ইসলাম নাযিল করেছেন এবং আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে শুধুমাত্র ইজতিহাদের মাধ্যমে শরীয়াহ দলীলসমূহ থেকে আল্লাহর হুকুমসমূহ জেনে নেয়া, অন্য কোথাও থেকে নয়। বুদ্ধিবৃত্তিক নীতিমালাসমূহকে অবশ্যই শরীয়াহর দলীলাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে কারণ শরীয়াহ দলীলসমূহেরই বিস্তারিত প্রমাণাদি বিদ্যমান। ইজতিহাদের প্রক্রিয়া একটি নির্ধারিত বিষয় যা সবসময় একই রকম থাকবে এবং একে কোন ভাবে পরিবর্তনের সুযোগ নেই। এই ভিত্তি থেকেই আমাদের অগ্রযাত্রার সূচনা হবে যা আমাদের পূর্বেও ঠিক একইভাবে শুরু হয়েছিল।

কিছু নিয়ন্ত্রিত শর'ঈ চিন্তা এবং মৌলিক নীতিমালা উল্লেখ করা প্রয়োজন যেগুলো দ্বারা অবশ্যই আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রিত হতে হবে যাতে সেগুলো আমাদের সঠিক পথের নির্দেশনা দিতে পারে এবং সঠিকভাবে বিন্যস্ত করতে পারে ফলে তখন আমরা সে অনুযায়ী কাজ করতে পারব। উদাহরণ স্বরুপ -"যেখানে শরঈ হুকুম বিদ্যমান সেটাই স্বার্থ এবং এর বিপরীত নয়", "কাজের ভিত্তি অবশ্যই শরঈ হুকুম দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে হবে", "নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ না থাকলেই কেবল কোন বস্তু মুবাহ (অনুমোদিত) বলে গণ্য হবে", "*হাসান*(প্রশংসনীয়) হচ্ছে তাই যাকে শরীয়াহ *হাসান* সাব্যস্ত করেছে এবং *কাবীহ*(নিন্দনীয়) হচ্ছে তাই যাকে শরীয়াহ *কাবীহ* সাব্যস্ত করেছে ", "ভাল হচ্ছে তাই যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে এবং খারাপ হচ্ছে তাই যা আল্লাহকে রাগান্বিত করে", "শরীয়াহর উপরে অন্যকিছুর প্রাধান্য নেই", "যে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে পড়বে তিনি তাদের জীবনকে সংকীর্ণ এবং কঠিন করে দিবেন", "অন্য সমস্ত জাতির বাইরে মুসলিমসমরা হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র জাতি", " স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্রকে ইসলাম অনুমোদন করে না", " ইসলাম একটি স্বতন্ত্র জীবনব্যবস্থা যা অন্যসব জীবনব্যবস্থা থেকে পুরোপুরি ভিন্ন।"

কিছু শরঈ মূলনীতির সাথে নিজেদেরকে পরিচিত করানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যাতে পূর্ববর্তী সৎকর্মশীলগণের অনুসরণ করতে পারি এবং তাদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ইবতিদায় (বিদআতে) লিপ্ত হয়ে না যাই। কারণ প্রত্যেকটা বিদআতই (দ্বীনের মাঝে নতুন সংযোজন) প্রত্যাখ্যাত।

রাসূল (সা) বলেছেন:

**"আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো বিপথে যাবেনা। একটি স্পষ্ট বিষয় আল্লাহর কিতাব এবং অন্যটি তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।"** [ সীরাতে ইবনে হিশাম] এখানে কখনো শব্দটি দ্বারা পরবর্তী যুগের লোকজনকেও অন্তর্ভূক্ত করে নেওয়া হয়েছে যারা বিপথে যাবেনা; ফলে আমরাও এর অন্তর্ভূক্ত হচ্ছি।

তিনি (সা) বলেছেন:

**"আমার উম্মত ৭৩টি ফিরকায় বিভক্ত হবে। তাদের মধ্য থেকে একটি বাদে বাকি সবগুলো জাহান্নামে যাবে। তাঁরা(সাহাবীরা) জিজ্ঞেস করলেন; ইয়া রাসূলুল্লাহ তারা কারা? তিনি(সা) বললেন: 'আমি এবং আমার সাহাবীরা আজকে যে পথের উপরে আছি ( সে পথের উপরে যারা থাকবে তারা)।'"** [ আবু দাউদ,আত-তিরমিযি,ইবনে মাজাহ এবং ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত]

তিনি(সা) বলেছেন:

**"আমি তোমাদের জন্য উজ্জ্বল প্রমাণ রেখে যাচ্ছি। আমার পরে পথভ্রষ্টরা ব্যতীত অন্য কেউ তা থেকে বিচ্যুত হবেনা।"** [ইবনে মাজাহ এবং ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত]

তিনি (সা) বলেছেন:

**"আমার প্রজন্মের লোকেরা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম, তারপরে এদের পরবর্তীগণ এবং তারপরে তাদের পরবর্তীগণ...।"** [মুসলিম হতে বর্ণিত]

তিনি (সা) বলেছেন:

**"...তোমাদের মধ্যে যারা দীর্ঘজীবী হবে নিশ্চিতভাবেই তারা অনেক বিতর্ক দেখতে পাবে। নতুন উদ্ভাবিত বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থাক কারণ প্রত্যেকটা নতুন বিষয়ই বিদআত এবং প্রত্যেকটা বিদআতই জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়...নিজেদেরকে আমার সুন্নাহর উপরে এবং সৎপথপ্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নাহর উপরে রাখ –তাদেরকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর।"** [আবু দাউদ এবং আত-তিরমিযি থেকে বর্ণিত]

তিনি (সা) আরো বলেছেন:

**"যে কাজ আমাদের বিষয়ের (দ্বীনের) মধ্য থেকে নয় তা প্রত্যাখ্যাত।"** [বুখারী এবং মুসলিম থেকে বর্ণিত]

এই হাদীসগুলো আমাদেরকে কল্যাণের (খায়র) অনুসরণ করতে এবং বিদআতের ব্যপারে সতর্ক থাকতে আহ্বান করে। কল্যাণের (খায়র) অনুসরণ করলে তা রাসূল (সা) এর যুগ থেকে অধিক বিচ্যুতির সম্ভাবনাকে দুর্বল করে ফেলে। এ থেকে এই অনুভূতির জন্ম হয় যে যুগ যত পরবর্তী হবে তত কঠোর এবং জোরালোভাবে আনুগত্য করতে হবে আমাদের, সত্যের সন্ধানে অধিক মনোযোগী হতে হবে এবং আরো বেশি আন্তরিক হতে হবে। কারণ আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যাতে আমরা রাসূল(সা) এর সুন্নাহর উপরে ও সৎপথপ্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নাহর উপরে এবং রাসূল (সা) ও তাঁর সাহাবাদের (রা) সুন্নাহর উপরে থাকি। সুতরাং আমরা নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন করবনা এবং নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ের অনুসরণও করবনা, কারণ যারা এরূপ করে তারা প্রত্যাখ্যাত। অতএব প্রশ্ন হলো আজকের দিনে এসব বিষয় নিশ্চিত করার উপায় কি?

–ইসলামী আক্বীদাকে নিজেদের অন্তরে স্পষ্টভাবে ও বিশুদ্ধরূপে সংরক্ষণ করতে হবে আমাদের এবং এটা যাতে কোন অস্পষ্ট বিষয় দ্বারা প্রভাবিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

–ইসলামের পবিত্র এবং বিশুদ্ধ উৎস থেকেই নিজেদের তৃষ্ণা মিটাতে হবে আমাদের।

–হুকুম বের করার যে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি আছে তা অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে আমাদের কারণ এটা শরঈ হুকুমসমূহকে লোকজনের খেয়াল-খুশী এবং ব্যক্তিগত মতামতসমূহ থেকে রক্ষা করে।

–ইসলামকে নিজেদের জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত করতে হবে আমাদের; নিজেদের উপরে, নিজেদের সন্তানদের উপরে, পার্থিব যেকোন সুবিধার উপরে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপরে তাকে স্থান দিতে হবে; যাতে আল্লাহর কথাগুলো জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের(সা) উপরে অন্য কিছুকেই আমরা প্রাধান্য না দেই এবং সেই অবস্থানে থাকি যে অবস্থানে সালফে-সালেহীন (পূর্ববর্তী সৎকর্মশীলগণের) এর যুগে মুসলিমরা ছিল।

–নিজেদের অন্তর থেকে কুফরের সমস্ত আবর্জনাময় চিন্তা আমাদেরকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে এবং এর চাকচিক্য ও উত্তেজনা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে ঠিক তেমনিভাবে যেমনভাবে সাহাবা (রা) গণ ইসলামের প্রবেশদ্বারে জাহিলিয়াতের সমস্ত আবর্জনাময় চিন্তা পরিত্যাগ করে পবিত্র এবং আল্লাহভীরু হিসেবে এতে প্রবেশ করেছিলেন।

আর এসব বিষয় পালনের জন্য আমাদেরকে পূর্ববর্তী যুগের দিকেই ফিরে যেতে হবে কারণ উম্মাহর পরবর্তী যুগে এমন কিছু পাওয়া যাবেনা যা পূর্ববর্তী যুগের চাইতে উত্তম। মুসলিমদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এটি একটি অপরিহার্য বিষয়। তাদের নিকটবর্তী হওয়া অথবা দূরবর্তী হওয়ার উপর নির্ভর করেই আমাদের অবস্থা ভাল নাকি খারাপ তা বুঝা যাবে।

উপরোক্ত আলোচনার পর এখন পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে ক্রমধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন বলতে কি বোঝায়? যারা এই চিন্তাকে ধারণ করে তাদের মতে এতে কোন কোন বিষয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে? এই চিন্তাকে ধারণ করার পেছনে কি যুক্তি রয়েছে? এবং এ ব্যাপারে শরঈ হুকুম কি?

ধাপেধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন বলতে বোঝায় কোন নির্দিষ্ট শরঈ হুকুমকে একবারে বাস্তবায়ন না করে ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়ন করা। একে তারা বলে মারহালিয়্যাহ। এক্ষেত্রে প্রথমে মুসলিমরা এমন একটি হুকুমের দিকে ডাকে যা নিজে শরীয়তসম্মত নয় কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে এটি বিদ্যমান হুকুমের চাইতে শরঈ হুকুমের অধিক নিকটবর্তী। তারপরে তারা শরীয়তসম্মত নয় কিন্তু বিদ্যমান হুকুমের চাইতে শরঈ হুকুমের অধিক নিকটবর্তী হুকুমটিকে ক্রমধাপে পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে প্রকৃত শরঈ হুকুম বাস্তবায়ন করার দিকে আহ্বান করতে থাকে। তারপরে শরীয়তসম্মত নয় এমন একটি হুকুম থেকে অন্য একটি হুকুম যা নিজে শরীয়তসম্মত নয় কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে বিদ্যমান হুকুমের চাইতে শরঈ হুকুমের অধিক নিকটবর্তী–তাতে পরিবর্তন করে অথবা পরিবর্তন করার আহ্বান জানাতে থাকে যতক্ষণনা তাদের দৃষ্টিতে যা প্রকৃত শরঈ হুকুম তা বাস্তবায়ন করতে পারছে।

এর মানে হচ্ছে অল্পকিছু শরঈ হুকুম বাস্তবায়ন করা এবং বাদবাকি কুফরী হুকুম বাস্তবায়িত হওয়ার ব্যাপারে ততক্ষণ নীরব থাকা যতক্ষণনা শরীয়াহ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ধাপেধাপে ইসলাম বাস্তবায়নের জন্য কোন নির্দিষ্ট ধাপসংখ্যা নেই। এমনকি যারা এর পক্ষে কথা বলে তাদের মতে এর জন্য কোন নির্দিষ্ট নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিও নেই। একটি হুকুম বাস্তবায়িত করতে একটি, দুটি, তিনটি এমনকি এর চাইতেও বেশি ধাপের প্রয়োজন হতে পারে। এই ধরনের ক্রমান্বয়িকতার ক্ষেত্রে ধাপসংখ্যা নির্ধারণের উপর পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রভাব

সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। ধাপসংখ্যা অল্পকিছু অথবা অনেকগুলো হতে পারে এবং প্রতিটা ধাপ বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প বা দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হতে পারে।

আক্বীদাগত বিষয়ে ধাপেধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন ধারণাটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকতে পারে; যেমন ইসলাম থেকে সমাজতন্ত্র এসেছে অথবা ইসলাম থেকে গণতন্ত্র এসেছে–এই মন্তব্যগুলোকে সমর্থন করা। শরঈ হুকুমগুলোও এর অন্তর্ভূক্ত হতে পারে যেমন এই বিষয়টিকে অনুমোদন করা যে একজন নারী হাঁটুর সামান্য নিচ পর্যন্ত কাপড় পরবে এবং প্রকৃত শর'ঈ হুকুম অনুযায়ী পোশাক পরিধানের জন্য সে কয়েকটি ধাপের মধ্য দিয়ে যাবে। আবার ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের ক্ষেত্রেও এটি হতে পারে যেমন শরীয়ার দৃষ্টিতে হারাম হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যমান ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করা-এমনকি যারা ক্রমান্বয়িকতার পক্ষে কথা বলে তাদের মতেও বিষয়টি হারাম। যাই হোক তারা এরূপ দাবী করেনা যে এ বিষয়ের বাস্তবায়নই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য বরং কয়েকটি ধাপের মধ্য দিয়ে ইসলামী শাসনব্যবস্থা অর্জনই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এটিই হচ্ছে প্রকৃত শরঈ হুকুম যা আমাদের উপর একটি বাধ্যবাধকতা।এর ফলে দেখা যাবে তারা চেষ্টা করছে নির্দিষ্ট কয়েকটি শরঈ হুকুম বাস্তবায়ন করতে এবং বিদ্যমান বাদবাকি অনৈসলামী হুকুমসমূহের বাস্তবায়িত থাকার ব্যাপারে এই আশায় নীরব থাকতে যে একসময় শরঈ হুকুমসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে সেগুলোর প্রভাব বেড়ে যাবে এবং তাদেরই সংখ্যার আধিক্য থাকবে;তারপরে তা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং এভাবে চলতে থাকবে।অথবা এই বিষয়টি দাওয়াতের ক্ষেত্রেও হতে পারে যখন লোকজনকে তারা এসব বিষয় বাস্তবায়নের দিকে ডাকে তখন।সুতরাং ক্রমান্বয়িকতার ধারণায় যারা বিশ্বাসী তারা লোকজনকে তাদের এই ধারণার দিকে ডাকার জন্য এজাতীয় ধরনসমূহ ব্যবহার করে থাকে।এসব ধারণার দিকে যারা লোকজনকে ডাকে তারা অনেকক্ষেত্রে এতটা আল্লাহভীরু হয়ে থাকে যে নিজেদের দায়িত্বের ব্যাপারে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করেনা কিন্তু তারপরও বিষয়টিকে গ্রহণ করে অন্যদের সুবিধা বিবেচনা করে।কারণ তারা ভাবে এরূপ না করলে লোকজন ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করবে;ফলে কোন কিছু না পাওয়ার চাইতে কিছু পাওয়াটাকেই তারা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছে।

ধাপেধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন বা মারহালিয়্যাহ এর পক্ষের যুক্তিসমূহ এবং সেগুলোর খণ্ডন প্রসঙ্গে এবার আসা যাক। যারা এভাবে অগ্রসর হওয়ার পক্ষপাতী তারা কিছু যুক্তির উপরে নির্ভর করে যেগুলোর ব্যাপারে তারা মনে করে যে এগুলো তাদের চিন্তা এবং দাওয়াতের পক্ষে সমর্থনকারী।ফলে তারা যা করতে চাচ্ছে তার পক্ষে যুক্তি হিসেবে এগুলোকে উপস্থাপন করে থাকে যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা এক্ষেত্রে দলীলসমূহ এবং তাদের সঠিক নির্দেশনার অনুগত থাকেনি বরং নিজেদের ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য তারা এসব দলীলকে ভুলভাবে ব্যবহার করেছে –যা আমরা সামনে দেখতে পাব।নিচে তাদের সেসব যুক্তিসমূহ এবং সেগুলোর খণ্ডন নিয়ে আলোচনা করা হলো।

## ১ম যুক্তি ও এর খন্ডন

তাদের মতে আল্লাহ সুদ(রিবা) একবারে হারাম করেননি বরং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ধাপে ধাপে তা নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন তিনি(সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেন:

*"মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এই আশায় তোমরা উপহার(রিবা) হিসেবে যা কিছু দাও আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায়না।পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, অতএব,তারাই দ্বিগুণ লাভ করবে।"* [আল-কুরআন ৩০:৩৯]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেন:

***"তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়োনা।"*** **[আল-কুরআন ৩:১৩০]**

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেন:

***"হে ঈমানদারগণ,তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে,তা পরিত্যাগ কর,যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।"*** **[আল-কুরআন ২:২৭৮]**

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেন:

***"তারা সুদ গ্রহণ করত অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল"*** **[আল-কুরআন ৪:১৬১]**

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) আরো বলেন:

*"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।"* [আল-কুরআন ২:২৭৫]

এসব আয়াতের প্রেক্ষিতে যারা ক্রমধাপে ইসলাম বাস্তবায়নের সুযোগ খুঁজে তারা বলে, প্রথম আয়াতে সুদ ছিল মুবাহ।সরল সুদকে বৈধ রেখে চক্রবৃদ্ধির সুদকে নিষিদ্ধ করা হয় দ্বিতীয় আয়াতে এবং পরবর্তীতে সরল সুদকেও নিষিদ্ধ করা হয় তৃতীয় আয়াতের মাধ্যমে।

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেন:

***"সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে,তা পরিত্যাগ কর।"*** **[আল-কুরআন ২:২৭৮]** তাদের মতে চতুর্থ আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার সুচনা হয়েছিল প্রথমে পরোক্ষ উপদেশদানের মাধ্যমে অর্থাৎ ইহুদীদেরকে সম্বোধিত করার মাধ্যমে এবং এক্ষেত্রে আল্লাহ কোন স্পষ্ট নির্দেশনা দেননি।ধাপে ধাপে বিভিন্ন আয়াত নাযিলের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ সুদকে নিষেধ করেন তাঁর এ কথার মাধ্যমে-

***"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম"*** **[আল-কুরআন ২:২৭৫]**

কেউ যদি উপরোক্ত আয়াতসমুহের সঠিক ফিক্‌হের (আইনগত জ্ঞান ) অনুসন্ধান করে, তাহলে দেখতে পাবে এক্ষেত্রে ক্রমান্বয়িকতার ধারণার কোন সত্যতা নেই।

–প্রথম আয়াতটি সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার সাথে কোনভাবেই সম্পৃক্ত নয় বরং এর বিষয়বস্তু হচ্ছে উপহার সামগ্রী। আয়াতটির মানে হচ্ছে কেউ যদি কাউকে কিছু উপহার দেয় এবং বিনিময়ে তার চাইতে বেশি কিছু আশা করে অথবা তা ফিরিয়ে দেয়ার দাবী জানায় তাহলে আল্লাহর কাছে এর কোন বৃদ্ধি নেই অর্থাৎ আল্লাহ তাকে এর জন্য কোন পুরস্কার দিবেন না। **রাসুল (সা) বলেন:**

**"কেউ যদি তার হালাল উপার্জন থেকে খেজুরের সমপরিমাণ কিছু দান করে- এবং আল্লাহ হালাল ছাড়া অন্যকিছু কবুল করেননা– তিনি তখন সেটা তার ডান হাতে ধারণ করেন– এবং দানকারীর জন্য তা বাড়াতে থাকেন যতক্ষণ না তা পাহাড়সম হয়ে যায় যেমনভাবে তোমরা তোমাদের ছোট্ট অশ্বকে প্রতিপালন করতে থাক।" [ বুখারী থেকে বর্ণিত ]**

এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (র) বলেন:***"তোমরা উপহার(রিবা) হিসেবে যা কিছু দাও।"*** **[আল কুরআন ৩০:৩৯]** এর অর্থ হচ্ছে যদি কেউ কাউকে উপহার হিসেবে কিছু দেয় এবং বিনিময়ে এর চাইতে বেশি কিছু আশা করে তাহলে আল্লাহর কাছ থেকে তার বেশি কিছু পাওয়ার নেই এবং এজন্য সে পুরস্কৃত ও হবেনা। যাইহোক এতে তার গোনাহ ও হবেনা। এ অর্থেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে (আল-কুরতুবী থেকে বর্ণিত)। ইবনে কাছীর (র) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন কেউ যদি উপহার হিসেবে কাউকে কিছু দেয় এবং বিনিময়ে সে উত্তম কিছু আশা করে তাহলে এজন্য সে আল্লাহর কাছ থেকে কোনরকম পুরস্কার পাবে না। ইবনে অব্বাস, মুজাহিদ, আদ-দাহ্‌হাক, কাতাদাহ, ইকরামাহ, মুহাম্মদ বিন কাব এবং আশ-শাবী প্রমুখ এর নিকট থেকে এরকম ব্যাখ্যাই এসেছে আয়াতটি সম্পর্কে। এ ধরনের কাজ হচ্ছে মুবাহ (অনুমোদিত)।

ইবনে আব্বাস বলেন; "সুদ (রিবা) দু ধরনের; একটি হচ্ছে অবৈধ যা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে এবং অন্যটিতে ক্ষতির কিছু নেই যেখানে একজন কাউকে উপহার হিসেবে কিছু দেয় এবং বিনিময়ে তার কাছ থেকে বহুগুণ আশা করে।"

–এবার দ্বিতীয় আয়াতের ব্যাপারে আসা যাক:

***"তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়োনা।"*** **[আল-কুরআন ৩:১৩০]** চক্রবৃদ্ধির সুদপ্রথা নিষিদ্ধ করার জন্য এ আয়াতটি নাযিল করা হয়েছিল,যা ছিল জাহিলি যুগের একটি বাস্তবতা। এখানে এমন কোন নির্দেশনা নেই যা থেকে এটা বুঝা যাবে যে সুদকে সীমিতভাবে (অর্থাৎ সরল সুদকে বৈধ রেখে কেবল চক্রবৃদ্ধির সুদকে) নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মুফাস্‌সিরগণের মতে (তাফসীরকার) সুদ নিষিদ্ধ করা হয় সুরা বাক্বারাহ তে এবং এটি ছিল মদীনায় নাযিলকৃত প্রথম সুরা। বহুগুণের সুদ নিষিদ্ধ করা হয় যে সুরাতে অর্থাৎ আলি ইমরানে তা নাযিল হয় সুরা বাক্বারাহ এর পরে। সুতরাং স্বল্পমাত্রার সুদকে আল্লাহ বৈধতা দিয়েছেন এরকম যেকোন ধারণাকে খণ্ডন করে এই ঘটনাটি। স্পষ্টত:ই বুঝা যাচ্ছে যে, সুদ সম্পর্কিত

আলি ইমরানের আয়াতটি কোন ক্রমান্বয়িকতার ফসল ছিল না বরং তা ছিল কাফিরদের সুদ চর্চার স্বভাবিক অভ্যাসের একটি উল্লেখমাত্র। সুতরাং সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার হুকুম প্রথমেই নাযিল হয়েছিল।

–এবার তৃতীয় আয়াতের প্রসঙ্গে আসা যাক:

***"হে ঈমানদারগণ,তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে,তা পরিত্যাগ কর,যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।"* [আল-কুরআন ২:২৭৮]** এই আয়াতের অর্থ এরকম কিছু নয় যে, প্রথমদিকে মুসলিমদের জন্য স্বল্পমাত্রার সুদ গ্রহণের অনুমোদন ছিল যা পরবর্তীতে নিষিদ্ধ করা হয়। বরং এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল তাদের ব্যাপারে যারা ইসলামে নতুন এসেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তারা সুদের উপর টাকা ধার দিত।সুদের অংশবিশেষ তারা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করে ফেলেছিল এবং কিছু অংশ বাকি ছিল। এজন্য যে অংশ তারা গ্রহণ করে ফেলেছে সেটি আল্লাহ(সুবহানাহু ওয়া তাআলা) মাফ করে দিয়েছেন এবং যা বাকি আছে তা গ্রহণ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। এই বিষয়টি আল্লাহর নিম্নোক্ত কথার দ্বারাও সমর্থিত:

***"অত:পর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে নিজেদের মূলধন পেয়ে যাবে।"* [আল-কুরআন ২:২৭৯]** অনুরূপভাবে রাসূল(সা) এর নিম্নোক্ত হাদিস:

**"জাহিলি যুগের সুদকে সমাপ্ত করা হয়েছে সম্পূর্ণরূপে এবং প্রথমে আমি যে সুদের সমাপ্তি ঘটিয়েছি তা হচ্ছে আল-আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সুদ।"** [সীরাতে ইবনে হিশাম]

–সবশেষে চতুর্থ আয়াতের প্রসঙ্গে আসা যাক:

*"তারা সুদ গ্রহণ করত অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল"* [আল-কুরআন ৪:১৬১]" The *Riba* intended here is the haraam money from bribery and other such money, which the Jews used to take, as Allah swt said;

*"(তারা) হারাম ভক্ষণ করে।"* [আল-কুরআন ৫:৪২]" এখানে সুদকে শর'ঈ অর্থে বুঝানো হয় নি।

অতএব এ সম্পর্কিত বিধানের শুরু থেকেই সুদ নিষিদ্ধ ছিল এবং এমন কোন নির্দেশনা নেই যা থেকে বুঝা যাবে যে সুদ ধাপে ধাপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বেশকিছু প্রমাণের মাধ্যমে নিশ্চিতরূপেই বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যে সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার সাথে ক্রমান্বয়িকতার কোন সম্পর্ক নেই।

## ২য় যুক্তি ও এর খন্ডন

তাদের মতে আল্লাহ ধাপে ধাপে মদ নিষিদ্ধ করেছেন।

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেন:

***"তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্যে উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়।"* [আল-কুরআন ২:২১৯]** তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেন:

***"হে ঈমানদারগণ তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাজের ধারে কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ।"* [আল-কুরআন ৪:৪৩]** তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেন:

***"হে মুমিনগণ! এই যে মদ,জুয়া,আল-আনসাব(দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত পশু),আল-আযলাম(ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ) এগুলো শয়তানের অপবিত্র কাজ ছাড়া অন্য কিছুনা। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক–যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবেনা ?"* [আল-কুরআন ৫:৯০-৯১]**

ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন পদ্ধতির ধারণায় যারা বিশ্বাসী তারা এসব আয়াতের প্রেক্ষিতে বলে থাকে যে শুরুতে মদ অনুমোদিত ছিল যা প্রথম আয়াত থেকে প্রমাণিত। পরবর্তীতে এই অনুমোদনকে সীমিত করা হয় এই আয়াতের মাধ্যমে

***“হে ঈমানদারগণ তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক,তখন নামাজের ধারে কাছেও যেওনা।”*** [আল-কুরআন ৪:৪৩] এবং এই সীমিত অনুমোদনকে সর্বশেষে নিষিদ্ধ করা হয়।

আইনগত দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে যদি কেউ এই আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা করে তাহলে মদ নিষিদ্ধ হওয়ার কোন ক্রমান্বয়িকতা দেখতে পাবেনা। বরং বাস্তবতা হচ্ছে নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে মদের ব্যপারে কোন শর'ঈ হুকুমই ছিলনা। অন্যভাবে বলা যায় মদ্যপান তখন একটি অনুমোদিত বিষয় ছিল যদিও তখন মুসলিমরা মদ্যপান অব্যাহত রেখেছিল তৃতীয় আয়াত নযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত। এই ধারণাটি উমর (রা) এর নিম্নোক্ত ঘটনাটির মাধ্যমেও সমর্থিত; তিনি বলেছিলেন :“হে আল্লাহ! তুমি মদের ব্যপারে আমাদেরকে স্পষ্ট ধারণা দাও কারণ তা আমাদের সম্পদ কেড়ে নেয় এবং মানসিকতাকে নষ্ট করে ফেলে।” জবাবে তখন এই আয়াত নাযিল হয়:

***“তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে ”*** **[আল-কুরআন ২:২১৯]** উমর(রা) দুআ করেছিলেন এবং তার কাছে এই আয়াত পাঠ করে শোনানো হয়েছিল। তিনি আবারো বললেন “ হে আল্লাহ তুমি মদের ব্যপারে আমাদেরকে স্পষ্ট নির্দেশনা দাও।” জবাবে তখন এই আয়াত নাযিল হয়:

***“হে ঈমানদারগণ তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক,তখন নামাজের ধারে কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ।”*** **[আল-কুরআন ৪:৪৩]** উমর(রা) দুআ করেছিলেন এবং তার কাছে এই আয়াত পাঠ করে শোনানো হয়েছিল। তিনি আবারো বললেন “ হে আল্লাহ তুমি মদের ব্যপারে আমাদেরকে স্পষ্ট নির্দেশনা দাও” জবাবে তখন এই আয়াত নাযিল হয়:

***“হে মুমিনগণ! এই যে মদ,জুয়া,আল-আনসাব(দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত পশু),আল-আযলাম(ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ) এগুলো শয়তানের অপবিত্র কাজ ছাড়া অন্য কিছুনা।অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক।”*** **[আল-কুরআন ৫:৯০]** অতএব উমর(রা) এভাবেই দুআ করে যেতে থাকলেন যতক্ষণ না নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়:

***“অতএব, তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবেনা ?”*** **[আল-কুরআন ৫:৯১]** জবাবে উমর(রা) বললেন: “আমরা নিবৃত্ত হলাম! আমরা নিবৃত্ত হলাম!” [আহমাদ , তিরমিযী, নাসাঈ, এবং আবু দাউদ থেকে বর্ণিত]

উমর(রা) মদের ব্যপারে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকলেন যা উপরে উল্লেখিত তৃতীয় আয়াত নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত মুসলিমদের জন্য বৈধ ছিল। তিনি(রা) তাঁর(সুবহানাহু ওয়া তাআলা) কাছে প্রথম এবং দ্বিতীয় আয়াত নাযিল হওয়ার পরও দু'আ করা অব্যাহত রাখলেন যার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে , তৃতীয় আয়াত নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত মদ্যপান মুবাহ(অনুমোদিত)ছিল।

দ্বিতীয় আয়াতের মূল বিষয় ছিল সালাত, মদ্যপান নয়। অর্থাৎ এ আয়াতটি সালাতের সাথে সম্পর্কিত। কেউ যদি এই আয়াতের ফিক্‌হ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাহলে দেখতে পাবে এখানে সালাতের সময় কাউকে মদ্যপান করতে নিষেধ করা হচ্ছেনা বরং নিষেধ করা হচ্ছে মদ্যপ অবস্থায় সালাত আদায় করতে যাতে মুসলিমরা বুঝতে পারে তারা কি তিলাওয়াত করছে। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরে কোন মুসলিমকে যদি দেখা যেত এমন অবস্থায় সালাত আদায় করছে যখন তার মুখ থেকে মদের গন্ধ আসছে অথবা সে তার সাথে মদের ভিস্তি (পানীয় বহনের জন্য ব্যবহৃত চামড়ার ব্যাগ) বহন করছে বা সে নির্দিষ্ট পরিমাণের মদ পান করেছে যা তার চিন্তাশক্তিকে প্রভাবিত করেনি তাহলে সেক্ষেত্রে দোষের কিছু ছিল না।

প্রথম আয়াতে আল্লাহ মদ্যপানকে তিরস্কার করেছেন কারণ তা ক্ষতিকর। দ্বিতীয় আয়াতে মদ্যপ অবস্থায় সালাত আদায় নিষিদ্ধ করা হয় এবং তৃতীয় আয়াতে মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়। এই ঘটনাকে কোনভাবেই ক্রমান্বয়িক বলা যায় না কারণ সূরা আল মায়িদাহতে নাযিলকৃত আয়াতের মাধ্যমে মদ নিষিদ্ধ করার পরে রাসূল (সা) অথবা সাহাবা (রা) অথবা তাবিঈন অথবা অথবা তাদের পরবর্তীদেব মধ্যে কেউ কখনোই মদ্যপানকে অনুমোদন দেয় নি। মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদগণদের মধ্যে এবং মুজাতাহিদীনের মধ্যেও কেউ কখনোই কোন ফিকহের কিতাবে মদ নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়িকতার কথা বলেননি। যখন পূর্ণ উদ্যমে ইসলামের বিজয় চলছিল, নতুন নতুন ভূখণ্ড ইসলামের অধীনে আসছিল এবং লোকজন দলে দলে দ্বীনের মধ্যে দাখিল হচ্ছিল তখন বিজয়ী মুসলিমদের কেউই নওমুসলিমদের নতুন ইসলামে আসার দিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি অথবা তাদের মদ্যপানের ব্যপারেও নীরব থাকেননি। যেসব মুসলিম বিজিত ভূখন্ডে গিয়েছিলেন তারা নওমুসলিমদের জন্য সেসব ধাপ পার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেননি মদ্যপান নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে যেসব ধাপ পার করা হয়েছিল। যদিও হয়তো সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি

অনুযায়ী  কারো কারো কাছে ক্রমান্বয়িকতা দরকারী ছিল বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে তাদের কাছে এর কোন তাৎপর্যই ছিলনা। আমাদের প্রাথমিক যুগের ইমামদের কেউই এই ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন ধারণার সাথে পরিচিত ছিলেননা বরং এটি হচ্ছে একটি নতুন আলোচনা যা দু:সহ বাস্তবতা এবং যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির কারণে কিছু তথাকথিত চিন্তাবিদ উদ্ভাবন করেছেন । তারা নির্দিষ্ট কিছু হুকুমের ক্ষেত্রে নয় বরং পুরো দ্বীনের জন্যই এই ধারণাটিকে একটি চিন্তার পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। **রাসূল (সা) যথার্থই বলেছেন:**

**“...তোমাদের মধ্যে যারা দীর্ঘজীবী হবে নিশ্চিতভাবেই তারা অনেক বিতর্ক দেখতে পাবে।নতুন উদ্ভাবিত বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থাক কারণ প্রত্যেকটা নতুন বিষয়ই বিদআত এবং প্রত্যেকটা বিদআতই জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়...নিজেদেরকে আমার সুন্নাহর উপরে এবং সৎপথপ্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নাহর উপরে রাখ –তাদেরকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর।”** [আবু দাউদ এবং আত-তিরমিযি থেকে বর্ণিত]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যারা ধাপে ধাপে বাস্তবানেরপক্ষে কথা  বলে তাদের জন্য কি এটা বৈধ হবে যে তারা ধাপে ধাপে আসা কোন হুকুমের সর্বশেষ হুকুমকে গ্রহণ না করে বরং পূর্বের কোন হুকুমকে গ্রহণ করতে পারবে?

নিশ্চিতভাবেই এর উত্তর হচ্ছে; ‘ না ’। কারণ শরীয়া মদ্যপানকে সুনির্দিষ্টভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ফলে পূর্ববর্তী কোন হুকুম মেনে চলার অনুমোদন আমাদেরকে দেয়া হয়নি কারণ শরীআ'হ যা করতে নিষেধ করেছে আমাদেরকে তা অবশ্যই মানতে হবে। এটাই ছিল সালাফ (পূর্ববর্তীদের) এবং খালাফ (পরবর্তীদের) উভয় প্রজন্মের অবস্থান। মদের ব্যাপারেও একই হুকুম বিদ্যমান। এই হুকুমটি কখনো বিন্দুমাত্রও পরিবর্তিত হবেনা এবং যে মদ্যপান করবে তার অপরাধও কিছুমাত্র কমবেনা।

## ৩য় যুক্তি ও এর খণ্ডন

তাদের মতে শরীআ'হ দাসপ্রথার বিষয়টিকে ধাপে ধাপে সমাধান করেছে। এই মতটি সঠিক নয় কারণ আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) দাসদের অস্তিত্বকে নিষিদ্ধ করেননি বরং এ থেকে উত্তরণের একটি পথ খুলে দিয়েছেন। যদি তারা আবারো অস্তিত্বলাভ করে তাহলে এ সম্পর্কিত আহকামও ফিরে আসবে এবং দ্বিতীয়বারের মত দাসদের অস্তিত্ব চোখ পড়বে।

## চতুর্থ যুক্তি ও এর খণ্ডন

তাদের মতে কুরআন একবারে নাযিল হয়নি বরং ধীরে ধীরে খণ্ড খণ্ড আকারে এসেছে যা থেকে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের বিষয়টি  প্রমাণিত  হয়। এর জবাব হচ্ছে আল্লাহ বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ঘটনা অনুযায়ী কুরআন নাযিল করতেন যাতে মুমিনদের অন্তর শক্তিশালী হয়। প্রথমে ঈমানের বিষয়ে নাযিল হতো। এজন্য প্রথমে জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা হয়েছিল এবং পরে হালাম-হারামের আলোচনা এসেছিল। কিন্তু এর মানে এই না যে নাযিলকৃত বিষয়ের অংশবিশেষ গ্রহণ করতে হবে এবং বাকি বিষয় ছেড়ে দিতে হবে। যেসব বিষয় নাযিল হয়েছিল তার পুরোটার ব্যাপারেই মুসলিমরা দায়িত্বশীল ছিল তখন এবং এর বাইরে তাদের কোনো দায়িত্ব ছিল না। যখন শুধুমাত্র ঈমানের বিষয়ে নাযিল হয়েছিল কিন্তু কোনো হুকুম নাযিল হয়নি তখন শর'ঈ দলীলের মাধ্যমে আসা বিস্তারিত বিবরণের পুরো ইসলামের ব্যাপারেই মুসলিমরা দায়িত্বশীল ছিল। সুতরাং, ইসলামী রাষ্ট্র থাকুক বা না থাকুক যেকোনো পরিস্থিতিতেই ব্যক্তিগত শর'ঈ হুকুমের ব্যাপারে মুসলিমরা দায়িত্বশীল থাকে। যেসব শর'ঈ হুকুম ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত সেগুলো রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। অতএব শর'ঈ দলীলের বিস্তারিত নির্দেশনাই মুসলিমদের কর্মকাণ্ডকে নির্ধারণ করে, অন্যকিছু না। সুতরাং, পিছনের দিকে ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ আমাদের হাতে আর নেই।

ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন বলতে কী বুঝায়? এতে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এর পক্ষে কী যুক্তি রয়েছে সেগুলো পর্যবেক্ষণের পর এবার আমরা চিন্তার শরঈ প্রক্রিয়া অনুযায়ী সঠিক শরঈ মতের ব্যাখ্যা দিব।

আমরা সঠিক মতের কাছাকাছি কোনো মতের ব্যাপারে বলছি না  বরং সঠিক মতের ব্যাপারেই বলছি, কারণ ক্রমান্বয়ে ইসলাম বাস্তবায়নের ধারণাটি শরীআ'হর মধ্যে নেই এবং ভুলভাবে একে শরীআ'হতে অন্তর্ভুক্ত করার কোনো সুযোগও নেই। ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন এবং এটি একটি শর'ঈ পদ্ধতি কিনা এর সঙ্গে এই আলোচনাটি যতটুকু সম্পর্কিত তার চাইতে বেশী সম্পর্কিত চিন্তার একটি প্রক্রিয়া হিসেবে -যাকে শরীআহ কোনোভাবেই অনুমোদন করে না।

কারণ, ইসলামের একটি প্রকৃতি আছে যা অন্যসব কিছু থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। ওহীর অনুসরণের উপরেই ইসলামের প্রকৃতি পুরোপুরি নির্ভরশীল, অন্যদিকে মানুষের উদ্ভাবন ও অভিজ্ঞতার উপরে মানবরচিত ব্যবস্থা পুরোপুরি নির্ভরশীল এবং এই উদ্ভাবন ও অভিজ্ঞতা যত শক্তিশালীই হোক না কেন মানুষের সমস্যার সঠিক সমাধান দেওয়ার জন্য তা অপর্যাপ্ত।

যখন মুসলিমরা শরীআ'হর আনুগত্য করে তখন আনুগত্যের ভিত্তি হিসেবে আল্লাহর উপর ঈমানকে মেনে নিতে হবে, নতুবা তাদের আনুগত্য গ্রহণযোগ্য হবে না। যখন সে অন্যদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করে তখন তার এই আহ্বানের ভিত্তি হতে হবে আল্লাহর উপরে ঈমান নতুবা তার আহ্বান গ্রহণযোগ্য হবে না। বিষয়টি প্রাথমিকভাবে ঈমানের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তারপরে সঠিক আনুগত্যের সঙ্গে।

মুসলিমরা যদি সত্য ও সঠিক পথে  নিজেদেরকে এবং ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে এসবের আধ্যাত্মিক ভিত্তি উপলব্ধি করতে হবে, যার উপায় হচ্ছে প্রথমে একে প্রতিষ্ঠিত করা এবং অতঃপর এর পরিচর্যা করা। তখন ইসলামের আনুগত্য করা তার জন্য সহজতর হবে চাই তা বাস্তবতা, স্বভাব বা লোকজনের ইচ্ছার অনুকূলে হোক অথবা প্রতিকূলে। আধ্যাত্মিক ভিত্তিকে গ্রহণ না করলে মুসলিমরা গুনাহগার হবে যদিও বা তা কুফরী না হয়। প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে ইসলামের একটি আধ্যাত্মিক ভিত্তি আছে যা হচ্ছে আল্লাহর উপরে ঈমান এবং এ থেকে এটা বোঝা যায় না কোনো হুকুম সত্যের কতটুকু নিকটবর্তী অথবা কতটুকু দূরবর্তী। বরং কোনো হুকুমকে যদি আমরা এই ভিত্তির আলোকে বিবেচনা করি তাহলে বুঝতে পারব তা এই ভিত্তির কতটুকু নিকটবর্তী অথবা দূরবর্তী।

যারা এই ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়নের পক্ষে কথা বলে এবার তাদেরকে আমরা কিছু প্রশ্ন করতে চাই; এই আহবানের আধ্যাত্মিক ভিত্তি কি? এর পিছনে আল্লাহর নির্দেশ কোথায় বিদ্যমান? রাসূল (সা.) কখন এই বিষয়টিকে গ্রহণ করেছেন–যদিও তাঁর (সা.) মক্কা বা মদিনায় এর প্রয়োজন ছিল ।

নুসরাহ খোঁজার সময় রাসূল (সা.) কি বনি আমর বিন সা'সা গোত্রকে বলেননি, "বিষয়টি (কর্তৃত্ব) আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।" [সীরাতে ইবনে হিশাম] অথচ সে সময় দাওয়াতের জন্য সাহায্য তাঁর (সা.) জন্য খুবই প্রয়োজন ছিল। তারা রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর নিজেদের হাতে কর্তৃত্ব চেয়েছিল। তখন কি তিনি পারতেন না তাদের অনুরোধকে মেনে নিতে এবং পরবর্তীতে ঈমান আনার পরে তাদের এই অনুরোধকে পরিবর্তন করে দিতে? এটাই কি সত্য দাওয়াত ও আল্লাহর হুকুম ছিলনা যার ফলে কোনোরকম তোষামোদ বা আপোষ ছাড়াই রাসূল (সা.) সততার সঙ্গে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন, যাতে যারা থাকে তার যেন স্পষ্ট প্রমাণ পেয়ে টিকে থাকে আর যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তারা যেন স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়?

চাচা আবু তালিব যখন দাওয়াতি কাজে আপোষ করতে বললেন এবং তার কাঁধে অসহনীয় বোঝা না চাপাতে বললেন তখন কি রাসূল (সা.) বলেননি যে; "আল্লাহর শপথ, চাচা! যদি তারা আমার ডানহাতে সূর্য ও বামহাতে চন্দ্র এনে দেয় যাতে আমি বিষয়টি ছেড়ে দেই তবুও আমি ক্ষান্ত হব না যতক্ষণ না আল্লাহ একে বিজয়ী করেন অথবা একাজ করতে গিয়ে আমার মৃত্যু হয়।" [সিরাতে ইবনে হিশাম] এই দলিল থেকে দেখা যাচ্ছে রাসূল (সা.) ন্যূনতম পরিমাণ আপোষও করেননি এবং তিনি দাওয়াতের জন্য সর্বোত্তম উদাহরণ রেখে গেছেন। তিনি (সা.) কোনোরকম আপোষ বা তোষামোদ করেননি, তাদের সঙ্গে তাল মিলাননি, বিনা আপত্তিতে প্রার্থনা করেননি। বরং তার দাওয়াত ছিল প্রকাশ্য ও সাহসিকতাপূর্ণ কারণ এর ফলে সত্য চিন্তার জয় হবে এবং মিথ্যা পরাজিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) কি মুসলিমদেরকে সেই স্থান থেকে হিজরত করতে নির্দেশ দেননি যেখানে তারা তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বাধ্যতামূলক নির্দেশ মানতে পারছিল না? তিনি কি সেখানে থাকতে তাদেরকে নিষেধ করেননি যখন তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

**"যারা নিজেদের অনিষ্ট করে (কারণ হিজরত বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও তারা কাফিরদের মধ্যেই বসবাস করছিল) ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে: এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় অবস্থায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে: আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলনা যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে?" [আল কুরআন ৪:৯৭]**

এমনকোনো ভূখণ্ড যেখানে মুসলিমরা তাদের দ্বীন কায়েম করতে সক্ষম না সেখানে থাকার উপর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত একটি ইজমা বর্ণনা করেছেন ইবনে কাছির।

রাসূল (সা.) কি “লা ইলাহা ইলল্ললাহ মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” দিয়েই তাঁর দাওয়াতের সূচনা করেননি এবং লোকজনকে এর মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করেননি? কোনোরকম পরিবর্তন ছাড়াই এটি ছিল তাঁর (সা.) শেষ বক্তব্যও। তিনি কি শুরুতে অল্প কিছু হাল্কা কথা দিয়ে শুরু করেছিলেন এবং ক্রমান্বয়ে তা বর্ধিত করেছেন? নাকি এটাই ছিল তাঁর (সা) প্রথম এবং শেষ আহবান।

যাকাত প্রদান যারা বন্ধ করে দিয়েছিল আবু বকর (রা.) কি কোনোরকম দেরি করা ছাড়া অথবা তাদেরকে সন্তুষ্ট করা ছাড়াই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি? তখন তিনি সেই বিখ্যাত উক্তিটি করেছেন:

“আল্লাহর কসম, রাসূল (সা.)-কে তারা যা দিত যদি তার চাইতে একটা উটের রশিও আমাকে কম দেয় তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।” তখন এভাবেই তিনি সাড়া দিয়েছিলেন যদিও মুসলিমরা সেসময় মুরতাদ হয়ে যাওয়া এবং বিদ্রোহের সূচনা করার মতো কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা দেখতে পাচ্ছিল।

প্রথম যুগের যেসব মুসলিম দাওয়াতি কাজ করতেন তারা কি কখনো এই ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়নের ব্যাপারে কিছু বলেছিলেন? তারা কি এই চিন্তাটিকে সেসব ভূখণ্ডে বাস্তবায়ন করেছিলেন যেগুলো বিজিত হয়েছিল এবং দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছিল? প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ ইসলামে নতুন দাখিল হওয়া লোকজনের পরিস্থিতিকে বিবেচনা করেননি এবং তাদেরকে মদ্যপান করার সুযোগ দেননি, ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেননি যতদিনে তারা মদ্য না করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, সুদ খেতে এবং নারীদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনেরও সুযোগ দেননি। বরং তারা ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ করেছিলেন এবং সুদ, ব্যভিচার, মদ্যপান ও অন্যসবকিছু যেগুলোর ব্যাপরে আল্লাহ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত ছিলেন। অনুরূপভাবে অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও মুসলিমরা সমস্ত শর'ঈ হুকুম বাস্তবায়ন করেছিলেন সেগুলো আলাদা ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে হোক, সামষ্টিকভাবে হোক, তাদের নিজস্ব বিষয়াদিতে হোক অথবা তাদের অংশবিশেষ আদয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে যায় এমনক্ষেত্রেই হোক।

ইসলামি ফিকহের প্রকৃত বইসমূহে কি এই বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে? আমাদের প্রাথমিক দিক্‌কার নির্ভরযোগ্য ফকিহ ও মুজতাহিদগণ কি ক্রমান্বয়িকতার ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করেছেন, যদিও আমরা জানি যে, তারা শরিআ'হর কুল্লিয়াত (সামগ্রিকতা) ও জুযিয়াত (শাখা) নিয়ে বিস্তারিত অলোচনা করেছেন?

শরীআ'হ সামগ্রিকভাবে এই বিষয়ের নির্দেশনা দেয় যে দাওয়াতের বাধ্যবাধকতা সততার সঙ্গে আদায় করতে হবে এবং সরলপথের উপরে থাকতে হবে;

**“সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তাতে কোনো বক্রতা রাখেননি।” [আল-কুরআন ১৮:১]**

আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কাফিররা চায় আমরা আপোষ করি এবং তাদের সঙ্গে ঐক্যমতে পৌঁছাই। তারা চায় আমরা সত্যকে পরিত্যাগ করি এবং প্রকৃত সমাধানের এক চতুর্থাংশ অথবা অর্ধেক গ্রহণ করি। তারা চেষ্টা করে যাতে আমরা কুফরি কর্মকাণ্ডের সূচনা করি। এ ব্যাপারে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

**“আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশতঃ চায় যে, মুসলিম হওয়ার পর তোমাদেরকে কোনোরকম কাফির বানিয়ে দেয় ---- [আল-কুরআন ২:১০৯]**

এবং শেষে চেষ্টা করবে তাদের আইনকানুন গ্রহণ করাতে। এ ব্যাপারে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

**“তারা চায় যদি আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে।” [আল-কুরআন ৬৮:৯]**

**“অতএব আপনি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবে না।” [আল-কুরআন ৬৮:৮]**

পথভ্রষ্ট লোকদের প্রতি ঝুঁকে পড়ার ব্যাপারে আমাদের রব আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন:

**“ আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। নতুবা তোমাদেরকেও আগুনে ধরবে। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোনো বন্ধু নেই, আর কোথাও সাহায্যও পাবে না।” [আল কুরআন ১১:১১৩]**

প্রকৃত ঈমানের দিকে সঠিক দাওয়াত মুসলিমদের আনুগত্যকে পূর্ণতাদান করে যদিও সে ইসলামে নতুন দাখিল হয় এবং এর আনুগত্য করে থাকে। দাওয়াত বহনকারী হিসেবে আমাদের উপরে এটা বাধ্যতামূলক যে আমরা নিজেদের অন্তরে ঈমানকে প্রোথিত করব এবং নিজেদেরকে এর জন্য উৎসর্গ করব যতক্ষণনা সর্বোত্তম আনুগত্য ও তাকওয়ার সঙ্গে তা ফল দিতে শুরু করবে। ইসলামি রাষ্ট্র যখন প্রতিষ্ঠিত হবে তখন অবশ্যই তা এমনসব লোকদের হাতে হবে না যার ইসলামি ধারণাশূন্য ও পাশ্চাত্যের ধারণায় পূর্ণ। এটি এমনসব লোকদের দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত হবে না যাদের মধ্যে দাওয়াতের কোনো প্রতিফলন হয়নি, দাওয়াত তাদেরকে প্রভাবিত করতে পারেনি এবং তারা একে গ্রহণ করেনি। বরং পূর্বে আমরা যা বলেছি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে সাধারণ গণজাগরণের মাধ্যমে সৃষ্ট জনমতের উপর ভিত্তি করে যা ইসলামের ধারণা এবং এর দ্বারা শাসিত হওয়ার ধারণাকে গ্রহণ করবে। মানুষের অন্তর ও মনকে ইসলামের কাছে টানার অজুহাতে ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন ধারণাকে গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই, আর না আছে মানবীয় দুর্বলতার কাছে মাথানত করার অথবা পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার, কারণ আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন মানুষের অন্তর ও মন এবং পরিস্থিতিকে ইসলাম অনুযায়ী পরিবর্তন করার জন্য।

যদি আমরা কুরআনের দিকে ফিরে যাই এবং এর আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করি তাহলে দেখতে পাব এতে সেসব নির্দেশ দেওয়া আছে তা চূড়ান্ত এবং ক্রমান্বয়িকতার ধারণাটি পাশ্চাত্যের বিজাতীয় চিন্তাসমূহ থেকে তথাকথিত উলেমাদের দ্বারা মিথ্যা এবং ভ্রান্ততার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

যখনই কোনো আয়াত নাযিল হতো তখনই রাসূল (সা.) এবং তাঁর (সা.) সঙ্গের মুসলিমগণ কোনোরকম বিলম্ব না করে তা বাস্তবায়নের জন্য ছুটতেন। যেকোনো নাযিলকৃত হুকুমের বাস্তবায়ন কেবল এজন্য বাধ্যতামূলক ছিল যে তা নাযিল হয়েছে। যখন আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এই আয়াতটি নাযিল করলেন;

**"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" [আল-কুরআন ৫:৩]**

তখনই মুসলিমরা পুরো ইসলামের বাস্তবায়নের জন্য বাধ্য হয়ে পড়ল, তা আক্বিদা, ইবাদাত, আখলাক, মুআমালাতের ক্ষেত্রে হোক অথবা বিচারব্যবস্থা, অর্থনীতি, সামাজিক ব্যবস্থা অথবা পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত হুকুমের ক্ষেত্রে হোক অথবা সন্ধি ও যুদ্ধের সময়েই হোকনা কেন।

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) বলেন, **"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" [আল কুরআন ৫৯:৭]**

অর্থাৎ রাসূল (সা.) যেসব বিষয় নিয়ে এসেছেন সেগুলো গ্রহণ করতে ও সে অনুযায়ী আমল করতে এবং তিনি (সা.) যেসব বিষয়কে নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকতে ও দূরত্ব বজায় রাখতে। কারণ এই আয়াতে 'মা' শব্দটি আম (সাধারণ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে সমস্ত ফরযকে বাধ্যতামূলকভাবে আদায় এবং সমস্ত হারাম থেকে বিরত থাকার ও দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টি এতে অন্তর্ভুক্ত। আয়াতের শেষদিকে উপস্থাপিত ক্বারিনা (নির্দেশনার)-এর ফলে আয়াতে উল্লিখিত বিষয়ের গ্রহণ বা বর্জন আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক, কারণ এই ক্বারিনাতে তাকওয়া অবলম্বনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আয়াত অনুযায়ী যে কাজ করবে না তার জন্য ভয়াবহ শাস্তির সতর্কবাণী রয়েছে।

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন; ***"আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক বিষয়াদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সেই অনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন যেন তারা আপনাকে এমনকোনো নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন।"*** **[আল কুরআন ৫:৪৯]**

এই আয়াতটি রাসূল (সা.) ও তাঁর পরবর্তী মুসলিমগণকে আল্লাহর নাযিলকৃত সমস্ত হুকুম অনুযায়ী শাসন করতে চূড়ান্ত নির্দেশ দিচ্ছে, তা আদেশ সংক্রান্ত বিষয়ে হোক অথবা নিষেধ সংক্রান্ত বিষয়ে। এটি রাসূল (সা.) ও তাঁর (সা.) পরবর্তী মুসলিমদেরকে লোকজনের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ এবং তাদের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ থেকে বিরত থাকারও নির্দেশ দিচ্ছে।

পাশাপাশি এটি রাসূল (সা.) ও তাঁর (সা.) পরবর্তী মুসলিমদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছে আল্লাহর নাযিলকৃত কিছু বিষয়ের বাস্তবায়ন থেকে লোকজন তাদেরকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করবে।

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন, "যারা আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী শাসন করেনা তারাই কাফির।" [আল-কুরআন ৫:৪৪]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসন করে না তারাই যালিম।"*** **[আল-কুরআন ৫:৪৫]**

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসন করে না তারাই*** ফাসিক ***।"*** **[আল-কুরআন ৫:৪৫]**

আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী শাসন করেনা তাদেরকে এসব আয়াতে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ) কাফির , যালিম ও ফাসিক সাব্যস্ত করেছেন। কারণ এখানে উল্লিখিত 'মা' শব্দটি আম (সাধারণ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, ফলে এতে আল্লাহর নাযিলকৃত আদেশ ও নিষেধ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উপরোক্ত সমস্ত বর্ণনা থেকে কোনোরকম দ্ব্যর্থতা ছাড়া নিশ্চিতভাবেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে কোনোরকম বিলম্ব, গড়িমসি অথবা ক্রমান্বয়িকতা ছাড়া ইসলামের সমস্ত হুকুম বাস্তবায়ন করতে ব্যক্তিগতভাবে, দলীয়ভাবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলিমরা বাধ্য। ব্যক্তি, দল বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এসব হুকুম বাস্তবায়ন না করার কোনো অজুহাতই গ্রহণযোগ্য হবে না।

ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন নীতিটি ইসলামের হুকুমের সঙ্গে পুরোপুরিই সাংঘর্ষিক। ব্যক্তি, দল বা রাষ্ট্র হিসেবে যদি আল্লাহর কিছু হুকুম কেউ বাস্তবায়ন করে এবং বাকিগুলো ছেড়ে দেয় তাহলে সে আল্লাহর দৃষ্টিতে অপরাধী বলে গণ্য হবে।

কোনো ওয়াজিব বিষয় ওয়াজিবই থাকে যার উপরে আমল করা বাধ্যতামূলক এবং কোনো হারাম বিষয় হারামই থাকে যা থেকে দূরে থাকা বাধ্যতামূলক। যখন সাকিফের প্রতিনিধি রাসূল (সা.)-কে অনুরোধ করেছিল তিন বছর পর্যন্ত আল-লাত-এর মূর্তি না ভাঙতে অথবা ইসলাম গ্রহণের বিনিময়ে সালাত আদায় করা থেকে অব্যাহতি দিতে। তিনি (সা.) তাদের এসব প্রস্তাবে সম্মত হননি এবং পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কোনোরকম বিলম্ব ছাড়াই মূর্তিগুলো ভাঙতে এবং সালাত আদায় করতে তিনি জোর দিলেন।

যেসব শাসক ইসলামের হুকুম বাস্তবায়ন করেনা অথবা যেসব শাসক সেগুলো থেকে অল্পকিছু বাস্তবায়ন করে আল্লাহ তাদেরকে কাফির আখ্যা দিয়েছেন। এই বিষয়টি তখন প্রযোজ্য যখন সে এগুলোর উপযুক্ততায় বিশ্বাস করেনা। উপযুক্ততায় বিশ্বাস করে ইসলামের সমস্ত হুকুম বাস্তবায়ন করে না অথবা কিছু হুকুম বাস্তবায়ন করে তাহলে সে যালিম বা ফাসিক বলে গণ্য হবে।

যদি কোনো শাসক প্রকাশ্য কুফরে লিপ্ত (যার ব্যাপারে আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের কাছে বুরহান স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে) তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা এবং তরবারি উন্মুক্ত করাকে রাসূল (সা.) আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন। অর্থাৎ তারা যদি কুফরি আইন দিয়ে শাসন করে এবং এগুলোর কুফর হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ না থাকে তাহলে এসব আইন অল্পসংখ্যক নাকি অধিক তা বিবেচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। উবাদাহ বিন সামিত থেকে বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে বিষয়টি প্রমাণিত হচ্ছে:

***"কর্তৃত্বশীল লোকদের সঙ্গে তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত বিবাদে জড়াবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে এমন প্রকাশ্য কুফরে লিপ্ত হতে দেখেছ যার ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে বুরহান (স্পষ্ট প্রমাণ) আছে।"*** **[মুসলিম থেকে বর্ণিত]**

অতএব ইসলামের হুকুম বাস্তবায়নে কোনোরকম আত্মসন্তুষ্টিতে ভোগা অথবা ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন অবলম্বন করার সুযোগ নেই, কারণ দুটো ওয়াজিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, দুটো হারামের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এবং দুটো হুকুমের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহর সমস্ত হুকুমই একসমান। এদের সবগুলোকে একসঙ্গেই প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করতে হবে কোনোরকম বিরতি, বিলম্ব অথবা কোন প্রকার ধাপছাড়া। নাহলে আমাদের উপরে আল্লাহর নিম্নোক্ত কথাটি প্রযোজ্য হবে:

***"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং বাকি অংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে তাদের জন্য দুর্গতি ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই। আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেওয়া হবে।"*** **[আল-কুরআন ২:৮৫]**

কোনো মুসলিম, সে শাসক হোক অথবা কোনো সাধারণ ব্যক্তি, শর'ঈ হুকুম বাস্তবায়িত না করার কোনো অজুহাতই তার কাজে আসবেনা, যদিনা শর'ঈ দলিলসমূহে তার পক্ষে কোনো শর'ঈ রুখসাত (বাধ্যতামূলক কাজ থেকে অব্যাহতির সুযোগ) বিদ্যমান থাকে। প্রকৃত এবং অনুভবযোগ্য দুর্বলতার কারণে সৃষ্ট অক্ষমতা যেমন জবরদস্তি ক্ষেত্রে অর্থাৎ কাউকে জবরদস্তি করে কোনো হারাম করতে বাধ্য করা হলে অথবা যে পরিস্থিতিতে রাসূল (সা.) মদিনায় উৎপাদিত ফলের এক তৃতীয়াংশ গাতফান গোত্রকে দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন অথবা যখন একজন খলিফা বিদ্রোহীদের সঙ্গে মধ্যস্থতা করতে চেয়েছিলেন অথবা যখন অবরোধকালে মৃত্যুর আশংকা থাকলে হারাম গোশত খাওয়া বৈধ হয়ে যায়–এসব বিষয়কে শর'ঈ রুখসাত হিসেবে গণ্য করা যায়।

ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন অনুসরণ থেকে আমরা যা বুঝতে পারছি, যারা এর পক্ষে কথা বলে তাদের মধ্যে এই ধারণাটির জন্ম হয়েছে পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত চাপের ফলে। এরকম চাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তারা এর পক্ষে প্রমাণ খুঁজতে শুরু করেছে যাতে এই পদ্ধতিতে দাওয়াত দেওয়ার জন্য তারা যুক্তি ও অনুমোদন প্রদর্শন করতে পারে। অর্থাৎ প্রথমে তাদের মধ্যে ধারণাটির জন্ম হয়েছে এবং পরবর্তীতে ধারণাটিকে সংরক্ষণের জন্য তারা শরিয়াকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছে যাতে এর পক্ষে শর'ঈ দলিল উপস্থাপন করতে পারে। এটই হল বিচ্যুতির সূচনা। যেসব মুসলিম এই ধারণাটিকে গ্রহণ করেছে তাদের প্রতি আমাদের উপদেশ হচ্ছে তারা যেন নিজেদের মধ্যকার দুর্বলতাকে অপসারণ করে। শরীআ'হর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এরূপ হতে হবে যেন তারা আল্লাহর উপরে ভরসা করে এবং তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) উপরে মজবুত ঈমান রাখে যিনি সমস্ত বিষয়কে তাদেরকে দান করেন। তাদেরকে এরূপই হতে হবে যাতে তারা এই ঈমান নিয়ে কঠোর বাস্তবতা ও ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে। তার এই ঈমান তার মধ্যে উন্নত অনুভূতির সৃষ্টি করবে এবং পরিস্থিতির তোয়াক্কা করবে না। শরীআ'হর সঠিক সীমানাতে অবস্থান এবং প্রকৃত আনুগত্যের মাধ্যমেই লোকজনকে ইসলামের দিকে ডাকতে হবে, কোন ধাপ গ্রহন করা ছাড়াই এই কাজটি সম্পাদন করতে হবে।

ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন পদ্ধতির দিকে আহবান হচ্ছে ইসলাম ভিন্ন অন্যকিছুর দিকে আহবান, যা হারাম। এর ভিত্তিতে যখন কোনো বিষয়ের দিকে অমুসলিম ও ত্রুটিপূর্ণ মুসলিমদেরকে আহবান করা হয় তারা সেগুলো গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। এই দ্বিধাগ্রস্ততার দায়ভার তাদেরই যারা ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন পদ্ধতির দিকে আহবান করে। কারণ, তাদের কাছে প্রকৃত ইসলামকে উপস্থাপন করা হয়নি এবং এই উপস্থাপনার ভিত্তি ইসলামের আধ্যাত্মিক ভিত্তি অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ও সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রণকারী আল্লাহর উপরে ঈমান এবং যে ভিত্তিতে শর'ঈ হুকুম গ্রহণ করা হয় তা থেকে অনেক দূরে। ফলে আল্লাহর হুজ্জাহ (প্রমাণ) তাদের বিরুদ্ধে যায় যারা ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন পদ্ধতির দিকে আহবান করে; তাদের বিরুদ্ধে যায়না যাদেরকে আহবান করা হয়েছে।

ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন পদ্ধতির দিকে আহবানের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে hostokkep ও আধিপত্য বিস্তার যার মাধ্যমে ইসলামের আংশিক বাস্তবায়নের পথ সুগম হয় এবং এক্ষেত্রে তাদের অজুহাত হচ্ছে শরীআ'হর পূর্ণাঙ্গ ও তাৎক্ষণিক বাস্তবায়নের মতো পর্যাপ্ত সামর্থ্য তাদের নেই। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.) আামাদেরকে যা দিয়েছেন সেগুলোর সামনে নতুন কিছু উপস্থাপন না করতে অথবা সেগুলো থেকে বিচ্যুত না হতে আমাদেরকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান যিনি দেন, তিনি হচ্ছেন মানুষের রব, সর্বজ্ঞানী, সমস্ত খবরের অধিকারী এবং যিনি জানেন তিনি কি সৃষ্টি করেছেন। ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন পদ্ধতির দিকে আহবানের সময় একজন মুসলিম কীভাবে নিজেকে এই অনুমতি দেয় যে সে আইন প্রণয়নের এই প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করে? একজন দাঈর (দাওয়াত বহনকারী) প্রকৃত অবস্থান হচ্ছে সে কেবল সমাধানকে কার্যকর করা ও বহন করার মধ্যেই নিজেকে সীমিত রাখবে এবং একে প্রণয়ন করতে যাবে না ।

ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন পদ্ধতির দিকে আহবান দা'ঈকে একটি নষ্ট চিন্তার পথ প্রদর্শন করে যার ভিত্তিতে যে লোকজনকে আহবান করে। ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন পদ্ধতির দিকে আহবানের ফলে কেউ যদি এর দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহলে তা তার চিন্তার প্রক্রিয়াকে দূষিত করে দিবে, যা অন্যান্য দূষিত চিন্তার মতোই পরিবর্তন করা জরুরী। যেহেতু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে চিন্তার প্রক্রিয়াই শুরুতে আসে সেহেতু চিন্তা পরিবর্তন করার চেয়ে চিন্তার প্রক্রিয়া পরিবর্তন করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যতক্ষণ না একটি সাধারণ উপায়ে উম্মাহর চিন্তার প্রক্রিয়াকে আমরা পরিবর্তন করতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত উম্মাহর অবস্থার কোনো নির্ভরযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হবে না। যে দূষিত প্রক্রিয়ায় সে চিন্তা করে এবং লোকজনকে আহবান করে তা প্রতিস্থাপন করে সেখানে চিন্তার সঠিক প্রক্রিয়াকে বসাতে হবে।

# ১১

# চিন্তা (Thought) ও পদ্ধতি (Method) হিসেবে আদর্শের প্রতি আনুগত্য

যখন পশ্চিমা কাফেররা তাদের জীবনব্যবস্থাকে এমনভাবে চাপিয়ে দিতে সক্ষম হলো যাতে তা জনগণ অনুসরণ করে, তখন মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনযাপনগত অবস্থান কারও নিকট আর ঈর্ষণীয় পর্যায়ে রইলো না। মুসলিমরা আক্বীদাহ্'র সাথে সাংঘর্ষিক চিন্তাসমূহ দ্বারা নিজেদের জীবন পরিচালিত করতে লাগলো। উম্মাহ্ কখনও যেসব বিজাতীয় চিন্তাসমূহকে গ্রহণ করেনি, তা হতে উৎসারিত পশ্চিমা জীবনদর্শনের সাথে ইসলামী আক্বীদা'হ্ হতে উৎসারিত চিন্তাসমূহের সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টার ফলে মুসলিমরা তাদের সঠিক পরিচিতি ও ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে ফেললো। অজ্ঞতা ও সবকিছু নিজেদের ভিত্তি হতে গ্রহণের অক্ষমতাই এসব ভ্রান্তচিন্তা বিস্তার লাভের জন্য দায়ী। তারা ইসলাম এবং ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এমন অসামঞ্জস্যপূর্ণ দুটি বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করলো। নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থকে তারা শারীআহ্'র উদ্দেশ্য বানিয়ে ফেললো। যেকোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে এবং যেকোন মনগড়া জিনিসের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতে তাদের কোনো আপত্তি ছিল না। পরিণতিতে জনগণের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবন পরস্পরবিরোধী বিষয়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। রাজনৈতিক শক্তিগুলো মুসলিমদের প্রকৃত চিন্তাগুলোকে মূল্যায়ন না করে বিজাতীয় চিন্তাসমূহের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী হয়ে পড়লো।

এরকম এক প্রতিকূল পরিবেশে বিদেশী কাফিরদের কর্তৃক আকৃতি দেয়া রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ভ্রান্ত চিন্তা ও বিশ্বাস, বিপথগামী আবেগের সমন্বয়ে গঠিত সম্প্রদায়কে মোকাবিলার লক্ষ্যে ইসলামী দল ও সংগঠনসমূহ যাত্রা শুরু করে।

এসবের প্রতিষেধক কিংবা নিরাময় এসব দল কিংবা সংগঠনের কাছে থাকা উচিত ছিল। জনগণকে দহনকারী বিভিন্ন বাঁকা পথের পাশে জনগণের অনুসরণীয় একটি সোজা পথনির্দেশনা উপস্থাপন করা উচিত ছিল। জনগণকে তাদের বলা উচিত ছিল,

**"নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তাহলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে।"** [সুরা আনআম :১৫৩]

এসব দল কিংবা সংগঠন এমন যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া উচিত ছিল যা তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয়। এসব যোগ্যতাসমূহ হচ্ছে চিন্তার স্বচ্ছতা, লক্ষ্য অর্জনের স্পৃহা, সচেতন একটি জনগোষ্ঠী প্রস্তুত করা, উম্মাহ্'কে প্রস্তুত করা এবং পদ্ধতি (Method) সংক্রান্ত প্রতিটি হুকুমের প্রতি আনুগত্য।

দলটি চিন্তাকে (idea) সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিবে। দলের দৃষ্টিতে চিন্তা হচ্ছে সেই সত্য যার দিকে জনগণ ফিরে আসা উচিত, এবং এটা হচ্ছে পথনির্দেশ যা মানবজাতির চলার পথকে আলোকিত করবে। এটা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য রহমতস্বরুপ। এটা মানুষকে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রবৃত্তিজাত চাহিদা থেকে বের করে নিয়ে আসবে। এটা মানুষের সামঞ্জস্যপূর্ণ, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যা মনকে ও আত্মাকে প্রশান্তিতে ভরিয়ে তোলে। এটি জীবনে সুখ বয়ে আনে এবং আশা জাগায়। এতে রয়েছে সেই গভীরতা ও পরিপূর্ণতা যা জীবন সম্পর্কে মানুষের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সামর্থ্য রাখে এবং এই জীবনের আগের ও পরের বাস্তবতার সাথে মানুষকে সম্পৃক্ত করে। সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করে, ফলে মানুষ তার এই জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য কী তা উপলব্দি করতে সক্ষম হয় এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এক প্রশান্তিময় জীবনের স্বাদ পায়।

এই চিন্তা ধারণকারী দলটি এটাও বিশ্বাস করে যে যখন এই চিন্তা সমাজে বিদ্যমান থাকেনা তখন কোনোরকম বাধা ছাড়াই মুনকার ও মিথ্যাচার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, মানুষ তার খেয়ালখুশীর অনুসরণ করা শুরু করে, যুলুম সংঘটিত হয় এবং জাহেলিয়াত বিস্তার লাভ করে। তখন সংকীর্ণ এক কঠিন জীবন মানুষকে নিদ্রাহীন করে তুলে, তাদেরকে কখনোই সন্তুষ্ট চিত্তে পাওয়া যায় না। না তাদের আচরণ থাকে স্বাভাবিক কিংবা অন্তরে কোনো প্রশান্তি।

দলের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে হবে এর চিন্তার (ফিক্‌রাহ্) দিকে মনোযোগ দেওয়া কারণ এটিই দলের আত্মা এবং তার অস্তিত্বের কারণ। এর যত্ন নেওয়া, বিশুদ্ধতা বজায় রাখা এবং অন্যকিছুর মিশ্রণ থেকে একে রক্ষা করার জন্য দলটির কাজ করতে হবে। অন্যান্য বিজাতীয় কুফর চিন্তা যাতে এর সাথে মিশ্রিত হতে না পারে সে বিষয়টি দলকে নিশ্চিত করতে হবে এবং বিজাতীয় কুফর চিন্তার ভিত্তিতে গড়ে উঠা সকল আহ্বান ও ধারণা থেকে একে স্বতন্ত্র রাখতে হবে। চিন্তার বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে হলে দলটির নিকট তার লক্ষ্য (vision) পরিষ্কার থাকতে হবে। লক্ষ্যের (vision) স্পষ্টতার জন্য প্রয়োজন সঠিক ইজতিহাদ লব্দ শারী'আহ্ হুকুম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান; এক্ষেত্রে শারী'আহ্ হুকুমকে অবশ্যই ইসলামী আক্বীদাহ্'র ভিত্তিতে হতে হবে।

চিন্তাগুলো (idea) যখন তার স্পষ্টতা, বিশুদ্ধতা ও স্বচ্ছতা এবং স্বাতন্ত্র্যতা হারিয়ে ফেলে তখন এটি নিজের বিশেষত্বও হারিয়ে ফেলে এবং এটা তখন আর আলোকবর্তিতা, হিদায়াত বা রহমত হিসেবে গণ্য হয়না। দলটি তখন নিজের অস্তিত্বে থাকার কারণ হারিয়ে ফেলে এবং তথাকথিত অন্যান্য আন্দোলনের মতো হয়ে পড়ে; বাস্তবতার নিকট এমনভাবে পরাজিত হয় যে বাস্তবতাকে প্রভাবিত করার পরিবর্তে নিজেই বাস্তবতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং বাস্তবতাকে যথার্থরূপে পরিবর্তন করার পরিবর্তে নিজেই পরিবর্তিত হয়ে যায়।

দলের কর্মীদের মধ্যে চিন্তাসমূহ (idea) যত স্বচ্ছ হবে ততই তা স্বচ্ছতার সাথে জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। চিন্তার (idea) স্বচ্ছতা থেকেই উদ্দেশ্য স্বচ্ছতা লাভ করে। শারী'আহ্'র অন্যান্য হুকুমের মতো এই উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়াও শারী'আহ্'র বিভিন্ন হুকুম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

আদর্শিক দল সর্বাবস্থায় আদর্শের আনুগত্য করে। আর এই কারণে আদর্শিক ফিকরাহ্‌তে (আক্বীদা ও সমাধান সম্বলিত চিন্তাসমূহ) বিশ্বাসী ও এর আহ্বানকারীদের এর অনুমোদন ব্যতীরেকে অন্য কোন উৎস থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। যেহেতু এটি একটি মৌলিক চিন্তা, সুতরাং এটি যেকোনো বিষয়কে তার গোঁড়া থেকে গবেষণা করে এবং মহাবিশ্বে মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র উত্তর প্রদান করে। ফলে জীবন সম্পর্কিত সকল প্রশ্নের সমাধান এই মৌলিক চিন্তা থেকে গ্রহণ করা হয় এবং তা হতে উৎসারিত হয়। তখন মানুষের জীবনদর্শন, জীবনের প্রতিটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রতিটি কর্মকান্ডের মাপকাঠি তার জীবন সম্পর্কে মৌলিক বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যতা লাভ করে।

ইসলামের কাঠামোটি পূর্ণাঙ্গ এবং এতে এমনকি একটি ইটও ফাঁকা নেই। এর সবকিছু একটি অপরটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কারণ এগুলো এমন এক অপরিবর্তনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি থেকে উৎসারিত যা মানবজীবনের স্বাভাবিক আচরণ এবং সৃষ্টি জগতের নিয়ম সম্মত।

সুতরাং ইসলামে বিশ্বাসীদের লাভ-ক্ষতির পরিবর্তে হালাল-হারামই হবে কাজের মাপকাঠি এবং প্রতিটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী। কারণ লাভ-ক্ষতি সেই চিন্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেই চিন্তা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র পরিবর্তে মানুষকে বিধানদাতা মনে করে। জীবনে সর্বোচ্চ ভোগ-বিলাসের সাথে একজন মুসলিমের সুখ সম্পৃক্ত নয় বরং তা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র সন্তুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত। অবাধ স্বাধীনতার চিন্তা যা মানুষকে স্বেচ্ছাচারী করে তোলে তার বিপরীতে একজন মুসলিমের জীবন হবে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র সার্বভৌমত্বের অধীন ও তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) নির্দেশের প্রতি আত্মসমর্পণকারী। ভিত্তিকে যদি কেউ গ্রহণ করে তাহলে তা থেকে উৎসারিত সবকিছুকে তার গ্রহণ করতে হবে। কেউ যদি পরিবর্তন চায় তাহলে ভিত্তি দিয়েই তাকে শুরু করতে হবে এবং সকল পারিপার্শ্বিক চিন্তাগুলোকে ভিত্তির সাথে সমন্বয় বিধান করতে হবে। এই হচ্ছে আদর্শিক ফিক্‌রাহ্ ও আদর্শিক দাওয়াত যা নিয়ে দলটিকে যাত্রা শুরু করতে হবে। সুতরাং মুসলিমরা, তাদের ব্যবস্থাসমূহ কিংবা বিভিন্ন সংগঠন ইসলামের সাথে অন্যকিছুর মিশ্রণ ঘটাবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে, বর্তমান শাসকগোষ্ঠী যদি অন্যান্য উৎসের পাশাপাশি শারী'আহ্'কে একটি উৎস হিসেবে কিংবা শারী'আহ্'র পাশাপাশি অন্যান্য উৎসকে সংমিশ্রণ করে গ্রহণ করে তবে তাও গ্রহণযোগ্য হবে না। ইসলামী দলগুলো যদি ইসলামের বহির্ভূত পাশ্চাত্যের কুফর চিন্তাগুলোকে ইসলামের সাথে সংমিশ্রণ করে তাও গ্রহণযোগ্য হবেনা। এটা সুস্পষ্ট পরাজয় ছাড়া আর কিছুই নয় যা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বান্দা তা কখনোই মেনে নেন না।

'লা ইলাহা ইলাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-আল্লাহ্ সুবহানালাহু ওয়া তা'আলা ব্যতীত ইবাদত বা আনুগত্যের যোগ্য অন্য কোনো সত্তা নেই– এই আক্বীদাহ্'র ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী দলগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুনের জন্য পূর্ব কিংবা পশ্চিম কোনোদিকের দ্বারস্ত হওয়াই বৈধ নয়। সকল চিন্তাই যেন আক্বীদাহ্ থেকে উৎসারিত হয়, এগুলো যেন নির্ভরযোগ্য

শারী'আহ্ দলিলের আলোকে হয় এবং বিস্তারিত দলিলাদি থেকে ইজতিহাদপ্রসূত হয়, এসব বিষয়কে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

সমাজতন্ত্রের উৎপত্তি ইসলাম থেকে, এই বক্তব্যটি কীভাবে 'লা ইলাহা ইলাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, কারণ জীবন সম্পর্কে সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা- 'সৃষ্টিকর্তা বলতে কিছু নেই এবং জীবন নিছক বস্তুমাত্র'। গণতন্ত্রের উৎপত্তি ইসলাম থেকে, এই বক্তব্যটিও কীভাবে ইসলামে সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে যেখানে এই ব্যবস্থাটি 'দ্বীনকে দুনিয়া থেকে পৃথকীকরণ', এই কুফর বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। অনুরূপভাবে দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদ ইসলাম থেকে এসেছে, এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীও কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে যেখানে গোত্রপ্রীতি থেকে জন্ম নেওয়া এসব চিন্তা ইসলামের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য?

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ সুবহানালাহু ওয়া তা'আলা ব্যতীত আর কোনো বিধানদাতা নেই, এই চিন্তাটি কীভাবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অন্যদের সাথে আমাদের অংশগ্রহণ করা উচিত অথবা আমাদের সাথে অন্যদের অংশগ্রহণ করা উচিত এমন দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে?

বিশ্বজগতের প্রতিপালকের আনুগত্য, দাসত্ব ও ইবাদতের ধারণার উপরে প্রতিষ্ঠিত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' কীভাবে পাশ্চাত্য ব্যবস্থার স্বাধীনতার ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে, যা সকল বিষয়ে একমাত্র মানুষকে সার্বভৌম মনে করে? সে সৃষ্টিকর্তার প্রতি ততটুকুই আত্মসমর্পণ করে যতটুকু তার খেয়াল-খুশী, ইচ্ছা ও স্বার্থের অনুকূল হয় ।

প্রকৃতপক্ষে, ইসলামে আক্বীদাহ্'কে রক্ষা করার অর্থ হচ্ছে তা থেকে উৎসারিত সমস্ত কিছুকে রক্ষা করা। অন্যথায় সামঞ্জস্যতা বিধানের অতল গহ্বরে দলের চরিত্র তলিয়ে যাবে; যা আল্লাহ্ সুবহানালাহু ওয়া তা'আলা ও তাঁর বান্দাগণ কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেন না।

স্পষ্টতা, বিশুদ্ধতা, স্বাতন্ত্র্যতা এবং স্বচ্ছতার দিক দিয়ে চিন্তাটিকে সংরক্ষণের জন্য একে বাস্তবতা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ও পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণের হাত থেকে দূরে রাখতে হবে এবং যেকোনো মিথ্যা, বিকৃতি ও বাগাড়ম্বরতা থেকে একে পবিত্র রাখতে হবে।

দাওয়াত বহনকারীগণ যেমন নিজস্ব লক্ষ্য অনুযায়ী সমাজ পরিবর্তন করতে চায় ঠিক তেমনিভাবে সমাজও তার নিজস্ব ভ্রান্ত ধারনা ও চিন্তা, রাজনৈতিক অবস্থা এবং সামাজিক কাঠামো আঁকড়ে রাখতে চায়, যা পরিবর্তন প্রত্যাশী সংগঠন এবং দাওয়াহ্ বহনকারীদের উপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করে।

## বিচ্যুতি ও আপোষের ব্যাপারে সতর্ক থাকা

কোনো আদর্শিক ফিকরাহ্'র (আক্বীদা ও সমাধান সম্বলিত চিন্তাসমূহ) উপরে প্রতিষ্ঠিত দল যখন বাস্তবতার মোকাবিলা করতে মাঠে নামে তখন তার উপর অনেক ঝড়-ঝাঁপটা আসে এবং তাকে শিকড় থেকে উপড়ে ফেলতে চায়। এই আন্দোলনটির প্রতি শাসকবর্গের আচরণ হবে অন্যান্য আন্দোলন থেকে পৃথক। কারণ অন্যান্য আন্দোলনগুলো আংশিক চিন্তা উপস্থাপন করে, যার ফলে তারা শাসকের জন্য মোটেও হুমকি হিসেবে কাজ করেনা। বরং শাসকবর্গ কর্তৃক সংঘটিত বিভিন্ন ত্রুটি ও অপূর্ণতার খালি জায়গাগুলো পূরণ করে দেয়। কিন্তু আদর্শিক ফিক্‌রাহ্'র ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত চরম আন্দোলনটি নিজস্ব ভিত্তির আলোকে বিভিন্ন বিষয়ের মোকাবিলা করে এবং কোনো জোড়াতালি দেওয়া সমাধানকে মেনে নেয়না অথবা পরিস্থিতির সাথেও তাল মেলায়না। না তারা কোনো আংশিক সমাধান মেনে নেয় আর না শাসকবর্গ কর্তৃক সৃষ্ট সমস্যার সংস্কার করে। সামগ্রিক পরিবর্তন অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এই দাওয়াহ্ ত্যাগ করাকে তারা মেনে নেয় না। না তারা ভিত্তিকে বাদ দিয়ে ভিত্তি থেকে উৎসারিত পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করাকে মেনে নেয়। ফলে এটা স্বাভাবিক এমন সংগঠনকে একটি নজিরবিহীন প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুক্ষীন হতে হবে। সামগ্রিক পরিবর্তনের পথকে সংগঠনটি যত বেশী অনুসরণ করবে এর প্রতি শাসকগোষ্ঠীর শত্রুতা ও বিরোধীতাও তত বেশী জোরালো হবে।

এই বিরোধিতার তীব্রতার পরিমান এতো বেশীও হতে পারে যা সহ্য করার ক্ষমতা দাওয়াহ্ বহনকারীগণ মাঝেমধ্যে হারিয়ে ফেলতে পারেন। এবং দাওয়াহ্'র বক্তব্যের তীব্রতাকে খানিকটা হালকা করার জন্য সংগঠনের উপর চাপ প্রয়োগ করতে পারেন। যখন সে প্রত্যক্ষ করবে সবাই তাকে ও তার এই আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছে তখন এই দাওয়াহ্ অব্যাহত রাখার কাজ

তার নিকট অত্যন্ত কঠিন মনে হবে এবং তার সংকল্প দুর্বল হয়ে পড়বে। সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতিতে যখন তার পার্থিব স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তখন সে নিজেকে প্ররোচিত করবে এবং কাজ ছেড়ে দিতে চেষ্টা করবে। তখন সে দলের উপর চাপ প্রয়োগ করবে যাতে দল পরিবর্তনের আহবানের পরিবর্তে সংস্কারের আহবান জানায়। দল যদি তার আহ্বানে সাড়া দেয় তাহলে সে দলে সাথে থাকবে। এভাবে নিজের দাবি অনুযায়ী সে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের জন্যই কাজ করবে এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও শাসকবর্গ উভয়কেই সন্তুষ্ট করবে। কিন্তু দল যদি তার এই চাপ প্রত্যাখ্যান করে দলের সামগ্রিক এবং মৌলিক কাজে অটল থাকে তাহলে সে দল ছেড়ে যাবে। অতএব, দল এক্ষেত্রে দুটো বিপদের সম্মুখীন হবে; একটি আভ্যন্তরীণ-যা আসবে সেসব শা'বাবদের তরফ থেকে যাদের মনোবল প্রচন্ড ঝড়-ঝাঁপটা আসার পূর্বেই ভেঙে পড়েছে এবং আরেকটি শাসকগোষ্ঠী তরফ থেকে যারা সামগ্রিক পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গী ধারণকারী দাওয়াহ্ বহনকারীদের সহ্য করতে পারে না।

একপর্যায়ে দল এবং শাসকবৃন্দের মধ্যে দরকষাকষি শুরু হবে। তখন দলের নিকট বিভিন্ন প্রস্তাব আসা শুরু করবে এবং ভয়-ভীতি আর প্রলোভন সমন্বিত একটি 'মূলা ঝুলানো' তত্ত্ব প্রয়োগ করা হবে। এটা সর্বজনবিদিত ব্যবসার ক্ষেত্রে দরকষাকষি প্রযোজ্য; সুতরাং দল যখন দরকষাকষিতে নামে তখন তা হয় তার দায়িত্বকে বিক্রি এবং উম্মাহ্'কে অপমানিত করার মতো অবস্থা। অন্যথায় একে শাসকগোষ্ঠীর আগুনে দগ্ধ ও তার শিখায় ঝলসাতে হয়।

অতএব, সঠিক আদর্শিক ফিকরাহ্ এমন একটি আদর্শিক দলের দাবি করে যার নেতৃত্ব এবং সদস্যগণ শারী'আহ্'র কর্তৃত্বকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়। স্পষ্টতা, বিশুদ্ধতা, ধৈর্য, ত্যাগ স্বীকার, পরার্থবাদ এবং এ সমস্ত বিষয়েও তারা সচেতন। পরিণতির আশংকায় যে কোন প্রলোভনের হাতছানিতে সাড়া দেওয়া থেকে তাদের অবশ্যই তাদেরকে বিরত থাকতে হবে যাতে তারা বিচ্যুত হয়ে না পড়ে এবং তাদের মনোবল না ভেঙে যায়। দলটি যদি এমন একটি সুরক্ষিত পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে চায় যাতে তার কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় এবং কোনোরূপ পরিবর্তনের জোয়ারে ভেসে না যায় অথবা দলটিকে নিয়ে লোকজন কোনোরকম খেলায় লিপ্ত হতে না পারে, সেজন্য দলটিকে অবশ্যই প্রতিটি চিন্তাকে বা শারী'আহ্ হুকুমকে দৃঢ়ভাবে ইসলামী আক্বীদাহ্'র সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। যদি কখনো লক্ষ্য অর্জনের পথে দাওয়াত বহনকারীর ব্যক্তিগত স্বার্থ বা সুবিধার সাথে দাওয়াহ্'র দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যের সংঘাত বাঁধে তাহলে অবশ্যই দাওয়াহ্'কে সর্বাবস্থায় প্রাধান্য দিতে হবে। যার ফলে তখন এই চিন্তাটি দুষ্কর্মের দিকে ধাবিতকারী শয়তান ও নফসের প্ররোচনার পথে একটি দূর্বেধ্য বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে।

কাঁদার মধ্যে সংগঠনটির তরী ডুবে যাওয়ার মতো ন্যাক্কারজনক পরিণতির হাত হতে বাঁচাতে হলে, তার নিকট নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় কিছু মূলনীতি বিদ্যমান থাকতে হবে যা দলের চিন্তা ও চিন্তার প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করবে। যা দলটিকে তার গৃহীত হুকুম শারী'আহ্'র মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে। নতুন ব্যাখ্যা বা মূল্যায়নের নামে এসব মূলনীতি থেকে সে কখনোই বিচ্যুত হতে পারবে না।

ফলে সঠিক নির্দেশনা, সঠিক অনুসরণ এবং সঠিক জ্ঞান দলটিকে পরিশুদ্ধ করবে এবং দলের সদস্যদের অন্তরকে যেকোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং দোষ থেকে মুক্ত করবে এবং তাদের ঈমানকে মজবুত করবে।

এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী মুমিনগণ ছাড়া আর কারও পক্ষে দৃঢ় থাকা অসম্ভব। এমন কঠিন পরীক্ষার সম্মুক্ষীন হওয়ার পর যারা টিকে রইবে, তাদের ঈমান সেইভাবে খাদমুক্ত হয়ে পরিশুদ্ধ হবে যেভাবে আগুন দ্বারা সোনা খাদমুক্ত হয়ে পরিশুদ্ধ হয়।

দল যখন তার গৃহীত নিয়ম নীতিমালাকে হারিয়ে ফেলে তখন সে কর্মসূচী প্রত্যাহার, রদবদল, পিছু হটা, অসঙ্গতিতে ভুগবে। পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতা ও অস্বচ্ছতা কঠিন পরিস্থিতিতে কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে সংগঠনকে পরিবর্তন সাধনে তাড়িত করে অথবা জনগণের নিকট দলিল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এসব পরিবর্তনের পক্ষে ন্যায্যতা কিংবা শারী'আহ্'র বাইরে গিয়ে ব্যাখ্যা উপস্থাপনের দিকে ধাবিত করে।

দল যখন আপোষ করবে, সত্যকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ না করে আংশিকভাবে গ্রহণ করবে এবং সামগ্রিক পরিবর্তনের আকাঙ্খা ও মৌলিক কাজকে পরিত্যাগ করবে তখন সে তার ধারণকৃত একমাত্র শক্তিকে হারিয়ে ফেলবে। তখন সে আর কোনো অনন্য ও স্বতন্ত্র দল হিসেবে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেনা। বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামে সে পরাজিত হবে এবং শত্রুপক্ষ বিজয়ী হবে যদিও তখন সে ইসলামের দিকে আহবান করে এবং ইসলামকে একমাত্র সমাধান হিসেবে উপস্থাপন করে। এর কারণ তার আহ্বান বিকৃত এবং প্রচলিত ব্যবস্থার জন্য সুবিধাজনক হয়ে গেছে। এবং পরিবর্তনের রাস্তায় সহযোগী হওয়ার

পরিবর্তে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। এই ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, রাসূল (সা:) এবং রাসূল (সা:) পরবর্তী উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন:

**"...এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ্ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন।"** [সুরা মায়েদা ঃ ৪৯]

তাছাড়া সাইয়্যিদুনা উমর (রাঃ) তার নিযুক্ত বিচারক শুরায়হ্'কে বলেছেন ঃ "কেউ যাতে তোমাকে নির্ধারিত এ পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।"

দলের মধ্যে বিদ্যমান সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র হচ্ছে তার ফিকরাহ্ (আক্বীদা ও সমাধান সম্বলিত চিন্তাসমূহ)। যদি দল একে সংরক্ষণ করে এবং আপোষের পরিবেশ থেকে রক্ষা করে, পরিস্থিতির তোয়াক্কা না করে এর উপরে অটল থাকে এবং রাসূল (সা:) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাহলে রাসূল (সা:) এর মতো তারাও মুমিনদের একটি দল প্রস্তুত করতে পারবে এবং আল্লাহ্'র নাযিলকৃত বিষয়াদি দিয়ে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা মেনে নিতে উম্মতকেও রাজি করাতে পারবে। এসব বিষয় প্রস্তুত করার পরে সে পরিস্থিতিকে দাওয়াহ্'র অনুকূলে নিয়ে আসতে পারবে এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

ইসলামী চিন্তাসমূহ সত্যের দাওয়াহ্ বহনকারী ব্যক্তিদের জন্য এমন এক নিয়ামত যা তাদেরকে পরিস্থিতি কর্তৃক সৃষ্ট চাপ মোকাবেলায় আসল মৌলিক চিন্তাসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইসলামী চিন্তাসমূহের উপর অটল থাকার দাবি জানায়। পরিস্থিতি সৃষ্ট চাপের মুখে- 'চাহিদানুযায়ী সবই গ্রহণযোগ্য', 'ততটুকুই উপস্থাপন কর যতটুকু বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ', 'দাবির আংশিক উপস্থাপন কর', 'আংশিক সমাধান গ্রহণ কর'- এ ধরনের মানসিকতা পোষণ করা দলের জন্য কোনভাবেই মানানসই না। এসব চিন্তাকে ব্যবহার করা নয় বরং এগুলোর মূলোৎপাটনের জন্য সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এগুলো পাশ্চাত্যের চিন্তার ধরণ যা দ্বারা তারা আমাদের চিন্তার উপর আগ্রাসন চালিয়েছে। এসব চিন্তার সাথে সামগ্রিকভাবে ভিন্নমত পোষণকারী ইসলামী চিন্তা এসব কুফর চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করে ও এগুলোকে সমূলে উপড়ে ফেলার জন্য কাজ করছে, এবং ইসলাম ও ইসলামের চিন্তার প্রক্রিয়া বলবৎ করার জন্য কাজ করছে। অতএব যে পরিবর্তন চায় এবং পরিবর্তনের জন্য কাজ করছে তাকে অবশ্যই প্রথমে নিজেকে দিয়ে শুরু করতে হবে।

ফিকরাহ্'র বিশুদ্ধতা ও স্পষ্টতার উপরে জোর দিতে এবং তা বজায় রাখতে কোন কোন বিষয়ের দিকে দলটিকে নজর দিতে হবে সেগুলো উপস্থাপনের পর এবার আমরা পাশ্চাত্যের কাফিরদের কর্তৃক প্রস্তাবিত দুটি চিন্তা নিয়ে আলোচনা করব। এসব চিন্তার প্রতি আমাদের শাসকবর্গ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এগুলোর মাধ্যমেই তারা মুসলিমদের উপর নির্যাতন চালায়। দুর্ভাগ্যবশত ইসলামের জন্য কাজ করে এমন কিছু ইসলামী দল এবং পাশ্চত্য চিন্তা গ্রহণের জন্য সবসময় উৎসাহ যোগায় এমন কিছু মুসলিম লেখক এসব চিন্তাকে দ্রুত গ্রহণ করে ফেলেছে। চিন্তা দুটির মধ্যে একটি হচ্ছে গণতন্ত্র এসেছে ইসলাম থেকে এবং গণতন্ত্রই শূ'রা। এমনকি শব্দের পুনর্মিলন ও বুদ্ধিবৃত্তিক অসততার দরুন একজন লেখক একে শূ'রাক্রেসি বা শূ'রাতন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন। অপর চিন্তাটি হচ্ছে কতিপয় মুসলিম এবং ইসলামী আন্দোলন কর্তৃক কুফর শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করার পক্ষে সাফাই গাওয়া। উপরোক্ত আলোচনাটিতে অগ্রসর হওয়ার শুরুতেই আমরা যেসব মূলনীতি উল্লেখ করেছি তার আলোকে আমরা যাচাই করবো কোন বাস্তবতায় গণতন্ত্র প্রয়োগযোগ্য, গণতন্ত্রের বাস্তবতা কী এবং শারী'আহ্'তে এমনকোনো বাস্তবতা আছে কিনা যা গণতন্ত্রের বাস্তবতার সাথে সদৃশপূর্ণ।

## গণতন্ত্র

পশ্চিমা সভ্যতা দুনিয়া থেকে দ্বীনের পৃথকীকরণ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই চিন্তা ও ভিত্তিতে বিশ্বাসের দরুণ পশ্চিমারা জনগণের জীবন থেকে দ্বীনের প্রতিটি প্রভাব বিনষ্ট করেছে। এর অনুকরণে তারা মৌলিক চিন্তার আদলে এর উপর ভিত্তি করে জীবন সম্পর্কিত সকল চিন্তা ও সমাধান বিকশিত করেছে। অতএব গণতন্ত্রের মাধ্যমে মানুষ নিজেদের উপর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র কর্তৃত্বের পরিবর্তে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলে নিজেদের কাজের মাপকাঠি হিসেবে তারা স্বার্থকে গ্রহণ করলো এবং সর্বোচ্চ মাত্রার ঈন্দ্রীয়গত পরিতুষ্টিকে সুখ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করলো। এটাই ছিল ব্যক্তিপূঁজার চিন্তা পরবর্তীতে ব্যক্তিস্বাধীনতার পূঁজার দিকে ধাবিত করে। এসব চিন্তার উপরে ভিত্তি করেই পাশ্চাত্য সভ্যতা গড়ে উঠেছে এবং পাশাপাশি এসব চিন্তার সাথে সাংঘর্ষিক সকর চিন্তার বিরোধিতা করেছে। এসব চিন্তা গ্রহণের ফলে নিজেদের সন্ধানকৃত সুখের পরিবর্তে পাশ্চাত্য কেবল দুর্ভোগেরই শিকার হয়েছে। এরূপ ঘটাই স্বাভাবিক কারণ মানুষ হচ্ছে দুর্বল যে নিজের বা অন্যের জন্য

আইন প্রণয়নের যোগ্যতা রাখেনা। যে সমাজে স্বার্থপরতা প্রবল থাকে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার কর্তৃত্ব থাকে সেরকম একটি সমাজ কেবল পাশবিকই হতে পারে যেখানে জংলী আইনকানুনের রাজত্ব থাকে।

এরপর পশ্চিমারা মনকে স্বাধীন রাজত্ব প্রদান করলো। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে তারা মনোনিবেশের ফলে তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করলো। এভাবে যখন সে ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠলো তখন পৃথিবীর উপর সে সত্যের জোরে নয় বরং ক্ষমতার জোরে আধিপত্য বিস্তার করলো। প্রথমে বস্তুগতভাবে ও পরবর্তীতে বুদ্ধিবৃত্তিভাবে সে নিজেকে পৃথিবীর উপর চাপিয়ে দিল। অন্যভাবে বলতে গেলে, একটি দেশের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর তারা প্রথমে এমন শাসকবর্গকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করলো যারা তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে এবং সেজন্য উপযোগী ব্যবস্থাও আরোপ করবে। এমন মিডিয়া ও পাঠ্যসূচী প্রতিষ্ঠা করলো যা তাদের চিন্তা ও জীবনব্যবস্থার পক্ষে প্রচারণা চালাবে। জনগণকে তারা উপলব্ধি করানোর চেষ্টা করলো যে জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী তাদেরকে ক্ষমতাধর অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে।

তখন সে নিজের স্বার্থের অনুকূলে পুরো পৃথিবীকে বিভক্ত করে ফেললো। শিল্পোন্নত, উৎপাদনশীল, শক্তিশালী, আধিপত্যবাদী এবং ঔপনিবেশিবাদী রাষ্ট্রগুলোকে তারা আধুনিক ও প্রগতিশীলদের কাতারে ফেললো। এবং অবশিষ্ট দরিদ্র, পরনির্ভরশীল, দুর্বল এবং নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রগুলোকে তারা পশ্চাৎপদদের কাতারে ফেললো। এই বিভক্তিকে আরও গভীর করা, এবং এসব রাষ্ট্রের সার্বিক পরিস্থিতি কিংবা চলমান পরিস্থিতি অসঙ্গতিপূর্ণ যেকোনো পরিবর্তনের চেষ্টাকে প্রতিরোধ করলো।

তারপর তারা নিজেদের দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতার দরজা খুলে দিল এবং জনগণকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা উপভোগের সুযোগ করে দিল। বৈষম্য বজায় রেখে জনগণকে মৌলিক চাহিদা ও পাশাপাশি ভোগবিলাসের চাহিদা পূরণের সুযোগ করে দিল। একই সময়ে এসব দরিদ্র দেশসমূহ যাতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বস্তুগত উন্নতি সাধন করতে না পারে এজন্য তারা এসব জাতিকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হতে বঞ্চিত রাখলো। মৌলিক শিল্প কাঠামো গড়তে বাঁধা প্রদান করেছে যাতে অতি প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদার জন্যেও এসব দেশকে পশ্চিমাদের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। এসব দেশকে দুর্বল করার মাধ্যমে তারা এগুলোকে নিজেদের বাজারে পরিণত করলো। এসব দেশের জনগণকে তারা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করলো। আর এজন্যেই শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলো দরিদ্র দেশগুলোকে নিজেদের উপনিবেশ বানাতে পরস্পরের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এই দ্বন্দ্ব আবার এ পর্যায়ের না যে তাদের একে অপরের সাথে যুদ্ধ লিপ্ত। বরং তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের পরিণতি হচ্ছে এসব দরিদ্র দেশের জনগণ একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত, অথবা ঐ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রনহীন বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠী ও বিপ্লবের উৎপত্তি। ফলে এসব রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হয় এবং জনগণের ভিতরে ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে। না বললে নয় যে এর মাধ্যমে তারা এসব দেশের জনগণের ভেতর বর্ণবাদ, গোত্রবাদ এবং জাতীয়তাবাদকে উস্কে দিয়েছে।

অনুরূপভাবে, পাশ্চাত্য দেশসমূহ নিজেদের জনগণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা যেমন ঔষধ, শিক্ষা, বেকার ভাতা, বার্ধক্য ভাতা প্রভৃতি বিষয় সরবরাহ করেছে অথচ অন্যান্য দেশে এসব বিষয়কে নিষেধ করেছে।

উপনিবেশীকরণের বিভিন্ন উপকরণ হিসেবে পাশ্চাত্য কিছু বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান যেমনঃ আন্তর্জাতিক আদালত, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ, বিশ্বব্যাংক ও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেছে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যকার দ্বন্দ-সংঘাত থামানোর জন্য অথবা দরিদ্র দেশগুলোতে দেওয়া ত্রাণের নিরাপত্তার জন্য তারা আন্তর্জাতিক সামরিক বাহিনী গঠন করেছে। গরিব দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিষয় পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান যেমন সেভ দি চিলড্রেন এবং মেডিসিন সানস ফ্রন্টিয়ারস প্রতিষ্ঠা করেছে।

প্রকৃতপক্ষে, জীবন থেকে দ্বীনের পৃথকীকরণ এবং এ থেকে উদ্ভূত স্বার্থের ধারণা থেকে পাশ্চাত্য উপনিবেশকরণের ধারণা প্রবল হয়েছে। তবে এই উপনিবেশীকরণ বর্তমানে তার আদিম চেহারায় আর নেই। বরং তা চিন্তা, উপকরণ ও ধরণ পাল্টে এক গুপ্ত উপনিবেশবাদে পরিণত করা হয়েছে। বাহ্যিকভাবে এটি করুণা এবং ভিতরগতভাবে যুলুম। এভাবেই পশ্চিমারা বিভিন্ন বিষয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে এবং নিজেদেরকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে যাতে জনগণ তাদেরকে একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ বলে ভাবতে শুরু করে এবং মুসলিমরা তাদেরকে কিবলা বানিয়ে মাথানত করে। তাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার চিন্তা থেকে এরূপ দাবি করার মতো বড় প্রতারণা এবং মুনাফিকী আর কী হতে পারে? পাশ্চাত্যের পছন্দকৃত স্বর্গে (?) যারা বাস করতে চায় তাদের জন্য পাশ্চাত্য হচ্ছে আশ্রয় ও করুণা। পাশাপাশি উপনিবেশিকতাবাদের প্রকৃত চেহারা যা হচ্ছে জনগণকে শোষণ করা ও তাদের সম্পদ অন্যায়রূপে দখল করা, তাদেরকে দুর্বল করে রাখা, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দিক

থেকে তাদেরকে পশ্চাৎপদ করে রাখা, নিজেদের সম্পদের জন্য তাদেরকে স্থায়ী বাজারে পরিণত করা এবং পুরো বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণের যে কারণ সেগুলোকে তারা গোপন করেছে। পাশ্চাত্যের সভ্যতা এবং এর উপনিবেশিকতাবাদের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ, আলোচনার সুবিধার্থে যার কিছু অংশ আমরা উপস্থাপন করেছি মাত্র।

হ্যাঁ, ঠিক এভাবেই পশ্চিমারা সত্যকে বিকৃত করেছে, বিষয়বস্তুকে উল্টে ফেলেছে এবং নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন বিষয়কে জনগণের প্রকৃত উপলব্ধি থেকে অন্ধকারে রেখেছে। ফলে বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক চিন্তা জনগণকে প্রভাবিত করতে লাগলো, যার মধ্যে 'জোর যার মুল্লুক তার' অন্যতম। শ্লোগাণটি 'শক্তিশালীর যুক্তি শক্তিশালী' এবং 'দুর্বলের যুক্তি দুর্বল' এই মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

আদর্শিক দল বা গোষ্ঠীর মূল ভূমিকা এখানেই যাতে সবকিছুই তার প্রকৃত অবস্থায় ফিরে আসে, দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক হয় এবং প্রতারণা বন্ধ হয়। দল যদি বাস্তবতা দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে সে সঠিক উপলব্ধি হারিয়ে ফেলবে এবং এমন সমাধানের প্রস্তাব দিবে যা সাধারণত তার শত্রুরা দিয়ে থাকে। তবে দল যদি বাস্তবতাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে এবং সমাধান খুঁজতে সঠিক প্রক্রিয়ায় শারী'আহ্'কে অনুসরণ করতে পারে তাহলে জনগণের সামনে সে সঠিক সমাধান উপস্থাপন করতে পারবে এবং জনগণকে পাশ্চাত্যের নষ্ট চিন্তা থেকে ইসলামের আলোকিত চিন্তায় আনতে সক্ষম হবে।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে বিভিন্ন দেশকে বস্তুগত অগ্রগতির উপকরণ অর্জনে বাঁধাপ্রদান এবং নিজেদেরকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে জ্ঞানচর্চার ব্যাপক স্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমে পশ্চিমারা তাদের ক্ষমতাধর অবস্থা ধরে রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে, তাদের মাত্রাতিরিক্ত সম্পদের পিছনে গণতন্ত্র নয় বরং দায়ী হচ্ছে তাদের ঔপনিবেশিকতাবাদ, বিভিন্ন জাতিসমূহের রক্তশোষণ এবং সম্পদ লুণ্ঠন।

আর গণতন্ত্র কী ও তা বাস্তবায়নের পরিণতি কী; তা এক ভিন্ন আলোচনা।

পাশ্চাত্যে 'জীবন থেকে দ্বীনের পৃথকীকরণ'–এই ধারণাটি জন্ম হয়েছে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে চার্চের হস্তক্ষেপের ফলে সৃষ্ট দুর্ভোগের কারণে। এসব হস্তক্ষেপ ধর্মের নামে চালানো হলেও এসব ব্যাপারে ধর্মের কোনো মন্তব্য ছিলনা। কারণ খ্রিস্টান ধর্মে পার্থিব বিষয়সমূহের জন্য কোনো আইনকানুন নেই। ধর্মের নামে পাদ্রীগণ বিভিন্ন অন্যায় আইনকানুন তৈরি করেছিল যার ফলে কিছু বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়; এর মধ্যে একটি ছিল ধর্মকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা এবং অন্যটি ছিল ধর্মকে স্বীকার করা কিন্তু জীবন থেকে একে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। প্রথম প্রতিক্রিয়াটির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা চিন্তাগুলোর উপর ভর করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনের উত্থান ঘটে এর শাসনে জনগণ পিষ্ট হয় এবং কয়েক দশক যেতে না যেতে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়াটির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা চিন্তাগুলোর উপর ভর করে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শাসনের উত্থান ঘটে যা ধ্বংসের পথে এগুচ্ছে। যার নমূনা চিন্তা এবং বাস্তবতার নিরিখে সুস্পষ্ট।

'জীবন থেকে দ্বীনের পৃথকীকরণ'-এই ধারণাটি ধর্মকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে মানুষকে আইন প্রণয়নের অধিকার দিয়েছে। সৃষ্টিকর্তার ধারণাকে স্বীকার করে নেয়া সত্ত্বেও তারা একে এমন একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তায় পরিণত করেছে যাতে এর কোন বক্তব্য কিংবা প্রভাব সমাজের উপর না পড়ে। সমাজের বিষয়ে যার কিছু বলার নেই এবং যা সমাজে কোনো প্রভাবও রাখতে পারবেনা। তাদের জন্য এটা ভুল নয় যদি কেউ আল্লাহ্, যীশু, বুদ্ধ বা অন্য কোন ব্যক্তির উপাসনা করে। এমনকি ধর্ম হতে উদ্ভুত নয় এমন বিশ্বাসে কেউ বিশ্বাসী হওয়াটাও তাদের দৃষ্টিতে দোষের নয়। কিন্তু সর্বদা মানুষকে সকল বিষয়ের একমাত্র ব্যবস্থাপক মানতে হবে। তাদের দৃষ্টিতে এ বিষয়টির সাথে কোন আপোষ-আলোচনার সুযোগ নাই। তাদের মতে মানুষ নিজেই নিজের বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা করবে এবং তার প্রবৃত্তিকে সন্তুষ্টির ব্যবস্থা করবে। এ চিন্তা থেকে গণতন্ত্রের ধারণা উদ্ভুত হয়েছে যার অর্থ 'জনগণের শাসন, জনগণের দ্বারা শাসন এবং জনগণের জন্য শাসন।'

'জনগণের শাসন' বলতে বুঝায় জনগণ নিজেই নিজের প্রভূ অর্থাৎ আইন তৈরি করবে অর্থাৎ বিধানদাতা।

'জনগণের দ্বারা শাসন' বলতে বুঝায় জনগণ তার প্রণীত আইন দ্বারা শাসন করবে।

এবং 'জনগণের জন্য শাসন' বলতে বুঝায় জনগণ তার প্রণীত আইন কর্তৃক শাসিত হবে।

তাদের মতে তিন ধরনের কর্তৃপক্ষের আবির্ভাব ঘটে,

১. আইন তৈরির জন্য কর্তৃপক্ষ। এ কর্তৃপক্ষ আইন ও কানুন তৈরি, এগুলো সংশোধন, রহিতকরণ এবং প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ করে।
২. নির্বাহী কর্তৃপক্ষ। এ কর্তৃপক্ষ সাধারণ আইন বা জনগণের সাধারণ ইচ্ছা ও আইন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আইন প্রয়োগ করে।
৩. বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য কর্তৃপক্ষ। এটি আইনী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আইন ও কানুন দ্বারা তার সামনে উত্থাপিত যে কোন বিষয়ের বিচারকার্য সম্পাদন করে।

এগুলো হলো গণতন্ত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এটা বলা সম্ভবপর যে, অন্যদের থেকে পার্থক্যকারী এই রকম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন আদর্শের নামই হল গণতন্ত্র। এর যে কোনটি বাদ পড়েছে এমন কোন ব্যবস্থার নাম গণতন্ত্র নয়। এই বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো মানুষের সার্বভৌমত্ব। একে গণতান্ত্রিক চিন্তার প্রাথমিক অবলম্বন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মেরুদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সুতরাং ইসলামে কি গণতন্ত্র আছে? গণতন্ত্রের এ উপরিল্লিখ বৈশিষ্ট্য কি ইসলামে বিদ্যমান? যদি এ বাস্তবতা ইসলামে বিদ্যমান থাকে তখনই আমরা বলতে পারি, 'গণতন্ত্র ইসলাম থেকে এসেছে' এবং 'খোলাফায়ে রাশেদীনগণ সর্বপ্রথম গণতন্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন' এবং 'গণতন্ত্র হলো সে হারানো সম্পদ যা পুনরায় আমাদের কাছে ফিরে এসেছে?' আর যদি তা বিদ্যমান না থাকে তাহলে গণতন্ত্র মোটেও ইসলাম থেকে আসেনি। কাজেই আমাদেরকে অবশ্যই গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের মতামত জানতে হবে।

নিশ্চয়ই গণতন্ত্র সেই মতাদর্শের ভিত্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে মতাদর্শের ভিত্তি হচ্ছে জীবন থেকে দ্বীনকে পৃথকীকরণ। এ ভিত্তি হতে গণতন্ত্র জন্ম লাভ করেছে এবং একই আইন গ্রহণ করেছে। এটি পরিত্যাজ্য একটি ভিত্তির শাখা, এবং এই ভিত্তির উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী কাফের হিসেবে গণ্য। এটা সর্বজনবিদিত, 'জীবন থেকে দ্বীনের পৃথকীকরণ' মুসলিমদের মৌলিক বিশ্বাস 'লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' এর পরিপন্থী। মুসলিমদের জন্য আক্বীদা হতে উদ্ভুত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ চিন্তা হচ্ছে ঃ

**"নিশ্চয় আইন প্রণয়নের মালিক একমাত্র আল্লাহ্। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ব্যতীত আর কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।** [সূরা ইউসুফ ঃ ৪০]

তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র) বক্তব্যের

**"...কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।"** এর অর্থ হল সারা জাহানের প্রভূর প্রদত্ত হুকুমের ক্ষেত্রে অধিকাংশ লোকের মতামতের কোন মূল্য নেই এবং আইন তৈরির ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র। সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থায় সর্বশেষ কথা কেবলমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র জন্য। আদেশ, নিষেধ, অনুমোদন, নিষিধাজ্ঞা প্রদান কেবলমাত্র সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে মহান, সর্বজ্ঞানী, সব বিষয়ে প্রাজ্ঞ সত্ত্বার জন্য; এছাড়া আর কারও জন্য নয়। কোন ব্যক্তি বা দলের আল্লাহ্'র সাথে এ ব্যাপারে সামান্যতম হিস্যাও নেই।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হলেন সে সত্ত্বা যিনি রায় দিয়েছেন,

**"নিশ্চয়ই আইন প্রণয়নের মালিক একমাত্র আল্লাহ্।"** [সূরা ইউসুফঃ ৪০]

এবং আল্লাহ্'র রায়ের ব্যাত্যয় ঘটানোর অধিকার কারও নেই,

**"তার নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই"**। [সূরা রা'দ ঃ ৪১]

তাহলে কী করে গণতন্ত্রের কালো রাত্রির সাথে ইসলামের জ্যোতিময় দিনের তুলনা চলে? আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর সুস্পষ্ট আয়াতে উল্লেখ করেছেন,

**"আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্'র পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমাননির্ভর কথাবার্তা বলে।"** [সূরা আল আনআম ঃ **১১৬**]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন,

**"...হয়তো তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছো যা তোমাদের জন্য কল্যানকর এবং এমন বিষয়কে পছন্দ করছো যা তোমাদের জন্য অকল্যানকর। এবং আল্লাহ্ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না।"** [সূরা বাক্বারা ঃ ২১৬]

## তাগুত কী?

ইসলামের দৃষ্টিতে বিচারের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও নিকট শরণাপন্ন হওয়াকে তাগুতের নিকট শরণাপন্ন হওয়া বুঝায়।

তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**"আপনি কি তাদেরকে প্রত্যক্ষ করেননি যারা দাবী করে যা আপনার উপর নাযিল হয়েছে, এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল হয়েছে, তার উপর তারা ঈমান এনেছে, এবং তারা বিবাদমান বিষয়গুলোর মিমাংসার জন্য তাগুতের শরণাপন্ন হতে চায় অথচ তা প্রত্যাখ্যানের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।"** [সূরা আন নিসা ঃ ৬০]

তাগুতের শাসন মানেই জাহেলিয়াতের শাসন। এর প্রতিটি আইন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাথে সাংঘর্ষিক। ইবনে আল-কাইয়্যিম তার রচিত গ্রন্থ আ'লাম আল- মুয়াক্কি'ন এ বলেন, "বান্দা যখন কোনকিছুর ইবাদত, কাউকে অনুসরণ কিংবা মান্য করার ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে তখন এইরকম প্রতিটি কর্মকান্ডই তাগুতের মধ্যে পড়ে। সুতরাং প্রত্যেকের জন্য তাগুত সেটাই যার নিকট সে আল্লাহ্ ও রাসূলকে বাদ দিয়ে বিচারের শরণাপন্ন হয়, অথবা আল্লাহ্ বাদ দিয়ে যার উপাসনা করা হয়, অথবা আল্লাহ্'র কাছ থেকে প্রাপ্ত সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে যার অনুসরণ করা হয়, অথবা এমন কিছুকে মান্য করা যা আল্লাহ্'র প্রতি আনুগত্য থেকে উৎপত্তি হয়নি।"

যে তাগুতের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে পবিত্র কুর'আনের দৃষ্টিতে তার ঈমান কোনো বাস্তবতা নয় বরং নিছক দাবী বা ভন্ডামী মাত্র। এছাড়াও কুর'আন তাগুতকে ঈমানের শত্রু হিসেবে আখ্যা দিয়েছে যখন তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

**"যে তাগুতকে অবিশ্বাস করলো এবং আল্লাহ্ প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো, সে এমন সুদৃঢ় হাতলকে ধারণ করলো যা ভাঙবার নয়।"** [সূরা বাক্বারা ঃ ২৫৬]

সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর মৃত্যুর পর, ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ্'কে অবশ্যই মানবজাতির স্বাক্ষী হয়ে থাকতে হবে। সে কারণে কুর'আন যা বলেছে, ঠিক তাই এ উম্মাহ্'র মানবতাকে বলা উচিত,

**"একমাত্র আল্লাহ্'র ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে দূরে থাকো।"** [সূরা নাহল ঃ ৩৬]

সুতরাং জীবন থেকে দ্বীনকে পৃথকীকরণের চিন্তা, এবং তা থেকে উৎসারিত সকল চিন্তা, যেমন গণতন্ত্র তাগুতের চিন্তা। ইসলাম আমাদেরকে তা প্রত্যাখান ও পরিত্যাগ করার আদেশ দিয়েছে।

এটাই হলো গণতন্ত্র এবং তা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী। আর এগুলো পৃথিবীতে বাস্তবায়নের ফলে যে ফলাফল তৈরি হবে তা কী এমন সম্মানজনক ও সুন্দর ব্যবস্থা হবে যার ছায়াতলে মানুষ বসবাস করতে পছন্দ করবে নাকি এমন মন্দ ব্যবস্থা হবে যার প্রয়োগে মানুষ অন্তঃসারশূন্য ও ক্ষতিকারক জীবনে পতিত হবে এবং তার আগুন দ্বারা নিয়ে দগ্ধ হবে?

## পশ্চিমা সমাজে স্বাধীনতা

জীবন থেকে দ্বীনকে পৃথকীকরণের ধারণার বশবর্তী হয়ে পশ্চিমারা নিজেদেরকে আইন তৈরির ক্ষমতা প্রদান করেছে। এটা এই দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে যে মানুষ অন্যের তোয়াক্কা না করে এমন জীবনযাপন করবে যাতে সে নিজেকে পরিতুষ্ট করতে পারে; যেখানে তার নিজের খেয়ালখুশীর প্রতিফলন ঘটবে কিন্তু অন্যদের নয়। তারা মনে করে মানুষ এরূপ অধিকার ভোগ করতে পারবে না যদি না সে স্বাধীন হয়। আর এটা থেকেই পাওয়া যায় বিশ্বাস, মালিকানা, মতপ্রকাশ ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ধারণা। এটা স্বাধীনতার এ ধারণাকে পবিত্র বলে বিবেচনা করে। এই স্বাধীনতার সুনির্দিষ্ট কৌশলগত অর্থ রয়েছে।

বিশ্বাসের স্বাধীনতা একজনকে পছন্দসই ধর্ম বেছে নেয়ার সুযোগ করে দেয়। অথবা দৈনন্দিন ব্যাপার হলেও তাকে এক বিশ্বাস থেকে অন্য বিশ্বাসে স্থানান্তরিত হওয়াকে অনুমোদন দেয়। এমনকি এটা তাকে ধর্ম পুরোপুরি পরিত্যাগ করতেও সুযোগ দেয়।

মালিকানার স্বাধীনতা তাকে যে কোন কিছুর, যে কোনভাবে মালিক হওয়ার স্বাধীনতা প্রদান করে। এমনকি এটা তাকে তার সম্পত্তি যেভাবে খুশী সেভাবে হস্তান্তর বা পরিত্যক্ত করবার স্বাধীনতা দেয়। যদি এটি সে তার উত্তরাধিকারকে না দিয়ে প্রিয় পোষা কুকুরকে উপহার হিসেবে দিতে চায় তাহলে কেউ তাতে বাঁধা প্রদান করতে পারবে না।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা তাকে খেয়ালখুশী মতো, অবাধে ও নিয়ন্ত্রনহীনভাবে সবকিছু বলবার স্বাধীনতা প্রদান করে, হোক সেটা সত্য বা মিথ্যা। তার উপলদ্ধি এবং খেয়ালখুশীর বিরুদ্ধে যায় এরকম যে কোন মতামতকে সে অবজ্ঞা বা সমালোচনা করতে পারে।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কারণে তারা ব্যক্তিগত বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে কোন মূল্যবোধ, নৈতিক বাধ্যবাধকতা, আধ্যাত্মিক সীমারেখার দ্বারস্থ হয় না।

গণতন্ত্রের মৌলিক অপরিহার্যতা স্বাধীনতার এই ধারণা এর পক্ষালম্বনকারীদের এমন এক বোধের দিকে নিয়ে গেছে যা তাদেরকে পশুর চেয়ে অধম করে দিয়েছে।

বিশ্বাসের স্বাধীনতা পুঁজিবাদী সমাজে ধর্মের উপর বিশ্বাসের গুরুত্বকে হালকা করে দিয়েছে। তাদের পোষাক পরিবর্তনের মতো ধর্ম পরিবর্তনকে সহজতর করে দিয়েছে। বস্তুবাদী চিন্তার প্রসার ও ধর্মীয় চিন্তাকে গন্ডীভূত করে ফেলবার কারণে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। একারণে লোকদের হৃদয় থেকে সমবেদনা উঠে গেছে এবং নেকড়ের মত দূর্বলের উপর সবলের আধিপত্য চলছে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতার কারণে তারা ইচ্ছেমতো যা খুশী বলতে পারে এবং যে কোন কিছুর দিকে লোকদের আহ্বান করতে পারে। সে কারণে তাদের সমাজে সব ধরণের অদ্ভুদ, মিথ্যা, খ্যাঁপাটে ধরণের মতামতের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। যে কোন সাধারণ লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা:) এর বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে এবং তাকে বিরত করার কোন আইন নেই। যেমন: সালমান রুশদী, যে বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতায় সে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

মালিকানার স্বাধীনতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো লাভ এবং এটা পুঁজিবাদের মধ্যে ভয়াবহতা তৈরি করেছে ও লোকদের ভবিষ্যত নির্ধারণ করা, তাদের সম্পদ হরণ করা, সম্পদকে ব্যবহার করা এবং লোকদের রক্ত শোষণ করার জন্য উপনিবেশবাদকে পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। একারণে অন্যদের সাথে হারাম উপার্জনের মাধ্যমে প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হতে হয়, মুসলিমদের রক্তের বিনিময়ে ব্যবসা করতে হয়, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতিসমূহের মধ্যকার যুদ্ধে উস্কানি দিতে হয় যাতে অতি লাভে তাদের নিকট পণ্য ও সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি করা যায়। এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহ যে কোন ধরণের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিবর্জিত। তবে যদি তারা বাধ্য হয় তাহলে ধর্মকে আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহার করে তাদের স্বার্থ, কুৎসিত চেহারা ও দুর্গন্ধযুক্ত আচরণকে আঁড়াল করার জন্য নৈতিক ও মানবিক বোধের কথা বলে বেড়ায়।

ব্যক্তিস্বাধীনতা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমাজগুলোকে পশুর সমাজে রূপান্তরিত করেছে। তাদের লাম্পট্য এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, পশুরাও এ অধঃপতিত অবস্থায় কখনও যায়নি। আইনের মাধ্যমে তারা অস্বাভাবিক ও ভ্রান্ত যৌন সম্পর্ককে বৈধতা দিয়েছে। তাদের মধ্যে এমনসব অভ্যাস দেখা যাবে যা চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে দেখা যায় না। তারা দলগত যৌনাচার ও নিকটাত্মীয় এমনকি মায়ের, বোন ও মেয়ের সাথেও যৌনাচারে লিপ্ত হয়। তারা পশুর সাথেও যৌনাচারে লিপ্ত হয়। এ কারণে তাদের এমন রোগ হয়েছে যা আগে কখনওই হয়নি। তাদের সমাজে ভঙ্গুর পরিবার খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায় এবং একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মানবোধ হারিয়ে গেছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা মানে সব বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া এবং যে কোন ধরণের মূল্যবোধকে গ্রহণ করা ও পরিবারকে ধ্বংস করবার স্বাধীনতা। এইসব স্বাধীনতার নামে সব ধরণের পাপকাজ করা হয় এবং সব নিষিদ্ধ জিনিষকে বৈধতা দেয়া হয়।

সেকারণে স্বাধীনতার নামে ব্যভিচার, সমকামীতা, সমকামী স্ত্রীলোক, নগ্নতা এবং অ্যালকোহল, যে কোন ঘৃণ্য ও গর্হিত কাজকে অনুসরণ করা যে কোন ধরণের চাপ বা বাধ্যবাধকতা ছাড়া স্বাধীনভাবে করা হয়।

এগুলোই হলো গণতন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব। এগুলো হলো মানুষের প্রবৃত্তির ফসল, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং তাঁর ঐশী বাণীর এক্ষেত্রে কোন ভূমিকা নেই। কোন ধর্মেরই এ ব্যাপারে কিছু করার নেই। আমরা যদি গণতন্ত্রের সমর্থক ও চিন্তাবিদদের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব যে, যা তাদের মনে একে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে এবং যে পরিস্থিতিতে এর উদ্ভব ঘটেছে তা সত্যিকার

অর্থেই একটি কুফর ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছে। আর এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিছু লোকের কথার উপর ভিত্তি করে, যেমন: রাজা ১৫তম লুইসের মতে, 'আমরা স্রষ্টা ছাড়া আর কারও কাছ থেকে মুকুট গ্রহণ করি না।' এবং রাজা ১৪ তম লুইস বলেন, 'রাজার কর্তৃত্ব আসে স্রষ্টার প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে। স্রষ্টা হলেন এর একচেটিয়া উৎস এবং জনগণ নয়। স্রষ্টা ছাড়া আর কারও কাছে রাজাগণ তাদের কর্তৃত্বের জন্য জবাবদিহী করেন না।' বোদ্ধাগণ জ্যাঁ জ্যাক রুশো'র সামাজিক চুক্তির মতবাদকে 'ফ্রেঞ্চ ধর্মনিরপেক্ষ বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সুতরাং উপরে উল্লেখিত সবকিছু থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি ইসলামের সাথে গণতন্ত্র পুরো মাত্রায় সাংঘর্ষিক। এর উৎস যা থেকে এটি এসেছে, যে বিশ্বাস থেকে এটি উৎসারিত হয়েছে, যে ভিত্তির উপর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যে চিন্তা ও ব্যবস্থা এটিকে নিয়ে এসেছে তা থেকেও বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

-যে উৎস থেকে এটি এসেছে সেটি হল মানুষ। তার কাজ ও বিভিন্ন বিষয়ে বিবেচনার জন্য, হুস্ন (পছন্দীয়) এবং কুব্হ (তিরষ্কারযোগ্য) এর বিষয়ে সে নিজেই শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এটা আর কোন কিছুই নয়, বরং তার খেয়ালখুশী ও প্রবত্তির অনুসরণ। এর সৃষ্টির শেকড় হল ইউরোপের দার্শনিকগণ।

ইসলামের ক্ষেত্রে তা গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র পক্ষ থেকে এসেছে। তিনি এটা নাযিল করেছেন তার বান্দা ও প্রেরিত রাসূল মুহম্মদ (সা:) এর উপর। ইসলামে শাসকগণ আইন জারির ক্ষেত্রে তার প্রবৃত্তি নয়, শারী'আহ্'র শরণাপন্ন হয়। শারী'আহ্'র বাণীসমূহকে বুঝা পর্যন্ত মনের ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখতে হয়।

-যে বিশ্বাস থেকে গণতন্ত্র উৎসারিত হয়, তা হলো জীবন থেকে দ্বীনকে পৃথকীকরণের বিশ্বাস বা আক্বীদাহ্ এবং এটা এসেছে আপোষমূলক সমাধানের মাধ্যমে। এটা ধর্মকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেনি, বরং জীবন ও রাষ্ট্রের উপর এর প্রভাবকে বিলুপ্ত করেছে এবং সর্বোপরি মানুষকে তার নিজের ব্যবস্থা প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছে। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই এর সভ্যতা গড়ে উঠেছে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দিকনির্দেশনা নির্ধারিত হয়েছে।

ইসলামের ক্ষেত্রে এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র পাওয়া যায়। এতে ইসলামী আক্বীদাহ্'র আলোকে জীবনের সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হয় এবং রাষ্ট্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র আদেশ ও নিষেধ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। অন্যকথায় ইসলামিক আক্বীদাহ্ থেকে উৎসারিত ইসলামী শারী'আহ্ ভিত্তিক হুকুমের মাধ্যমে জীবন পরিচালিত হয়। এই আক্বীদাহ্'র ভিত্তিতেই এর সভ্যতা গড়ে উঠেছে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দিকনির্দেশনা নির্ধারিত হয়েছে।

-যে ভিত্তির উপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত তা হলো মানুষের সার্বভৌমত্ব। জনগণ হলো সকল ক্ষমতার উৎস। এর উপর নির্ভর করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তিনটি শক্তির জন্ম দিয়েছে; আইন, নির্বাহী ও বিচারিক ক্ষমতা, যাতে সে এর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্বের বাস্তব প্রয়োগ করতে পারে।

ইসলামে শারী'আহ্'র উপর সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত এবং উম্মাহ্'র আইন তৈরির ক্ষমতা নেই। তবে ইসলাম মুসলিমদের আল্লাহ্ প্রদত্ত আদেশ-নিষেধকে কার্যকর করার দায়িত্ব অর্পণ করেছে এবং শারী'আহ্গত দলিলের ভাষায় খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে।

-গণতন্ত্র এমন এক ব্যবস্থা ও চিন্তা নিয়ে এসেছে যার ভিত্তি মানুষের প্রবৃত্তিজাত এবং তা হলো লাভ। অন্যদিকে ইসলামের আইন প্রক্রিয়া শারী'আহ্ এবং শারী'আহ্ থেকে উৎসারিত আইনের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ এটি এই নির্দেশিত পথের অনুমোদন ও অনুসরণের উপর নির্ভরশীল।

গণতন্ত্রের এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা থেকে ইসলাম লাভবান হতে পারে; এ ধরণের উক্তি ভিত্তিহীন এবং দলিল নির্ভর নয়। আমরা গণতন্ত্রের কিছু প্রভাব দেখতে পেয়েছি যা এমন এক মন্দ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছে যা কোনো কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসেনি। মানবতার জন্য আগত সর্বোত্তম উম্মতের গণতন্ত্র থেকে নেওয়ার কিছু নেই। ইসলামের কী এমন কোনো ঘাটতি রয়ে গেছে যে তা পূরণের জন্য গণতন্ত্রের মুখাপেক্ষী হতে হবে?

## বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ পশ্চিমা সভ্যতার ফলাফল নয়

এরকম ধারণা বিরাজমান রয়েছে যে পশ্চিমাদের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন গণতন্ত্রের বাস্তবায়নের ফসল। অথচ এর পক্ষালম্বনকারীরা বাস্তব চিত্র সম্পর্কে অজ্ঞ। এর কারণ বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত আবিষ্কারসমূহ কোন দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সংযুক্ত নয় বরং এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত মানুষের চিন্তাশক্তি দ্বারা কোনকিছু অর্জনের ক্ষমতা। যে কোনো পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক বা মুসলিম ব্যক্তি যে তার মনকে মুক্তভাবে চলতে দেয় সেই এটা অর্জন করতে পারে। কোন ধর্ম বা জীবনব্যবস্থার এক্ষেত্রে কোন প্রভাব নেই, যদি না বিশেষ কোন আদর্শ বিজ্ঞানকে অনুমোদন দেয় ও মানুষের মনের ব্যবহারকে বৈধতা দেয় অথবা এটি পূর্বের গীর্জার মত এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। এটা সর্বজনবিদিত যে, ইসলামী আদর্শ কেবলমাত্র পরীক্ষা করা ও বস্তুসমূহকে সম্পর্কে জানার বিষয়টিকেই অনুমোদন দেয়নি বরং আদর্শের সার্বভৌমত্বের রক্ষায় প্রয়োজনীয় বস্তুগত সামর্থ্য অর্জনকে বাধ্যতামূলক করেছে।

পশ্চিমারা তাদের মন্দ পণ্য আমাদের কাছে উপস্থাপন করছে, যেমনঃ গণতন্ত্র, যা আমাদের অনুসরণ করতে শারী'আহ্ নিষেধ করেছে। অন্যদিকে অন্য পণ্যসমূহ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, যেমনঃ বিজ্ঞান ও নতুন আবিষ্কার, যে ব্যাপারে শারী'আহ্'র কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কারণ ক্ষমতা অর্জনের সমস্ত উপকরণকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। পশ্চিমাদের কাজ থেকে বুঝা যায় যে, তারা এসব সচেতনভাবেই করছে। অতএব কিছু কিছু ইসলামী  দলের এ ব্যাপারে অন্ধ হওয়াকে কি অনুমোদিত?

এটা পরিষ্কার যে বলে গণতন্ত্র ইসলাম থেকে এসেছে, সে গণতন্ত্রও বুঝেনি কিংবা ইসলামও বুঝেনি।

## গণতন্ত্র, শূ'রা নয়

নিজেদেরকে জ্ঞানী বলে দাবিকারী কিছু লোক যখন বলে, ইসলামের শুরু গণতন্ত্র দিয়ে আর শেষ একনায়কতন্ত্র দিয়ে, তখন তা শুনে একজন হাসবে না কাঁদবে তা ঠিক করতে পারে না। তারা প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করে:

**"কাজে কর্মে তাদের পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র উপর ভরসা করুন"** [সূরা আলি ইমরান ঃ ১৫৯]

আমাদের আলোচনার সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি চিন্তা নিয়ে এখনও আলোকপাত করা বাকী রয়েছে, আর তা হলো কিছু লোকের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র ইসলাম দ্বারা অনুমোদিত যেহেতু কুর'আন ও সুন্নাহ্'তে শূ'রার বিষয়টি পরোক্ষভাবে এসেছে। তারা বলে গণতন্ত্র শূ'রা ছাড়া আর কিছুই নয়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনগণের মতামতের উপর এবং ইসলামও আমাদেরকে জনগণের মতামত নিতে বলেছে। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেছেন,

**"কাজে কর্মে তাদের পরামর্শ করুন।"** [সূরা আলি ইমরান ঃ ১৫৯]

এবং তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেছেন,

**"এবং যারা পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে।"** [সূরা আশ শূরা ঃ ৩৮]; এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিভিন্ন বাস্তবিক, রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে প্রতিনিয়ত তাঁর সাহাবীদের সাথে আলোচনা করেছেন এবং তাদের মতামত গ্রহণ করেছন। যেহেতু এটা পবিত্র কুর'আনের নির্দেশনা ও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তা অনুসরণ করেছেন সেহেতু মুসলিমদের এটা অনুসরণ করা উচিত। তারা আরও বলে শূ'রা এবং গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য হল শব্দার্থগত। অর্থ এক হলে ভিন্ন নাম কোন সমস্যা না।

আমরা জানি বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর লোকজন গণতন্ত্রের আহ্বান জানাচ্ছে। এদের মধ্যে একটি অংশ হচ্ছে জেনে বুঝে প্রতারণাকারী আর আরেকটি নিষ্ঠাবান অংশ কিন্তু অজ্ঞ কারণ তারা না বুঝে গণতন্ত্রের আহ্বান করছে। এসব নিষ্ঠাবান-আন্তরিক গোষ্ঠীকে অবশ্যই এসব চিন্তাগুলো থেকে দুরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে নতুবা তাদের উদাহরণ হবে ঐ ব্যক্তির মতো যে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্'র ইবাদত করে কিন্তু গুনাহ্'র ভাগীদার হয়। অনুতপ্ত হওয়া, নিয়ন্ত্রন বজায় রাখা এবং (বিশ্বাসের) প্রতিফলন ঘটানো, এগুলো নিষ্ঠাবান ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য।

এ ধরণের লোকেরা এক সময় বলেছিল সমাজতন্ত্র ইসলাম থেকে এসেছে এবং মুহম্মদ (সাঃ) তাদের ইমাম। তাহলে সেই দূর্গন্ধময় সমাজতন্ত্র যখন এখন বিলুপ্ত হয়ে গেলো, এখন তাদের উত্তর কী? একইভাবে গণতন্ত্র আজ যখন মৃত্যুর শেষযন্ত্রনায় কাঁতড়াচ্ছে তখন এর আহ্বানকারীদের আর কী আশা আছে? এ ধরণের চিন্তা ইসলাম নয় গণতন্ত্রের কল্যাণের জন্য। তারা এর প্রতারণা উন্মোচনের বদলে একে সর্বোচ্চ চিন্তা হিসেবে গ্রহণ করেছে। পায়ের নীচে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলার বদলে একে জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র বাণীকে সর্বোচ্চ আসনে স্থান দিয়ে এবং শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির আলোকে জীবন ব্যবস্থাকে রূপদান করলেই কেবল এটা সুস্পষ্ট হবে যে আমরা তাঁর হুকুমকে সঠিকভাবে অনুবাধন করেছি। এটা এমন একটি দলের মাধ্যমেই অর্জন সম্ভব যারা সঠিক জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত এবং প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সচেতন, এবং বিশ্বাসের দিক থেকে আলোকিত, শারী'আহ্ হুকুমের ব্যাপারে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন এবং সকল ভিন্ন প্রকৃতির চিন্তা-চেতনা ও বিজাতীয় ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণ বর্জনকারী। এরা বাস্তবতার কাছে কখনও মাথানত করে না এবং পরিস্থিতির প্রভাবমুক্ত থাকে।

# ১২

# কুফর শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ

দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বান্দার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ পূর্ণ করেছেন।

তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**"এবং সত্য ও ইনসাফ (এর আলোকে) আপনার ররের কথাগুলো পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। তাঁর কথা পরিবর্তন করার কেউ নেই। এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"** [সূরা আল আনআম ঃ ১১৫]

নিশ্চয়ই দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করা বান্দার প্রতি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র একটি বিশেষ রহমত। কুর'আনকে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) সুরক্ষিত করেছেন এবং পরিবর্তন ও রদবদল হতে নিরাপদ রেখেছেন। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

**"নিশ্চয়ই সন্দেহাতীতভাবে আমি কুর'আন নাযিল করেছি এবং নিশ্চয়ই আমি তা সংরক্ষন করবো।"** [সূরা হিজর ঃ ৯] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) একে সংরক্ষণ করেছেন যাতে তা কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য প্রমাণ হয়ে থাকে।

যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা:) পৃথিবীতে নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী ওহী গ্রহণ করেছেন সেহেতু তাঁর পর আল্লাহ্'র নির্দেশ মোতাবেক কুর'আন এবং সুন্নাহ্'কে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে নবুয়্যতের দায়িত্ব সর্বোত্তম পন্থায় পালন করতে মুসলিমরা বাধ্য। আর তা করলে তখন আমরা দাবি করতে পারবো যে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা:) ও তাঁর সাহাবীগণের প্রদর্শিত পথের উপর রয়েছি। যার স্বপক্ষে অসংখ্য দলিল আছে।

মানুষের চিন্তা ও সহজাত প্রবৃত্তি (ফিতরাহ্) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সত্য এই দ্বীনের দাওয়াহ্ বহন করতে গিয়ে মুসলিমদের যেহেতু অন্যান্য জাতির সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল সেহেতু অন্যান্য জাতিগুলো পাল্টাপাল্টি কিংবা আত্মরক্ষার খাতিরে তাদের বিশ্বাসকে মুসলিমদের সামনে উপস্থাপন করেছিল। না বুঝে কখনও কখনও কিছু মুসলিম এসব চিন্তাসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ফলে তাদের চিন্তা ও দাওয়াহ্'তে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যদিও তার ঠিক পরই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক মনোনিত দ্বীনের মিনার এবং পথিকৃত সম্মানিত আলেমগণ মুসলিমদের সতর্ক করা শুরু করেন। সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং তারা দ্বীনকে কুফরের সংমিশ্রণের হতে মুক্ত করতে সক্ষম হন। তারা জাল দলিলসমুহকে রুখে দিয়ে প্রতারণামূলক কর্মকান্ডকে ব্যর্থ করে দেন। ফলে দ্বীন তার ঔজ্জ্বল্যতা ফিরে পায়। বর্তমান ক্ষতিকর পরিস্থিতি পূর্বে এভাবেই কখনো ভালো কখনো খারাপ পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। সুতরাং এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

প্রাথমিক স্বর্ণযুগে ইসলামকে ফিরিয়ে আনতে তৎকালীন ভালো অবস্থার পেছনে কারণগুলো অনুসন্ধান করা এখন সময়ের দাবি।

ইসলামকে সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখতে, ইসলাম বহির্ভূত যেকোনো চিন্তা সংযোজনের প্রতারণামূলক অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে হলে প্রথমেই আমাদের উত্তরাধীকার সূত্রে প্রাপ্ত পশ্চিমা দুষিত মানসিকতা হতে মুক্ত হতে হবে। যে মানসিকতা লাভ-ক্ষতি আর খেয়াল-খুশিকে দাওয়াহ্ পরিচালনার মাপকাঠিতে পরিণত করে ফলে আমরা এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়কে গ্রহণ এবং অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয়কে বর্জন করছি। তারপর এই দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে শারী'আহ্ দলীলের ব্যাখ্যা দিচ্ছি। এবং শেষে এর যথার্থতা সমর্থনে বিভিন্ন দলীল পেশ করছি। হুকুম শুধুমাত্র একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র - এটাই সঠিক ইসলামী মানসিকতা। সুতরাং নিজের পছন্দ-অপছন্দ এবং ইচ্ছানুযায়ী আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র বিধানকে অনুধাবনের চেষ্টা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের খেয়ালখুশির প্রাধান্যও গ্রহণযোগ্য নয়। শত্রুর ভয়, গণবিচ্ছিন্নতা, শাসকগোষ্ঠীর ইসলামবিরোধী অবস্থান এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতির ভয়ে ভীত হওয়াটা যেমন গ্রহণযোগ্য নয়। ঠিক তেমনি অবস্থার দোহাই দিয়ে দাওয়াহ্ বহনকারীর দায়িত্বকে হালকা করাটাও গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সব জানেন এবং সব বিষয়ের খবর রাখেন। তিনি মানুষের প্রকৃতি, প্রয়োজন, সামর্থ্য, বাস্তব জীবন, শত্রু ও শত্রুকে মোকাবেলা এবং তদুপরী সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।

আমরা ইতিমধ্যে বর্ণনা করেছি যে ইজতিহাদের সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে প্রথমে সমস্যার বাস্তবতাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা। তারপর শারী'আহ্ দলীলের নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত সমস্যাটির সমাধান বের করা। আর এই প্রক্রিয়ায় বর্তমান বাস্তবতায় যেকোনো সমস্যা সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র হুকুমসমুহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। অন্যভাবে বললে এ প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হলে আমরা বলতে সক্ষম হবো বিদ্যমান কোন সমস্যার প্রতি শারী'আহ্'র হুকুম কি, পাশাপাশি এই হুকুম পালনের পথে প্রতিবন্ধক পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পরিস্থিতি, বাঁধা-বিপত্তি এবং এই হুকুম হতে ঈস্পিত স্বার্থ অর্জন ইত্যাদির ব্যাপারে শারী'আহ্ দৃষ্টিভঙ্গী। এ বিষয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না, এবং আল্লাহ্'কে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন ও জানেন।"** [সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১]

তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন,

**"আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত আসার পর তাতে ভিন্নতা পোষণ করা মু'মিন পুরুষ কিংবা নারী কারও ক্ষেত্রেই সঙ্গত নয়। এবং যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।"** [সূরা আল আহ্যাব ঃ ৩৬]

ভিন্ন এই দুই মানসিকতাই মুলতঃ বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে আল্লাহ্'র হুকুম বোঝার ক্ষেত্রে মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য তৈরি করে।

পশ্চিমা চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত মানসিকতা পরিস্থিতি-পারিপার্শ্বিক অবস্থা, লাভ-ক্ষতির আশংকা ইত্যাদি ভিত্তিহীন মিথ্যা অজুহাতে শারী'আহ্'র অকাট্য অনেক দলিলকে পরিত্যাগ এবং প্রত্যাখ্যান করেছে। উদাহরণস্বরূপ সুদকে সুস্পষ্ট হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর কারণ বা ব্যাখ্যা খোঁজার কোনো অবকাশ নাই; অথচ বাস্তবতা, পরিস্থিতি, লাভ-ক্ষতির হিসাব কিংবা পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা সুদের লেনদেনকে বৈধতা দানে ভিন্ন হুকুম নিয়ে হাজির হয়েছে।

এ ধরনের মানসিকতার উপর কিছু দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তারা এমন কিছু হুকুম নিয়ে এসেছে যা শারী'আহ্ অনুমোদিত নয় বরং চরম সাংঘর্ষিক। এই কারণে পুরোপুরি বিপরীতধর্মী হওয়া সত্ত্বেও তারা দাবি করে গণতন্ত্র ইসলাম থেকে এসেছে যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। তারা আরও দাবি করে কুফর শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করা শারী'আহ্ অনুমোদিত এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনকারী দলসমূহের জন্য এটাই একমাত্র অবশিষ্ট পথ। যদিও তা পবিত্র কুর'আনের আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নাহ্'র সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

যখন আমরা ধাপে ধাপে ইসলামী শাসন বাস্তবায়ন বা এর আহ্বান নিয়ে আলোচনা করছি তখন মুলত আমরা একই সাথে তা সংশ্লিষ্ট চিন্তাগুলোর অসাড়তা ও দুষণ নিয়েও আলোচনা করছি, যেমনঃ কুফর শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ। এ বিষয় নিয়ে বিদ্যমান সন্দেহ নিরসন এবং এসব কুফর চিন্তাসমুহ প্রচার করার পক্ষে যাতে কোনো অজুহাত অবশিষ্ট না থাকে সে লক্ষ্যে এখন আমরা এই উল্লেখিত বিষয়টির উপর আলোকপাত করবো।

আমরা আরও জানি এসব দলগুলো কর্তৃক ধারণকৃত পশ্চিমা চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত দুষিত কুফর মানসিকতা যদি পরিশোধিত না হয় তাহলে আমাদের এসব উপদেশ কোনও কাজেই আসবে না। যেমন যদি আমরা তাদেরকে বুঝাতে সক্ষমও হই যে ক্ষমতা ভাগাভাগি একটি কুফর দুষিত চিন্তা কিন্তু তাদের যদি মানসিকতা অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে তখন তারা এই চিন্তার বিকল্প খুঁজতে একই মানসিকতাকে প্রয়োগ করবে। সুতরাং আমাদের এমন মানসিকতার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে যা শারী'আহ্ অনুমোদিত নয়। পথভ্রষ্ট চিন্তাগুলোর জন্ম লাভে এ ধরনের মানসিকতাগুলো উর্বর ভুমি হিসেবে কাজ করে।

বর্তমান সময়ে ক্ষমতার ভাগাভাগি বলতে কি বুঝায় এবং এর যথার্থতার প্রতি এর পক্ষালম্বনকারীরা কি যুক্তি উপস্থাপন করে?

ক্ষমতা ভাগাভাগি বলতে তারা বুঝায় এমন এক শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করা যার ভিত্তি ইসলাম নয় এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। আর তাই নিজেদের ও নিজেদের মতামতকে ক্ষমতার স্বাদ দিতে তারা গণতান্ত্রিক খেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পার্লামেন্টে প্রবেশ করে এবং কল্পনা করে এভাবে কোনও এক সময়ে তারা সম্পূর্ণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে। যা হবে ক্রমাণ্বয়ে বা ধাপে ধাপে এবং তাদের মতে ইসলাম একে অনুমোদন দেয়।

তাদের মতে ক্ষমতা ভাগাভাগির যৌক্তিকতা শারী'আহ্ ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি দ্বারা অনুমোদিত। তাদের পক্ষ থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোন থেকে প্রদত্ত যুক্তি ঃ

* বর্তমান যুগে ইসলামকে ঐতিহাসিক রূপে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। কারণ ইসলামী বিশ্বের সব অঞ্চল এখন বিস্ময়কর বস্তুগত ও অবস্তুগত (সম্মান, প্রভাব ইত্যাদি) ক্ষমতার অধিকারী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শক্তির সমর্থনপুষ্ট কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে নিয়ন্ত্রিত। ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনসমূহকে তারা পর্যবেক্ষণ করছে এবং তাদেরকে সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে রাখতে ও তাদের সাফল্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টির প্রয়াস চালাচ্ছে। আর এই কারণে তাদের মতে অতীতের সাথে বর্তমানের সাদৃশ্যতা অনুসন্ধান করা বাস্তবসম্মত নয়।

* অতীতে সব মুসলিমদের সম্পৃক্ততায় ইসলামী দাওয়াহ্ সংগঠিত হতো অথচ বর্তমানে গুটি কয়েক গোষ্ঠীকে এই আন্দোলনে পাওয়া যাচ্ছে। আর অধিকাংশ মুসলিম এই নেতৃত্বের আওতার বাইরে থাকায় জাহেল সরকারগুলো এর নানামুখী সুবিধা লুটে নিচ্ছে এবং যা আন্দোলনকে কঠিন পরিস্থিতিতে পতিত করেছে। এজন্য আধুনিক ইসলামী আন্দোলনগুলো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুসরণ করছে।

প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করছে। যার মধ্যে রয়েছে গণতান্ত্রিক খেলা অথবা সেনা অভ্যূত্থান অথবা সশস্ত্র গণবিপ্লব।

যেহেতু আধুনিক ইসলামী আন্দোলনগুলোর জন্য সেনা অভ্যূত্থানের লক্ষ্যে নিজ দেশের সেনাবাহিনীর ভেতর সমর্থন তৈরির সকল দরজা বন্ধ এবং চারিদিকে স্বৈরাচারী শাসকের কারণে গণবিপ্লবের দরজাও বন্ধ, তাই এখন তাদের জন্য একটি পথটিই অবশিষ্ট আছে যে পথে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো কাজ করছে। যা তাদের অনৈসলামী শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের দিকে ধাবিত করে।

তারা আরও যোগ করে ঃ ইসলামী আন্দোলনগুলো যে মহান আদর্শকে সামনে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা অর্জন করতে হলে এর সাথে সাংঘর্ষিক পার্শ্বিক বিষয়গুলোকে এখন আমাদের পাশ কাটাতে হবে। কারণ জু'জি বা আংশিক বিষয়ের সাথে যদি কু'ল্লী বা সামগ্রিক বিষয়ের দ্বন্দ্ব হয় তাহলে কু'ল্লীকে প্রাধান্য দিতে হবে। ইসলামী শারী'আহ্'র বাস্তবতা এবং এর উদার দৃষ্টিভঙ্গী উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না যদি আংশিক বিষয়ের সাথে দ্বন্দ্বের কারণে মূল লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত হয়। একইভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও মুসলিমদের সব সময় কঠিন এবং কেবলমাত্র একটি পথেই সীমাবদ্ধ থাকা ঠিক নয়। যদি প্রথম রাস্তাটি প্রয়োগ করা সম্ভব না হয় তখন দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ইত্যাদি রাস্তাগুলো প্রয়োগ করা যায়। এমনকি কোন এক পর্যায়ে চারটি পথেই একসঙ্গে কাজ করা যায় যতক্ষন না উত্তম পথটি বের হয়ে আসে।

## উল্লেখিত বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির উপর আলোচনা

শারী'আহ্ হুকুম থেকে বিচ্যুততে উপস্থাপিত বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি থেকে তাদের ইসলামী শিক্ষার অজ্ঞতা পরিষ্কার প্রতীয়মান যদিও তারা মুখে উসূল ও শারী'আহ্'র কথা বলে। শারী'আহ্ হুকুম বের করা কিংবা এমনকি শুধুমাত্র শারী'আহ্ হুকুম জানার প্রক্রিয়া কি সে সম্পর্কেও তাদের নূন্যতম ইসলামী জ্ঞান নেই। তারা পদ্ধতি (Method) ও ধরণ (Style) আলাদা করতে পারে না। 'শারী'আহ্ নমনীয়' এই চিন্তার প্রভাব এবং যুগের সাথে তাল মেলানোর অজুহাত তাদেরকে শারী'আহ্ হুকুম এবং শারী'আহ্ হুকুমকে শারী'আহ্ বহির্ভূত হুকুম দ্বারা পরিবর্তনের প্রতি বার বার প্রেরণা যোগায়।

যুগের সাথে অনেক কিছু পাল্টে গেছে এই অজুহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা:)-এর পদ্ধতি ও শারী'আহ্ পরিত্যাগ করার অজুহাতটি মোটেও গ্রহণযোগ্য ও সঠিক নয় বরং এতে সমাজের বাস্তবতা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতাই পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে। কেননা সমাজের বাস্তবতা অনুধাবনে এর মৌলিক উপাদানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ, এর পরিবর্তনশীল উপাদান নয়। গোত্রতান্ত্রিক, সরল অথবা জটিল রাষ্ট্রকাঠামো, গণতান্ত্রিক অথবা একনায়কতান্ত্রিক বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন রূপ থাকতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটি সমাজের গঠনের মৌলিক উপাদান (জনগণ, চিন্তা, আবেগ এবং ব্যবস্থা) একই। সে কারণে মৌলিক উপাদানগুলোকেই বিবেচনা করতে হবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রকাঠামো পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির কোন প্রয়োজন নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা:)-এর প্রদর্শিত পদ্ধতিতে সমাজের ভ্রান্ত চিন্তা, ভ্রান্ত ধারণা এবং ভ্রান্ত রীতিনীতি ও ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ করে সমাজ পরিবর্তন করা শারী'আহ্ হুকুম। সুতরাং এটি একটি প্রতিষ্ঠিত কাজ। মুলত চিন্তার পার্থক্যই সমাজের পার্থক্য; কোথাও দেশপ্রেম বা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের উপর তৈরি সমাজ অথবা কোথাও আদর্শিক পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে তৈরি সমাজ। এটা সর্বজনবিদিত যে আদর্শিক চিন্তা অন্য সব চিন্তার চেয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং একে ছুঁড়ে ফেলা কঠিন কাজ। আর তাই সমাজভেদে চিন্তার পার্থক্যের কারণে

কোথাও পরিবর্তনের কাজ সহজ কোথাও কঠিন কিন্তু পদ্ধতি একই এবং অপরিবর্তনীয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা:)-এর সময়ের গোত্রতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এবং আমাদের বর্তমান সরল বা জটিল রাষ্ট্রব্যবস্থার পার্থক্য হয়তো আমাদের সমাজ পরিবর্তনের কাজকে সহজ কিংবা কঠিনতর করবে কিন্তু পদ্ধতির নিয়মে কোন পরিবর্তন আসবে না। প্রতিটি রাষ্ট্রকেই তার নিরাপত্তা ও অবস্থান সুসংহতকরণে সেনাবাহিনী হোক কিংবা অনুরূপ কোন গোষ্ঠী হোক কারও না কারও উপর নির্ভর করতেই হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা:) ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ ধরণের গোষ্ঠীর নিকট নুসরাহ্ চেয়েছিলেন। তিনি (সা:) যখন একটি নতুন সমাজ গঠনের কাজ শুরু করেন তখন তিনি (সা:) সমাজের মৌলিক উপাদানের উপর মনোনিবেশ করেন। তিনি (সা:) দৃঢ় ঈমানসম্পন্ন দাওয়াহ্ বহন ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিচালনায় সক্ষম (মুহাজিরীন) একটি গোষ্ঠিকে প্রস্তুত করেন এবং দাওয়াহ্ ও দাওয়াহ্ বহনকারীদের গ্রহণকারী এবং রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম ক্ষমতার অধিকারী (আনসার) একটি জনপ্রিয় ভিত্তি (Popular base) তৈরি করেন। তাই নুসরাহ্ অনুসন্ধান করা ক্ষমতায় যাওয়ার পদ্ধতি। রাসূলুল্লাহ্ (সা:) নুসরাহ্ অনুসন্ধানের সময় অনেক প্রতিকূলতা, সংকটের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও এ পদ্ধতির উপর অটল ছিলেন। যারা মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা:)-এর কাজের পদ্ধতিকে নিরীক্ষা করেছে তারা দেখবে যে তিনি (সা:) পরিবর্তনের জন্য সমাজের ভিত্তিগুলো নিয়ে কাজ করেছেন। স্থান, কাল এবং অঞ্চলভেদেও তার পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়নি। কারণ অঞ্চল বা সমাজভেদে পার্থক্য মানে কাঠামোর পার্থক্য মৌলিক উপাদানের নয়। এ পার্থক্য কাজকে সহজ বা কঠিন করে মাত্র।

শারী'আহ্'র নমনীয় এ ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে নমনীয়তার অজুহাতে শারী'আহ্'কে ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করার অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শারী'আহ্'কে সম্পূর্ণ করেছেন। মানব জীবনের নতুন-পুরাতন সকল সমস্যার সমাধান এতে রয়েছে। তবে সমাধানগুলো হুকুম একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র এই ভিত্তি থেকে উৎসারিত নিয়মতান্ত্রিক কিছু উসূল (মূলনীতি)-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

শারী'আহ্ অনেক বিস্তৃত - এ দৃষ্টিভঙ্গীর দোহাই দিয়ে আল্লাহ্'র বাণীকে পরিত্যাগ করা কিংবা শারী'আহ্ বহির্ভূত বিষয়বস্তুর প্রবেশ করানোর চেষ্টা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য না। কিছু মুসলিম চিন্তাবিদ এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শারী'আহ্'র কিছু বিষয়কে পরিত্যাগ করেছেন। তাদের মতে যেহেতু শারী'আহ্'র শাস্তির উদ্দেশ্যই হলো অপরাধকে নিরুৎসাহিত করা সেহেতু যা কিছু অপরাধকে নিরুৎসাহিত করে তাই শারী'আহ্'তে গ্রহণযোগ্য। যেহেতু শারী'আহ্'র শাস্তিসমূহ যুগের সাথে মানানসই হচ্ছে না, এবং মানুষ চিন্তা-চেতনা দিয়ে তা প্রত্যাখান করেছে সেহেতু আমরা একই উদ্দেশ্য অর্জিত হয় এমন শারী'আহ্ বহির্ভূত শাস্তিকেও গ্রহণ করতে পারি। আর শারীআ'হ্ নমনীয় ও বিবর্তনযোগ্য বলেই এটা সম্ভব।

তারা আরও বলে যেহেতু জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ইসলাম প্রচারের জন্য এবং জিহাদ ছাড়াও অন্য অনেক উপায় যেমন: রেডিও, টেলিভিশন, অন্যান্য প্রচারমাধ্যমসহ আধুনিক সভ্যতার অনেক উপকরণের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার সম্ভব, সেহেতু এসব আধুনিক মাধ্যমকে জিহাদের বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। শারীআ'হ্ যদি নমনীয় ও বিবর্তনযোগ্য না হতো তাহলে আমরা এরূপ করতে পারতাম না।

ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির ক্ষেত্রে তারা মনে করে, যে পদ্ধতি ব্যবহার করে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে, সেটাই অনুসরণ করা উচিত। কেবল একটি পথে পড়ে থাকা এবং এর বাইরে না যাওয়াটা অপরিহার্য নয়। তাদের মতে অনমনীয় ও দৃঢ় মনোভাব ইসলামের উদার, নমনীয় ও বিবর্তনশীল প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এতে কঠোরতা রাখেননি।

সুতরাং এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 'শারী'আহ্'কে নমনীয়' বলা হারাম। কারণ এটা দ্বীনের হুকুমসমূহকে বাতিল করে দেয় এবং এটা ইসলামের প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক। বরং এটি পশ্চিমা চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত এবং তাদের চিন্তার অনুকরণ।

আর সামগ্রিক বিষয়ের সাথে আংশিক বিষয়ের দ্বন্দ্বে সামগ্রিককে গুরুত্ব দিতে হবে; তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীটিও ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কারণ আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে উসূলী চিন্তাবিদদের সামঞ্জস্যতা আছে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে উসূলী চিন্তাবিদগণ যে অর্থে এই মুলনীতিকে ব্যবহার করেন তারা তা করে না। তাদের চিন্তা ও কর্মের মাপকাঠির বেহাল দশার এটি আরেকটি নমুনা। তাই সমস্ত শারী'আহ্'কে নমনীয় আখ্যা দিতে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে শারী'আহ্'র উদারতা ও নমনীয়তাকে উদাহরণ হিসেবে হাজির করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এ বিষয়ে সবশেষে বলা দরকার শারী'আহ্'র হুকুম বুঝবার ক্ষেত্রে যুক্তি প্রয়োগের কোন সুযোগই ইসলামে নেই। উসুলী চিন্তাবিদগণের বর্ণনা মতে বাস্তবতা থেকে হুকুমের মানাত (object) পাওয়া যায়, ফরজ বা হারামের নির্দেশনা নয়। তাই

বাস্তবতাকে এর মত করেই বুঝতে হবে। তারপর শারী'আহ্ দলিলের আলোকে হুকুম বের করতে হবে। সুতরাং নীতিগতভাবে যৌক্তিক বিবেচনা মূল্যহীন।

আর ক্ষমতার ভাগাভাগিতে শারী'আহ্'র যৌক্তিকতার বিষয়ে শারী'আহ্ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র দ্বীন ব্যতীত অন্যকোনও দ্বীন দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণকে স্পষ্ট নিষেধ করেছে। এর বেশকিছু কারণ রয়েছে।

*আল্লাহ্'র নাযিলকৃত বিধান দ্বারা যারা শাসনকার্য পরিচালনা না করাকে সুস্পষ্টভাবে কুফর (অবিশ্বাসী), যুলুম (অবিচার) এবং ফিসক (পাপাচারী) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

**"এবং যারা আমার প্রদত্ত বিধান দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারাই কাফের।"** [সূরা মায়িদাহ্ ঃ ৪৪]। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

**"এবং যারা আমার প্রদত্ত বিধান দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারাই জালিম।"** [সূরা মায়িদাহ্ ঃ ৪৫]। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

**"এবং যারা আমার প্রদত্ত বিধান দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারাই ফাসেক।"** [সূরা মায়িদাহ্ ঃ ৪৭]

*হাকিমিয়্যাহ বা সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র জন্য। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

**"হুকুম একমাত্র আল্লাহ্'র। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা শুধুমাত্র তারই ইবাদত করবে।"** [সূরা ইউসুফ ঃ ৪০]

*এছাড়া আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র শারী'আহ্ বাদ দিয়ে অন্যকোনও আইন বা বিধানের শরণাপন্ন হওয়াকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং একে ঈমান বিরোধী কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**"কিন্তু না, তোমার রবের শপথ! ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার (মুহাম্মদ (সা:)) উপর ন্যস্ত না করে।"** [সূরা আন নিসা ঃ ৬৫]

*আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কোন কিছুর শরণাপন্ন হওয়ায় তিনি মুনাফেকদের সমালোচনা করেছেন ঃ

**"আপনি কি তাদেরকে প্রত্যক্ষ করেননি যারা দাবী করে যা আপনার প্রতি অবর্তীর্ণ হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে সেই সব বিষয়ের উপর তারা ঈমান এনেছে কিন্তু তারা (বিরোধপূর্ণ বিষয়ের) মিমাংসার জন্য তাগুতের শরণাপন্ন হতে চায়, অথচ তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।"** [সূরা নিসা ঃ ৬০]

*আল্লাহ্'র আইনের উপর অন্য কারও আইনকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। যে তা করলো সে মূলত আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র হুকুমের উপর জাহেলিয়াতকে প্রাধান্য দিল।

**"তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ্ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?"** [সূরা মায়িদাহ্ ঃ ৫০]

মূলত এটাই হুকুম। কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে মন্ত্রীসভায় অংশগ্রহণ করা নিম্নোক্ত দলিলের কারণে মৌলিক হুকুমের একটি ব্যতিক্রম।

১. (সমকালীন) শাসনব্যবস্থায় ইউসুফ (আঃ) এর অংশগ্রহণ
২. আন-নাজ্জাশীর অবস্থা
৩. আল-মাসলাহা (জনস্বার্থ)

# ১৩

# সাইয়্যিদুনা ইউসুফ (আঃ) এবং কুফর ব্যবস্থার অধীনে শাসন

সাইয়্যিদুনা ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে তাদের বক্তব্য হচ্ছে, তিনি (আঃ) এমন একটি জাহেলী সমাজে বসবাস করতেন যেখানে শিরকী বিশ্বাসের কর্তৃত্ব ছিল। সমাজটির নৈতিক বিপর্যয়ও ছিল ব্যাপক। লোভ এবং অবিচার এতই বিস্তার লাভ করেছিল যে সেই সমাজের লোকেরা ইউসুফ (আঃ)-এর নিস্পাপ চরিত্রের নিদর্শন পেয়ে তাকে কারাবন্দি করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ইউসুফ (আঃ) এর সততা ও স্বপ্নের সুব্যাখ্যা দেয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করে রাজা তাকে কারামুক্ত করেন এবং নিজের নিকটবর্তী করেন। সাইয়্যিদুনা ইউসুফ (আঃ) রাজাকে বলেছিলেন তাকে যেন কোষাগারের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং রাজা তাঁর অনুরোধ রেখেছিলেন। তাই তাদের বক্তব্য হচ্ছে, ইউসুফ (আঃ) জাহেলী শাসন ও শাসনব্যবস্থার মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, যা ছিল বনী ইসরাইলের শারী'আহ্'র বিপরীত। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও তিনি (আঃ) রাজার দ্বীনের (ব্যবস্থার) অর্থাৎ রাজার শাসন ও কর্তৃত্বের উপর বহাল ছিলেন, এমনকি তিনি (আঃ) নিজের ভাইকে তাঁর নিকটে রাখতে কৌশল হিসেবে ইয়াকুব (আঃ)-এর শারী'আহ্ উল্লেখ করেন। ভাইয়ের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ দায়ের করার পুরো ঘটনাটিই ছিল তাঁর একটি কৌশল কারণ ইয়াকুব (আঃ) শারী'আহ্ মোতাবেক চোরকে দাসত্ব বরণ করতে হতো।

তারা আরও বলে বিষয়টি যে শুধুমাত্র সাইয়্যিদূনা ইউসুফ (আঃ)-এর জন্যই প্রযোজ্য এটা বলা যাবে না কারণ তা বলার জন্য দলিল প্রয়োজন। কারণ মৌলিকভাবে নবীগণ (আঃ) এবং তাঁদের (আঃ) নির্দেশিত পথের ব্যাপারে যাই উল্লেখ আছে তাই আমাদের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

তাছাড়া তারা আরো বলে কারও এ দাবীও করা উচিত নয় যে এটা আমাদের পূর্ববর্তীগণের জন্য প্রযোজ্য শারী'আহ্ হতে এসেছে, কারণ শাসন সংক্রান্ত বিষয়টি শারী'আহ্'র ফুরু (শাখা) হতে উৎসারিত হয়নি যেখানে ভিন্নতার অবকাশ থাকবে বরং তা উসূল হতে উৎসারিত যেখানে সকলের ঐক্যমত্য রয়েছে। তাছাড়া সাইয়্যিদুনা ইউসুফ (আঃ) জানতেন যে,

**"হুকুম একমাত্র আল্লাহ্'র"**। [সূরা ইউসুফ:৪০], এবং তা জানা সত্ত্বেও তিনি (আঃ) রাজার শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সূরা ইউসুফের এ বিষয় সংক্রান্ত আয়াতগুলো অধ্যয়ন করলে লক্ষ্য করা যায় যে নিম্নোক্ত আয়াত দু'টির উপর ভিত্তি করে তারা কুফর শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের বৈধতার পক্ষে মতামত দেয়,

"**সে বাদশাহ্'র আইনে নিজ ভাইকে কখনও দাসত্বে দিতে পারত না, যদি আল্লাহ্ না চাইতেন।"** [সূরা ইউসুফঃ ৭৬], এবং;

**"(ইউসুফ) বলল: আমাকে দেশের কোষাগারের দায়িত্বে নিযুক্ত করুন।"** [সূরা ইউসুফ:৫৫]

তারা বিষয়টিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছে যাতে তা তাদের মতামতের সাথে মিলে যায়। তারা ভুলে গেল সেসব মূলনীতির কথা যেগুলোর উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত যা তাদের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং সেইসব আয়াতগুলোকে পাশ কাটিয়ে গেল যা তাদের এই ব্যাখ্যার সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। তারা নবীদের নিস্পাপতার বিষয়টিও ভুলে গেল। যদি এ আয়াত দুটির ব্যাপারে তাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় তবে সাইয়্যিদুনা ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কিত তাদের সকল ব্যাখ্যাও ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হবে।

নবীগণ আল্লাহ্'র সকর সৃষ্টির মাঝে পবিত্রতম এবং তারা নির্বাচিত। স্বীয় দ্বীনকে বিস্তৃত করার জন্যই তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাদের (আঃ) নির্বাচিত করেছেন। তারা (আঃ) ছিলেন তাদের স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য সঠিক দৃষ্টান্ত ও অনুসরণীয় আদর্শ। কারণ তারা (আঃ) আল্লাহ্'র হুকুমকে সর্বোত্তম উপায়ে পালন করেছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে সমস্ত গুণাহ্ এবং প্রলোভন হতে পবিত্র রেখেছেন, এবং তাদেরকে সত্যের উপর অবিচল রেখেছেন এবং তাদের সাহায্য করেছেন। সাইয়্যিদুনা ইউসুফ (আঃ) ছিলেন সেই বাছাইকৃতদেরই একজন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একাধিক আয়াতে তাঁর প্রশংসা ও তারিফ করেছেন।

**"এমনিভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে বাণীসমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দেবেন এবং পূর্ণ করবেন স্বীয় অনুগ্রহ....."** [সূরা ইউসুফ:৬]

**"যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গেল, তখন তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম। এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দেই।"** [সূরা ইউসুফ:২২]

**"এটা ছিল এজন্য যাতে আমি তার কাছ থেকে মন্দ ও নির্লজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয়ই সে আমার মনোনীত বান্দাদের একজন।"** [সূরা ইউসুফ:২৪]

**"এমনিভাবে আমি ইউসুফকে (মিশরের) ভূখন্ডে ক্ষমতা দান করলাম। সে তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত। আমি স্বীয় রহমত যাকে ইচ্ছা পৌঁছে দেই এবং আমি পুণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না।"** [সূরা ইউসুফ ঃ ৫৬]

আল্লাহ্'র নিকট তিনি সর্বোচ্চ পর্যায়ের দাওয়াহ্বহনকারী ছিলেন। পবিত্র কুর'আনে উল্লেখ আছে যে যখন কয়েদখানায় তার সহকয়েদীরা তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইল তখন তিনি বললেন,

**"হে কারাগারের সঙ্গীরা। পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, নাকি পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্? তোমরা আল্লাহ্'কে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের এবাদত করছো, যেগুলো (অজ্ঞতাবশত) তোমাদের ও তোমাদের বাপ-দাদাদের সাব্যস্ত করে নেয়া। অথচ এ ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কোন দলীল-প্রমাণ নাযিল করেননি। আল্লাহ্ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও এবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।"** [সূরা ইউসুফ:৩৯-৪০]

তিনি ছিলেন পরিশুদ্ধ, আল্লাহ্'র প্রতি আনুগত্যশীল এবং তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করতেন। সে কারণে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে নারীদের ও আল আযিযের স্ত্রীর কূটকৌশল থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং যা পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত আছে ঃ

**"ইউসুফ বললঃ হে প্রতিপালক, তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে, তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর তার প্রতিপালক তার দো'আ কবুল করে নিলেন। অতঃপর তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"** [সূরা ইউসুফ:৩২-৩৪]

লোকেরা তাঁর ধর্মপরায়ণতা, সততা ও মহত্ত্ব পরীক্ষা করেছে। কয়েদখানায় তার দু'জন সহচর বলেছিল,

**"আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলুন। আমরা আপনাকে সৎকর্মশীল দেখতে পাচ্ছি।"** [সূরা ইউসুফ ঃ ৩৬]

রাজা স্বপ্ন দেখার পর দুই বন্দীর একজন যিনি মুক্ত হয়েছিলেন তিনি ইউসুফ (আঃ)-কে বললেন,

**"হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী।"** [সূরা ইউসুফ ঃ৪৬]

নির্দোষিতা প্রমাণের আগে কারাগার থেকে মুক্তির প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করায় তাঁর সম্পর্কে নারীগণ বলল,

**"তারা বললঃ 'আশ্চর্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র মাহাত্ম্য! আমরা তো তাঁর উপর কোন পাপ কিংবা এ ধরণের কোন অভিযোগই দেখতে পাইনি!' (একথা শুনে) আযীযের স্ত্রী বলল: 'এখন (যখন) সত্য প্রকাশিত হয়েই গেছে, (তখন আমাকেও বলতে হয়, আসলে) আমিই তাঁর কাছে অসৎ কাজ কামনা করেছিলাম, অবশ্যই সে ছিল সত্যবাদীদের একজন।'"** [সূরা ইউসুফঃ ৫১]

ইউসুফ (আঃ) এর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে রাজা বললেন,

**"বাদশাহ্ বললঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে নিজের বিশ্বস্ত সহচর করে রাখব।"** [সূরা ইউসুফঃ৫৪]

তাঁর ভাইকে নেয়ার সিদ্ধান্তের পর, ভাই বলল,

**"সুতরাং আপনি আমাদের একজনকে তাঁর বদলে রেখে দিন। আমরা আপনাকে অনুগ্রহশীল ব্যক্তিদের একজন দেখতে পাচ্ছি।"** [সূরা ইউসুফঃ৭৮]

সাইয়্যিদুনা ইউসুফ (আঃ) তাক্ওয়া, দৃঢ়তা, আনুগত্য ও পাপ থেকে মুক্ত থাকার কারণে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে যে রহমত দিয়েছেন তা তিনি স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন,

**"বললেন ঃ আমিই ইউসুফ এবং এই হল আমার সহোদর ভাই। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়ই যে তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, আল্লাহ্ এহেন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।"** [সূরা ইউসুফঃ৯০]

যার ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারী সকলেই সাক্ষ্য প্রদান করছেন তাকে কিভাবে কিছু মুসলিম অভিযুক্ত করে? পবিত্র কুর'আনে তিনি রাজার আইন দিয়ে শাসন করেছেন এ ব্যাপারে একটি দৃষ্টান্তও উল্লেখ নেই। তিনি যে আইন দিয়ে শাসন করেছেন তার সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি বাদে আরও কোনকিছু উল্লেখ নেই,

**"তারা বলল ঃ এর শাস্তি এই যে, যার রসদপত্র থেকে তা পাওয়া যাবে, এর প্রতিদানে সে দাসত্বে যাবে।"** [সূরা ইউসুফঃ ৭৫]

এই হুকুমটি ছিল ইয়াকুব (আঃ)-এর শারী'আহ্ অনুসারে। তিনি আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কোন কিছু দিয়ে শাসন করেছেন এ ব্যাপারে কোন দৃষ্টান্ত বা জ্ঞান কারও জানা নেই। তাদের সন্দেহযুক্ত যুক্তি নিম্নোক্ত আয়াত থেকে আসে ঃ

**"সে বাদশাহ্র আইনে আপন ভাইকে কখনও দাসত্বে দিতে পারত না, কিন্তু আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন।"** [সূরা ইউসুফঃ ৭৬]

যখন এ আয়াতটির সঠিক তাফসীর করা হয় তখন সব সুবাহ বা সন্দেহ দূর হয় এবং তাদের দাবী অযৌক্তিক প্রমাণিত হয়।

এই পদ্ধতির পক্ষালম্বনকারীরা আয়াতটিকে দ্বান্দিক মনে করে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছে যা তাদের অবস্থানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাদের ব্যাখ্যা ছিল নিম্নরূপ-

দূর্ভিক্ষের বছর, লোকেরা প্রতিটি এলাকা থেকে ইউসুফ (আঃ) কাছে আসা শুরু করল যাতে করে সংরক্ষিত ফসল থেকে তারা কিছু পায় এবং রাজা এগুলো বন্টনের দায়িত্ব ইউসুফ (আঃ) এর উপর ন্যস্ত করেছিলেন। তাঁর ভাইয়েরা আসল। যদিও ভাইয়েরা তাকে সনাক্ত করতে পারেনি, কিন্তু তিনি ঠিকই ভাইদের সনাক্ত করতে পারলেন। তিনি তার ছোট ভাইকে বললেন যে তিনি তাদের ভাই। তিনি তাঁর ভাইয়ের জন্য একটি কৌশল আঁটলেন। সবার অগোচরে একটি পানপাত্র বা সিকায়াহ তার ভাইয়ের উটের জিনের মধ্যে পুরে দিলেন। অতঃপর তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে পানপাত্রটি চুরি গেছে এবং কেউ বলল ঐ উটের বহরের কেউ এটি চুরি করেছে। যে তা খুঁজে বের করবে তাকে একটি শস্যবাহী উট দ্বারা পুরস্কৃত করা হবে। ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা এ দাবীকে তীব্রভাবে প্রত্যাখান করল। যারা বিতরণকার্য তত্ত্বাবধান করছিলেন তারা বললেন,

**"......যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও, তবে যে চুরি করেছে তার কি শাস্তি ?"** [সূরা ইউসুফঃ ৭৪]

ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইগণ বললেন,

**"......শাস্তি হচ্ছে, যার রসদপত্রের মাঝে তা পাওয়া যাবে, প্রতিদানে সে দাসত্বে যাবে।"** [সূরা ইউসুফ ঃ৭৫]; অর্থাৎ চুরির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে। আর এটা ছিল ইয়াকুব (আঃ) এর শারী'আহ্ মোতাবেক শাস্তি। সে কারণে ইউসুফ (আঃ) তার ভাইয়ের তল্পিতল্পা খোঁজার আগে অন্যদের তল্পিতল্পা খোঁজা শুরু করলেন। অতঃপর তার ভাইয়ের থলে থেকে এটি উদ্ধার করা হল এবং নিয়ম অনুসারে তাকে দাসত্ব বরণ করতে হল। তারপর ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে আয়াতটি বর্ণিত হয়েছে,

**"সে বাদশাহ্‌'র প্রচলিত আইনানুযায়ী তাঁর ভাইকে তাঁর নিকটে রাখতে পারত না।"** [সূরা ইউসুফঃ৭৬]; কেউ কেউ এটাকে রাজার শারী'আহ্ (আইন) বা নিযাম (জীবন ব্যবস্থা) বলে ব্যাখ্যা করে থাকে। এর অর্থ হল মিশরের রাজার একটি শারী'আহ্ বা ব্যবস্থা ছিল এবং সাইয়্যিদুনা ইউসুফ (আঃ) তা দ্বারা পরিচালিত হতেন। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণে তিনি কৌশলের আশ্রয় নিলেন যাতে তাঁর ভাইকে তাঁর কাছে রেখে দেয়া যায়। সে কারণে তিনি একটি শিষ্টাচারসম্মত কৌশলের আশ্রয় নিলেন এবং অভিযুক্তকেই তার শাস্তির ব্যাপারে মতামত দিতে বললেন। তিনি রাজার আইনানুসারে এ অপরাধের শাস্তি কি মোটেও তা বর্ণনা করেননি। বরং তিনি ভাইদের মুখ দিয়ে ইয়াকুব (আঃ)-এর আইনানুসারে রায় বের করে নিয়ে এসেছেন যাতে নিজ ভাইকে নিজের কাছে রাখা যায়।

আয়াতের এহেন ব্যাখ্যাই তাদেরকে উপরোক্ত উপলব্ধিতে আসতে সহায়তা করেছে।

আমরা যদি আরবীতে 'দ্বীন' শব্দটির উপর আলোকপাত করি তাহলে দেখতে পাব যে, এটি একটি সার্বজনীন শব্দ যার একাধিক অর্থ রয়েছে। লিসান আল আরব (আরবদের ভাষা) ভাষাকোষ অনুসারে 'দ্বীন' বলতে বুঝায় বলপ্রয়োগের শাসন এবং আনুগত্য। সুতরাং 'দ্বীনতুহুম ফা দ্বানও' অর্থ হল 'আমি তাদেরকে বাধ্য করলাম, তারা আমাকে আনুগত্য করল।' দ্বীন বলতে আরও বুঝায় পুরষ্কার ও মূল্যবান বস্তু। 'আমি তাকে পুরস্কৃত করলাম' এটা ব্যক্ত করতে আপনি বলতে পারেন, 'তার দ্বীনুন কাজের জন্য দ্বীনতুহু'। আবার 'ইয়াওম আল-দ্বীন' অর্থ হল 'বিচার দিবস'। 'দ্বীন' বলতে জবাবদিহী করাকেও বোঝায়। যেমনঃ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**"যিনি বিচার দিবসের মালিক"**। [সূরা ফাতিহা : ৪]

দ্বীন এর আরেকটি অর্থ হল শারী'আহ্ এবং সুলতান। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**"আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না সমস্ত ফিত্না দূর হয়, এবং আল্লাহ্‌'র সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়।"** [সূরা আনফাল : ৩৯]

দ্বীন শব্দের আরও অর্থ হল অবমাননা বা দাসত্ব বরণ করা এবং 'মাদ্বীন' অর্থ হল দাস। আল-মাদ্বীনা মানে অধীনস্থ জাতি। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন, **"আমরা কি মাদ্বীনুন?"** [আল কুর'আন - ৩৭: ৫৩] যার অর্থ 'আধিকার লাভ'।

একইভাবে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) অন্যত্র বলেন,

**"যদি তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াই ঠিক হয়, তবে তোমরা একে (আত্মাকে) ফিরিয়ে দাও না কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?"** [সূরা আল ওয়াক্বিয়াহ্ ঃ ৮৬-৮৭]; এখানেও মাদ্বীনান অর্থ হল 'অধিকার প্রাপ্ত হওয়া'।

'দ্বীন' এর এরকম আরও অনেক অর্থ রয়েছে।

সুতরাং এ আয়াতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কোন অর্থটি বুঝিয়েছেন? এই অর্থগুলোর মধ্যে থেকে কোনও একটি অর্থ গ্রহণ করতে হলে সেই সুনির্দিষ্ট অর্থের প্রতি ইঙ্গিতদানকারী ক্বারিনা (নির্দেশক) প্রয়োজন। যদি কেউ তা না করে তার মত ও দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থ গ্রহণ করে; নিজের খেয়াল-খুশিকে শারী'আহ্‌'র উপর স্থান প্রদান করে তবে তার অসৎ উদ্দেশ্য উন্মোচিত হবে। অন্যদিকে যিনি শারী'আহ্ ক্বারা'ইন (নির্দেশনা) কর্তৃক দিকনির্দেশনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সীমাবদ্ধ থেকে অর্থ গ্রহণ করেন, তিনি শারী'আহ্‌'কে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং প্রভূর হুকুম পালন করেছেন বলে গণ্য হবেন। সুতরাং বুঝা দরকার যে এসব একাধিক অর্থের মধ্যে কোন অর্থটি আসলে উদ্দেশ্য?

আমরা যদি বলি দ্বীন শব্দটি এখানে শারী'আহ্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তবে আমাদের জানা উচিত শারী'আহ্‌'র নির্দেশনা এমন যেকোন ধরনের ব্যাখ্যা হতে আমাদের বিরত থাকতে বলেছে, যে ব্যাখ্যা মনে করে যে সাইয়্যিদুনা ইউসুফ (আঃ) কুফর শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করেছেন। কারণ তা নবীগণ(আঃ) এবং বিশ্বাসীগণদের জন্য হারাম করা হয়েছে, এবং তা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত বাণীর প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক যে বাণী একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ইবাদত ও দাসত্বের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং তা আইন প্রণয়নের একচ্ছত্র মালিক একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-এই বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**"আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর।"** [সূরা আম্বিয়াঃ২৫]

একই কথা ইউসুফ (আ:) এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যখন তিনিও বলেন,

**"আল্লাহ্ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।"** [সূরা ইউসুফ: ৪০]

এটা অসম্ভব যে তিনি এ আয়াতের ব্যাত্যয় ঘটিয়েছেন এবং বিভিন্ন প্রভূর হুকুমকে মেনে নিয়েছেন। একই অবস্থা আমরা সাইয়্যিদুনা শোয়াইব (আঃ) এর ক্ষেত্রেও দেখতে পাই, যখন তিনি বলেন,

**"আর আমি চাই না যে তোমাদেরকে যা ছাড়াতে চাই পরে নিজেই সে কাজে লিপ্ত হব, আমিতো যথাসাধ্য শোধরাতে চাই। আল্লাহ্র মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি এবং তাঁরই প্রতি ফিরে যাই।"** [সূরা হুদ: ৮৮]

আল কুরতুবীর মতে এ আয়াতের তাফসীর হল আমি নিজে যা করি সে সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করতে পারি না যেমনিভাবে আমি তোমাদের যা করার আদেশ দেই তা পরিত্যাগ করি না।

'দ্বীন' শব্দের অভিপ্রেত অর্থ যদি 'দাসত্ব' নেয়া হয় যার মানে হচ্ছে তার ভাই 'মাদ্বীনান' অর্থাৎ মালিকবিহীন দাসে পরিণত হয়েছে তাহলে এই অর্থ পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ যাতে ইউসুফ (আঃ) এর ভাইয়ের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে চোরকে দাসত্বে আবদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, রাজা কর্তৃক দাসে পরিণত না হলে অর্থাৎ মাদ্বীন (মালিকানাধীন দাস) না হলে তিনি তাঁর ভাইকে নিতে পারতেন না যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন। আর এই অর্থই সত্যের খুব কাছাকাছি। এমন কোন শারী'আহ্ ইঙ্গিত নেই যা এরূপ অর্থের অন্তরায় হতে পারে। বরং আয়াতে এর আগে যা এসেছিল তার সাথে এটা সঙ্গতিপূর্ণ এবং এটা প্রমাণ করে যে, সাইয়্যিদুনা ইউসুফ (আঃ) একজন মুহসীন বা সৎকর্মশীল, মুখলেসীন বা আল্লাহ্'র প্রতি আন্তরিক- যেমনটি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন। লোকেরা যে বিষয়ে স্বাক্ষ্য দিয়েছে এটা তার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ।

সেকারণে এরকম তাফসীর প্রত্যাখাত হবে যা নবীদের নিষ্পাপতা ও পাপ থেকে পবিত্র হওয়ার ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক এবং যার মানে দাঁড়ায় তারা যা বলেন তা করেন না।

রাজার প্রতি সাইয়্যদনা ইউসুফ (আঃ)-এর বক্তব্যের তাফসিরের বেলায়,

**"(ইউসুফ) বলল : আমাকে দেশের কোষাগারের দায়িত্বে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান।"** [সূরা ইউসুফ: ৫৫]

এর তাফসীর প্রসঙ্গে তারা বলতে চায়, তিনি অর্থমন্ত্রী হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং এ পদে তাকে বহালের সময় তিনি ইয়াকুব (আঃ) এর শারী'আহ্ প্রয়োগ করেননি, বরং রাজার ব্যবস্থা প্রয়োগ করেছেন যা ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলনা।

এটি একটি বিশাল পদস্খলন ও সত্য বিচ্যুতি। বিষয়টিতে সঠিক পথনির্দেশনা পেতে হলে আমাদেরকে নিম্নে বর্ণিত কিছু ইস্যুর সাথে পরিচিত হওয়া খুবই জরুরী।

- ❖ সেসময়ের শাসব্যবস্থাটি ছিল রাজতান্ত্রিক যেখানে রাজা তার নিজের আদেশ ও মতামতের ভিত্তিতে রাজ্য পরিচালনা করতেন। ইতিহাসে দু'ধরনের রাজতান্ত্রিক শাসব্যবস্থা দেখা যায় ঃ

১. রাজতন্ত্রের নির্বাহী ব্যবস্থায় রাজা তার মতামত ও হুকুমের মাধ্যমে রাজ্য পরিচালনা করেন। লোকদের তাই মানতে হয় যা কিছুকে রাজা উপযুক্ত মনে করেন এবং কেউ তার বিচারকে পরিবর্তন করতে পারেন না। আইন, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ সবই থাকে তার করতলগত। তিনি নিজে তার সহকারীদের নিয়োগ দেন এবং যখন খুশী তখন অপসারণ করেন। আনুগত্য ও ঘনিষ্টতার উপর নির্ভর করে অথবা তাদের যথার্থ বিচার ও সুপরিকল্পনার জন্য তিনি তাদের এ পদে নিযুক্ত করেন। এইসব সহকারীদের আনুগত্য ও বাধ্যতাই মুক্তভাবে শাসন করবার জন্য যথেষ্ট এবং

তখন তারা নিজেদের হুকুম ও মতামতের মাধ্যমে শাসন পরিচালনা করতে পারেন। অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরিসরে তারা প্রত্যেকেই আলাদাভাবে একেকজন রাজা।

২. সীমাবদ্ধ নির্বাহী ক্ষমতাচর্চার মাধ্যমে রাজতন্ত্র। এ ব্যবস্থায় রাজা একজন প্রকৃত রাজার বদলে একটি প্রতিচ্ছবি হয়েই থাকেন যেখানে তার নিরঙ্কুশ কোন ক্ষমতা থাকে না। এক্ষেত্রে রাজা নন, সংবিধান ও কানুনের উপর সার্বভৌমত্বের দায়িত্ব অর্পিত থাকে। রাজাকে ছাড়াই আইনপ্রণেতাগণ আইন প্রণয়ন করেন। এমন নির্বাহী কাঠামো থাকে যারা সংবিধান ও কানুন বাস্তবায়ন করে থাকেন। এছাড়াও এমন বিচার কাঠামো থাকে যারা রাজা ব্যতিরেকে বিবাদ মিমাংসা করেন এবং লোকদের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটান। এ ধরনের রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যাপকতা পায় যখন গণতন্ত্র বিস্তৃতি লাভ করে। আর এটাই হল সীমাবদ্ধ বা সাংবিধানিক রাজতন্ত্র। ইউসুফ (আঃ) এর সময়ে মিশরে তাহলে এই দু'টির মধ্যে কী ধরনের রাজতন্ত্র বলবৎ ছিল?

কেউ এ বিষয়টি কল্পনাও করতে পারবে না যে সেসময় মিশরের রাজা কোন ব্যবস্থা বা সংবিধানের অনুগত ছিলেন। 'দ্বীন আল মালিক' বলতে তারা বুঝায় তা নয় বরং রাজার আইনকেই বোঝানো হয়। শাসকের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রনকারী আজকের রাজতন্ত্র ও ইউসুফ (আঃ)-এর সময়কার রাজতন্ত্রের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়ার ভিত্তিতে যে মতামত তা সঠিক মতামত থেকে বিচ্যুত এবং এটি একটি ত্রুটিপূর্ণ সাদৃশ্যতা।

কোষাগারের দায়িত্ব প্রদান করতে রাজার প্রতি সাইয়্যিদুনা ইউসুফ (আঃ)-এর অনুরোধ এবং এ ব্যাপারে রাজার সম্মতির সাথে শাসনের কোনরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান নেই। বরং কুর'আন এ বিষয়টিকে স্বপ্নের বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে এবং এর বাইরে আর কিছুই নয়। এটা ফসলের উৎপাদন, ফসল কাটার বছর, খরার বছর এবং এ ব্যাপারে করণীয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সেকারণে তিনি বাহুল্য বর্জন করে অর্পিত বিশ্বাসে আস্থা রেখে সাইয়্যিদুনা ইউসুফ (আঃ) কে ময়দা মজুদ করবার দায়িত্ব নিতে এবং খরার বছরের জন্য ফসল কাটার বছরে বন্টনের ব্যবস্থা করবার আদেশ করেন। এটা ছিল একটি কঠিন কাজ এবং এটা ইউসুফ (আঃ)-এর মত কোন দক্ষ, বিশ্বস্ত, সচেতন এবং জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের সাথে যা হয়েছে তা আলোচ্য ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমাদের এ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোন সুযোগ নেই এবং সাইয়্যিদুনা ইউসুফ (আঃ)-এর দায়দায়িত্ব পর্যন্ত একে বিস্তৃত করবার কোন সুযোগ নেই। আমরা এ কথা বলার অধিকার রাখি না যে সম্পদ সংগ্রহ করা এবং তা রাজার পরিষদবর্গ, পরিবার, সেনাবাহিনী ও নাগরিকদের জন্য ইয়াকুব (আঃ)-এর শারী'আহ্ ব্যতিরেকে রাজার ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্যায় করা ছিল তাঁর দায়িত্ব। কিতাবের বাণীর এহেন ব্যাখা দেয়ার জন্য দলিল প্রয়োজন।

মুলতঃ রাজা ইউসুফ (আঃ)-এর বিচক্ষণ রায়, বিষয়াদি পর্যালোচনার ক্ষমতা ও দক্ষতার বিষয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। আর এটাই ইউসুফ (আ:) কে রাজার অত্যন্ত নিকটে নিয়ে এসেছিল এবং এতো বড় দায়িত্বে নিযুক্ত হবার সুযোগ করে দিয়েছিল যা স্বপ্ন দেখার পর থেকেই তার (রাজার) মনে আসন গেড়েছিল। অতএব এটা গুরুত্বপূর্ণ যে ইউসুফ (আঃ) অন্য কারো হস্তক্ষেপ ছাড়াই এ সুযোগ লাভ করেছিলেন।

কেউ হয়ত এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে যে সাইয়্যিদুনা ইউসুফ (আঃ) কেবলমাত্র রাজার স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করেননি। বরং তিনি এ ব্যাপারে বিকল্প ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় সংস্থার ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন। এটাই গুদামজাত পণ্যের দেখাশুনার দায়িত্ব প্রদান করতে ও এ ব্যাপারে তাকে স্বাধীন ক্ষমতা প্রদানে রাজাকে আস্থাশীল করেছে। রাজা ইউসুফ (আঃ) কে এমনটা বলেননি যে তার একটি শারী'আহ্ বা ব্যবস্থা রয়েছে এবং এটা দিয়েই পরিচালিত হতে হবে। বরং রাজা ইউসুফ (আঃ) এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা এবং এ ব্যাপারে তার সমাধানকে গ্রহণ করেছেন। ফলে রাজা উপযুক্ত মনে করেই তাকে ফসল বন্টন ও মজুদের দায়িত্ব দেন।

এটা অনস্বীকার্য যে খরার বছরের পর ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে জনগণকে দুর্ভীক্ষ থেকে উদ্ধারের জন্য আসতে হয়েছে। এটাও অবধারিত যে সুবিচার ও সঠিক বন্টনের জন্য তার সুখ্যাতি দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। এটা রাজার সাথে তার সম্পর্ককে আরও ঘনীভূত করেছে ও তাকে আরও নিকটে নিয়ে এসেছে। হয়ত এটাই তাকে আজিজ হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে যেমনটি তার ভাইদের কথায় পাওয়া যায়।

**"হে ভূমির অধিপতি (হে আযীয)"**। [সূরা ইউসুফ ঃ ৮৮]; সেই রাজা যার কাছে তার পিতামাতাকে মরুভূমি থেকে আসতে হয়েছে।

তিনি রবের নিকট দু'আ করলেন এবং বললেন;

**"হে আমার রব! তুমি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছ...... ।"** [সূরা ইউসুফঃ১০১]

অতঃপর আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**"সে তার পিতামাতাকে উচ্চাসনে বসালো... ।"** [সূরা ইউসুফঃ১০০]; এর অর্থ হল তাকে কর্তৃত্বও দেয়া হয়েছিল।

পবিত্র কুর'আন এর বর্ণনানুসারে একমাত্র আইন যা ইউসুফ (আঃ) বাস্তবায়ন করেছিলেন তা হলো ইয়াকুব (আঃ)-এর শারী'আহ্‌ অনুসারে তার ভাইকে দাস হিসেবে গ্রহণ করা। যদি রাজার কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকতো তাহলে সেটা না গ্রহণ করার মাধ্যমে তিনি রাজকীয় ব্যবস্থার ব্যাত্যয় ঘটালেন কেন?

এটা কল্পনা করা সম্ভব নয় যে সাইয়্যিদুনা ইউসুফ (আঃ) শারী'আহ্‌'র বিন্দুমাত্র ব্যাত্যয় ঘটিয়েছেন। কারণ তিনি হলেন মাসুম বা ভুলের উর্ধ্বে এবং তাঁর রব তাকে মুহসীন বা উত্তম, আন্তরিক ও ধার্মিক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যিনি প্রেমের চেয়ে কারাভোগকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি কারাগারের ভেতরে দাওয়াহ্‌'র কাজ করতেন। তিনি নিজেকে নিরাপরাধ প্রমাণ না করে কারাগার থেকে বের হতে চাননি। তিনি সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর সততা ও দক্ষতার কারণে আযীয পত্নী হতে শুরু করে শহরের নারীগণ, কারাগারে তাঁর দুই সাথী, রাজার, এমনকি পরিচয় প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তাঁর ভাইগণ পর্যন্ত তৎকালীন সমাজের সকর কাফেরদের প্রসংশা অর্জন করেছিলেন।

এটা উল্লেখযোগ্য যে সাইয়্যিদুনা ইউসুফ (আঃ)-এর অবস্থা ও রাজার রাষ্ট্রবিষয়ক তাফসীর এসবই হল তাফসির জান্নি (ধারণামূলক ব্যাখ্যা (Speculative interpretation))। যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তারা আসুক না কেন সবই অসাড়। সুতরাং রাজা কি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন নাকি কাফের রয়ে গিয়েছিলেন, নাকি রাজার মৃত্যু বা অপসারণের পর রাজর্ষিক দায়িত্ব ইউসুফ (আঃ)-এর উপর অর্পিত হয়েছিল, নাকি পূর্বের আযিযের মৃত্যু বা অপসারণের পর তিনি কি আযিয হয়েছিলেন-এসব সম্পর্কে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র বক্তব্য হল ঃ

**"সে বাদশাহ্‌র আইনে নিজ ভাইকে দাসত্বে নিতে পারত না।"** [সূরা ইউসুফ ঃ ৭৬], অথবা তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র) বক্তব্যের ব্যাখ্যা,

**"আমাকে দেশের কোষাগারের দায়িত্বে নিযুক্ত করুন...... ।"** [সূরা ইউসুফ ঃ ৫৫]; এসব প্রশ্নের সব উত্তরই ধারণামূলক (Speculative)। কারণ পবিত্র কুর'আন এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উত্তরের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করেনি। এছাড়া এ বিস্তারিত বিষয়গুলো আইন হিসেবে মেনে নেয়া আমাদের জন্য অপরিহার্যও নয়। আমাদের ব্যাখ্যাও এর ব্যতিক্রম নয়, যেহেতু এটাও অন্যান্য ধারণামূলক (Speculative) ব্যাখ্যার মতোই ভিন্নরুপের আরেকটি ব্যাখ্যা মাত্র। তবে আমাদের ব্যাখ্যাটি অন্যান্য ব্যাখ্যার চেয়ে এদিক থেকে অনন্য যে এটা তাক্বওয়া ও ঈমানের ভিত্তিতে নবীদের যথার্থতা তুলে ধরে এবং নবীদের নিষ্পাপতার সাথেও সাংঘর্ষিক নয় যা কিনা দ্বীনের অন্যতম ভিত্তি। একটি ব্যাখ্যা সত্য হতে কতটা বিচ্যুত হতে পারে যার নমূনা ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি যখন তা স্বয়ং ইউসুফ (আঃ) মুখ হতে নিসৃত অকাট্য বক্তব্য যা তিনি শিরকের আক্বীদা বর্জনের জন্য সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন তার সাথে সাংঘর্ষিক হয় এবং বিচার-ফয়সালায় শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র প্রতি মুখাপেক্ষিতাকে বর্জন করে? এভাবে অগ্রসর হয়ে ইউসুফ (আঃ) এর পরিস্থিতি সুস্পষ্ট করার মাধ্যমে আমরা এমন একটি অবস্থায় উপনীত হতে পারি যেখান থেকে কুফর ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের পক্ষে কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীই হলো শারী'আহ্‌'র হুকুম, কোন ধারণানির্ভর (Speculative) হুকুম নয়। এটা দলিলের অর্থ ও সত্যতার বিচারে অকাট্য।

কেউ হয়ত বলতে পারে যে ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নির্দেশ মোতাবেকই রাজার ব্যবস্থা অনুসারে শাসন করেছিলেন এবং এতে তাঁর রবের ইচ্ছাই প্রতিফলিত হয়েছে। এর উত্তরে বলা যায়, হয় এই কুফর ব্যবস্থা দিয়ে শাসন করার অনুমোদন সাইয়্যিদুনা ইউসুফ (আঃ)-এর জন্য সুনির্দিষ্ট ছিল, না হয় তা ছিল সার্বজনীন?

যদি এটা শুধুমাত্র সাইয়্যিদুনা ইউসুফ (আঃ)-এর জন্য সুনির্দিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে এটা আমাদের জন্য অনুমোদিত নয়। সে কারণে এটা আমাদের জন্য দলিল বা অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে না।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, যদি এটা তৎকালীন সময়ের সার্বজনীন হয়ে থাকে তাহলে এটা এমন একটি হুকুম যা পূর্ববর্তীগণের শারী'আহ্'র বর্ণনা হিসেবে আমাদের নিকট এসেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পূর্ববর্তীগণদের শারী'আহ্ কি আমাদের জন্য প্রযোজ্য? একদল ফিক্হ ও উসূলবিদগণ নিম্নোক্ত উসুলী মূলনীতিটি বর্ণনা করেছেন,

**"পূর্ববর্তীগণদের শারী'আহ্, আমাদের জন্য শারী'আহ্ নয়।"**

এ ব্যাপারে অনেক দলিল পেশ করা যায়, যার মাধ্যমে দেখানো যাবে যে মুহম্মদ (সা:) আনীত ব্যবস্থা পূর্ববর্তী সকল শারী'আহ্'র হুকুমকে রহিত করেছে এবং কিছু হুকুমকে ব্যাখ্যাসহ রহিত করেছে। আমরা যদি এই চিন্তাবিদদের মতামতকে গ্রহণ করি, তাহলে ইউসুফ (আঃ)-এর সময়কে কিংবা অন্যকোন নবীর(আঃ) সময়কে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা বা অনুসরণ করা অনুমোদিত নয়। আরেকদল ফিক্হ ও উসুলবিদ নিম্নোক্ত মূলনীতিটি বর্ণনা করেছেন,

**"পূর্ববর্তীগণদের শারী'আহ্ ততক্ষণ আমাদের জন্য শারী'আহ্ হয়ে থাকবে যতক্ষন না তা রহিত হয়।"** এসব চিন্তাবিদগণ তাদের আইনগত কারণও উল্লেখ করেছেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, যদি পূর্ববর্তীদের আইনের মধ্যে আমাদের কোন উপকারীতা না থাকত তবে সেগুলো পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত হতো না। তারা আরও বলে থাকেন যে পবিত্র কুর'আন পূর্ববর্তী শারী'আহ্'র হুকুমকে হঠাৎ রহিত করেনি। তারা বলেন যে, পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে পবিত্র কুর'আন এবং হাদীসে যা বলা হয়েছে তা আমাদের জন্যও প্রযোজ্য যদি না নতুন কোন আইন দ্বারা সেগুলো রহিতকিংবা প্রতিস্থাপিত হয়।

যখন এই মূলনীতিকে আমরা আলোচ্য বিষয়ে প্রয়োগ করি তখন আমরা কি পাই? আমাদের শারী'আহ্ কী আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা বাদ দিয়ে অন্য কিছু দিয়ে শাসন করাকে অবৈধ করেনি? পবিত্র কুর'আন বা মুহাম্মদ (সা:), শাসনের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (সা:)-এর শারী'আহ্ হতে চুল পরিমাণ বিচ্যুতির ব্যাপারে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেনি?

অবশ্যই মুহম্মদ (সা:)-এর শারী'আহ্ আমাদের বিচার-মীমাংসার ক্ষেত্রে সেটি ছাড়া অন্যকোন কিছুর নিকট দ্বারস্থ হতে নিষেধ করেছে। কুফর ও জাহেলিয়াতের কাছ থেকে যেকোন হুকুম নেয়া থেকে বিরত থাকবার জন্য অকাট্যভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যদি এটা দাবি করা হয় যে এটা সাইয়্যিদুনা ইউসুফ (আঃ)-এর সময়ে বৈধ ছিল, তাদেরকে আমরা বলতে চাই যদি তাদের কথা মেনেও নেয়া হয় তারপরেও কুর'আনের শারী'আহ্ মোতাবেক এটা সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ (রহিত)।

যারা বলেন যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে শাসন করার দৃষ্টিভঙ্গী উসূল থেকে উৎসারিত, শাখা থেকে নয়, তাদের এ মতটিও সঠিক নয়। কারণ বিশ্বাসের জায়গা হল চিন্তায় এবং শারী'আহ্গত হুকুমের জায়গা হল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। আক্বীদা হল শারী'আহ্'র ভিত্তি এবং শারী'আহ্গত হুকুম হল আক্বীদার ফসল।

বান্দার কাজের সাথে সম্পর্কিত শারী'আহ্গত হুকুমের দু'টি দিক রয়েছে ঃ

**১. বুদ্ধিবৃত্তিক ও বিশ্বাসগত দিক যা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।**

এই ক্ষেত্রটি আক্বীদার সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং দলিল ক্বাতী'ঈ (অকাট্য) কিংবা জান্নি (ধারণামূলক) যাই হোক এর অস্বীকার কুফরী বা পাপের দিকে ধাবিত করবে।

**২. ব্যবহারিক দিক যা কার্যসম্পাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।**

যেমনঃ সালাত হল ফরয এবং এটাকে ফরয হিসেবেই বিশ্বাস করতে হবে। এটাকে ফরয হিসেবে বিশ্বাস না করা কুফরী।

আবার, (আমলের ক্ষেত্রে) সালাত হল ফরয এবং এটাকে ফরয হিসেবেই পালন করতে হবে। এটা ফরয হিসেবে পালন না করা গুনাহ্।

মদ খাওয়া হারাম এবং এর হারাম হওয়াটা অবশ্যই মেনে নিতে হবে। আর এটাকে অনুমোদিত বলা কুফরী।

আবার, মদ হারাম এবং এটা পান করা পরিত্যাজ্য। কাজেই (আমলের ক্ষেত্রে) মদপান একটি গুনাহ্।

একইভাবে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র আইন দিয়ে শাসন করা ফরয। আর এটাকে মেনে নেয়া ঈমানের সাথে সম্পর্কিত যা অকাট্য দলিল থেকে উদ্ভুত। একে কার্যকর করার ক্ষেত্রে এটা হল তা'আহ্ বা আনুগত্য এবং কার্যকর না করা হল মা'সিয়াহ্ বা গুনাহ্। সুতরাং আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা না করাটা কুফর হিসেবে গণ্য হবে যদি আল্লাহ্'র ওহী দ্বারা শাসনের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করা হয় কিংবা তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। আর যদি আল্লাহ্'র ওহী দ্বারা শাসনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হয় কিন্তু তা কার্যকর না করা হয় তবে তা গুনাহ্ (কাফের হবে না) হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে শাসন করা একটি উসুলী ঐক্যমত-এ বক্তব্য প্রথম দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে এবং এটা সঠিক। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে (ব্যবহারিক দিক) এটা শারী'আহ্ এবং এর প্রয়োগের ব্যাপার। অন্য কথায়, এটা ফুরু বা শাখা-প্রশাখার সাথে সম্পর্কিত, উসুল বা ভিত্তির সাথে নয়। এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এটা আলোচনার ইস্যু হয়ে দাড়িয়েছে যে এটা কি আমাদের পূর্ববর্তী শারী'আহ্'তে ছিল কি না?

এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমরা বলতে পারি যে সাইয়্যিদুনা ইউসুফ (আঃ) শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করেননি এবং ঐভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা অনুমোদিত নয়। যেসব লোকেরা বিষয়টিকে অন্যভাবে নিয়েছে তাদের দাবি প্রত্যাখ্যাত, এমনকি তাদের নিজেদের যুক্তির দিক থেকে দেখলেও। এর কারণ হল আলেমগণ শা'রা মান কাবলানা বা পূর্ববর্তীগণের শারী'আহ্'র ব্যাপারে দু'টি মত পোষণ করেছেন। একটির মতে, পূর্ববর্তীদের শারী'আহ্ আমাদের জন্য শারী'আহ্ নয়। সুতরাং এ উপলব্ধি অনুসারে, জাহেল ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অনুমোদন প্রত্যাখাত। অন্য একটি অংশের মতামত হল, পূর্ববর্তীদের শারী'আহ্ ততক্ষণ আমাদের জন্য শারী'আহ্ হিসেবে থাকবে যতক্ষণ না সেটি রহিত হবে। অনেক আয়াত, আক্বীদা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা:) এর কাজের মাধ্যমে কীভাবে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা প্রতিষ্ঠিত করা যায় সে পদ্ধতি বলে দেয়া হয়েছে এবং এসব মূলনীতি অনুসারে কুফর ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করা অনুমোদিত নয়। বরং ইসলাম সামগ্রিকভাবেই এ ধরনের চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করে। অন্য কথায়, যদি জাহেল শাসনব্যবস্থায় অংশ নেয়া পূর্ববর্তীদের শারী'আহ্ হয়েও থাকে-তবে আমাদের শারী'আহ্ অসংখ্য দলিলের মাধ্যমে এটাকে রহিত করে দিয়েছে।

নবীদের জীবন এবং তাদের প্রতি নাযিলকৃত নির্দেশনা সম্পর্কে (আল-কুর'আনে) যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য হল (সেসব বিষয়ে) তাদেরকে অনুকরণ ও অনুসরণ করা-এ কথাটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আক্বীদার ক্ষেত্রে সব নবী একই দাওয়াত দিয়েছেন। সবাই লোকদেরকে আল্লাহ্, তার একত্ববাদ, আল খালিক্ব বা স্রষ্টা, আল মুদাব্বির বা সবকিছুর পরিচালনাকারী-এ দিকে আহ্বান করেছেন। তারা ফেরেশতা, আল্লাহ্'র কিতাব, রাসূল ও শেষ বিচার দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য লোকদের দাওয়াত দিয়েছেন,

**"আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর।"** [সূরা আম্বিয়া ঃ ২৫]

দাওয়াহ্ বহন, বহনের সময় দুর্ভোগ, ক্ষতি ও নির্যাতন ভোগ করা, আল্লাহ্'র জন্য ধৈর্যধারণ করা ও তাঁর পথে ত্যাগ স্বীকার করা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে সাদৃশ্যতা পাওয়া যায়। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**"আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গম্বরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তারা ধৈয্য ধারণ করেছেন। তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌছানো পর্যন্ত তারা নির্যাতিত হয়েছেন। আল্লাহ্'র বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। আপনার কাছে পয়গম্বরদের কিছু কাহিনী এসে পৌঁছেছে।"** [সূরা আল আনআম ঃ ৩৪]

তিনি আরও বলেন,

**"আপনাকে তো তাই বলা হয়, যা বলা হতো পূর্ববর্তী রাসূলগণকে।"** [সূরা হামীম সিজদাহ্ ঃ ৪৩]

গ্রহণ ও আনুগত্য করার বেলায় তাদের লোকদের বলার ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

**"বস্তুত আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহ্'র নির্দেশানুযায়ী তাদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়।"** [সূরা নিসা ঃ ৬৪]

তাদের দাওয়াহ্'কে অবিশ্বাস করা ও প্রত্যাখানের দিক থেকে একই পরিণতি বরণ করতে হয়েছে। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**"হায় মানবজাতি! তাদের কাছে এমন কোন রাসূলই আগমন করেনি যাদেরকে তারা বিদ্রুপ করেনি।"** [সূরা ইয়াসীনঃ ৩০]

এবং তিনি আরও বলেন,

**"কাফেররা পয়গম্বরগণদের বলেছিলঃ 'আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে।' তখন তাদের কাছে তাদের প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করলেন যে, 'আমি যালিমদের অবশ্যই ধ্বংস করব। তাদের পর তোমাদেরকে ভূখন্ডে প্রতিষ্ঠিত করব। এটা ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আমার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার আযাবের ওয়াদাকে ভয় করে।'"** [সূরা ইবরাহীম ঃ ১৩-১৪]

অবশেষে তাদের দ্বীনকে বিজয়ী করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**"এমনকি যখন পয়গম্বরগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন যে, তাদের অনুমান ভুল হয়েছিল, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি তারা উদ্ধার পেয়েছে। আর না-ফরমান জাতির উপর থেকে আমার আযাব কখনোই রোধ হবে না।"** [সূরা ইউসুফ ঃ ১১০]

এভাবে দাওয়াহ্'র ক্ষেত্রে বিভিন্ন পয়গম্বরগণ একইরকম ছিলেন-যার কিছু উদাহরণ আমরা উপস্থাপন করেছি। যারা আগে এসেছিলেন তাদের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এগুলো এজন্যই বিধৃত করেছেন যাতে এগুলো থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি, সতর্ক হতে পারি, ঈমানকে বুলন্দ করতে পারি, দৃঢ়চেতা হই ও ধৈর্যকে বাড়াতে পারি। তারা আমাদের আরও দেখিয়েছেন যে, আক্বীদার দিক থেকে, সর্বজ্ঞানী এবং সবজান্তার (আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র) পথে অটল থাকার বিষয়ে এবং এই কাজের ফলাফলের দিক থেকে তাদের দাওয়াহ্'র ধারা সবসময় একইরকম। এ বিষয়ক আয়াতগুলো এসেছে যাতে দাওয়াহ্'র পথ আলোকিত হয় এবং এ পথে লোকদের বিরোধীতা, কুফর ও ঈমানের মধ্যকার প্রচন্ড বৈরীতা এবং অবিরাম কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাবার বিষয়ে আমরা ওয়াকিবহাল থাকি। এসব আমাদেরকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র প্রতি ওয়া'লা বা আনুগত্য এবং বা'রা বা শিরক থেকে মুক্ত থাকবার শিক্ষা দেয় এবং ঈমানের পরীক্ষার পর ঐশী হস্তক্ষেপসহ আরও অনেক ব্যাপারে আমাদের ওয়াকিবহাল করে।

যাই হোক, (সত্যের পথে) দৃঢ়তা প্রদর্শনের বিষয়ে আমাদের পূর্ববর্তী নবীগণদের জীবনচরিত অনুসরণ করা উচিত। বিধানের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করা যাবে না। কারণ, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রত্যেক নবীকে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা দিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**"প্রত্যেকের (নবীগণ) জন্য, আমি শারী'আহ্ ও মানহায (পদ্ধতি) নির্ধারণ করে দিয়েছি।"** [সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৮]

এর কারণ হলো অন্যান্য নবীদের কেবলমাত্র তার লোকদের জন্য এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা:) কে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁর বাণীই চূড়ান্ত। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তাদের নিজস্ব ধর্মকে পরিত্যাগ করে এ ধর্মকে অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**"নিশ্চয়ই আল্লাহ্'র নিকট মনোনীত দ্বীন একমাত্র ইসলাম।"** [সূরা আলি-ইমরানঃ ১৯]

এবং তিনি বলেন,

**"এবং যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যাতীত অন্য কোন দ্বীনের তালাশ করে কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থ।"** [সূরা আলি-ইমরানঃ ৮৫]

**"আমি আপনার প্রতি (হে মুহাম্মদ) সত্যসহকারে এই কিতাব (কুর'আন) নাযিল করেছি যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।"** [সূরা মায়িদাহ্ ঃ৪৮]

এছাড়া সাইয়্যিদুনা মুহম্মদ (সাঃ) এর উপর নাযিলকৃত বাণীর প্রকৃতি ভিন্ন ছিল, কেননা তা ছিল চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ। ইসলামী রাষ্ট্র এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং শারী'আহ্ রক্ষা, প্রয়োগ ও প্রসারের জন্য পদ্ধতি হিসেবে কাজ করে। অন্যান্য নবীদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে তাদের দাওয়াহ্ অন্যদের বাদ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর অর্থ হলো তাদের দাওয়াহ্ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল ও সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এটা ইসলামের মত নয় যার হুকুম সব সময় ও অঞ্চলের জন্য উপযোগী। এই পার্থক্য ইসলাম ও অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে সাদৃশ্য অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে অন্তরায়। এটা মুসলিমদের কেবলমাত্র ইসলাম থেকে সমাধান নিতে বাধ্য করে, কারণ এর হুকুমসমূহের সাথে এর প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সম্পর্ক রয়েছে। এ ব্যাপারে সাইয়্যিদুনা ঈসা (আঃ) এর উদাহরণ দেখা যেতে পারে। তা ছিল সাইয়্যিদুনা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ব্যবস্থা হতে আলাদা। কেননা সেটা ছিল কেবল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বাণী সম্বলিত যেখানে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোন আহ্বান অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এছাড়াও এটা ছিল কেবল বণী ইসরাঈলের জন্য সুনির্দিষ্ট। তাহলে কীভাবে শারী'আহ্ হুকুমসমূহ তুলনীয় হবে?

এটা দুঃখজনক যে দ্বীনের সুস্পষ্ট বিষয়সমূহকে নিয়ে আমাদের কথা বলতে হচ্ছে। এতে বোঝা যায় বর্তমানে দাওয়াহ্'র স্তর কতটা অধঃপতিত হয়েছে। আমরা পবিত্র কুর'আনে সাইয়্যিদুনা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে যা বলা হয়েছে তা বলতে পারিঃ

**"বলুনঃ 'এটাই আমার পথ; আমি পরিপূর্ণ জ্ঞান অনুসারে আল্লাহ্'র দিকে মানুষকে আহ্বান করি, আমি এবং আমার অনুসারীগণ...'"**। [সূরা ইউসুফঃ ১০৮]

**"(মিশরের) রাজার আইন অনুযায়ী সে তাঁর ভাইকে রেখে (দাসত্বে) দিতে পারত না, তবে আল্লাহ্ চাইলে ভিন্ন কথা।"** [সূরা ইউসুফঃ ৭৬]

**"(ইউসুফ) বললেনঃ আমাকে দেশের কোষাগারের দায়িত্বে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান।"** [সূরা ইউসুফঃ ৫৫]

**"আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলকেই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর।"** [সূরা আম্বিয়া ঃ ২৫]

**"আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গম্বরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তারা ধৈয্য ধারণ করেছেন। তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছানো পর্যন্ত তারা নির্যাতিত হয়েছেন। আল্লাহ্'র বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। আপনার কাছে পয়গম্বরদের কিছু কাহিনী এসে পৌঁছেছে।"** [সূরা আল আনআম ঃ ৩৪]

**"বস্তুত আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহ্'র নির্দেশানুযায়ী তাদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়।"** [সূরা আন-নিসাঃ ৬৪]

**"আপনি তাদের কাছে সে জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন, যখন সেখানে রাসূলগণ আগমন করেছিলেন।"** [সূরা ইয়াসীনঃ ৩০]

**"কাফেররা পয়গম্বরগণদের বলেছিলঃ 'আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে।' তখন তাদের কাছে তাদের প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করলেন যে, 'আমি যালিমদের অবশ্যই ধ্বংস করব। তাদের পর তোমাদেরকে ভূখন্ডে প্রতিষ্ঠিত করব। এটা ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আমার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার আযাবের ওয়াদাকে ভয় করে।'"** [সূরা ইবরাহীম ঃ ১৩-১৪]

**"এমনকি যখন পয়গম্বরগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন যে, তাদের অনুমান ভুল হয়েছিল, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি তারা উদ্ধার পেয়েছে। আর না-ফরমান জাতির উপর থেকে আমার আযাব কখনোই রোধ হবে না।"** [সূরা ইউসুফ ঃ ১১০]

# ১৪

# মাসলাহা'র (সুবিধা) দোহাই দিয়ে হারামকে অনুমোদন দেয়া

শারীআহ্ কিছু বিষয়কে আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছে আর কিছু বিষয়কে নিষেধ করেছে। কোনভাবেই তার রদবদল, পরিবর্তন ও বিকৃত করা আমাদের জন্য বৈধ নয়। সর্বজ্ঞানী আইনপ্রণেতা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শুধুমাত্র যেখানে প্রয়োজন সেখানেই রুখসাহ্-কে (অব্যহতি) অনুমোদন দিয়েছেন। সুতরাং শয়তান বা মানুষের প্রবৃত্তি সুবিধার দোহাই দিয়ে যতই এতে প্ররোচনা দিক না কেন, যে স্থানে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) রুখসাহ্ (অব্যহতি) প্রদান করেননি সে স্থানে তাঁর হুকুমকে পাশ কাটানোর কোন অনুমোদন নাই। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত রুখসাহ্ ব্যতীত বাধ্যতামূলক হুকুমসমূহ পরিত্যাগ করাকে অনুমোদন দেয় আর নিষেধ অমান্য করাকে বৈধতা দান করে সে কাফির কিংবা অজ্ঞ ফাসিকদের অন্তর্ভূক্ত।

কিছু বিপথগামী ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছে যে মাসলাহা হচ্ছে ক্ষমতার অংশীদারিত্বের দলিল-

তাদের মতে, মাসলাহা হলো সে সমস্ত কর্মকান্ড যা থেকে মুলতঃ অধিকাংশ এমনকি বেশীরভাগ সময়ই ব্যক্তি বা জনগণের কল্যান সাধিত হয়। তাদের মতে ওলেমাগণ শারীআহ্ পর্যবেক্ষন করে এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছেন যে শারীআহ্'কে এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে দুনিয়া এবং আখিরাতে বান্দার কল্যান সাধিত হয়।

তারা মাসালিহ্ মুরসালাহ্ (অসজ্ঞায়িত বিষয়সমূহের কল্যাণ) সম্পর্কিত উদাহরণ ও যে ভিত্তির উপর তা প্রতিষ্ঠিত তা উদ্ধৃত করে। তারা বলে যে ক্ষমতায় অংশীদারিত্বের দলিল মাসালিহ্ মুরসালাহ্'র ভিত্তিতে সম্ভব নয়। কারণ সুস্পষ্ট দলিলাদির মাধ্যমে এটা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত যে, জাহেলী ব্যবস্থায় শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করা গুনাহের কাজ। বরং এখানে লব্ধ বিষয়টির ভিত্তি হলো, দু'টি ভাল কাজের মধ্যে উত্তমটি পছন্দ করা এবং দু'টি খারাপ কাজের মধ্যে অপেক্ষাকৃত মন্দটি চিহ্নিত করা; দু'টি সুবিধার মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম সুবিধাটি বর্জন করে অধিকতর সুবিধাটি গ্রহণ করা এবং দু'টি ক্ষতিকর বিষয়ের মধ্যে অধিকতর ক্ষতিকর বিষয়টি বর্জন করে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর বিষয়টি গ্রহণ করা ।

তারা বলে, শারীআহ্ প্রদর্শিত এই পথের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন, সামান্য কিছু উপকারীতা সত্ত্বেও ইসলাম মদ ও জুয়াকে নিষিদ্ধ করার কারণ হলো সামান্য উপকারীতার তুলনায় বিরাট ক্ষতি গুরুত্বপূর্ণ। জিহাদের মাধ্যমে বিশ্বাসীদের জান ও মালের ক্ষয়-ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু এর মাধ্যমে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নৈকট্য লাভের মধ্য দিয়ে বান্দার কল্যান সাধিত হয় তাই জিহাদকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

তাদের ভাষায়, ইসলামের ইতিহাসে শাসক ও আলেমগণ ইসলামের অগ্রযাত্রায় এ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। একারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা:) কাবাকে ভেঙে ফেলে তা ইব্রাহীমী ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ থেকে বিরত থেকেছেন-যদিও এতে ধর্মীয় সুবিধা ছিল। কেননা কাবা পুনঃনির্মাণ করলে যতটা লাভ হবে ক্ষতি হবে তার চেয়ে বেশী। তিনি (সা:) তাঁর বিবি আয়েশা (রা.) কে বলেন,

**"যদি কাবা তোমাদের (যারা অতিসম্প্রতি জাহেলিয়াত ত্যাগ করে এসেছে) সম্প্রদায়ের অংশ না হতো তবে আমি তা ভেঁঙ্গে এর দুটো দরজা করে দিতাম।"** [তিরমিযী ও নাসা'ঈর সূত্রে বর্ণিত]

তারা এরূপ আরও অনেক উদাহরণ নিয়ে আসে-

এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তারা বলে যে নিঃসন্দেহে জাহেলী সরকারে অংশগ্রহণ করা অত্যন্ত ক্ষতিকর বিষয়। এ সরকারগুলো তাগুতের হুকুম বাস্তবায়ন করে এবং তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা) হুকুম থেকে বিচ্যুত হয় ও বিবাদে লিপ্ত হয়।

**"হুকুম (বিধান বা আইন) দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ্"**। [সূরা-ইউসুফ ঃ ৪০]

**"তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না"**। [সূরা কাহাফঃ ২৬]

এতদসত্ত্বেও তাদের বক্তব্য হচ্ছে, ক্ষমতার ভাগাভাগির কারণে ইসলাম, মুসলিম, ইসলামী দলগুলোর জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক ফায়দা রয়েছে যা তাগুত দূরীকরণে এবং সত্যের প্রতিষ্ঠায় বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঠিক চিত্রটি তুলে ধরতে তাদের কিছু উক্তি তুলে ধরা যাক। যখন তাদের চিন্তার পদ্ধতি ও মতামতগুলো খন্ডন হয়ে যাবে তখন আমরা সহজেই বুঝতে পারব যে শারীআহ্ পদ্ধতি থেকে তারা কতদূরে অবস্থান করছে। তাদের বক্তব্য নিম্নরূপঃ

-জাহেলী শাসনব্যবস্থায় কোন মুসলিমের অংশগ্রহণ তাকে একটি বড় দ্বন্দের দিকে ঠেলে দেয়। মুসলিমদের তাগুত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত। তাহলে কী করে সে তাগুত প্রতিষ্ঠাকারীদের সাথে থাকতে পারে? যেসব মুসলিম নিজেদের ঈমানদার বলে দাবী করে এবং পরবর্তীতে আইনের জন্য তাগুতের শরণাপন্ন হয় আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেন,

**"আপনি কি তাদেরকে প্রত্যক্ষ করেননি যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল হয়েছে, সে সমস্ত বিষয়ের উপর আমরা ঈমান এনেছি আর বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তারা শয়তানের শরণাপন্ন হয়, অথচ তাকে প্রত্যাখ্যানের জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।"** [সূরা নিসা ঃ ৬০]

-তাগুতের প্রতি আনুগত্য করা আইনগতভাবে আল্লাহ্'র আদেশের বিরুদ্ধে যায় এবং সেক্ষেত্রে আল্লাহ্'কে ইলাহ্ মানার বদলে তাদেরকে ইলাহ্ মানা বুঝায়। তিনি সুবহানাহু তা'আলা আহলে কিতাবদের সম্পর্কে বলেন,

**"তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে আল্লাহ্ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের ইবাদতের জন্য।"** [সূরা আত্-তাওবা: ৩১] রাসূল (সা:) আদি বিন হাতিম (রা.) এর নিকট এগুলোকে ইলাহ্ হিসেবে গ্রহণের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এমন অবস্থায় তাদেরকে মান্য করা যখন তারা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল হিসেবে গণ্য করে।

-আজকাল আমরা দেখতে পাই শাসকগণ সরল প্রকৃতির ও সাধারণ জনগণকে প্রতারিত করতে কিছু সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন মুসলিমকে কিছু পদে নিয়োগ দিয়ে তাদের কুশাসনকে শোভামন্ডিত করার চেষ্টা করে, যাতে তারা যুক্তি দাঁড় করাতে পারে যদি তারা ভ্রান্ত হতো তাহলে অমুক এবং অমুক কোনভাবেই তাদের সাথে ক্ষমতার ভাগাভাগিতে আসত না ।

-এবং তারপর অত্যন্ত জগণ্যভাবে এসব শাসকেরা মুসলিম মন্ত্রীদের দিয়ে অন্যায় ও নিষ্ঠুর আইনসমূহ পাস করিয়ে নেয় এবং কার্যসিদ্ধির পর তাদেরকে অপ্রয়োজনীয় বস্তুর মতই ছুড়ে ফেলে দেয়।

-ক্ষমতার ভাগাভাগি প্রতি আসক্তি হলো যালিম শাসকের নিদর্শন। আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআ'লা আমাদের এ ব্যাপারে সাবধান করে বলেছেন যে,

**"আর যালিমদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না। নতুবা জাহান্নামের আগুণ তোমাদের পাকড়াও করবে।"** [সূরা হুদ : ১১৩]

এছাড়াও ক্ষমতার ভাগাভাগি জাহেল শাসকদের শাসনকালকে প্রলম্বিত করে।

-আমাদের জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট, যারা এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে তারা এমন সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন,

**"এবং যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারাই কাফের"**। [সূরা মায়িদাহ্ : ৪৪], এবং;

**"এবং যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারাই যালেম"**। [সূরা মায়িদাহ্ : ৪৫]; এবং;

**"এবং যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারাই ফাসেক"**। [সূরা মায়িদাহ্ : ৪৭]

উল্লেখিত প্রতিটি বিষয়ের কোনটিই এ ধরনের আন্দোলনের নেতৃত্ব ও দাওয়াহ্ বহনকারীদের কাছে অপরিচিত বিষয় নয়। উল্লেখিত স্পষ্ট আয়াতগুলো হতে দিক নির্দেশনাও গোপন নয়।

এতদসত্ত্বেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে ক্ষমতার ভাগাভাগি ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন এবং মুসলিমদের জন্য সুফল বয়ে আনবে। এমনকি এর দ্বারা তাগুত অপসারিত হবে এবং সত্য বুলন্দিত হবে। ক্ষমতার ভাগাভাগি থেকে ইসলামী আন্দোলনগুলো তথাকথিত কী কী সুবিধা লাভ করতে পারে তার সারমর্ম নিম্নরূপঃ

১. দরজার ওপাশে কী হচ্ছে এ ব্যাপারে ধারণালাভের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রুখে দেয়া ও ব্যর্থ করা।
২. লোকদের এটা বুঝতে দেয়া দলটি শাসন করতে সক্ষম এবং এটি দরবেশদের একটি সজ্ঞ নয়।
৩. ইসলামের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে নিয়ে আসা এই অর্থে যে, এটি মানুষের ব্যক্তিগত ও সার্বজনীন বিষয়সমূহ সমাধান দিতে সক্ষম।
৪. শাসনব্যবস্থার প্রশাসনিক কাজের জন্য দলটির অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করা।
৫. বর্তমান শাসনব্যবস্থার সাথে পরিচিত হয়ে এর ক্ষতি থেকে আন্দোলনকে রক্ষা করা।
৬. বিশেষ ইসলামী ব্যক্তি ও কর্মীদের সরকারী বৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করে তোলা যায়।
৭. একটি ইসলামী দলের ভেতর থেকে এমন কিছু ব্যক্তিকে বের করে নিয়ে আসা যারা লোকদের মধ্যে উচ্চপদে আসীন হবে। তারাই দল এবং এর সদস্যদের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান করবে।
৮. ইসলামী কেন্দ্রসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি করে কুফরী কেন্দ্রসমূহের বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনা করা।
৯. রাজনীতিতে ইসলামী ব্যক্তিত্বদের গড়ে তোলা এবং শেখানো কীভাবে এ ব্যবস্থার দোষণীয় বিষয়গুলো বর্জন করা যায়।
১০. শাসনব্যবস্থায় সুনামের মাধ্যমে দলের সুনাম বৃদ্ধি করা।
১১. যদি দলটি ক্ষমতার অংশীদারিত্ব না নেয়, তাহলে ইসলামের শত্রু কেউ অংশগ্রহণ করবে এবং তারা ইসলামী আন্দোলনকে আক্রমণ করার জন্য এবং ইসলাম ও মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবে।

আমরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছি। যদিও আমাদের বক্তব্য কেবলমাত্র বক্তব্য দেয়ার জন্য নয়, বরং যুক্তিখন্ডনের জন্য। পরিষ্কারভাবে এর আসল প্রকৃতি তুলে ধরা এবং আল্লাহ্'র দ্বীন থেকে তারা কতটা বিচ্যুত হওয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছে তা বুঝার জন্য। তারা যখন কোনো ফাতওয়া বা রায় দেয় তখন তা দুনিয়া ও আখেরাতের অধিপতি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ক্রোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলার) হক ও নির্দেশের প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা সৃষ্টির বদলে মুসলিমদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আর সেজন্যই তাদের দৃষ্টিভঙ্গী অকাট্য দলিলসম্পন্ন শারী'আহ্'র সাথে কী পরিমাণ সাংঘর্ষিক সেটা মুসলিমদের বুঝানো প্রয়োজন এবং ইসলামের সঠিক ইসতিম্বাতের (মাসআ'লা আহরণ)পদ্ধতি গ্রহণ থেকে তারা কতটা বিচ্যুত তাও আমাদের জানা প্রয়োজন; এবং দেখানো প্রয়োজন তাদের নতুন আবিষ্কৃত পদ্ধতি-যা মুসলিমদের অধঃপতনের সময়কার একটি স্মারক যখন তারা পশ্চিমা চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল -যাতে করে আমরা তাদের চিন্তা বিশদভাবে বুঝতে পারি এবং খন্ডন করতে পারি ও তাদের চিন্তার পদ্ধতিকে উপলব্ধি করতে পারি এবং তা মিথ্যা প্রমাণ করতে পারি।

একটি সুস্পষ্ট ও অকাট্য শারী'আহ্গত হুকুম হচ্ছে সুদ খাওয়া যাবে না- যে ব্যাপারে কোনরূপ ইজতিহাদ গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এটাকে নিষিদ্ধ করেছেন যখন তিনি বলেন,

**"আল্লাহ্ ব্যবসাকে করেছেন হালাল আর সুদকে করেছেন হারাম"**। [সূরা বাক্বারা : ২৭৫] ; এগুলো হল অকাট্য শারী'ঈ দৃষ্টান্ত যে ব্যাপারে কঠিনভাবে বলা হয়েছে, যেমন যখন তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

**"আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন"**। [ সূরা বাক্বারা:২৭৬] ; যারা সুদের সাথে সম্পর্ক রাখে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন এবং একে যুদ্ধের ঘোষণার শামীল হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেছেন,

**"হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্'কে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া রয়েছে তা পরিত্যাগ কর যদি তোমরা মু'মিন হও। অতঃপর যদি তোমরা তা না কর তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও...."** [সূরা বাক্বারা : ২৭৮-২৭৯]; যারা সুদ খায় তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**"যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দন্ডায়মান হবে ঐ ব্যক্তির ন্যয়, যাকে শয়তান আছর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়।"** [সূরা বাক্বারাঃ ২৭৫]; রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এটা ভয়াবহ অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং একে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র সাথে শিরক হিসেবে দেখিয়েছেনঃ

**"সাত ধরনের মুবিকাত (ভয়ঙ্কর গুণাহ্'র কাজ) থেকে বিরত থাক। তারা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, 'সেগুলো কী ইয়া রাসূলুল্লাহ্?' তিনি (সাঃ) বললেন, 'আল্লাহ্'র সাথে শিরক করা, যাদু, বিনা কারণে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, এতিমের সম্পত্তি ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসা, মু'মিনা-সৎ-সতী সাধ্বী নারীর উপর অপবাদ আরোপ করা'।"**

এতদসত্ত্বে আমরা দেখি যে তারা তাদের অনুসৃত পদ্ধতি অনুসারে বলে, সুদ অনুমোদিত! তাহলে এই সুস্পষ্ট ও অকাট্য নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে কী হল? এই সাবধান বাণী ও ভীতি প্রদর্শনের কী হবে? এ পদ্ধতির মাধ্যমে তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত হুকুম পরিবর্তন ও সংশোধন করছে, শারী'আহ্'র গায়ে কালিমালেপন করছে, দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে অবহেলা প্রদর্শন করাকে স্বাভাবিক করে ফেলছে এবং এটাকে মুসলিমদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে উপস্থাপন করছে।

একইভাবে আল্লাহ্ যা দিয়ে নাযিল করেছেন তা দিয়ে শাসন করা হল ফরয। তাদের সুপারিশক্রমেই বলা যায় যে, আইন তৈরির বিষয়টি কেবলমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র জন্য রাখাটাই বাধ্যতামূলক। এতদসত্ত্বেও তাদের তৈরি করা পদ্ধতি অনুসারে, তারা মুসলিমদের কুফর শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অনুমোদন দিচ্ছে। নিজেদের ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও চিন্তাবিদ হিসেবে দাবি করলেও তারা সত্য থেকে কতটুকু বিচ্যুত তা আমরা দেখিয়েছি যদিও নেতাদের তাদের অনুসারীদের নিকট মিথ্যা বলা কোনভাবেই কাম্য নয়।

তারা নিজেরাই বলে,

-এটা সন্দেহাতীত যে জাহেলী শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ আমাদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। সরকারগুলো তাগুতের হুকুম বাস্তবায়ন করে এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র হুকুম থেকে বিচ্যুত হয় ও তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে।

-জাহেলী শাসনব্যবস্থায় মুসলিমদের অংশগ্রহণ তাদের একটি বড় দ্বন্দের দিকে ঠেলে দেয়। মুসলিমদের তাগুত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত। তাহলে কী করে একজন তাগুত প্রতিষ্ঠাকারীদের সাথে থাকতে পারে?

-তাগুতের প্রতি আনুগত্য করা আইনগতভাবে আল্লাহ্'র আদেশের বিরুদ্ধে যায় এবং সেক্ষেত্রে আল্লাহ্'কে ইলাহ্ মানার বদলে তাদেরকে ইলাহ্ মানা বুঝায়।

-আজকাল আমরা দেখতে পাই শাসকগণ সহজ সরল প্রকৃতির মানুষ ও সাধারণ জনগণকে প্রতারিত করার জন্য কিছু মর্যাদাবান মুসলিমকে অলংকারিক কিছু পদে নিয়োগ দেন যারা ঐ সব শাসকদের দু:শাসনকে বৈধতা দেয়। তখন শাসকেরা বলে যে, যদি তারা মিথ্যের মধ্যে থাকতেন তাহলে অমুক এবং অমুক কোনভাবেই তাদের সাথে ক্ষমতার ভাগাভাগিতে আসত না।

-পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় যখন সেসব শাসকরা মুসলিম মন্ত্রীদের দিয়ে অন্যায় ও নিষ্ঠুর আইনসমূহ পাস করিয়ে নেয় এবং কার্যসিদ্ধির পর সেসব ব্যক্তিদের তারা অপ্রয়োজনীয় বস্তুর মতই ছুড়ে ফেলে দেয়।

-ক্ষমতার ভাগাভাগি হল অবিচারকারী শাসকদের প্রতি মন্দ প্রবণতার উজ্জল দৃষ্টান্ত।

- এছাড়াও ক্ষমতার ভাগাভাগি জাহেল শাসকদের কার্যকালকে প্রলম্বিত করে।

আমাদের জন্য এটুকু জানা যথেষ্ট যে, যে ব্যক্তি এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে তারা এমন সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**"...তারাই কাফের"**। [সূরা মায়িদাহ্ : ৪৪]

**"... তারাই যালেম"**। [সূরা মায়িদাহ্ : ৪৫]

**"...তারাই ফাসেক"**। [সূরা মায়িদাহ্ : ৪৭]

এতদসত্ত্বেও তারা এহেন মতামত বা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। আল্লাহ্'র দ্বীনের বিরুদ্ধে কীভাবে তারা এরকম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে! আরও ঘৃণ্য বিষয় হচ্ছে, তারা কেবল নিজেরাই ইসলামের হুকুমসমূহকে অমান্য করে না বরং অন্যদেরকেও অমান্য করতে উৎসাহী করে তোলে। এটা অবশ্যই একটি ভয়াবহ গুণাহ্।

শারী'আহ্গত হুকুমকে তারা কীভাবে অমান্য করেছে সেটা উপস্থাপনের পর আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই কুফর শাসব্যবস্থায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা কী অর্জন করবে? আমরা ভেবেছিলাম এই দাওয়াহ্'র বিরুদ্ধে তাদের পূর্বসর্তকতা উপস্থাপনের পর তারা শারী'আহ্ উপেক্ষিত এসব ভ্রান্ত সুবিধাবাদী চিন্তাসমূহ উল্লেখ করবে কিন্তু এটা বুঝতে পারার মতো তারা যথেষ্ট চতুর ছিল যে, এসব পরিত্যাজ্য যুক্তি এবং অথর্ব চিন্তা দ্বারা নিঃসন্দেহে শারী'আহ্ লজ্জিত হবে এবং আল্লাহ্'র শত্রুরা সুবিধা পাবে। আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখার সুযোগ দানকারী তাদের এসব 'অভিনব' চিন্তা- না মুসলিমদেরকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে লাভবান করেছে, না তাদেরকে সত্যের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে, না বিজয়কে নিকটবর্তী করেছে এবং না বাস্তবতাকে সামান্যতম পরিবর্তন করেছে। বরং প্রাপ্তিটা হয়েছে ঠিক তার উল্টো। যার সত্যতা বাস্তবতা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান।

জাহেল শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের কী সুবিধা হয়েছে এ ব্যাপারে তাদের ১১ টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। আল্লাহ্'র কসম! একবার এগুলোর দিকে তাকালেই বুঝা যায় যে এর বিশাল গুণাহ্'র তুলনায় এর প্রাপ্তি কত সামান্য। এর কয়েকটিকে পরীক্ষা করে দেখা যাক:

- শাসনব্যবস্থার প্রশাসনিক কাজের জন্য দলটির অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করা।
- বিশেষ ইসলামী ব্যক্তিদের সরকারী বৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করে তোলা।
- রাজনীতিতে ইসলামী ব্যক্তিত্বদের গড়ে তোলা এবং তাদের শেখানো কীভাবে এ ব্যবস্থার দোষণীয় বিষয়গুলো বর্জন করা যায়।

এ তিনটি অনুচ্ছেদ একটি বিষয়ের সাথে বিজড়িত। এ তিনটিকে একটি অনুচ্ছেদে রাখলেই বরং বেশী উপযোগী-যদি না কেউ এর স্বপক্ষে অনেক বেশী যুক্তি তুলে ধরতে চায়। এটাও জানা দরকার যে, এ বিষয়ে কে কতটুকু কথা বলতে পারল তা নয়, বরং সত্যিকারের যথার্থতাই এখানে মুখ্য। এ অনুচ্ছেদগুলো কী ধারনাভিত্তিক সুবিধার বিনিময়ে মুসলিমদের আল্লাহ্'র হুকুম অমান্য করতে বৈধতা প্রদান করে? কোনো আন্দোলনের কর্মীদের প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ করে তোলার জন্য আল্লাহ্'র ক্রোধের এই পথ ছাড়া কি অন্য কোনো পথ নেই? শারী'আহ্ পদ্ধতি অনুসরণ করলে কী এ প্রশিক্ষণে ঘাটতি হতো? যে ইসলামী আন্দোলন রাসূলুল্লাহ্ (সা:) এর পদ্ধতিকে অনুসরন করে বৈধভাবে রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে তারাও তাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করতে পারে, শাসকদের বাস্তবতার সাথে পরিচিতি হতে পারে, কুফর রাষ্ট্রের সাথে এই শাসকদের সম্পর্কের গভীরতা বুঝতে পারে এবং তাদের নানা কৌশল ও শঠতা ধরতে পারে । একজন দাওয়াহ্ বহনকারী কি মদখোরকে তার মদ খাওয়া পরিত্যাগ করার ব্যাপারে আহ্বান করতে অক্ষম? নাকি এর জন্য দাওয়াহ্ বহনকারীকে পানশালায় প্রবেশ করতে হবে, মদ পানকারীর সাথে তাকেও পান করতে হবে এবং এরপর তা ছেড়ে দিবে যাতে করে এ পদ্ধতির মাধ্যমে মদ পানকারী মনে করে যে, সেও চাইলে মদ পান ছাড়তে পারে। আল্লাহ্'র কসম! যারা এমন পদ্ধতিতে কাজ করে তাদের মন কতটাই না দূর্বল! তারা কী করে নিজেদের জন্য আল্লাহ্'র আইন পরিবর্তন করাকে অনুমোদন করে!

(জাহেল শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুবিধা হিসেবে) অতঃপর তাদের উল্লেখিত আরও তিনটি অনুচ্ছেদ-

- বর্তমান শাসনব্যবস্থার সাথে পরিচিত হয়ে এর ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া।
- দরজার ওপাশে কী হচ্ছে এ ব্যাপারে ধারণালাভের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রুখে দেয়া এবং একে ব্যর্থ করে দেয়া।
- যদি দলটি ক্ষমতার অংশীদারিত্ব না নেয়, তাহলে ইসলামের শত্রু কেউ অংশগ্রহণ করবে এবং তারা ইসলামী আন্দোলনকে আক্রমণ করার জন্য এবং ইসলাম ও মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করতে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবে।

এখানে আমরা তিনটি অনুচ্ছেদ দেখতে পাই যা একটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। তা হল বর্তমান শাসনব্যবস্থার কুফল থেকে নিজেকে হেফাযত করা এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করা। এ বিষয়ে আমরা তাদের সাথে একমত পোষণ না করেও তাদের মূলনীতি অনুসারে বিবেচনা করে ও তাদের উপস্থাপিত বাস্তবতার দৃষ্টিতেই বলতে পারি - তারা কী আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে শাসন না করে উম্মাহ্'কে এবং নিজেদেরকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে? তাদের নিজেদের ভাষায়, শাসকগণ মুসলিম মন্ত্রীদের নিয়োগ দেন যাতে করে তাদের শাসনব্যবস্থা প্রলম্বিত হয়, তাদের পরিকল্পনাগুলোকে পাশ করিয়ে নেয়া যায় এবং জনগণের সামনে তাদের ভাবমূর্তিকে উন্নত করা যায়। আর শাসকদের চাওয়া

পাওয়া বাস্তবায়িত হওয়ার পর খেজুরের বীচির মতই তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়। তাহলে কীভাবে ক্ষতি ও ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাওয়া গেল? মুসলিমগণ ঐ শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করায় সে শাসনব্যবস্থার ভাবমূর্তি উন্নত হলেও অংশগ্রহণকারীদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় এবং জনগণ ঐ শাসনব্যবস্থা ও এতে যারা অংশগ্রহণ করে তাদের একই দৃষ্টিতে বিচার করে।

অতঃপর নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদ দুটিকেও একটি অনুচ্ছেদের আওতায় উপস্থাপন করা যায়:

-লোকদের এটা বুঝতে দেয়া যে দলটি শাসন করতে সক্ষম।

- ইসলামের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে নিয়ে আসা এই অর্থে যে, এটি মানুষের ব্যক্তিগত ও সার্বিক বিষয়সমূহের সমাধান দিতে সক্ষম।

দলটি এ ধরনের ভাবমূর্তি প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে না। বরং এটা একটি খারাপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করবে যা অনুসরণীয় নয়। বাস্তবতা হল এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। যদি এসব দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধাচরণকারী খাঁটি ও সচেতন ইসলামী আন্দোলন এবং আন্তরিকতাসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদগণ না থাকত তাহলে যারা এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে বিদ্যমান শাসনের ওকালতি করছে তাদের কারণে ইসলাম ইতিমধ্যে মানুষের অন্তর থেকে খসে পড়তো। যেসব দল ও এর চিন্তাবিদগণ এই শাসকদের আনুকূল্যে আয়েশী জীবনযাপন করে, তাদের মিথ্যা নেতৃত্বের জাঁকজমক পরিবেষ্টিত থাকে, তাদের সাথে অহংকার ঔদ্ধত্যের ঘ্রাণ নেয় তারা আর যেসব আন্দোলন বা ইসলামী চিন্তাবিদগণ কেবলমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ওয়াস্তে সত্যের দিকে আহ্বান করে ও তা ধারণ করে এবং এ বিষয়ে কারও নিন্দার পরোয়া করে না তাদের মধ্যে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও তাঁর বান্দাদের দৃষ্টিতে রয়েছে বিস্তর ফারাক। তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলেও তা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র বাণীই স্মরণ করিয়ে দেয়,

**"অতএব আপনি সবর করুন (হে মুহাম্মদ) যেমন উচ্চ সাহসী পয়গম্বরগণ সবর করেছেন।"** [সূরা আল আহক্বাফ: ৩৫]

**"আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন (হে মুহাম্মদ)। আপনি আমার দৃষ্টির সামনে আছেন।"** [সূরা আত তূর:৪৮]

**"অতএব আপনি সবর করুন (হে মুহাম্মদ)। নিশ্চয় আল্লাহ্'র ওয়াদা সত্য।"** [সূরা মুমিনুন: ৫৫]

এ দুইয়ের দৃষ্টান্ত কি একই রকম?

তাদের পরবর্তী চারটি অনুচ্ছেদকেও একটি অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা যায়:

- ইসলামী একটি দলের ভেতর থেকে এমন কিছু ব্যক্তিকে বের করে নিয়ে আসা যারা লোকদের মধ্যে উচ্চপদে আসীন হবে। তারাই দল এবং এর সদস্যদের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান করবে।
- ইসলামী কেন্দ্রসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি করে কুফরী কেন্দ্রসমূহের বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনা করা।
- রাজনীতিতে ইসলামী ব্যক্তিত্বদের গড়ে তোলা এবং শেখানো কীভাবে এ ব্যবস্থার দোষণীয় বিষয়গুলো বর্জন করা যায়।
- শাসনকর্তৃত্বের সুনামের মাধ্যমে দলের সুনাম বৃদ্ধি করা।

এ বক্তব্যসমূহ এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী পোষণকারীদের চিন্তার ক্ষুদ্রতাকেই প্রমাণ করে। এ ধরনের ফলাফল কী আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না এবং যালিমুন বা অবিচারী, ফাসিকুন বা মিথ্যাবাদী এবং অত্যাচারীদের দোসর হবার ঝুঁকি বাড়ায় না? কোনো আন্দোলন কি এ অবস্থায় পতিত না হয়ে কাজগুলো করতে পারে না? আমরা কখনই মনে করিনা যে কোনো দল আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র আনুগত্য না করে এবং জাহেলী শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে এসব লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে, বরং ঐ দলের জন্য ফলাফল এর উল্টোই হবে এবং দাওয়াহ্ ও ইসলামের উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে।

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী পোষণকারীরা যদি তাদের এসব কাজের যৌক্তিকতা দেখাতে **১১**টি অনুচ্ছেদ বা কারণের আবতারণা করে থাকে তবে তাদের বাতিল চিন্তার ধারা অনুসরণ করে আমরাও এরূপ কাজের ফলে সৃষ্ট অসংখ্য ঝুঁকি ও প্রতিবন্ধকতা দেখাতে পারি। যেমন:

-এ পদ্ধতির অনুসরণকারী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ও সদস্যগণ মুনাফিকীর শিক্ষা লাভ করে। যেসব শাসকরা তাদের জাহেলী শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে উদ্ধুদ্ধ করে তাদের সামনে যখন তারা যায় তখন তারা এমনকিছুই বলে যা সেসব শাসকদের সন্তুষ্ট করে। যখন তারা জনগণের সামনে যায় তখন অন্যকিছু বলে এবং তাদের বুঝানোর চেষ্টা করে যে, তারা শাসনব্যবস্থা ও শাসকদের কাছে যাচ্ছে যাতে করে শাসনক্ষমতা কেড়ে নিতে পারে।

-দলটির আচরণ সামগ্রিক পরিবর্তনমুখী হওয়ার বদলে হালকা, আত্মতুষ্টিমূলক ও নমনীয় হয়ে যায়।

-শাসনব্যবস্থার অধিকারীরা আন্দোলনকারীদের সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা লাভের সুযোগ পায় যাতে করে তারা এবং তাদের গোপন বিষয়সমূহ জানতে পারে। দলের সদস্যদের মধ্যকার পার্থক্যকে শাসকরা খুঁজে বের করতে পারে এবং এ বিভেদকে আরও শক্তিশালী এবং অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করে। এভাবে দলটিকে সহজেই নিয়ন্ত্রন করতে পারে এবং যখন প্রয়োজন তখন ভাঁঙ্গন সৃষ্টি করতে পারে।

- এই সমস্ত দলগুলোর দাওয়াহ্ শাসকদের শাসনের (সমালোচনার) মধ্যে সীমাবদ্ধ যা শাসকদের জন্য কোনো বিপদজ্জনক বিষয় নয় এবং তারা (ইসলামের) মূখ্য বিষয়ে নীরব থাকে যা দাওয়াহ্ ও ইসলাম সম্পর্কে ভুল দৃষ্টিভঙ্গী প্রদান করে।

-যখন একটি শাসনব্যবস্থা কোন ইসলামী আন্দোলনকে তার ভেতরে কাজ করবার সুযোগ দেয় তখন সে দলটিকে নিজের কাজ করার জন্য শাসনকর্তৃত্বের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরির অনুমতি নিতে হয় এবং এভাবে দলটি প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে আটকা পড়ে যায়, কারণ তখন একটি ভীতি কাজ করে যে, শাসনকর্তৃত্ব হয়ত এসব প্রতিষ্ঠানকে তাদের নিয়ন্ত্রন নিয়ে নিবে এবং বাজেয়াপ্ত করবে। সে কারণে তারা এমন কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা যা সরকারকে নাখোশ করে এবং ফলে তা অবসানের সিদ্ধান্তও নিতে পারেনা।

-এসব তথাকথিত ইসলামী আন্দোলনগুলো জাহেলী শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা:) এর পদ্ধতির অনুসারী সঠিক ইসলামী আন্দোলনগুলোর উপর মৌলবাদী বা ধর্মান্ধ আখ্যা দিয়ে দমন-নীপিড়ন চালানোর সুযোগ করে দেয়। অন্যদিকে যারা শাসন কাজে সহযোগীতা করে তারা আলোকিত ও উদারমনা হিসেবে পরিগণিত হয়। এটা সত্যিই অদ্ভুত একটি ব্যাপার। এই উদার আচরণকারীরা যুক্তি উপস্থাপন করে যে, পদ্ধতিগত কারণেই তারা অনেক বেশী সহনশীল যেজন্য শাসকরা তাদের প্রতি সহযোগীতার হাত প্রসারিত করতে পারে এবং তারা বাদে অন্যরা ধর্মান্ধ।

-এ ধরনের ইসলামী দলের ধারণা বাস্তবতার সাথে মিল রেখে ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, অমুসলিম জিম্মিদের কাছ থেকে জিযিয়া না নেওয়া, জিম্মি বলে তাদের অসন্তোষকে উস্কে না দেয়া। এছাড়াও তাদের দৃষ্টিভঙ্গী হল গণতন্ত্র তাদেরই একটি সম্পদ যা তাদের কাছেই আবার ফিরে এসেছে অথবা সুদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কোনো কিছু দিয়ে পরিচালিত যে শাসনব্যবস্থা তাতে অংশগ্রহণ করাও এর আরেকটি উদাহরণ।

-এটা (বিদ্যমান) শাসনকার্যকালকে আরো দীর্ঘ করে।

-(বিদ্যমান) শাসনব্যবস্থার একটি সুন্দর ভাবমূর্তি তুলে ধরে।

-লোকদের মন থেকে তখনই ইসলাম সম্পর্কিত বিষয়াদি হারিয়ে যেতে থাকে যখন তারা দেখে যে, এ শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলাম তাদের কিছুই দিতে পারছে না, বিশেষ করে তারা যখন আল মান্না ওয়া সালওয়া বা সবধরনের ঐশ্বর্য্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেয়। এটা প্রমাণ করে যে তারা সমস্যাসমূহের সমাধান সঠিক উপায়ে দিতে অক্ষম। ফলে এধরনের আন্দোলন অনুসরণীয় দৃষ্টান্তের বদলে নোংরা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

-আন্দোলনের কর্মীগণের নৈতিক অধঃপতন ঘটে কারণ তাদের নিকট শাসকের অবৈধ কর্মকান্ড এবং তার যথার্থতার সমালোচনার বদলে দলের কর্মকান্ডের যুক্তি-যথার্থতা তুলে ধরে দাওয়াহ্ বহন করাটাই মূখ্য বিষয় হয়ে পড়ে।

-শাসকরা যখন অন্য দলের দাওয়াহ্ বহনকারীদের উপর দমন-নিপীড়ন চালায় বা এর সদস্যদের গ্রেফতার করে তখন তারা পুরোপুরি নিশ্চুপ থাকে, এমনকি শাসকদের খুশি করার জন্য বা তাদের অনুরোধে এরূপ আন্দোলন অন্য (ইসলামী) আন্দোলনের কর্মীদের উপর হামলা চালায় যেমনি আজকাল মিশরে ঘটছে।

-এধরনের আচরণ পুরো দলটিকে শারী'আহ্ গ্রহণ করার বদলে সুবিধাবাদী করে তোলে। শারী'আহ্'র সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক হলেও যদি কোন কাজ সুবিধা বয়ে নিয়ে আসে তবে তাই সম্পাদিত হবে। মুসলিমদের কাছে তখন লাভের বিষয়টি শারী'আহ্'র চেয়ে প্রিয় হয়ে যায়। সুতরাং এরকম আরও অনেক কারণ রয়েছে যা দ্বীন ও দাওয়াহ্'র ক্ষতি করছে।

আমরা এসব কিছুই বাস্তবতার নিরিখে তুলে ধরেছি, শারী'আহ্'র ভিত্তিতে নয়-যাতে করে আমরা দেখাতে পারি যে তাদের অবলম্বিত পথ অনুযায়ীও যদি আমরা তাদের চিন্তার পদ্ধতিকে বিবেচনা করে দেখি তবে তা থেকে দাওয়াহ্ ও ইসলামের জন্য কুফল ছাড়া আর কিছু দৃষ্ট হয়না। এটি একটি নিষ্ফল চিন্তা যে ব্যাপারে শারী'আহ্'র কোন অনুমোদন নেই।

শারী'আহ্ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এটা করতে আমাদের বাধা দেয় যে আমরা (কেবল) বাস্তবতার বিচারে কোন একটি চিন্তার ভ্রান্তি তুলে ধরবো বা বুদ্ধিবৃত্তির বিচারে শারী'আহ্'র কোন বিষয়কে পরিত্যাগ করবো। আমরা তাদের পদ্ধতি অনুসরণ করে আলোচনার সূত্রপাত করেছি শুধু এজন্য যাতে করে তাদের মুখের কথা দিয়েই তাদের ভুল দেখিয়ে দেয়া যায় ও তাদের নিজস্ব মানদন্ড দিয়েই তাদের কথার অসারতা প্রমাণ করা যায়। তবে আমরাসহ সব সচেতন ও আন্তরিক মুসলিম এটা জানে যে, কোন কাজ বা কথা গ্রহণ বা বর্জনের মানদন্ড হল শারী'আহ্। যেহেতু এটাই মূল ব্যাপার, অতএব যেসব শারী'আহ্গত দলিল তারা উল্লেখ করেছে যা তারা নিজেরা জানে এবং অন্যরাও জানে - সেগুলোই তাদের মতামত ও উপলব্ধিকে খন্ডানোর জন্য যথেষ্ট যদিওবা তারা আরও উদাহরণ নিয়ে আসতে পারে। সমস্যাটি অনেক উদাহরণ দেখানোর বিষয় নয়, বরং চিন্তার পদ্ধতি সম্পর্কিত।

(শারী'আহ্'র ঐ প্রমাণগুলো) তারা জানে বলে (দাবী করলেও) তাদের সেকথা আমরা মেনে নেব না। তাদেরকে তা মনে করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই-তাও নয়। কেননা, এসব শারী'আহ্ দলিলের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তারা যেসব কারণ উল্লেখ করেছে সেগুলোর দোহাই দিয়ে এ দলিলগুলোকে তারা গ্রহণ করেনি। এটা অনুমোদিত নয়; পাশাপাশি এটি দ্বীনের ব্যাপারে উদ্ধ্যত্বপূর্ণ আচরণ এবং সুস্পষ্ট ও সঠিক হুকুমের বিষয়ে চরম অবহেলা। আর তাদের চিন্তার পিছনে কিছু ইসলামী চিন্তাবিদের বক্তব্য-যা কিনা এমনিতেও এই বাস্তবতার উপর প্রযোজ্য নয় - তা দলিল হিসেবে উপস্থাপন করার বিষয়ে আমরা বলবো, কোন মানুষের বক্তব্য শারী'আহ্'র দলিল হতে পারে না। যেটা একমাত্র বিবেচ্য তা হলো দলিল এবং ইসতিদ'লাল বা লব্ধ বিষয়ের যথার্থতা। যদি তারা বলে অমুক ও অমুক ব্যক্তি বলেন, তখন আমরা বলি এ ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা:) যা বলেন তাই চূড়ান্ত এবং মুহকাম (সুস্পষ্ট ও অরহিত)। কোন একজন ব্যক্তির কথায় আল্লাহ্ এবং তার রাসূল (সা:) এর বাণী কি রহিত হয়ে যাবে? এ পদ্ধতির পক্ষালম্বনকারীদের মাথায় লাভের চিন্তা এতটাই প্রাধান্য বিস্তার করে যে তাদের দাওয়াহ্'র ব্যবসায়ী বলাই সঙ্গত। অবশ্য ব্যবসায়ীরা সর্বদা লাভের আশায়ই ব্যবসা করে থাকে, লোকসানের জন্য নয়।

তাদের চিন্তার দূষণ আরো যেভাবে বুঝা যায় তা হলো তারা নিয়মবহির্ভূত ক্বিয়াসের উপর ভরসা করে যা সুবিধাকে প্রাধান্য দেয়ার ভিত্তিতে যুক্তি দিয়ে শারী'আহ্'র বিধানকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে লব্ধ। এটা তাদের নুতন ইসতিম্বাতের দিকে ধাবিত করে-যে ব্যাপারে ইসলামী উম্মাহ্ ও চিন্তাবিদগণ ওয়াকিফহাল ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা:) প্রদর্শিত এবং উম্মাহ্'র সব উলামাগণ (সালাফ আস সালীহ বা নেককার পূর্বসূরী) কর্তৃক অনুসৃত এবং তাদেরকে যারা ইহসান বা সৎ কাজের ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন, তাদের গৃহীত সঠিক ইসতিম্বাদের পদ্ধতিকে তারা পরিত্যাগ করেছে। তাদের কোনো আলোচনার মধ্যে এ ধরনের সুশৃঙ্খল ও যথার্থ শারী'আহ্গত পদ্ধতির উল্লেখ নেই। তারা পশ্চিমা পদ্ধতি অর্থাৎ বুদ্ধিজাত সাদৃশ্যতা এবং লাভকে মানদন্ড হিসেবে ব্যবহার করে। নিম্নের হাদীসটি যথার্থভাবে তাদের জন্যই প্রযোজ্য:

**"তোমাদের মধ্যে যারা দীর্ঘজীবী হবে তারা অনেক মতপার্থক্য লক্ষ্য করবে। নতুন জিনিসের ব্যাপারে সাবধান হও, প্রতিটি নতুন বিষয়ই বিদায়াত (নবপ্রচলন) এবং প্রত্যেক বিদায়াতই জাহান্নামের আগুনের দিকে যাবে।"** [তিরমিযী ও আবু দাউদ]

তাদের ভাষ্য অনুসারে, ইসলাম মদ ও জুয়াকে নিষিদ্ধ করেছে যদিও মানুষ এগুলো থেকে কিছু উপকারিতা পেয়ে থাকে। সে কারণে বড় উপকারিতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে মদ ও জুয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিশ্বাসীদের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও শারী'আহ্ জিহাদকে বাধ্যতামূলক করেছে। এর কারণ হলো জিহাদ মানুষের রবের নিকট ও মানবজাতির জন্য মঙ্গলজনক।

ধর্মীয় গুরুত্ব থাকার পরও রাসূলুল্লাহ্ (সা:) কাবা'কে ধ্বংস করে ইব্রাহীম (আঃ) এর ভিত্তির উপর তা পূনঃনির্মাণ করার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেছিলেন। কারণ কাবা'র কাঠামোগত সংস্কার করলে উপকারের চেয়ে ক্ষতি হতো বেশী।

এর উপর ভিত্তি করে তারা বলে যে, জাহেলী শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করা সত্যিই বড় ক্ষতির কারণ। তবে আন্দোলনটি কিছু পরিস্থিতিতে মনে করতে পারে যে, ক্ষমতার অংশীদারিত্ব কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলাম, মুসলিম ও ইসলামী আন্দোলনকে লাভবান করবে। এর মাধ্যমে তাগুত দূরীভূত হবে এবং সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

তারা তাদের চিন্তাকে আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করে যা থেকে উপলদ্ধি করা যায় যে এ চিন্তাকে তারা তাদের মর্মমূলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

শারী'আহ্'র বাণীকে এরকম পন্থায় উপলদ্ধি করে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হুকুমসমূহ বের করা খুবই বেদনাদায়ক। পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসনের এই যুগে লাভ-লোকসানের সাথে তুলনা করে লব্দ এসব চিন্তা বর্তমান যুগে আমাদের বেদনাকে আরও বহুমাত্রায় বৃদ্ধি করেছে। পূর্বে ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সুশৃংখল নীতিমালাকে অনুসরণ করতেন, যেখানে মানুষের বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ ছিলনা বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত নিয়মকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হতো, যা আমরা খুব দ্রুতই ব্যাখ্যা করব ইনশা'আল্লাহ্। অপরদিকে, আমরা দেখি কিছু মুসলিম নতুন আবিষ্কৃত এই পদ্ধতির দ্বারা আইন তৈরির একটি দরজাকে উন্মোচন করে এবং এতে প্রবেশ করে। কোনো কাজের লাভ বা ক্ষতি বের করার ক্ষেত্রে তারা তাদের খেয়ালখুশী বা প্রবৃত্তির বশবর্তী হয় এবং এ পদ্ধতিকে গ্রহণ করে। বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যখন একটি উপকার, সংশ্লিষ্ট ক্ষতিকে ছাড়িয়ে যায় তখন কাজটি অনুমোদিত। আবার যখন ক্ষতি, সংশ্লিষ্ট উপকারকে অতিক্রম করে তখন কাজটি পরিত্যাজ্য। এ নতুন আবিষ্কৃত পদ্ধতি অনুসারে মানুষ তার খেয়াল ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে আইনপ্রণেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

উল্লেখিত পদ্ধতিতে কোনো কর্মের হুকুম বের করতে তারা শারী'আহ্'র বাণীকে উপরে উল্লেখিত পদ্ধতিতে খেয়াল-খুশিমতো ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে। এটাই পশ্চিমাদের চিন্তা পদ্ধতি। পশ্চিমারা এ ধরনের চিন্তার উপর নির্ভর করে থাকে।

যাইহোক এ পদ্ধতি মুসলিমদেরকে লাভ-ক্ষতির উপাসক বানায়, আল্লাহ্'র আদেশের নয়। এটা এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যেখানে লাভ অকাট্য শারী'আহ্'র হুকুমের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায় এবং লাভ-ক্ষতির মাপকাঠিকে প্রাপ্ত হুকুমসমূহ দ্বারা শারী'আহ্'র হুকুমসমূহ বাতিল হয়ে যায়।

শারী'আহ্'র হুকুমসমূহের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় সুসংজ্ঞায়িত মূলনীতির মাধ্যমে। যে মুসলিম এটাকে সঠিকভাবে অনুসরণ করেন তিনি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্'র বান্দা এবং তাঁর হুকুমের প্রতি আনুগত্যশীল। হুকুম বের করার সঠিক পদ্ধতির মাধ্যমে লব্ধ শারী'আহ্'ই আল্লাহ্'র হুকুম। আর এটা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে না যতক্ষণ না সে ব্যক্তি ক্বিয়াসের জন্য শারী'আহ্গত ইল্লাহ্ বা কারণের উপর নির্ভর করবে।

ভাল ও মন্দ, আকর্ষণীয় ও অনাকর্ষণীয়, হালাল ও হারামকে সংজ্ঞায়িত করার এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র। এটা কখনওই মানুষের হাতে অর্পণ করা হয়নি। যদি মানুষকে এ অধিকার দেয়া হতো তাহলে শুরু থেকেই তাকে আইন প্রণয়নের সুযোগ দেয়া হতো। শারী'আহ্ মানুষের কর্মকান্ডজনিত হুকুমের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতো না। এবং মানব জীবনের সব কাজের নিয়ন্ত্রক এবং সংগঠক শুধুমাত্র আল্লাহ্ এটা বিশ্বাস না করে মুসলিমদের শুধু এতটুকু বিশ্বাস করলে হতো যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তা।

সমগ্র মুসলিম যুগ ধরেই ইসতিম্বাতের শারী'আহ্গত পদ্ধতির উপর নির্ভর করে হাজার হাজার বই লেখা হয়েছে। আমাদের বিশিষ্ট বিচারকগণ এই পদ্ধতি অনুসরণ করে সব সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে ব্যক্তির এ ব্যাপারে জ্ঞান রয়েছে এবং নিজেকে এইসব মূলনীতির আওতায় রাখে তার জন্য এটা একটি সহজ ও বাস্তবসম্মত পদ্ধতি।

এই নবআবিস্কৃত পদ্ধতির দূর্বলতা হলো, এগুলো শারী'আহ্'র অকাট্য হুকুমের সাথে সাংঘর্ষিক। যদি পদ্ধতিটি সঠিক হতো তাহলে এর মাধ্যমে লব্ধ হুকুমসমূহ অবশ্যই শারী'আহ্'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো। এটা স্বয়ং এবং এটা যে প্রভাব তৈরী করে উভয়ই প্রমাণ করে যে, এ পদ্ধতিটি ক্রটিপূর্ণ। নিম্নের কিছু উদাহরণ ব্যাপারটি আরো পরিষ্কারভাবে বুঝতে সহায়তা করবেঃ

- বৈধ উপায়ে দাওয়াহ্'র জন্য প্রয়োজন সৎ স্পষ্টবাদিতা, সাহস, শক্তি এবং চিন্তা। একজনকে অবশ্যই যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক তাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে এবং দ্বন্দে অবতীর্ণ হতে হবে যাতে পরিস্থিতির কোনরকম তোয়াক্কা না করে এর অসত্যতা স্পষ্ট করে তোলা যায়। এর জন্য প্রয়োজন কেবলমাত্র ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রতি নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব -যদিও এটা অধিকাংশ লোকের মতামত বা ঐতিহ্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হয় অথবা তারা এর গ্রহণ, প্রত্যাখ্যান বা বিরোধিতা করে। দাওয়াহ্ বহনকারী ব্যক্তি লোকদের ও ক্ষমতাসীনদের তোষামোদ করে না। এভাবেই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে সত্যের দাওয়াহ্ দিতেন তার উপর বিশ্বাস করে আহ্বান অব্যাহত রাখতেন। এসময় তিনি কোনো প্রথা, ঐতিহ্য, ধর্ম, বিশ্বাস, শাসক ও জনগণকে তোয়াক্কা না করে পুরো পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। তিনি ইসলামের বাণী ব্যতিরেকে অন্য কোনো দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেননি। ইবনে হিশাম উল্লেখ করেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কুরাইশদের চ্যালেঞ্জ করেন তখন তাদের দেবতাসমূহকে অপদস্থ করেছিলেন, তাদের মানসিকতাকে কটাক্ষ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন পথভ্রষ্ট। কুরাইশগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তার বিরোধিতা ও শত্রুতায় একতাবদ্ধ হয়েছিল। এভাবেই মুসলিমদের আজকে দাওয়াহ্ বহন করা উচিত। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে অনুসরণ করতে চায় তারা যাতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা'র নিম্নের আয়াতকে মনে রাখে:

**"বলুন (হে মুহাম্মদ): এটাই আমার পথ: 'আমি পূর্ণ সচেতনতার সাথে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাই, আমি এবং আমার অনুসারীরা।'"** [সূরা ইউসুফ: ১০৮]

এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন,

**"আমি তোমাদের মাঝে এমন কিছু জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তা তোমরা ধারণ করো তাহলে কখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। এটি হলো সুস্পষ্ট বিষয়: আল্লাহ্'র কিতাব ও তাঁর প্রেরিত রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্।"** (সীরাতে ইবনে হিশাম); এবং যারা সালাফ আস সালিহ'দের পথ ও তাদের কথা অনুসরণ করে তারা বলে "বিষয়ের (দ্বীনের) সমাপ্তি ভাল হতে পারে না, যদি না যার মাধ্যমে এর শুরুটা ভাল হয়েছিল, তা না থাকে", আর এ ধরনের দাওয়াহ্'তে তা মানতেই হবে।

বর্তমানে শারী'আহ্ কর্তৃক অননুমোদিত এই নতুন ও নবআবিষ্কৃত পদ্ধতির অনুসারীদের বক্তব্য হচ্ছে অধিকতর সুবিধা সবচেয়ে উপযোগী ও সর্বোত্তম চিন্তার দিকে ঈঙ্গিত প্রদান করে এবং তারা ইস্যুসমূহকে হিকমাহ্'র (প্রজ্ঞা) সাথে উপস্থাপন করে এবং সর্বোত্তম পন্থায় আহ্বান করে। এটা তাদের কর্মপদ্ধতি, এটা কখনোই শারী'আহ্গত কোনো পদ্ধতি নয়। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, দাওয়াহ্'র প্রতিবন্ধক সববিষয়কে চ্যালেঞ্জ করে দাওয়াহ্'র লাভ কি? এর মাধ্যমে অন্যদের হৃদয় উন্মুক্ত নাকি বন্ধ হয়? অন্যদের সাথে মৌলিক মতপার্থক্যের ভিন্নতা প্রকাশের দরকার কি? অন্যদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেয়াটাই কি ভাল নয় এবং এটাই হল তাদের হৃদয়-মনে জায়গা করে নেয়ার অন্যতম প্রধান কৌশলগত দিক? তাদের আরও বক্তব্য হচ্ছে, যখন তারা আমাদের ও তাদের মাঝে বড় কোন মতপার্থক্য খুঁজে পাবে না তখন কি তারা আমাদের আরও নিকটবর্তী হবে না? শাসকের বিরোধীতা করা এবং উম্মাহ্'র সম্মুখে তাদের ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা উন্মোচন করা কি দাওয়াহ্'র স্বার্থের আনুকুল্য? তাদের ক্ষিপ্ত করা এবং তাদের মন্দ দিকসমূহ উন্মোচন করার চেয়ে তাদের নিকটবর্তী ও বন্ধুসুলভ হওয়াই কি বেশী ভাল নয়? হয়ত এতে তারা তাদের খুব কাছে আসবে এবং তাদেরকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে আসবে যাতে দাওয়াহ্ লাভবান হবে এবং সবাই এর সুফল ভোগ করবে। সম্ভবত এভাবে তারা ক্ষমতায় পৌঁছে যাবে। আর একারণেই তারা এটা নিশ্চিত করতে চায় যে, তারা শাসকগোষ্ঠীর জন্য ভয়ের কারণ না এবং তাদেরকে নিকটবর্তী হতে দিলে তারা ক্ষতির কারণ হবে না। এখানেই তোষামোদের অধ্যায়ের শুরু এবং যা সঠিক পদ্ধতি থেকে যোজন যোজন দূরে। এছাড়া এটি হল শাসকদের তুষ্ট করার সূচনা, তাদের কর্মকান্ডের মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেয়া, তাদের প্রতারণামূলক কর্মকান্ডের ব্যাপারে নীরব থাকা, শাসকদের উষ্মা সৃষ্টি করে না এমনসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকা, কথা বলা এবং উম্মাহ্'কে সাবধান করা উচিত এমনসব অপরিহার্য বিষয়কে অবহেলা করা এবং সত্যের সাথে আপোষকারী এজাতীয় আরও অনেক কথা ও কাজে ব্যস্ত থাকা। এসব কিছুর পেছনে দায়ী তাদের চিন্তার পদ্ধতির পরিবর্তন।

- নবী (সাঃ)-এর জ্ঞানের উত্তরসুরী ইসলামী চিন্তাবিদগণের উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র হক্ব হচ্ছে তারা মুজাহিদীনদের মধ্যে সামনের সারিতে থাকবেন, সত্য উচ্চারণ করবেন, তা ধারণ করবেন এবং শাসকদের ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা জনগণের সামনে তুলে ধরে তাদের সাথে দ্বন্দে লিপ্ত হবেন। অন্যকথায় তারা অবশ্যই জ্ঞান, মিহরাব ও যুদ্ধের ইমাম হবেন। সালাফ আস সালিহ্গণ এরুপ ছিলেন। এ নবআবিষ্কৃত পদ্ধতিতে আমরা দেখতে পাই যে, এমন এক নতুন উপলব্ধি তৈরি হয়েছে যা পূর্বের ইসলামী চিন্তাবিদদের চিন্তার সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। তাদের চিন্তা কথার

মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়। তারা বলে যদি আমাদের চিন্তাবিদগণ হক্ব কথা বলতে গিয়ে গ্রেফতার অথবা মারা যান তাহলে কে তার স্থলাভিষিক্ত হবে? উম্মাহ্ এতে করে যে ক্ষতির সম্মুখীন হবে তা এর লাভের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। তাহলে কেন আমরা উম্মাহ্'কে এসব চিন্তাবিদের উপকার থেকে বঞ্চিত করব?

- অনুরূপভাবে, সংসদীয় নির্বাচনের অংশগ্রহণ করা কিছু শর্তের ভিত্তিতে অনুমোদিত: প্রার্থীকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে এবং তাকে ইসলামী শাসনের প্রতি আনুগত্যশীল থাকতে হবে। তিনি অবশ্যই কুফর আইনকে মেনে নেবে না বরং খন্ডন করবেন এবং শারী'আহ্ আইনকে এর বিকল্প হিসেবে উপস্থাপন করবেন। তিনি নির্বাচিত করতে পারবেন না একজন অমুসলিম প্রেসিডেন্টকে কিংবা এমন একটি সরকারকে যার ভিত্তি কুফর। সরকারকে আস্থা ভোট দেয়া তার জন্য অনুমোদিত নয়, বরং তিনি তা প্রতিরোধ করবেন। কারণ সরকার ইসলামের ভিত্তিতে গঠিত হয়নি। আর এটাই হল সুস্পষ্ট শারী'আহ্ আইন।

তবে আমরা এই নবআবিষ্কৃত পদ্ধতি অনুসারে দেখতে পাই যে, মুসলিমদের এমন কাউকে নির্বাচিত করার অনুমোদন দেয়া হয় যিনি শারী'আহ্ দিয়ে শাসন, জবাবদিহিতা ও শাসক নির্বাচন করেন না । বরং তারা খ্রিস্টান প্রার্থীদের নির্বাচনও মেনে নেন এবং নির্বাচনী তালিকায় অংশগ্রহনের জন্য তাদের সম্মতি দেন এ অজুহাতে যে, আইন প্রত্যেক অঞ্চলে এমপি সংখ্যা নির্ধারন করে দিয়েছে। মুসলিমরা নির্বাচিত করুক বা না করুক এভাবে খ্রিস্টান প্রার্থী বিজয়ী হয়। তাই তাদের দৃষ্টিতে প্রতিদ্বন্ধি পক্ষের লোকেরা তাকে নির্বাচিত করার চেয়ে মুসলিমদের জন্য উত্তম হলো তাদের জন্য অধিক উপকারী কাউকে নির্বাচিত করা।

এ কারণে এ পদ্ধতির সমর্থকগণ যত বেশী যুক্তি নিয়ে অগ্রসর হয় ততবেশী তারা সত্য থেকে দূরে সরে যেতে থাকে।

ইসলামের সঠিক উপলব্ধি থেকে দূরে থাকা এই নবআবিষ্কৃত ও নতুন মানসিকতার সমর্থকদের এটা বোঝা উচিত যে তাদের মানসিকতা ও আচরণের সাথে ইসলামের কোনো সম্পৃক্ততা নাই এবং এ ব্যাপারে সাবধান হওয়া উচিত। তারা যা প্রতিষ্ঠা করেছে সে ব্যাপারে তাদের অনুতপ্ত হওয়া উচিত। ইসলামী দাওয়াহ্'তে তাদের প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু তার আগে প্রথমে তাদেরকে এ মানসিকতা ও আচরণ হতে বের হয়ে আসতে হবে যাতে তারা আল্লাহ্'র নাযিলকৃত বিধান বাদ দিয়ে অন্যকিছু দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনাকারী শাসকগোষ্ঠীকে পরিত্যাগ করে ইসলামী শাসনের সমর্থক হয়।

মহাবিশ্বের অধিপতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হচ্ছেন লাভ-ক্ষতির অকাট্য সংজ্ঞা প্রদানের মালিক। তিনি ছাড়া আর কেউই কোনটি আমাদের জন্য কল্যাণকর এবং কোনটি অকল্যাণকর তা বলতে পারে না। যদি কোন মানুষ তা পারতো তবে সে আইনপ্রণেতার স্থান পেত এবং মানুষের জীবনযাপনের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র পক্ষ থেকে দ্বীনের কোনো প্রয়োজন ছিলনা। সেকারণে ইসলাম মুসলিমদের জন্য তাদের প্রভূর শারী'আহ্'কে গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করেছে। শারী'আহ্ যা বলে তাই আমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা নিষেধ করে তাই অকল্যাণকর। আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুকে আমাদের জন্য কল্যাণকর বা ক্ষতিকর বলতে পারি না যতক্ষণ না এ ব্যাপারে কোনো হুকুম জারি হয়। এর আগে এটা খুঁজে বের করা আমাদের আয়ত্তাধীন নয়। কারণ মনের এমন কোন মানদন্ড নেই যার ভিত্তিতে যে ভাল বা খায়ের, মন্দ বা শা'র এবং হাসান বা সুন্দর ও কুব্হ বা নিন্দনীয়-এর মধ্যে পার্থক্য করা যেতে পারে। সুতরাং আমাদের রয়েছে শারী'আহ্গত নীতিমালা: 'যেখানে আমরা আল্লাহ্'র শারী'আহ্ পাই সেখানেই রয়েছে কল্যাণ।' তাদের সেই মূলনীতি যাতে তারা বলে, 'যেখানে মানুষের উপকারিতা রয়েছে সেখানেই আল্লাহ্'র আইন'- এ ধারণাটি ভুল। এ ব্যাপারে নীচের আয়াতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উল্লেখ করেন,

**"তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়; এবং হয়তো তোমরা এমনকিছুকে অপছন্দ করছো যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর এমনকিছুকে পছন্দ করছো যা তোমাদের জন্য অকল্যানকর। বস্তুত: আল্লাহ্ যা জানেন তা তোমরা জান না।"** [সূরা বাক্বারা: ২১৬]

এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র আয়াতটি বুঝতে পারি,

**"তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ"**। [সূরা আল আ'রাফ:১৫৭]

তাইয়্যিব বা ভাল হলো সেটিই যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হালাল করেছেন এবং তিনি আমাদের এ ব্যাপারে অবহিত করার আগে আমরা এ ব্যাপারে জানতাম না। খাবিস বা খারাপ হলো সে জিনিস যা আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা নিষিদ্ধ করেছেন এবং আমরা এ ব্যাপারে কখনওই জানতে পারতাম না যদি না তিনি তা নিষিদ্ধ করতেন। এর অর্থ এই নয় যে,

আমাদের মন বুঝতে পারে কোনটি হালাল যেজন্য তিনি তা অনুমোদন করেন এবং মন যেটিকে হারাম বলে তিনি তা নিষেধ করেন।

যখন তারা বলে দু'টি ভাল জিনিসের মধ্যে শ্রেয়তর, দু'টি মন্দ জিনিসের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম দোষযুক্ত এবং দু'টি উপকারের মধ্যে উত্তমটি ও দু'টি ক্ষতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিটি বেছে নেয়া যায়- এই বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে ভুল এবং এটা শারী'আহ্'র জন্য সত্যিই বিপদজনক। এটা মাসালিহ্ মুরসালাহ্'র বিষয়ে মতামতের চেয়েও ভয়াবহ। এটা একারণে যে, মাসালিহ্'র ভিত্তিতে তারা তখনই কাজ করে যখন বাস্তবতা শারী'আহ্'র দিক নির্দেশনা বর্হিভূত হয়, কিন্তু উপরোক্ত বক্তব্য অনুযায়ী তারা আল্লাহ্'র হুকুমকে পর্যন্ত বদলাতে পারে, প্রবৃত্তিকে এগুলো রহিত করতে অনুমোদন দেয়। এর মাধ্যমে তারা হারামকে অনুমোদন দেয় এবং হালালকে বাতিল করে দেয়। এটা দ্বীনের জন্য ক্ষতিকারক এবং ভয়ংকর কার্যপদ্ধতি। একারণে তাদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গী সত্য থেকে অনেক দূরে।

এতক্ষন আমরা যা উপস্থাপন করলাম তাতে দেখতে পাই যে তাদের উসুল বা মুলনীতিগুলো একটি আরেকটির সহযোগী যা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র আইনের মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে চায়, কেননা তারা শারী'আহ্'র মূলনীতির বদলে তাদের মন প্রদত্ত যুক্তিকে গ্রহণ করেছে এবং শারী'আহ্ যা চায় তা নয় বরং তারা যা চায় তাতে পৌঁছাতে তারা শারী'আহ্ প্রদত্ত চিন্তাপদ্ধতির বদলে যুক্তিনির্ভর চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়েছে। সে কারণে যৌক্তিক সাদৃশ্যতা হলো সব আলোচনায় তাদের পথনির্দেশক মূলনীতি। যদিও বিধানদাতা (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) মুসলিমদের জন্য যুক্তিনির্ভর সাদৃশ্যতা অনুসরণকে নিষিদ্ধ করেছেন। কারণ এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র বিরুদ্ধে যায় এবং কুফর শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অনুমোদন দেয় ও এটা সত্য এবং যথার্থতা থেকে বিচ্যুত হয়ে একজনকে খেয়ালখুশী ও প্রবণতার দিকে ধাবিত করে। তাদের আলোচনা হলো তাগুতের সাথে মধ্যস্থতা করা যা আমাদের প্রত্যাখান করতে বলা হয়েছে। কারণ তাগুত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা নাজিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছুর সাথে মধ্যস্থতা করে।

পরিশেষে আমরা অবশ্যই যুক্তিনির্ভর সাদৃশ্যতা এবং শারী'আহ্গত সাদৃশ্যতার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য তুলে ধরবো যাতে যুক্তিনির্ভর সাদৃশ্যতার কুফল তুলে ধরা যায় এবং শারী'আহ্গত সাদৃশ্যতার গুরুত্ব তুলে ধরা যায় এবং এভাবে আমরা আমাদের নিজেদের, উম্মাহ ও সমগ্র মানবজাতিকে হেফাজত করতে পারি।

ঐসব মুসলিমগণ শারী'আহ্ হুকুম নির্ধারণের ক্ষেত্রে যৌক্তিক মানদন্ডের ভিত্তিতে উপলব্ধ অধিকতর লাভের দিকে ধাবিত হয়। যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তারা শারী'আহ্ হুকুম থেকে প্রাপ্ত লাভ এবং এ থেকে উদ্ভুত ক্ষতির মধ্যে তুলনা করে । তাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী যদি এতে ক্ষতির পরিমান বেশী দেখা যায় তাহলে তারা যুক্তির ভিত্তিতে যে হুকুমটি নিলে বেশী লাভ হবে তা গ্রহণ করে ঐ বিষয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট শারী'আহ্ হুকুমকে পরিত্যাগ করে। যদি শারী'আহ্ হুকুমের মধ্যে উপকারের পরিমাণ বেশী থাকে তাহলে তারা সেটা গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ্'র হুকুম হিসেবে নয় বরং তাদের মন সম্মত বলে। এটা একটি বিপজ্জনক বিষয় এবং এ ব্যাপারে কারও নীরব থাকা কাম্য নয়। কারণ এটা মন ও প্রবৃত্তিকে শারী'আহ্'র অভিভাবক বানায় এবং মনকে আল্লাহ্'র হুকুমের উপর হস্তক্ষেপকারী বানায় এবং শারী'আহ্'র উপর প্রাধান্য দেয়। আর এটাই মানবরচিত আইন। আর এটাই তাদের এই বিষয়ে প্রদত্ত মতামতসমূহ যে শারী'আহ্'র সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক তার ব্যাখ্যা দেয়। তাই শুধু পার্থক্য এটা নয় যে তাদের মতামত অনুমোদিত না অনঅনুমোদিত কিংবা আল্লাহ্'র বিধান বাদে দিয়ে শাসন ক্ষমতায় অংশগ্রহন করা না করার বিষয়, বরং পার্থক্য হলো চিন্তার পদ্ধতিতে; কারণ এর দ্বারাই তারা শারী'আহ্বহির্ভূত হুকুম, যুক্তিনির্ভর হুকুম, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নাযিল বর্হিভূত হুকুম ও প্রত্যাখ্যাত তাগুতের হুকুমের নিকটবর্তী হয়।

একারণে আমরা বলি যে, এ ধরনের উপলব্ধি সঠিক উপলব্ধি থেকে দূরবর্তী অথবা বিপরীত। এর স্বরূপই এর অসারতাকে তুলে ধরে। এর উপর নির্ভর করা বা এর ভিত্তিকে হুকুম গ্রহণ করা সঠিক নয়। কারণ লাভ-লোকসানের অকাট্য সংজ্ঞা কেবলমাত্র জগতসমূহের অধিপতি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র জন্যই নির্ধারিত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ জানে এরকম কোন লাভ বা ক্ষতি থেকে বিরত থাকার মধ্যে আমাদের জন্য কি উপকার রয়েছে? আর যদি এটা সম্ভব হতো তাহলে মানুষ নিজেই আইনপ্রণেতা হতো। মানুষের জীবনের সামগ্রিক বিষয়াবলীর ব্যবস্থাপনার জন্য ঐশী ব্যবস্থার অপরিহার্যতার কথা বিবেচনায় রেখেই ইসলাম মুসলিমদের জন্য তাদের প্রভূর শারী'আহ্কে গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করেছে। সে কারণে শারী'আহ্ আমাদের যা করতে বলেছে তাই আমাদের জন্য কল্যাণকর আর যা পরিত্যাগ করতে বলেছে তাই ক্ষতিকর।

আল্লাহ্'র নির্দেশ বা নাযিল করা হুকুম ব্যাতিরেকে কোন কিছুর দ্বারা কল্যাণ বা ক্ষতি সম্পর্কে আমাদের জানা নাই। এর পূর্বে এ ব্যাপারে কোন কিছু সংজ্ঞায়িত করতে আমরা অক্ষম।

যখন মানুষ আইন প্রণয়ন করে তখন সে যুক্তিনির্ভর সাদৃশ্যতার পথ অনুসরণ করে, যেখানে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের জন্য একই রকম হুকুম আসে এবং বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন হুকম আসে। যখন আমরা ইসলামী শারী'আহ্'র দিকে লক্ষ্য করি তখন দেখি যে, এর প্রবক্তা সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞাত স্রষ্টা সাদৃশ্যপূর্ণ অনেক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন হুকুম ও বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ে একইরকম হুকুম দিয়েছেন। এটা যুক্তিনির্ভর সাদৃশ্যতার বিপরীত। এটা এমন সব হুকুম দিয়েছে যেখানে মন কোন ভূমিকা রাখে না। আর এটাই ঐসব লোকদের জন্য নবআবিস্কৃত পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যানের জন্য যথেষ্ট।

# ১৫

# হারামের মাধ্যমে হালালে পৌঁছানো যায় না (ফলাফল কোন প্রক্রিয়ার ন্যায্যতা প্রমান করে না)

কিছু কিছু মুসলিমের চিন্তা যুক্তিনির্ভর সাদৃশ্যতা (Rational Analogy) দ্বারা প্রভাবিত। এই সাদৃশ্যতা বিবেচনায় তারা শারী'আহ্ প্রদত্ত ইঙ্গিত অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট দলিলে উল্লেখিত ইল্লাহ্ (হুকুমের পেছনে ঐশী বা শারী'আহ্ প্রদত্ত কারণ) এর উপর নির্ভর করে না। তাদের মতে চিন্তা ব্যবহার করে সমগ্র শারী'আহ্ হতে যুক্তিনির্ভর ক্বিয়াস (Rational Qiyas) অনুধাবন করা যায়, তার জন্য নির্দিষ্ট কোন দলিলের প্রয়োজন নাই। শারী'আহ্ প্রদত্ত সুস্পষ্ট কোন ইঙ্গিত ছাড়াই এক হুকুমের সাথে অন্য হুকুমের সাদৃশ্যতা বিবেচনা করে মানব চিন্তা তা অনুধাবনে সক্ষম। শারী'আহ্ হুকুম ও অন্যান্য হুকুমের মধ্যে মাসলাহা'র (সুবিধা) ভিত্তিতে প্রাধান্য বিবেচনা করেও তা উপলদ্ধি করা সম্ভব।

উপরের যুক্তিগুলো কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের দৃষ্টিতে সমস্ত শারী'আহ্ আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, জীবন, চিন্তা, বংশীয় ধারা এবং সম্পদের সুরক্ষার দিকে ইঙ্গিত দিয়েছে। সুতরাং যা কিছু এই পাঁচ বিষয়ের সুরক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট তাই শারী'আহ্'র নির্দেশনা, শারী'আহ্ দলীলে তা উল্লেখ না থাকুক কিংবা তা বিবেচনায় কোন শারী'আহ্ ইল্লাহ্ (ঐশী কারণ) না থাকুক। দুটি বিষয়ের মধ্যে তুলনামূলক সাদৃশ্যতা বিবেচনা করার কারণেই তারা এরুপ করে থাকে। তাদের আরও যুক্তি হচ্ছে, যেহেতু জরুরী প্রয়োজনে শারী'আহ্ হারাম কিছু ভক্ষণ ও মদ পান করাকে বৈধতা দিয়েছে সেহেতু দুটি বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্যতা বিবেচনা করে জরুরী প্রয়োজনে সুদের সম্পৃক্ততাও অনুমোদিত।

এ ধরনের বোধ সঠিক চিন্তার সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক ও বৈপরীত্যপূর্ণ। এ ধরণের পদ্ধতির ধরণ হতে এর অসততার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং এ ধরনের পদ্ধতির উপর না নির্ভর করা যায়, না গ্রহন করা যায়। কারণ যুক্তিনির্ভর সাদৃশ্যতার ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়সমূহকে এক জায়গায় এনে তাকে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়সমূহ হতে আলাদা রাখতে হয়। কিন্তু আমরা দেখি শারী'আহ্ একই ধরনের অনেক বিষয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রায় দিয়েছে এবং অন্যদিকে একাধিক ভিন্ন বিষয়ে একই প্রকার রায় দিয়েছে। তাছাড়া এটা এমন কিছু বিধানও দিয়েছে যা আমাদের চিন্তার আওয়ার বাইরে। তাই এই পদ্ধতিকে সমূলে প্রত্যাখ্যানে এতটুকুই যথেষ্ট।

## সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ে ভিন্ন হুকুম

সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়বস্তুর মধ্যে ভিন্নতার উদাহরণ হিসেবে যেমন আমরা বলতে পারি- শারী'আহ্ স্থান-কালের মধ্যে পার্থক্য বিধান করেছে যদিও মুসলিমদের কাছে মর্যাদার দৃষ্টিকোনে সব স্থান-কাল একই। যেমন শারী'আহ্ লাইলাতুল ক্বদরের রাতকে অন্যান্য রাতের উপর মর্যাদা দিয়েছে, মক্কাকে মদীনার উপর এবং মদীনাকে অন্যান্য শহরসমূহের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। কছর (সংক্ষিপ্ত) নামাযের ক্ষেত্রে পার্থক্য বিধান করেছে, যেমন- ৪ রাকাত নামায সংক্ষিপ্ত করা যায়, কিন্তু ৩ বা ২ রাকাতে যায় না। এটা মনি (বীর্য) এবং মাজিহ (প্রাকবীর্য তরল) এর মধ্যে পার্থক্য করেছে। একই স্থান হতে নির্গত হওয়া সত্ত্বেও মনি (বীর্য) পাক এবং মাজিহ (প্রাকবীর্য তরল) নাপাক। স্বেচ্ছায় মনি নির্গত হলে গোসলকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং রোজা ভঙ্গের কারণ বলা হয়েছে, কিন্তু একই স্থান থেকে নির্গত হওয়া সত্ত্বেও মাজিহ বের হবার ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। শারী'আহ্ মেয়ে বাচ্চার মুত্র দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র নোংরা হলে তা পবিত্রকরণে ধোয়াকে বাধ্যতামূলক করেছে, কিন্তু ছেলে বাচ্চার মুত্র দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র নোংরা হলে তা পবিত্রকরণে পানি ছিটানোকে যথেষ্ট করেছে। শারী'আহ্ ঋতুবতী (Menstruating) নারীর জন্য (বাদ যাওয়া) রোযা কাযা করাকে বাধ্যতামূলক করেছে কিন্তু (বাদ যাওয়া) সালাতকে নয়। ৩ দিরহাম চুরি করলে হাত কাটার বিধান দিলেও অবৈধ পন্থায় অর্জিত বিপুল সম্পদের অধিকারী ব্যক্তির হাত কাটতে বলেনি। এটা তালাকপ্রাপ্ত নারীর জন্য ইদ্দতকালীন সময় ৩টি মাসিক (Menstrual) চক্র বেঁধে দিয়েছে অথচ বিধবা নারীর জন্য তা ৪ মাস ১০ দিন, যদিও উভয়ের রেহম (জরায়ু) এর অবস্থা একই। এরকম আরও অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। যদি এ বিষয়গুলোর হুকুম অনুসন্ধানে মানব চিন্তার উপর ছেড়ে দেয়া হতো তাহলে আমরা তাদেরকে অনেক ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনিত হতে দেখতাম। এবং তারা এমন হুকুমসমূহ নিয়ে

আসত যা শারী'আহ্'র সম্পূর্ণ বিপরীত এবং সাংঘর্ষিক। শারী'আহ্ কর্তৃক প্রত্যেকটি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন হুকুম প্রদান প্রমাণ করে যে তাদের সাদৃশ্যতা বিবেচনা করে হুকুম বের করার নব্য এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ অবৈধ ও ভ্রান্ত।

## ভিন্ন বিষয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ হুকুম

ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে অনেক সময় শারী'আহ্ একই প্রকার হুকুম প্রদান করেছে, যদিও মানব যুক্তি ঠিক তার উল্টো কাজ করে। শারী'আহ্ পবিত্র হওয়ার ক্ষেত্রে পানি এবং ধুলাকে একই মর্যাদায় স্থান দিয়েছে, যদিও পানি পরিষ্কার করে অথচ ধুলা অপরিষ্কার করে। এটা স্বর্ণ এবং গমের ক্ষেত্রে রিবা আল-ফাদল (অতিরিক্ত পরিমাণ) কে নিষিদ্ধ করেছে, যদিও এদের বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এটা যিনাহ্ এবং মুরতাদ (দ্বীনত্যাগ) এর শাস্তি মৃত্যুদন্ড বিধান করেছে অথচ অপরাধ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এটা মুসলিম ও অমুসলিমদের সুরক্ষা দিয়েছে যদিও বিশ্বাসের দিক থেকে তারা ভিন্ন। কোন নারীর উপর যিনাহ্'র দায় চাপানো মিথ্যা অভিযুক্তকারী এবং মদ পানকারী উভয়কেই ৮০টি দোররা মারার হুকুম দিয়েছে অথচ দুটি কাজের প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সুতরাং এরকম অনেক কাজ রয়েছে যেগুলো ভিন্ন এবং কোনক্রমেই এদেরকে একত্রে বিবেচনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু শারী'আহ্ তাদের জন্য একই হুকুম বিধান করেছে। যদি এগুলোকে মানুষের চিন্তার উপর ছেড়ে দেয়া হতো তাহলে মানুষ এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন হুকুম নিয়ে আসতো এবং ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন বাস্তবতা ও প্রেক্ষাপটের কারণে একই হুকুম বের করতে পারতো না। সুতরাং, এটাও সাদৃশ্যতা বিবেচনা নির্ভর অকার্যকর এই পদ্ধতির স্বরূপ উন্মোচন করে।

এছাড়াও শারী'আহ্ কর্তৃক আরও অনেক হুকুম প্রদত্ত হয়েছে যেখানে মানুষের চিন্তা বা যুক্তির কোন ভূমিকা নেই। শারী'আহ্ ব্যবসাকে বৈধতা দিয়েছে কিন্তু সুদকে হারাম করেছে যদিও তাদের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে এবং উভয়ই ব্যবসা। ইহা ধর্ষনের স্বাক্ষী হিসেবে ৪ জনকে নির্ধারন করেছে অথচ হত্যার জন্য ২ জন, যদিও ধর্ষণের চেয়ে হত্যা অনেক নৃশংস অপরাধ। বাতিলযোগ্য তালাকের বেলায় স্বাক্ষী একজন মুসলিম হওয়া বাধ্যতামূলক কিন্তু অর্পিত সম্পত্তির বিচারাধীন মামলায় একজন কাফিরের স্বাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। একজন মুক্ত কিন্তু কুৎসিত নারী যার প্রতি আকর্ষন না জন্মানোটাই স্বাভাবিক তার প্রতিও দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখতে বলা হয়েছে কিন্তু একজন জারিয়াহ্ (সুদর্শনা দাসী) এর ক্ষেত্রে এই বাধ্যবাধকতা নাই। খুফ্‌ফাইন (চামড়ার মোজা) এর উপরের অংশ মাসেহ্ করা বাধ্যতামূলক কিন্তু নীচের অংশ নয় অথচ নীচের অংশ মাসেহ্ করাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। এ ব্যাপারে সাইয়্যিদুনা আলী (রা.) বলেন, **"দ্বীন যদি যুক্তিনির্ভর সাদৃশ্যতার ভিত্তিতে পরিচালিত হতো তাহলে মোজার নীচের অংশ উপরের অংশের চেয়ে মাসেহ্-এর বেশী দাবীদার।"**

এ কারণেই হয়ত বিখ্যাত কবি আবুল 'আলা আল-মা'র্রি বলতে বাধ্য হয়েছিল,

একটি হাতের দিয়তের (ক্ষতিপূরণ) জন্য শত শত স্বর্ণমুদ্রা দিতে হয়,

কী করে এটা সিকি স্বর্ণমুদ্রার কারণে কাটা  যায়?

অন্য কথায়, কেউ কারও হাত নষ্ট করলে তার দিয়ত বা ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০০ দিনার স্বর্ণমুদ্রা দিতে হয়, তাহলে মাত্র সিকি স্বর্ণমুদ্রা চুরির কারণে কীভাবে একটি হাত কাটা যায়?

যুক্তি কখনো সিকি পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা চুরির দায়ে কারো হাত কাটাকে ঠিক মনে করেনা। যুক্তির ভিত্তিতে বিচার করার অর্থ শারী'আহ্'র ভিত্তিতে বিচারকে অগ্রাহ্য করা। যদি মানুষকে শারী'আহ্'র সামগ্রিকতা থেকে, অথবা জাহির আন-নাস (শারী'আহ্'র বাহ্যিক বক্তব্য) থেকে, অথবা দু'টি হুকুমের সাদৃশ্যতা থেকে প্রাপ্ত ক্বিয়াসের (তুলনামূলক বিবেচনা) অস্তিত্ব উপলব্ধির মাধ্যমে ইল্লাহ্ (ঐশী কারণ) বের করার দায়িত্ব দেয়া হতো তবে মানুষ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক অনুমোদিত অধিকাংশ বিষয়কে নিষিদ্ধ করে দিত এবং নিষেধসমুহকে অনুমোদন দিয়ে দিত। তাই শারী'আহ্ প্রদত্ত পদ্ধতি ছাড়া ক্বিয়াস অনুমোদিত নয়। অন্যকথায় শারী'আহ্'র উৎসে উল্লেখিত ইল্লাহ্ ছাড়া বৈধ ক্বিয়াস হতে পারে না। শারী'আহ্ ইল্লাহ্ বিবর্জিত কোন বাণী থেকে ক্বিয়াস করা অসম্ভব। এ ব্যাপারে মনগড়া কোন ইল্লাহ্ দেয়া যায় না এবং শর'ঈ ইল্লাহ্ উল্লেখিত ও চিহ্নিত না থাকলে আমরা নিজ থেকে কোন শর'ঈ ইল্লাহ্ আরোপ করতে পারিনা। সে কারণে ফকীহ্গণ শারী'আহ্ থেকে কীভাবে ইল্লাহ্ বের করতে হবে তা দেখিয়েছেন। তারা বলেন ইল্লাহ্ পাওয়া যাবে হয় দলিলে (Text) নির্দেশিত শারা'হাতান (দলিলের

সুস্পষ্টতা (Explicitly)) বা দালালাতান (অর্থের সুস্পষ্টতা (Meaning)) বা ইসতিম্বাতান (সিদ্ধান্তগ্রহণ (Deduction)) না হয় ক্বিয়াসান (সাদৃশ্যতা বিবেচনা (Analogy)) এর মাধ্যমে । (দ্রষ্টব্যঃ বিস্তারিত জানতে উসুল সম্পর্কিত বই দেখুন)।

যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ক্বিয়াস ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছেন তখন তিনি এর ধরনও সুনির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ্ বিন আয জুবায়ের হতে আহমেদ ও নাসায়ী বর্ণনা করেন যে,

**"খাতা'য়াম থেকে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আসলেন এবং বললেন, 'আমার বাবা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তার উপর হজ্জ্ব ফরয হয়েছে; কিন্তু তিনি উটের পিঠে চড়তে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ্ব সম্পাদন করতে পারি?' তিনি (সাঃ) বললেন, 'তুমি কি বড় ছেলে?' সে বলল, 'হ্যাঁ'। তিনি (সা) বললেন, 'ধর, তোমার বাবার একটি ঋণ আছে এবং তুমি যদি তার পক্ষ থেকে সেটি পরিশোধ কর সেটি কী যথেষ্ট হবে?' সে বলল, 'হ্যাঁ'। তিনি (সাঃ) বললেন, 'তাহলে তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জও পালন করতে পার'।"** হজ্জ একটি ইবাদত আর ঋণ পরিশোধ একটি মু'আমালাত (লেনদেন) এবং যা একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তথাপি উভয়টিকে ঋণ বিবেচনায় হজ্জ্ব পালন ও ঋণ পরিশোধ একই কাতারে ফেলা হয়েছে এবং এজন্য ঋণ পরিশোধের মত ছেলেকে বাবার পক্ষ থেকে হজ্জ্ব পালন করতে বলা হয়েছে। এখানে আল্লাহ্'র প্রতি ঋণকে মানুষের ঋণের সাথে তুলনা করে বিষয়টিকে নিস্পত্তি করা হয়েছে। যদি আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে বিষয়টি না আসতো তবে মানুষের চিন্তা কোনদিনও এরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সক্ষম ছিল না।

কোন হুকুমের পেছনে তা'লীল (কারণ) হল সে হুকুমটি কেন এসেছে তা পরিষ্কারভাবে বুঝার একটি দলিল। এর মানে যেখানে ইল্লাহ্ উপস্থিত সেখানেই কেবল তা অনুসরণ করা উচিত। আর এটাই ক্বিয়াস। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিড়াল সম্পর্কে বলেন,

**"বিড়ালের লালা নাজাস (অপবিত্র) নয়"**। সাথে সাথে তার কারণ উল্লেখ করে তিনি (সাঃ) বলেন,

**"কারণ এটি তোমাদের গৃহে আশেপাশে ঘুরাঘুরি করে অর্থাৎ গৃহপালিত।"** (বুখারী ও মুসলিম)

এর ভিত্তিতে বলা যায়, যে সকল প্রাণী গৃহের আশেপাশে ঘুরাঘুরি করে তার লালা অপবিত্র হবে না, যদি না বিপরীত দলিল পাওয়া যায়। তদ্রুপ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন,

**"দৃষ্টির কারণে কোন গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশে অনুমতি অত্যাবশ্যক।"** (বুখারী ও মুসলিম)

এর অর্থ হল গৃহে প্রবেশের আগে মুসলিমগণ অবশ্যই অনুমতি নিবে। কারণ ঘরের রয়েছে নিজস্ব পবিত্রতা ও একে আওড়া বলে পরিগণিত করা হয়। অনুমতি ছাড়া গৃহে প্রবেশের বিধান না থাকার কারণ হল নিষিদ্ধ কিছুর দিকে চোখ পড়া থেকে বিরত থাকা। তাঁর (সাঃ) ভাষায়, **"মিন আজলিন নাজর"** (দৃষ্টির কারণ) হচ্ছে ইল্লাহ্ অর্থাৎ অনুমতি প্রার্থনার পেছনে শারী'আহ্ কারণ। এজন্য কোন মুসলিমের নিজ গৃহে প্রবেশে অনুমতির প্রয়োজন নাই। যেহেতু এ ব্যাপারে ইল্লাহ্ অনুপস্থিত সেহেতু হুকুমও অনুপস্থিত। অন্যথায় হুকুম আগেরটি, যেমন তার বাসায় যদি কোন মেহমান বা এ জাতীয় কেউ এসে থাকে। সুতরাং যখন ইল্লাহ্ ফিরে আসে তখনও হুকুমও আসে। সুতরাং হুকুমের উপস্থিতি ইল্লাহ্'র সাথে সম্পর্কিত।

এই কারণে ক্বিয়াস একটি সংবেদনশীল ইস্যু। এটা বোঝা উচিত যে, ক্বিয়াস হল সেসব বুদ্ধিমান লোকের জন্য যারা শারী'আহ্ দলিল, হুকুম ও প্রেক্ষাপট বুঝতে সক্ষম। এটা কখনোই কোন ব্যক্তির কাছে আশা করা যায় না যে, সে খেয়াল-খুশি বা প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে ক্বিয়াস করবে। এটা সেসব ব্যক্তির জন্য সুনির্ধারিত যাদের রয়েছে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং উপলব্ধি। অন্যথায় সেটা হবে আল্লাহ্'র হুকুমকে বিনষ্ট করার উপকরণ এবং তা থেকে পরিষ্কার বিচ্যুতির কারণ। ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) বলেন, "ক্বিয়াস করা ততক্ষণ পর্যন্ত একজন ব্যক্তির দায়িত্বের মধ্যে পড়বে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে পূর্ববর্তী সুনান সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানবান হবে এবং সালাফদের উক্তি ও আরবী ভাষা যথার্থভাবে বুঝতে পারবে। তার বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থা উন্নত হতে হবে যাতে সে সন্দেহযুক্ত (বা সাদৃশ্যপূর্ণ) বিষয়সমূহের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং রায় প্রদানের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো না করে। যারা তার মতামতের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে তাদের কথা শুনতে আপত্তি করে না, কারণ তারা হয়ত এমন কিছু মনে করিয়ে দিবে যা সে ভুলে গেছে অথবা তার এমন কোন ভুলকে ধরিয়ে দিবে যা সে সঠিক ভেবেছিল। ক্বিয়াসের যথোপযুক্ত ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট উপলব্ধি। ক্বিয়াসকে ব্যবহার করে একটি হুকুম বের করার কাজ একজন মুজতাহিদ ছাড়া আর কারও জন্য বৈধ নয়।

আমাদের উল্লেখিত উপরে সবগুলো দলিলই যারা কুফর শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করায় এবং পক্ষপাতিত্ব করে, তাদের অবস্থানের দূর্বলতা ও অসারতাকেই প্রমাণ করেছে। এখন জানা দরকার এ বিষয়ে ইসলামের সুনির্দিষ্ট মতামত কি, যার জন্য ইজতিহাদের কোন প্রয়োজন নাই?

আক্বীদাসহ সমস্ত শারী'আহ্-ই এক আল্লাহ্'র উপর বিশ্বাস ও একমাত্র তাঁর ইবাদতের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'লা ইলাহা' এর অর্থ হল স্বর্গীয় মহিমা, ইবাদত ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসেবে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবাইকে অস্বীকার করা। 'ইল্লাল্লাহ্' অর্থ একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'কে এসব কাজের জন্য সুনিশ্চিতভাবে মেনে নেয়া। তিনি হলেন ইলাহ্, শাশ্বত এবং ইবাদত ও আইন প্রণয়ণের একমাত্র মালিক। ইবাদত ও আত্নসমর্পণ একমাত্র তাঁর কাছে এবং শারী'আহ্ সম্পর্কিত জ্ঞান এসেছে রাসূলুল্লাহ্ (সা:) এর মাধ্যমে। দু'টি স্বাক্ষ্যের দ্বিতীয়টির অর্থ হল মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহ্'র রাসূল। সে কারণে আইনগত বিষয়ে কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা:)-কেই অনুকরণ ও অনুসরণ করা উচিত।

এমনকি উসূল আল ফিক্হ ওহীর উৎসকে সংজ্ঞায়িত করার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যাতে এটা ছাড়া অন্য কোন উৎস থেকে বিধান না নেয়া হয়। এটা ইসতিম্বাত-এর মূলনীতিকে ঠিক করে দেয়ার প্রচেষ্টা চালায় যাতে এতে শারী'আহ্ বহির্ভুত কিছু অনুপ্রবেশ করতে না পারে। এজন্যই উসূল আল ফিক্হ সর্বপ্রথম যা আলোচনা করে তা হচ্ছে, হাকিম হলো আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং বিধান দেবার অধিকার শুধু তাঁর। শারী'আহ্'র নাযিলকৃত বাণী ছাড়া কোন হুকুমের বৈধতা নেই এবং শারী'আহ্র বাইরেও কিছু নেই ।

তারপর একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ইবাদত করা, তার প্রতি নিজেকে আত্নসমর্পণ করা ও তাকে ছাড়া আর কাউকে আইনদাতা হিসেবে মেনে না নেয়ার ব্যবহারিক ব্যাখ্যা প্রদান করার জন্য আসে ফিক্হ।

কুফর ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অর্থ হল ঐশী ব্যবস্থার পাশাপাশি কুফর ব্যবস্থাকে মেনে নেবার আহ্বান। অর্থাৎ, শর'ঈ বহির্ভূত হুকুমের আইনপ্রণেতাদের শর'ঈ হুকুমের আইনপ্রণেতার পাশাপাশি মেনে নেয়া। যার অর্থ হল আইনের উৎসের বহুত্বকে মেনে নেয়া। তাহলে আল্লাহ্'র একত্ববাদ কোথায় থাকল, যিনিই কেবল প্রকাশ্য ও গোপনে একমাত্র উপাসনার যোগ্য?

শিরক যেমন নিষিদ্ধ ঠিক তেমনি আইন প্রণয়নে তাঁর অংশীদারিত্বও নিষিদ্ধ।

সুতরাং শারী'আহ্ তার সামগ্রিকতা দিয়ে জাহেলী ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করাকে হারাম করেছে।

সীরাত থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা:)-এর দাওয়াহ্'র মাধ্যমে নিঃসন্দেহাতীতভাবে বুঝা যায় যে, উপস্থাপনের রীতিটি ছিল মৌলিক এবং তা ঐ বাস্তবতা দ্বারা প্রভাবিত ছিল না। যে কাজ বাস্তবতাকে প্রভাবিত করতে পারে তার মাধ্যমেই কাঙ্খিত পরিবর্তন ঘটতে পারে।. রাসূলুল্লাহ্ (সা:) এর দাওয়াহ্'র মধ্যে মক্কার কাফেরদের শিরকের কোন প্রভাব পড়েনি। তিনি তাদের ঐতিহ্য ও রীতিনীতিকে তোয়াক্কা করেন নি কিংবা সে সময় লোকদের মানা বা না মানা তার কাজে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করেনি। তৎকালীণ সমাজপতিদের তিনি কখনও তোষামোদ করেন নি, যদিও মক্কাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা:) এবং তাঁর দাওয়াহ্ ছিল প্রবল। তিনি প্রকাশ্যে জনসম্মুখে বলেছেন, **"আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহম্মদ (সা:) আল্লাহ্'র প্রেরিত রাসূল"**, যা বাস্তবিকভাবেই ইসলামের সামগ্রিকতাকে ধারণ করে এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোন বিশ্বাস বা শারীআহ্-কে প্রত্যাখান করে। এর ভিত্তিতে এই শাহাদাহ্-কে মক্কার অন্যান্য কাফির নেতৃবৃন্দের সাথে আবু জাহল প্রত্যাখ্যান করল। একই ভিত্তির উপর দাড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা:) কালো-সাদা, মুক্ত-দাস, ধনী-গরীব, আরব-অনারব, মূর্তিপূজারী-আহলে কিতাব, সবাইকে লক্ষ্য করে এই শাহাদাহ্'র বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের সমালোচনা করে তাদের সাথে দ্বন্দে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন এবং চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে তারা ছিল শক্রভাবাপন্ন। তারা তাঁর সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিল এবং তাকে (সা:) আহ্বান জানিয়েছিল যাতে তিনি তাদের ব্যাপারে চুপ থাকেন এবং ফলে তারাও রাসূলুল্লাহ্ (সা:)-এর ব্যাপারে নীরব থাকতে পারেন। তাদের ইচ্ছা এরকম ছিল যে, যদি রাসূল (সা:) আপোষ করেন তাহলে তারাও আপোষরফা করে নিবে। তিনি (সা:) তা গ্রহণ করেননি এবং দাওয়াহ্'র সময় তার উপর আসা অত্যাচার এবং সাহাবীদের (রা.) উপর নির্যাতনের সময় ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। বিশ্বাসীরাও এসময় ধৈর্য ধারণ করেছিল। তাদের সবার ধৈর্য ছিল দাওয়াহ্'র সত্যবাদিতা ও তাদের উচ্চারণের স্মারক। এছাড়াও দাওয়াহ্'র কঠিন সময়ে যখন কোন সাহায্যকারী ছিল না তখন তিনি (সা:) দ্বীনকে সহায়তার (নুসরাহ্) আহ্বান নিয়ে বনু শা'শার কাছে যাবার পর তারা যে শর্ত দিয়েছিল তাও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তারা রাসূল (সা:) কে নুসরাহ্ (শাসনক্ষমতা অর্জনে সহায়তা) প্রদানে প্রস্তুত ছিল এই শর্তে যে, তাঁর (সা:) মৃত্যুর পর কর্তৃত্ব কেবলমাত্র তাদের হবে। তিনি (সা:) এরূপ বলেননি যে এটি একটি সুযোগ যা থেকে উপকার পাওয়া যাবে, যেহেতু তাঁর সামনে অন্য সকল

দরজাই বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। বরং তিনি একজন শিক্ষক, নেতা, দাওয়াহ্ বহনকারী ও পথপ্রদর্শক হিসেবে তাদেরকে এবং তাদের মাধ্যমে আমাদেরকেও জানালেন যে,

**"কর্তৃত্ব কেবলমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র এবং তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তা প্রদান করেন।"**

এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, কর্তৃত্ব কেবলমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র এবং এতে কেউ শরীক নয়। কেবলমাত্র আল্লাহ্ যাকে পছন্দ করেন তাকেই তা প্রদান করেন এবং তখন কারও কোন কিছু বলার থাকে না। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র সহায়তা ও ফিক্রার দৃঢ়তার উপর ভরসা ছাড়া আর কোন কিছুর উপর নির্ভর না করেই রাসূলুল্লাহ্ (সা:) দাওয়াহ্ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। দাওয়াহ্ তখনই তার লক্ষ্যে পৌঁছালো যখন মদীনাতে আল্লাহ্'র ইচ্ছায় মদীনাবাসীর হৃদয়-মন খুলে যাবার দরুণ মুহম্মদ (সা:)-কে সহায়তা ও সমর্থন প্রদানের মাধ্যমে দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হল। তারা কেবলমাত্র আল্লাহ্'র উপরই নির্ভর করেছিল, তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করেছিল এবং চিন্তার বিশুদ্ধতা, উপলব্ধির স্বচ্ছতা, পদ্ধতির বিশুদ্ধতা ও কর্মকান্ডের সঠিকতা বজায় রেখেছিল।

এখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র আইন ছাড়া অন্য আইন দিয়ে শাসনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আলোচনার শেষের দিকে আমরা বর্তমান শাসনব্যবস্থার বাস্তবতা ও এতে অংশীদার হওয়ার স্বরূপ উপস্থাপন করব। তারপর আমরা এটি নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কুর'আনের আয়াত ও সহীহ্ হাদীস উল্লেখ করব এবং কোন প্রকার ব্যাখ্যা ছাড়াই এ প্রসঙ্গে সমাপ্তি টানব কারণ আয়াতগুলো তাদের অর্থের দিক থেকে সুনির্দিষ্ট।

যেকোন দেশের সংবিধান একটি সুনির্দিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হোক সেটা গণতান্ত্রিক বা ইসলামী, যাতে কোন আইন এই সুনির্দিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্বাস ও ভিত্তি ব্যতিরেকে অন্য কিছু থেকে উৎসারিত না হতে পারে।

সুতরাং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনকে অবশ্যই এর ভিত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব জনগণের জন্য। জনগণ তাদের নির্বাচিত একটি এসেম্বলীর মাধ্যমে তার নিজের আইন তৈরি করে এবং একে বলা হয় পার্লামেন্ট বা সংসদ। শাসন করার ক্ষেত্রে এটা জনগণ প্রদত্ত নির্বাহী ক্ষমতাবলে আইন প্রণয়ন করে থাকে। সরকারকে জনগণের শাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য সংসদকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যাতে সরকারকে আস্থা ভোটের মাধ্যমে পরীক্ষা করা যায়। আস্থা ভোট ব্যাতিরেকে এটা বৈধতা পায় না। একে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যাতে সে সরকারের কর্মকান্ডের নিরীক্ষা, নিয়ন্ত্রন ও জবাবদিহীতা করতে পারে। একইভাবে সরকার আইন ভঙ্গ করলে বা সংবিধানের রীতিনীতির বাইরে কিছু করলে এটি পুরো সরকার বা বিশেষ কোন মন্ত্রনালয় থেকে আস্থা উঠিয়ে নিতে পারে।

সুতরাং এ ব্যবস্থায় সরকারের কাজের ভিত্তি হল গণতন্ত্র, কোনক্রমেই ইসলাম নয়। আমরা ইতিমধ্যে পূর্বের এক আলোচনায় বলেছি যে, ইসলাম এমন কোন কাজকে গ্রহণ করে না যার কোন আধ্যাত্মিক ভিত্তি নাই অর্থাৎ এটা হল আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র উপর ঈমান।

এ ব্যবস্থার রয়েছে একটি সামগ্রিক কাঠামো যেমনি রয়েছে তাদের একক ভিত্তি। যে কর্মসূচী তারা বাস্তবায়ন করতে চায় তাও একটি এবং তা সম্পাদন করে থাকে বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে। একটি মন্ত্রনালয়ের কর্মসূচী সাথে অন্য মন্ত্রনালয়ের কর্মসূচীর সুসামঞ্জস্যতা থাকতে হবে। সরকারই একসাথে এ নীতিকে নিয়মে পরিণত করে। অনেক কণ্ঠের মাঝে একা একজন মুসলিম মন্ত্রীর কণ্ঠে কিছুই হবে না, বরং সম্মিলিত কণ্ঠের মাধ্যমে যে মত জন্ম নেয় তা দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংবিধান ও এর মূলনীতির ভিত্তিতে আইনের রূপরেখা তৈরী করেন। এটি হল আইনগত দৃষ্টিভঙ্গি। তবে এর চিন্তা ও বাস্তবায়নের পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। সরকারের নেতৃবৃন্দ এবং তাদের সভাসদগণ বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রীদের নির্বাচিত হবার আগেই সরকারের কর্মসূচী নির্ধারণ করে থাকেন। মন্ত্রীদের এই পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা ছাড়া আর কোন ফুরসৎ থাকে না। তার মন্ত্রনালয়ের জন্য আলাদা করে কোন কর্মসূচী গ্রহণের সুযোগ নেই।

তাছাড়া মন্ত্রীর দায়দায়িত্ব হল একটি যৌথ দায়িত্ব। এর অর্থ হল যখন সরকার কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয় ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতই প্রাধান্য পায়। অর্থাৎ, একজন মন্ত্রী অন্য মন্ত্রীর কাজে হস্তক্ষেপ করে এবং সরকারের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গিকেই তুলে ধরে। এভাবে একজন মুসলিম মন্ত্রী সব ব্যাপারে দায়বহন করে

- সেটা তার মন্ত্রনালয় থেকে উদ্ভুত বা সম্পর্কিত বিষয় হোক অথবা অন্য কারো মন্ত্রনালয়ের ব্যাপারে হোক। এমতাবস্থায় সে বাইরে থেকে এবং জনসম্মুখে সরকারের যে কোন কর্মসূচীর পক্ষাবলম্বন করতে বাধ্য- যদিও সে মন্ত্রনালয়ের ভেতরে এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছিল। এখানে একজন মনে করতে পারে যে, মুসলিম মন্ত্রীগণ ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক যে কোন কিছুর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে পারে। এধরনের বিষয় সত্যিই অগভীর চিন্তার ফল। মন্ত্রী সংসদ সদস্য থেকে ভিন্ন। সুতরাং, বাস্তবায়ন নয়, বরং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য তাদেরকে প্রতিনিধিত্ব করেন যারা তাকে নির্বাচিত করেছে। তিনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন অথবা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বামপন্থীদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। কিন্তু, একজন মন্ত্রীকে কখনোই মন্ত্রনালয়ে আনা হয় না বিরোধিতা করবার জন্য। যদি করে তাহলে বিরোধিতার জন্য তাকে মন্ত্রীসভার বাইরে অবস্থান নিতে হবে। সুতরাং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের বা তার কর্মসূচীর বিরোধিতাকারী কেউই এর ভেতরে থাকতে পারেন না বা ভেতরে প্রবেশের অনুমতি নেই। যদি সে ভুলক্রমে প্রবেশ করেও থাকে তাহলে তাকে জোরপূর্বক বের করে দেয়া হয়। সরকার আসে শাসন ও বাস্তবায়ন করতে। তাদের কিছু নীতিমালা থাকে যা তারা বাস্তবায়ন করতে চায়। পরস্পরবিরোধীদের সমন্বয়ে তা হতে পারেনা। যে কেউ এ নীতির বাইরে যাবে তাকে প্রধানমন্ত্রী অথবা অন্যদের সমন্বিত আমন্ত্রনে বেরিয়ে যেতে হবে। এমপিরা ব্যক্তিগতভাবে তার উপর থেকে আস্থা তুলে নিবে এবং সরকারের কার্যক্রম চলতে থাকবে।

এখানে একটি কথা বলা অপরিহার্য যে, কুফর শাসনব্যবস্থার মন্ত্রীসভায় মুসলিমদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের বর্তমান সংবিধান ও এটি যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাকে বৈধতা দেয়া হয়। উপরে উল্লেখিত তাদের এরূপ বিরোধীতা ভিত্তিমূল থেকে ঐ (কুফর) ব্যবস্থার বিরোধিতা নয়, বরং এ হচ্ছে ব্যবস্থার ভেতরে স্থান নিয়ে বিরোধীতা যা কিনা এমনধরণের বিরোধীতা যাতে ঐ (কুফর) ব্যবস্থার মূল ভিত্তিকে মেনে নিয়ে কেবল শাখা-প্রশাখা নিয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয়।

তাছাড়া যখন কোন মন্ত্রনালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আইন গৃহীত হয় তখন তা ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ বা কার্যকারিতায় আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনটি পক্ষ থেকে অনুমোদন ও স্বাক্ষর না পাওয়া যায়। এরা হলেন রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী। এর অর্থ হল মুসলিম মন্ত্রী তার ইচ্ছা অনুযায়ী মন্ত্রনালয় চালাতে পারেন না ও বাস্তবসম্মত আইনও জারি করতে পারেন না।

এ থেকে আমরা কিছু বিষয় স্পষ্ট হতে পারি:

-যে সব আইন দ্বারা শাসক শাসন করে সেগুলোর আধ্যাত্মিক ভিত্তি (যা হলো আল্লাহ্'র উপর বিশ্বাস) নেই কিন্তু গণতান্ত্রিক ভিত্তি রয়েছে-যেখানে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক কিন্তু আল্লাহ্ নন।

-সরকার হল নির্বাহী কর্তৃপক্ষ। এ কর্তৃপক্ষ শাসন ও নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সংবিধানের অনুশাসন কায়েম করে থাকে। মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রীসহ পুরো সরকারের প্রত্যেকেই সংবিধানের হুকুম মেনে চলতে বাধ্য; অন্যথায় এটা ভঙ্গের অভিযোগে তারা অভিযুক্ত হবে।

-মুসলিম মন্ত্রীসহ কোন মন্ত্রীই তার মন্ত্রনালয়ের জন্য স্বতন্ত্রভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেন না। বরং তিনি রাষ্ট্রের প্রধানসহ সামগ্রিকভাবে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় সেটাই বাস্তবায়ন করেন।

-প্রত্যেক মন্ত্রী সরকারের যে কোন কর্মকান্ড ও সিদ্ধান্তের দায়বহন করে। কারণ আইন অনুসারে মন্ত্রীপরিষদ সামষ্টিকভাবে ও যৌথভাবে দায়িত্বশীল।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, এ ব্যবস্থায় কেউ মন্ত্রীপরিষদ ব্যতিরেকে এককভাবে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের এখতিয়ার রাখেন না। আর এটাই হল এসব সরকারের বাস্তবতা। এই ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে পবিত্র কুর'আনে অনেক আয়াত রয়েছে।

-আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এটা বাধ্যতামূলক করেছেন যে, হুকুম দেবার মালিক কেবলমাত্র তিনি, যা একটি ভিত্তি এবং এই ভিত্তি থেকেই আইন উৎসারিত হয়। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**"কিন্তু না, তোমার রবের শপথ! ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার (মুহাম্মদ (সা:)) উপর ন্যস্ত না করে এবং কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই সন্তুষ্ট চিত্তে তোমার (মুহাম্মদ (সা:)) সিদ্ধান্ত মেনে নেয়।"** [আন-নিসা: আয়াত ৬৫]

তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**"আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত আসার পর তাতে ভিন্নতা পোষণ করা মু'মিন পুরুষ কিংবা নারী কারও ক্ষেত্রেই সঙ্গত নয়।"** [সূরা আল আহ্যাব ঃ ৩৬]

-আল্লাহ্ এটা বাধ্য করেছেন যে, শাসককে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্'র নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল তাদের।"** [সূরা আন নিসা: ৫৯]

-আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিম শাসকদের ইসলাম দিয়ে শাসন করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**"আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী ফয়সালা করুন.....।"** [সূরা মায়িদাহ্ :৪৯]

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিম শাসকদের ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শাসন না করার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন, যদি তা মাত্র একটি আইনও হয়। তাই তিনি বলেন,

**"...যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ্ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন।"** [সূরা মায়িদাহ্:৪৯)

তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যারা কুফর দিয়ে শাসন করে তাদের সাথে তলোয়ারী দিয়ে ফায়সালা করার জন্য। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা:) কে ফাযির শাসকদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ারী ধরা যাবে কিনা? উত্তরে তিনি বলেন,

**"যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা (তার) প্রকাশ্য কুফরী দেখতে পাও যাতে তোমাদের পক্ষে তোমাদের কাছে আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রমাণ থাকে।"** (মুসলিম)

-তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শাসকদের উপদেষ্টা ও পরিষদবর্গকে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কিছুর অনুসরণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন।

**"হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে (উপদেষ্টা, সাহায্যকারী, রক্ষাকারী) গ্রহণ করো না।"** [সূরা আল ইমরান: **১১৮**]

-আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিমদের ইসলামের দ্বারস্থ হতে বলেছেন এবং এ ব্যাপারে তাগুতকে পরিত্যাগ করতে বলেছেন। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি এটা না করে সে সত্যিকারের ঈমানদার নয়। তিনি বলেন,

**"আপনি কি তাদেরকে প্রত্যক্ষ করেননি যারা দাবী করে যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে সেই সব বিষয়ের উপর তারা ঈমান এনেছে কিন্তু তারা (বিরোধপূর্ণ বিষয়ের) মিমাংসার জন্য তাগুতের শরণাপন্ন হতে চায়, অথচ তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।"** [সূরা নিসা ঃ ৬০]

-আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিমদের ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

**"হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্ যে জাতির প্রতি রুষ্ট, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তারা পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে যেমন কবরস্থ কাফেররা নিরাশ হয়ে গেছে।"** [সূরা মুমতাহিনা: **১৩**]

এবং তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন,

**"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে তোমাদের বন্ধুরূপে গ্রহন করো না। তারা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ্ বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন, ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্য সেদিন অনুতপ্ত হবে।"** [সূরা মায়িদাহ্ : ৫১-৫২]

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, আজকের দিনে শাসকরা ইহুদী বা খ্রীস্টান নয়। প্রকৃত অর্থে তারা ইহুদী বা খ্রীস্টানদের প্রতি অনুগত। যে এই শাসকদের আনুগত্য করে সে যেন তাদেরই আনুগত্য করে যাদের প্রতি ঐ শাসকরা অনুগত।

তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**"আর যারা কাফের তারা পারস্পরিক সহযোগী বন্ধু। তোমরাও যদি তা না কর (অর্থাৎ এক খিলাফতের অধীনে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ না হও) তাহলে দুনিয়ার বুকে ফিত্না (যুদ্ধ, বিগ্রহ) ও যুলুম বিস্তার লাভ করবে এবং দুষ্কর্ম ও দূর্নীতি ছেয়ে যাবে ।"** [সূরা আনফাল:৭৩]

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের প্রতি অনুগত না হবার অর্থ এটা নয় যে তারা ব্যতীত অন্যদের আনুগত্য করা যাবে। বরং এখানে ইস্যুটি হল যে বা যা কিছু ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক তার সাথে সম্পর্ক না রাখা। তাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা থাকার অর্থ হল তাদের সাথে চিন্তা, ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোনরূপ সম্পর্ক না রাখা এবং তাদের পক্ষ থেকে কোন কিছু গ্রহণ না করা যতক্ষণ পর্যন্ত এর ভিত্তি হল কুফর। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইব্রাহীম (আ:) এর মুখ দিয়ে বলেন,

**"তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্'র পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমরা এক আল্লাহ্'র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে......"** [মুমতাহিনা:৪]

ওয়ালা (আনুগত্য) কেবলমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, তাঁর রাসূল (সা:) ও মু'মিনদের প্রতি। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**"আর যারা আল্লাহ্, তাঁর রসুল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহ্'র দল এবং তারাই বিজয়ী।"** [সূরা মায়িদাহ্ : ৫৬]

এখানে আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের বিষয়টি গ্রহণ করার অর্থ এই নয় যে আমরা ঐ ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য দেখাচ্ছি। কেউ বলতে পারে, আমরা আনুগত্যের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মডেলটিকে (প্রভাব বিস্তার করার আগ পর্যন্ত আনুগত্য দেখাই) অনুসরণ করি কিন্তু আমাদের মন তাদের কাজগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে। সত্য কথা হল আনুগত্য হল এমন একটি বিষয় যেখানে শরীর ও মনের অংশীদারিত্ব রয়েছে। আমরা অবশ্যই এসব শাসক যা করে তা হাত, জিহ্বা ও হৃদয় দিয়ে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য, যখন সে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা নাযিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শাসন করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেন, হৃদয় দিয়ে ঘৃণা করা হল ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর এবং এর পরে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যাদের হৃদয় ঈমানের দূর্বলমত স্তরে রয়েছে তারা তাদের কাজ ও বক্তব্যের মাধ্যমে অনৈসলামিক শাসনকে সমর্থন দেয়া উচিত নয়। যারা এর ব্যাত্যয় ঘটায় তারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে অমান্য করছে ও পাপে লিপ্ত আছে যদিও তারা মনে মনে একে প্রত্যাখ্যান করে। আর যদি তাদের মনও এটা অনুমোদন করে নেয় তাহলেতো তারা কুফরে লিপ্ত। যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কোন কিছু দিয়ে শাসনকারীদের সাথে অংশগ্রহণ করে তাদের সম্পর্কে একজন সর্বনিম্ন এতটুকু বলতে পারে যে, সে ব্যক্তি ফাসিক (পাপাচারী), যালিম বা যুলুমকারী এবং আ'সী বা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অবাধ্য।

# ১৬

# খন্ডিত সংস্কার ও আমূল সংস্কার

মুসলিমদের আজকের এ করুণ দশায় অবস্থার পরিবর্তন ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মত উত্তম বিকল্পের জন্য কাজ করতে অনেক ইসলামী আন্দোলনের উন্মেষ ঘটেছে। এ আন্দোলনগুলো মূলত দু'ধরনের। প্রথম ধরনের আন্দোলন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার দাওয়াহ্'র ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। সুতরাং তারা, যা ধ্বংস হয়েছে তা ঠিক করার চেষ্টা করে এবং যা দূষিত হয়ে গেছে তার সংস্কার সাধনের চেষ্টা করে। দ্বিতীয় ধরনের আন্দোলন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পথের উপর নির্ভর করে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গী হল, ভিত্তিমূল যেখানে দূর্নীতিগ্রস্ত হয়ে গেছে সেখানে সংস্কার সাধন করে বাস্তবে তেমন কোন সুফল পাওয়া যাবে না, তাই খন্ডিত সংস্কার আদৌ কোন কাজে আসবে না।

এ দুই আন্দোলনের চিন্তার পার্থক্যের দরুণ বাস্তবতাকে বিশ্লেষণের ও এর প্রতি আচরণের প্রক্রিয়া ভিন্ন হয়ে গেছে। ফলতঃ কাজের প্রক্রিয়া ও দাওয়াহ্'র পদ্ধতিও ভিন্ন ।

সুতরাং এ ব্যাপারে শারী'আহ্র দৃষ্টিভঙ্গি কী?

শারী'আহ্ আইন উপলব্ধি করতে হলে আমাদের ইসলামী চিন্তার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। এর কারণ হল ভিত্তি নিয়ে আলোচনা না করলে শারী'আহ্ হুকুমের ব্যাপারে জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়।

শারী'আহ্ পদ্ধতি অনুযায়ী অগ্রসর হতে হলে আমাদের সামনের উপস্থিত বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারনা থাকতে হবে, সেই বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শারী'আহ্ দলিলসমূহ অনুসন্ধান করতে হবে এবং অতঃপর এগুলোকে আইনগত প্রক্রিয়ায় বুঝতে হবে।

এটা সর্বজনবিদিত যে, পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম সংস্কার পদ্ধতির কথা বলে যখন সংস্কার কার্যত অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং পরিবর্তন পদ্ধতির কথা বলে যখন পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং শারী'আহ্র দৃষ্টিতে বর্তমান বাস্তবতায় কি করা প্রয়োজন?

আমাদের কী সংস্কার প্রয়োজন নাকি আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন?

উভয়ক্ষেত্রে রায় নিতে হবে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র কাছ থেকে এবং এর ভিত্তি হতে হবে শারী'আহ্ দলিল। যে বাস্তবতাকে পরিবর্তন বা সংস্কার করা হবে তার উপর মুলতঃ দাওয়াহ্'র প্রকার (সংস্কার নাকি পরিবর্তন) নির্ভর করে।

পরিবর্তনের ক্ষেত্রে হোক সেটা ব্যক্তির চিন্তা পরিবর্তন অথবা তার অবস্থা পরিবর্তন অথবা সমাজের পরির্বতন অথবা মানুষের বা জাতির পরিবর্তন, মুলতঃ এটা শুরু হওয়া উচিত মানুষ, সমাজ ও তার অবস্থা যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেটা থেকে। কারণ এই ভিত্তি থেকেই মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রনকারী সকল বিশ্বাস ও চিন্তা উদ্ভূত হয়। এই ভিত্তি এবং তা সংশ্লিষ্ট আংশিক ও পারিপার্শ্বিক সকল চিন্তার উপর নির্ভর করে মানবজাতির সুখ-দুঃখ, পুনর্জাগরণ কিংবা অধঃপতন।

মুসলিম ও ইসলামী সমাজ যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা হল ইসলামী আক্বীদা। মুসলিমের অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের কোন কার্যক্রম এই আক্বীদা এবং এর আওতা থেকে একচুল বিচ্যুত হওয়ার সুযোগ নাই।

ইসলাহ্ বা সংস্কারের মধ্যে তাগীর বা পরিবর্তনও অন্তর্ভুক্ত। যদি ভিত্তি ঠিক থাকে তবে এটা কেবলমাত্র শাখা-প্রশাখা নিয়ে কাজ করে, মৌলিক ভিত্তি নিয়ে নয়। অন্যথায় এটা ভিত্তিকেই সঠিক ও পরিশুদ্ধ করার কাজ করে।

যদি ভিত্তি ঠিক থাকে কিন্তু এতে কিছু অস্পষ্টতা থাকে অথবা কোন চিন্তা দ্বারা এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও তা প্রাধান্য বিস্তার করে, সেক্ষেত্রে কাজটি হবে সংস্কারমূলক কিন্তু পরিবর্তনমূলক নয়। মূল ভিত্তিতে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা ফিরিয়ে আনাই হবে আসল কাজ

এবং এর মাধ্যমে এটি শক্তিশালী হবে। এতে করে শাখাপ্রশাখাসমূহেও এ পরিবর্তনের ছোঁয়া টের পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমা চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত একজন মুসলিমকে দাওয়াহ্'র বেলায় তার ঈমানকে বিশুদ্ধ করা এবং তার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার দাওয়াহ্ করতে হবে যাতে সে সঠিক পথে আসে এবং তার চারিত্রিক ত্রুটি দূর হয়। আবার গুনাহ্‌গার মুসলিমকে দাওয়াহ্ প্রদানের ক্ষেত্রে তার ঈমান বৃদ্ধির দিকে শ্রম দিতে হবে যাতে তার ভেতর আবেগের সঞ্চার ঘটে যা তাকে তাক্বওয়া বৃদ্ধির দিকে ধাবিত করে এবং গুনাহ্ দিকে ধাবিত হওয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কোন মুসলিমের জন্য যা প্রযোজ্য ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যও তা প্রযোজ্য। উদাহরনস্বরূপ যখন আমরা কোন কাফিরকে ইসলামের দাওয়াহ্ দিব তখন তা হবে পরিবর্তনের দাওয়াহ্। কারণ তার বিশ্বাসের ভিত্তি এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত ও উৎসারিত সবকিছুই ভুল। সুতরাং সঠিক ভিত্তি দিয়ে একে সরাতে হবে। তাই ভিত্তিকে পাশ কাটিয়ে শুরুতেই আমরা একজন কাফিরকে নামাযের দাওয়াহ্ দেই না। এটাই রাসূলুল্লাহ্ (সা:) করেছেন এবং এটাই বাস্তবতায় পরিলক্ষিত। একজন কাফিরের সকল কাজই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিকট অবৈধ ও অগ্রহণযোগ্য, তা এখন যত ভালোই হোক না কেন এবং কোন কাফিরই তার কর্মগুণে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না কারণ তার কোন কর্মই আল্লাহ্ প্রদত্ত ঈমানের উপর ভিত্তি করে সম্পাদিত হয়নি। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

**"এবং আমি তাদের (কাফির, মুশরিক) কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণারূপ করে দিব।"** [সূরা আল-ফুরকান: ২৩]; একইভাবে যদি একজন মুসলিম ঈমান ত্যাগ করে মুরতাদ হয় তবে তার সমস্ত কর্মই বৃথা হয়ে যাবে। সুতরাং, ঈমান হচ্ছে সমস্ত কর্মের মূল ভিত্তি।

যখন আমরা একজন মুসলিমকে দাওয়াহ্ করব তখন তা হবে সংস্কারমূলক। কারণ তার মূল ভিত্তি ঠিক আছে। তাকে দাওয়াহ্ করতে হবে যাতে সে ত্রুটিমুক্ত হয় এবং যে কারণে সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং নিষ্ঠা দূর্বল হয়েছে, সে কারণ দুর করা যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত ভিত্তি ঠিক আছে ততক্ষণ পর্যন্ত এর উপর নির্ভর করে তাকে বিকশিত করা, শক্তিশালী করা, ফলপ্রসূ করা ও বিশুদ্ধ করা সম্ভব হবে। এর ফলে সে সঠিক পথে যাবে এবং প্রকৃত নিষ্ঠা অর্জন করবে। যদি কোন মুসলিম মদ খায়, যিনাহ্ করে, চুরি করে, সুদ খায় এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থা পুণঃপ্রতিষ্ঠার দাওয়াহ্'কে অবহেলা করে তাহলে তার ঈমানকে পরিশুদ্ধ করলেই সে পরিশুদ্ধ হবে। সে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে, যিনি জীবনের সবকিছুর পরিচালক, যাকে উপাসনা ও মান্য করা হয়। তার অপরাধ কত ছোট সেদিকে সে লক্ষ্য করবে না, বরং লক্ষ্য করবে যে স্রষ্টা কত মহান। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে সে স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ মান্য করবে। তাকে অবশ্যই খারাপ কাজের পরিমাণ সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, অর্থাৎ প্রজ্জলিত আগুনের কথা। অন্যদিকে, ভাল কাজের পুরস্কারের কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ পরকালে আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পুরস্কারের কথা। সুতরাং একজনকে বিচার দিবসের ভয়াবহতা ও জাহান্নামের কঠিন আযাব এবং জান্নাতের নেয়ামত সম্পর্কে মনোযোগী হতে হবে। এভাবে তার মধ্যে ঈমানের ভাব জাগ্রত হবে এবং আনুগত্যের দিকে ছুটে যাওয়া ও গুনাহ্ থেকে মুক্ত হবার জন্য সে তৎপর হবে। এ পদ্ধতি ছাড়া মুসলিমদের সংশোধন করা যাবে না। সে কারণে আজকে আমাদের দাওয়াহ্'র মধ্যে ব্যক্তি মুসলিমকে মুসলিম বিবেচনায় এনে তাদের চিন্তাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে এবং আচরণকে সংস্কার করতে হবে।

রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয় সংবিধানের মাধ্যমে এবং এই সংবিধান একটি উৎসের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে এবং এই উৎস আবার একটি ভিত্তির উপর অবস্থান করছে। এ বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে। রাষ্ট্র কি ইসলামী আক্বীদার উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে এবং কেবলমাত্র কুর'আন ও সুন্নাহ্‌তে যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সেটি কী আইনের উৎস হিসেবে নেয়া হয়েছে? সংবিধানের কানুনসমূহ কী নাযিলকৃত আদেশ থেকে বিচ্যুত হয়েছে কিনা? যদি এগুলোর উত্তর ইতিবাচক হয় তাহলে রাষ্ট্রটি ইসলামী রাষ্ট্র।

যদি ইসলামী রাষ্ট্রে দূর্নীতি ও অপপ্রয়োগ ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে তখন সে অবস্থায় পরিবর্তন নয়, সংস্কার প্রয়োজন। এ অবস্থা ওসমানিয়া খিলাফতের শেষের দিকে দেখা গিয়েছিল। এর সংস্কার অপরিহার্য এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পশ্চিমা কুফরদের তা ধ্বংসে সহযোগিতা করা কোনক্রমেই অনুমোদিত নয়। কিন্তু এটাই করেছিল (হিজাযের) তথাকথিত শরীফ হুসেইন।

কিন্তু রাষ্ট্র যদি ইসলামী আক্বীদা'র ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং এই অনৈসলামী আক্বীদা'র উপর ভিত্তি করে যদি তার সংবিধান, ব্যবস্থা ও আইন প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সংস্কার নয়, পরিবর্তন প্রয়োজন। মুসলিমগণ আজকে এ ধরনের রাষ্ট্রে বসবাস করছে। এ রাষ্ট্রসমূহ অনৈসলামিক। কারণ তাদের ব্যবস্থাপনা ইসলামী শারী'আহ্ থেকে উৎসারিত হয়নি, যদিও তারা বলে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। কেননা এক্ষেত্রে কোন নাম বা উক্তি বিষয় নয় বরং এর অর্থ ও বাস্তবায়নই মুখ্য।

সুতরাং মুসলিমদের পরিচালনাকারী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সংবিধান, কেবলমাত্র কুর'আন ও সুন্নাহ্'র উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত নয়। এই কারণে বাস্তবতা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছে সার্বিক পরিবর্তনে ধাবিত হতে, আংশিক নয় এবং এই পরিবর্তন হচ্ছে শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি ও বুনিয়াদের মৌলিক পরিবর্তন। এই বাস্তবতাকে কখনওই দায়সারা গোছের সংস্কারমূলক কাজ দিয়ে পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না, বরং এটা সামগ্রিক, মৌলিক ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ভিত্তিতে হতে হবে। অন্যকোন ভিত্তির উপর নির্ভর করে অন্যকোন পথে এটা করা অনুমোদিত নয়। প্রকারান্তরে এটা কুফরী ব্যবস্থাকে মেনে নেয়ার শামিল এবং বাস্তবতার নিরীখে শারী'আহ্ বিবর্জিত দাবি কেননা বাস্তবতা হল আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা বাদ দিয়ে অন্য কোন কিছু দিয়ে শাসনকার্য পরিচালিত হচ্ছে। সেই কারণে আমরা দেখতে পাই, বর্তমান প্রচলিত শাসনব্যবস্থার সাথে অংশগ্রহণকৃত দলসমূহ মূলত সহাবস্থান করছে ও সেখানে নিজেদের একটি অবস্থান করে নেয়ার জন্য প্রচেষ্টায় রত। যে বাস্তবতায় তারা সংস্কার সাধন করতে চায় তাতে এই প্রচেষ্টা নেহায়েত আংশিক; কেননা তাদের কর্মসূচী আংশিক। তারা সাদৃশ্যপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক তৈরি করে এবং এটাকে তাদের ও ব্যবস্থার মধ্যে সংলাপের সূচনা হিসেবে মনে করে। তারা ইসলামী রঙে দেশকে রাঙানোর চেষ্টা করে যদিও এর নির্যাস হচ্ছে অনৈসলামী আর একে তারা ইসলামের ছদ্মাবরনে প্রদর্শন করে যদিও এই রং এর নির্যাসের কাছাকাছি পৌঁছে না।

পরিবর্তনের জন্য দাওয়াহ্ বহনকারীগণ অন্যদের থেকে সবদিক থেকে আলাদা, তাদের আচরণ এবং যে বাস্তবতা পরিবর্তনের জন্য তারা কাজ করছে। কারণ তাদের সকল চিন্তা তাদের বিশ্বাসের সাথে যুক্ত। ভিত্তির (ভিন্নতার) কারণেই বর্তমান বাস্তবতাকে তারা প্রত্যাখান করে। ভিত্তিকে প্রত্যাখ্যানের কারণে যা কিছু এই ভিত্তি থেকে উৎসারিত হয় তাও তারা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও কিছু আংশিক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

তাই তারা সরাসরি এ প্রক্রিয়াকে উপস্থাপন করে , এই মডেলের সামগ্রিক চিত্র জনগণের কাছে তুলে ধরে যা তাদের মন-মগজে বিদ্যমান। এই মডেল তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবীদের সময়ে নিয়ে যায়। তারা যে বাস্তবতায় বসবাস করে সেটাকে এর ভিত্তিসহ সমালোচনা করে। সেকারণে সব দেশে এ দলের আচরণ একই রকম। কারণ বিভিন্ন দেশে কাফের উপনিবেশবাদীরা মুসলিমদের যে বাস্তবতার দিকে ঠেলে দিয়েছে তা একই ও সাদৃশ্যপূর্ণ এবং এজন্য এর সমাধানও একই।

পশ্চিমারা তাদের উপনিবেশবাদের শুরু থেকেই মুসলিমদের কুর'আন ও সুন্নাহ্ যাতে তাদের আইনের উৎস হিসেবে কাজ করতে না পারে সেবিষয়ে সচেষ্ট ছিল। আর এটা তখনই সম্ভব হয়েছে যখন ইসলামী দ্বীনকে জীবনের বাস্তবতা ও এর সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে এবং এভাবে তারা সফলও হয়েছে। আর এই পরিণতি ছিল আমাদের জন্য ভয়াবহ। আজকে বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনগুলো যেভাবে পশ্চিমাদের তৈরি কৃত্রিম বিষয়গুলো নিয়ে ব্যস্ত নিয়ে তা ভাবতে অবাক লাগে; তারা সমূল এসবকে উৎপাটনের বদলে এগুলোকে সংস্কারের জন্য কাজ করে। অবশ্যই এ খন্ডিত সংস্কারমূলক কাজ বাস্তবতাকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে না। যারা বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে অক্ষম, তারা এর নিয়মকানুনও বুঝতে পারবে না। সেকারণে তারা অবশ্যই কাজের সত্যিকারের পদ্ধতি ও সুন্নাহ্ থেকে বিচ্যুত হবে।

যারা আজকের দিনে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র প্রতি মানুষকে আহ্বান করেন তারা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই হাদীসটি ভুলে যাবে না, যেখানে বলা হয়েছেঃ

**"....অতঃপর আবার আসবে খিলাফত নব্যুয়তের আদলে।"** [মুসনাদে আহ্মাদ]

যারা নব্যুয়তের আদলে খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রত্যাবর্তন চায় তাদের অবশ্যই মানবশ্রেষ্ঠ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সীরাত অনুসরণ করা ছাড়া আর কোন পথ নেই, যাঁর প্রচেষ্টায় আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র সাহায্য ফলদায়ক হয়েছিল এবং এর ফলে মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম এই উম্মাহ্ অস্তিত্ব লাভ করেছে। নবীদের (আঃ) জীবন এবং তাদের অনুসারীদের জীবন একই সুতায় বাঁধা। আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র কাছে প্রার্থনা করি যেন আমরা এই সুঁতার একটি অংশ হতে পারি। সে কারণে আমরা আল মুস্তাফা (সাঃ)-এর জীবনকে অনুসরণ করব এবং মানুষ আমাদেরকে এ বিষয়ে অনুসরণ করবে, আর আমরা সকলে মিলে একত্রিত হব সর্বোত্তম কাজ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের জন্য।

# ১৭

# ইসলাম গ্রহণের পরও কি রাসূলুল্লাহ্ (সা:) নাজ্জাশীকে কুফর দ্বারা শাসনের অনুমোদন দিয়েছিলেন?

যারা ইসলামের দাওয়াহ্ সঠিকভাবে বহন করতে চায় এবং দলীয় কিংবা ব্যক্তি জীবনে একে প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করে, তারা কুফর শাসনব্যবস্থা ধ্বংসের নামে কখনওই এতে অংশগ্রহণ করতে পারে না। কারণ কুফর ব্যবস্থা ও আইন-কানুনসমূহ বাস্তবায়নকারী কুফর শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তা কেবল শক্তিশালীই হয়, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। কুফর শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সমর্থনে যেসব দলিল পেশ করা হয় তা একধরনের আত্মপ্রবঞ্চণা, তারও আগে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও মুমিনদের সাথে প্রবঞ্চণার নামান্তরমাত্র। বিশেষতঃ যখন তা হয় অর্থ ও প্রামাণ্যতার দিক থেকে অকাট্য শারী'আহ্ দলিলের সাথে সাংঘর্ষিক।

অর্থ ও প্রামাণ্যতার দিক থেকে অকাট্য শারী'আহ্ দলিলের বিরোধীতার সমর্থনে শারী'আহ্'কে বিবেচনায় না এনে মনগড়া মাসলাহা (রহঃবৎবংঃ) অবলম্বন করা একজন দাওয়াহ্ বহনকারীর জন্য অবশ্যই কঠিন পরীক্ষা ও ভয়াবহ গুণাহ্। অন্যকথায়, অর্থ ও প্রামাণ্যতার দিক থেকে অকাট্য শারী'আহ্ দলিল সর্বদা কুফর শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সাথে সাংঘর্ষিক। অথচ তা সত্ত্বেও, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা বাদ দিয়ে কুফর শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সমর্থনে এমনকিছুর অবলম্বন করা যেখানে সুবহাত আদ-দলিল (দলিলের আভাস) নাই, তাও ভয়াবহ গুণাহ্রে কাজ। এসব দলিল আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে শাসন করতে বাধ্য করে এবং যা তার পক্ষ থেকে নয় তা দিয়ে শাসন করার বিষয়টিকে নিষিদ্ধ করে।

তারা আন নাজ্জাশীর ঘটনাকে কুফর শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে, যার মৃত্যুর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা:) সাহাবীদের কাছে ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং তার সালাতুল জানাযাও আদায় করেছিলেন। তারা বলে যে, নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ্ (সা:) এর সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং পূর্বে যে শাসনব্যবস্থা দিয়ে শাসন করেছিল তা অব্যাহত রেখেছিল; অর্থাৎ সে শাসনব্যবস্থা ছিল অনৈসলামী। এর প্রমাণের জন্য তারা বুখারী শরীফে নাজ্জাশীর মৃত্যু ও জানাযার নামাযের ব্যাপারে বর্ণিত ছয়টি হাদীসকে তুলে ধরে। এদের তিনটি জাবির বিন আবদুল্লাহ আল আনসারী এবং অপর তিনটি আবু হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। যদিও এ ছয়টি হাদীস কুফর আইন কানুন দ্বারা পরিচালিত কুফর ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের দলিল হতে পারেনা।

নীচের অনুচ্ছেদগুলোতে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবেঃ

যখন বুখারী এ হাদীসগুলো বর্ণনা করেন তখন এদের পাঁচটিকে 'বাব মাউত আন-নাজ্জাশী' (নাজ্জাশীর মৃত্যু বিষয়ক অধ্যায়) এবং ষষ্ঠটিকে তিনি 'বাব আল জানাইয়েয' (জানাযার নামাজের অধ্যায়) এ স্থান দেন। এ ছয়টি হাদীসই নাজ্জাশীর মৃত্যু সম্পর্কিত, যেগুলোর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা:) সাহাবীদের তার মৃত্যু সম্পর্কে অবগত করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তিনি একজন ধার্মিক লোক ছিলেন এবং তাদের ভাই ও তাকে যাতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ক্ষমা করে দেন সেজন্য দো'আ করার নির্দেশ দেন এবং নবী (সা:) এর সাথে জানাযার নামাজ পড়তে নির্দেশ দেন। এটা থেকে বুঝা যায় তিনি একজন মুসলিম ছিলেন।

ইবনে হাজার আল আসকালানী তার 'ফাত উল বারী' (সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা)-তে নাজ্জাশীর ইসলাম ধর্মে রূপান্তরিত হওয়া নিয়ে আলোচনা না করে বরং 'আন নাজ্জাশীর মৃত্যু' শিরোনামে বুখারীর বর্ণনার উপর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, "এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ আছে যে আল বুখারী নাজ্জাশীর ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়ে কিছু বর্ণনা করেছেন বরং তিনি তার মৃত্যু খবরটিই তুলে ধরেছেন। কারণ তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টির চেয়ে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মৃত্যুর বিষয়টিই উঠে এসেছে। সুতরাং বুখারী নাজ্জাশীর মৃত্যুর ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন এজন্য যাতে তার জানাযার নামাজ আদায় করা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।"

বুখারী বর্ণিত হাদীসের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে রাসূলুল্লাহ্ (সা:) ওহীর মাধ্যমে যেদিন নাজ্জাশী মারা যান সেদিন তার মৃত্যু ও ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি অবগত হন। এ থেকে আরও বুঝা যায় সাহাবাগণ এ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না যদি না রাসূলুল্লাহ্ (সা:) তাদের এ ব্যাপারে অবহিত করতেন। সে কারণে জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়,

**"যখন নাজ্জাশী মারা গেল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেন, 'আজকে একজন ধার্মিক লোক মারা গেল। সুতরাং তোমাদের ভাই আসিমাহ এর জন্য দাঁড়াও এবং প্রার্থনা কর'।"**

আবু হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে,

**"রাসূলুল্লাহ্ (সা:) তাদেরকে হাবাশার শাসক নাজ্জাশী যেদিন মারা যান সেদিন তার মৃত্যুর ব্যাপারে অবহিত করেন।"** এ থেকেও বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা:) সাহাবীদেরকে যেদিন নাজ্জাশী মারা যায় সেদিন ওহীর মাধ্যমে তার মৃত্যু ও ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি অবগত করেন।

জাবির বিন আবদুল্লাহ'র বর্ণনা অনুসারে, রাসূলুল্লাহ্ (সা:) সাহাবীদের বলেন,

**"আজকে একজন ধার্মিক লোক মারা গেল।"** এবং

**"দাঁড়াও এবং তোমাদের ভাই আসীমাহ্'র জন্য দোয়া করো।"**

এ থেকে বুঝা যায় যে তারা ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি জানতো না। যদি তারা এটা আগে জানতো তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (সা:)-এর এভাবে বলার প্রয়োজন ছিল না যে,

**"একজন ধার্মিক লোক"**

**"তোমাদের ভাই"**

এর কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা:) সাধারণত যখন কোন সাহাবী মারা যেত তখন তাদের জানাযার নামাজের জন্য এভাবে আহ্বান করতেন না।

এসব হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, নাজ্জাশী তার মৃত্যুর সামান্য কিছুদিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কবে করেছিলেন এ সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া যায় না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা:) ওহীর মাধ্যমে যেদিন নাজ্জাশী মারা যান সেদিন তার মৃত্যু ও ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি অবগত হন। অন্য কোন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা:) এ ব্যাপারে অবগত হয়েছেন, এ ব্যাপারে কোন অকাট্য দলিল নেই।

এই ছয়টি হাদীসে বর্ণনার মধ্যে এমন কোন ইঙ্গিত নেই যা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে এই নাজ্জাশীই সেই নাজ্জাশী যার নিকট সাহাবীগণ হাবাশা বা ইথিওপিয়ায় হিজরত করেছিলেন। একইভাবে এরকমের কোন ইঙ্গিত নেই যে তিনি সেই নাজ্জাশী যার কাছে ইসলাম গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা:) চিঠি প্রেরণ করেছিলেন। এর কারণ হলো 'নাজ্জাশী' শব্দটি কোন ব্যক্তির নামবাচক শব্দ নয়। বরং ইমাম নববীর 'শরহে সহীহ মুসলিম' এর দ্বিতীয় খন্ড এবং ইবনে হাজার আল 'আসকালানী-এর 'আল ইসাবা'এর তৃতীয় খন্ড অনুসারে এটি হলো যারা হাবাশা শাসন করতেন এরকম সবার লকব বা উপাধিসূচক একটি শব্দ।

সহীহ মুসলিমের দ্বাদশ খন্ডে ইমাম নববী মন্তব্য করেন যে হিজরতের ষষ্ঠ বছরের শেষের দিকে হুদাইবিয়ার অভিযান থেকে ফিরে রাসূলুল্লাহ্ (সা:) যার কাছে ইসলাম গ্রহণের জন্য পত্র পাঠিয়েছিলেন আর যার জন্য জানাযার নামাজ পড়েছিলেন, তারা উভয়ই এক নাজ্জাশী নয়। এ ব্যাপারে হাদীসের ভাষ্য নিম্নরূপ:

"আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, **রাসূলুল্লাহ্ (সা:) কিসরা, কায়সার, নাজ্জাশী ও প্রত্যেক যালিম শাসকের নিকট আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি ঈমান আনার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি সে নাজ্জাশী ছিলেন না, যার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা:) জানাযার নামাজ আদায় করেন।"**

সুতরাং এ হাদীস থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, যার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা:) জানাযার নামায পড়েছিলেন, তার কাছে আশ্রয়ের জন্য সাহাবীগণ হিজরত করেননি এবং তিনি সে ব্যক্তিও নন যার কাছে হিজরতের ষষ্ঠ বছরে রাসূলুল্লাহ্ (সা:) ইসলাম গ্রহণের

জন্য পত্র প্রেরণ করেছিলেন। বরং যে নাজ্জাশীর জন্য জানাযার নামাজ পড়া হয়েছিল তিনি ক্ষমতায় আসেন নাজ্জাশীর (যার নিকট ইসলাম গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা:) আমর বিন উমাইয়া আদ-দামরির মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়েছিলেন) মৃত্যুর পর। পত্র গ্রহণকারী নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করেননি। যদি করতেন তাহলে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা:) এর মাধ্যমে এ বিষয়ে অবগত হতেন এবং তার জন্য জানাযা পড়তেন। জাফর বিন আবি তালিব এবং অন্যান্য হিজরতকারীগণ তাহলে এ বিষয়ে জানতে পারতেন। কারণ মক্কা বিজয়ের পর সপ্তম হিজরীতে তারা ফিরে আসেন অর্থাৎ চিঠি প্রেরণের পরের বছর। যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করতেন তাহলে তা হতো মুসলিমদের জন্য আনন্দের ও উদযাপনের একটি বিষয়, বিশেষ করে খায়বার বিজয়ের পর। অবশ্যই তিনি (সা:) নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি সাহাবাদের জানাতেন, শুধু জাফরের (রা.) আগমনকে ঘিরে তার মন্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখতেন না;

**"আমি জানি না কী আমাকে বেশী আনন্দ দিয়েছে; খায়বার বিজয় নাকি জা'ফরের আগমন"**। (সীরাত ইবনে হিশাম); তিনি (সা:) হয়তো যোগ করতেন, 'নাকি নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণ।' কিন্তু তিনি (সা:) হাদীসের মধ্যে নাজ্জাশীর নাম উল্লেখ করেননি যদিও অবস্থাপ্রেক্ষিতে তা জরুরী ছিল যদি নাজ্জাশী তাঁর (সা:) দাওয়াহ্ কবুল ও  ইসলাম গ্রহণ করতেন।

যারা ধারনা করেন, যে নাজ্জাশীর কাছে মুসলিমগণ আশ্রয় গ্রহণের জন্য হিজরত করেছিলেন, যে নাজ্জাশীর কাছে রাসূল (সা:) ষষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন এবং যার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা:) জানাযার নামাজ পড়েছিলেন, এই তিন নাজ্জাশী একই ব্যক্তি, তারা ভুল করছেন। কারণ তিনি (সা:) হিজরতকারী সাহাবীদের (রা.) উদ্দেশ্য করে নাজ্জাশীর ব্যাপারে মুল্যায়ন করে বলেছিলেন, **"তিনি এমন একজন রাজা যার অধীনে কেউই অত্যাচারিত হয় না এবং তার ভূমি হলো ন্যায়ের ভূমি।"** (ইবনে হিশাম); এবং যেসব মুসলিম সেখানে হিজরত করেছিলেন তারা সর্বোচ্চ সুরক্ষা ও নিরাপত্তা পেয়েছিলেন এবং নির্বিঘ্নে ইবাদত করতে পেরেছিলেন। তিনি তাদেরকে তার পরিষদবর্গের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে কুরাইশদের দু'জন প্রতিনিধির কাছে সমর্পণ করেননি। তিনি তাদের উভয়পক্ষকে এ বলে প্রতিহত, সুরক্ষা প্রদান ও নিরাপত্তা বিধান করেছিলেন যে, 'আপনারা আমার দেশে নিরাপদ এবং যারা আশ্রয়প্রাপ্তদের ক্ষতি করবে তারাই শাস্তির আওতায় আসবে।' জাফরের উত্তরের কারণে তিনি এ ধরনের মন্তব্য করেছিলেন। যখন নাজ্জাশী সাহাবাদের প্রশ্ন করেছিলেন যে, মুহম্মদ (সা:) তোমাদের জন্য কী নিয়ে এসেছে এবং প্রত্যুত্তরে জাফর (রা.) বলেছিলেন, **"অবশ্যই তিনি (সা:) যা এনেছেন এবং ঈসা (আঃ) যা নিয়ে এসেছিলেন তা একই প্রদীপ থেকে উৎসারিত।"** জাফরের এ উত্তরের উপর মন্তব্য করা ছাড়াও দ্বিতীয় দিন তিনি ঈসার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গী জানতে চাওয়ার পর মাটি থেকে একটি লাঠি উঠিয়ে বললেন, 'আল্লাহ্'র কসম ঈসা ইবনে মারিয়ম এর ব্যাপারে তোমরা এই লাঠির প্রস্থের চেয়ে একটুও বাড়িয়ে বলোনি।' (সীরাত ইবনে হিশাম); এ ঘটনা থেকে তারা মনে করে যে, নাজ্জাশী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, যদিও তা রাসূলুল্লাহ্ (সা:) এর কোন ভাষ্য দ্বারা সমর্থিত নয়। একইভাবে হিজরতকারীদের মধ্যে একজন রাসূলুল্লাহ্ (সা:) এর বিবি উম্মে সালামাও ইসলাম ধর্ম গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করেননি। যখন তিনি নাজ্জাশী ও তার দেশে কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে বর্ণনা করেন তখন উল্লেখ করেন যে, **"যখন আমরা হাবাশার ভূমিতে প্রবেশ করি তখন আমরা নাজ্জাশীর মতো সর্বোত্তম প্রতিবেশীকে পেয়েছিলাম। আমরা দ্বীনের ব্যাপারে সেখানে নিরাপদ অনুভব করেছিলাম এবং কোনরূপ ক্ষতির সম্মুখীন না হয়ে আল্লাহ্'র উপাসনা করতে পারছিলাম এবং অপছন্দনীয় কোন কিছুই শুনতে পাইনি...."** তিনি আরও বলেন, **"যতক্ষণ না একজন লোক হাবাশায় এসে তার কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করলো ততক্ষণ আমরা এ অবস্থায় চলছিলাম।"** তিনি বললেন, নাজ্জাশী যেভাবে আমাদের অধিকারগুলো দিয়েছিল সেভাবে যদি ঐ লোকটি যে তাকে পরাস্ত করতে চেয়েছিল আমাদের তা না দেয় এ ভয়টা ছাড়া অন্য কোন ভয় আমাদের আমাদের আচ্ছন্ন করেনি।  তিনি বলেন, **"যখন আল্লাহ্ নাজ্জাশীকে তার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় দান করলেন ও তার ভূমিকে আরও শক্তিশালী করলেন, আল্লাহ্'র কসম সে সময়ের মতো আনন্দিত আমরা আর কখনওই হইনি।" "নাজ্জাশী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসলেন এবং তখন নিজ দেশে তার কর্তৃত্ব আরো বৃদ্ধি পেল এবং হাবাশার রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড আরও ভালভাবে পরিচালিত হতে লাগল। মক্কায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা:) এর কাছে পৌঁছার আগ পর্যন্ত আমরা নাজ্জাশীর কাছাকাছিই সবচেয়ে ভাল বাড়িতে ছিলাম।"** (সীরাত ইবনে হিসাম); উম্মে সালামা বর্ণিত এ হাদীস প্রমাণ করে না যে, নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

এটা হলো একটি দৃষ্টিকোণ থেকে। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে, যারা বলে, যে নাজ্জাশীর জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা:) প্রার্থনা করেছিলেন, যার কাছে মুহাজিরগণ আশ্রয় লাভ করেছিলেন এবং যার কাছে ইসলাম গ্রহণের জন্য পত্র পাঠানো হয়েছিল, তিনজনই একই ব্যক্তি তারা হয়তো সহীহ মুসলিমের আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটির সাথে সুপরিচিত নয়:

**“রাসূলুল্লাহ্ (সা:) কিসরা, কায়সার, নাজ্জাশী ও প্রত্যেক যালিম শাসকের নিকট আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি ঈমান আনার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি সে নাজ্জাশী ছিলেন না, যার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা:) জানাযার নামাজ আদায় করেন।”**

মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ লিখিত 'নবীর সময়কার রাজনৈতিক দলিলপত্র' শীর্ষক বইয়ে উল্লেখিত দু'টি চিঠির বিষয়ে বলা হয়েছে যে, নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ্ (সা:) কে একটি পত্র লিখেছিলেন যেখানে তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তিনি (সা:) অনুমতি দিলে নাজ্জাশী রাসূল (সা:) এর সাথে দেখা করতে প্রস্তত বলেও অবহিত করেন ও তিনি তার পুত্র আরহা বিন আল আসাম বিন আবহার-কে প্রেরণ করেন এবং চিঠিটি যখন প্রেরণ করা হয় যখন রাসুল (সা:) মক্কায় অবস্থান করছিলেন।

দ্বিতীয় চিঠির ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয় যে, নাজ্জাশী হাবাশা ত্যাগকৃত সাহাবাদের কাছে মদীনায় অবস্থানরত রাসূলুল্লাহর জন্য পত্রটি দিয়ে দেন। এই দু'টি চিঠির ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য কোনো হাদীস গ্রন্থে কোনো উল্লেখ নেই। 'নবীর সময়কার রাজনৈতিক দলিলপত্র' বইয়ের রচয়িতা উল্লেখ করেন যে, তিনি এহেন তথ্যাদি তাবারী, কালকাসান্দি, ইবনে কাসির এবং অন্যান্য ইতিহাস বই থেকে সংগ্রহ করেছেন। তিনি বলেননি যে, এগুলো কোন হাদীসের বই থেকে সংগ্রহ করেছেন। ইতিহাসের বইসমূহ অকাট্য নয়, কেননা এগুলোর ক্ষেত্রে হাদীসের মত বর্ণনার সূত্রসমূহ পরীক্ষিত নয়। তারা রাতের অন্ধকারে কাঠ সংগ্রহকারীর মতোই তথ্যসমূহ সংগ্রহ করে থাকে যেন সেই সংগ্রাহক গাছের ডাল নাকি সাপ সংগ্রহ করছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয়। একারণে এ দু'টি চিঠির কোনো মূল্য নেই। এগুলো আনাস বিন মালিকের (রা.) বর্ণিত হাদীস, নাজ্জাশীর ব্যাপারে উম্মে সালামার বক্তব্য ও হাবাশায় আশ্রয়রত মুহাজিরীনদের বক্তব্য, যাদের মধ্যে জাফর (রা.) ছিলেন সর্বশেষ এবং তিনি বলেননি যে, নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যদিও জাফর হিজরতের সপ্তম বছরে বিভিন্ন শাসক নিকট পত্র প্রেরণ ও খায়বার বিজয়ের পর ফিরে এসেছিলেন। অতএব ঐ দু'টি চিঠি সঠিক হতে পারে না। উপরের সবকিছুর ভিত্তিতে এটা স্পষ্ট যে নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করেছিল ও যার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা:) জানাযার নামায আদায় করেছিলেন এবং যার কাছে মুহাজিরীনগণ হিজরত করেছিলেন তারা একই ব্যক্তি নয়। আবার তিনি সেই ব্যক্তিও নন যার কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা:) ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রন জানিয়ে হিজরী ষষ্ঠ সালের শেষের ও সপ্তম সালের শুরুর দিকের মাঝামাঝি সময়ে আমরু বিন উমাইয়াহ আদ দামরি মারফত পত্র পাঠিয়েছিলেন। বরং যার জন্য জানাযার নামাজ পড়া হয়েছিল তিনি সে নাজ্জাশী যিনি ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা:) এর নিকট হতে পত্রগ্রহণকারী নাজ্জাশীর মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

যে নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি হিজরতের সপ্তম বছরে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এর কারণ হলো হুদাইবিয়ার অভিযাত্রা শেষ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা:) নাজ্জাশী সহ অন্যান্য শাসকদের কাছে তাঁর বার্তাবাহককে প্রেরণ করেন। এটা ছিল হিজরী ষষ্ঠ সালের শেষ মাস, অর্থাৎ জিলকৃদ। এ নাজ্জাশী সপ্তম বছরে মারা যান এবং এর মধ্যে ইসলাম গ্রহণকারী নাজ্জাশী ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং তার জন্যই রাসূল (সা:) জানাযার নামাজ আদায় করেন। আর এই নাজ্জাশী মারা গিয়েছিলেন অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পূর্বেই যা আল বায়হাকী তার 'দালাইল আন নব্যুয়্যাত-এ উল্লেখ করেন।

সুতরাং তার ক্ষমতা গ্রহণ, ইসলাম গ্রহণ এবং মৃত্যুবরণ, সবই একটি স্বল্প সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। তিনি গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং কেউ এ ব্যাপারে জ্ঞাত ছিল না, এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা:)ও নন। রাসূলুল্লাহ্ (সা:) তার ইসলাম গ্রহণ ও মৃত্যুর বিষয়টি তিনি যেদিন মারা যান সেদিনই ওহীর মাধ্যমে অবগত হন যা আমরা বুখারী কর্তৃক বর্ণিত নাজ্জাশীর মৃত্যু সংক্রান্ত ছয়টি হাদীস থেকে জানতে পারি। ইসলাম গ্রহণ ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী স্বল্প সময়ের মধ্যে তার পক্ষে ইসলামের আইন-কানুন সমূহ জানা সম্ভব ছিল না। ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা:) এর কাছে কোন ধারণা না থাকায় তিনি নাজ্জাশীর কর্তব্য সম্বন্ধে জানাতে পারেননি।

সেকারণে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা নাযিল করেছে তা অনুসারে শাসন না করে কুফর শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে এটাকে দলিল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। সুতরাং তাদের যুক্তি অসার প্রমাণিত হলো।

# ১৮

# উদারপন্থা ও চরমপন্থা

পশ্চিমাদের ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক ও পরিমন্ডল রয়েছে, বাস্তব জীবন থেকে ইসলামের দূরত্ব সৃষ্টির জন্য এই সবগুলোকে প্রয়োগ করা হয়। এই প্রপাগান্ডা কেবল এর ভাবমূর্তিকে খাটো করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর উদ্দেশ্য ছিল খিলাফতকে ধ্বংস করা, এর হুকুমসমূহকে অকার্যকর করা এবং ইসলামকে প্রাচীনকালের বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা। ইসলাম যাতে পুরো পৃথিবীকে আবারও নেতৃত্ব দিতে না পারে সেটাকে লক্ষ্য করেই এরূপ অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। তারা সার্বক্ষনিকভাবে ইসলামকে ভয় পায়। সে কারণে তাদের ষড়যন্ত্রও এক মুহুর্তের জন্য থেমে নেই কারণ যদি তাদের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যায় এবং মুসলিমরা তাদের হারানো গৌরব ফিরে পায়।

পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে মুসলিমরা এমন এক জাতি যারা ইসলাম দ্বারা বাচঁতে চায় এবং গোটা মানব জাতির জন্য সর্বাবস্থায় উপযোগী এই চিরন্তন দ্বীনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হতে তাদের হৃদয় সর্বদাই হতে মরিয়া হয়ে থাকে। তাদের কৌশলগত বিভিন্ন স্থানসমুহকে যদি তারা একটি একক রাষ্ট্রের অধীনস্থ করে কৌশলগত স্থানে পরিণত হয় তবে তারা বিভিন্ন মহাদেশকে কব্জা করবে এবং কর্তৃত্ব নিয়ে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। তারা সুপার পাওয়ার হওয়ার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় বেশী সম্পদের অধিকারী যা তাদেরকে একটি নেতৃত্বদানকারী রাষ্ট্রে পরিণত করবে। তাদের জনসংখ্যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। শত্রুদের দুশ্চিন্তা এবং বিচলিত হওয়ার আরও কারণ হলো যদি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিমদের বিজয় দান করেন, তাহলে মুসলিমরা যে শুধু কাফিরদের ভূমি ও অন্যান্য সম্পদ দখল করে নিবে তা নয়, বরং তারা মানুষের হৃদয়কে দখল করে নিবে যার ফলে সব মানুষ কুফরীর অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোকবর্তিকার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। কারণ মুসলিমরা মনে করে এ পৃথিবী এবং তার মধ্যকার সব কিছুর চেয়ে কাউকে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসা অধিকতর মূল্যবান।

আর এই কারণে ইসলামী শাসন এবং নিজ জাতি ও অন্যান্য জাতির উপর থেকে পশ্চিমাদের প্রভাব অপসারণে নিয়োজিত নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। আর ইসলামের ব্যাপারে তাদের ভীতি অনুযায়ী আনুপাতিক হারে তাদের ষড়যন্ত্রের মাত্রাও বেড়ে চলেছে।

ইসলাম আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র কর্তৃক মনোনিত সত্য দ্বীন না হলে এতদিনে তা সম্পূর্ণ মুছে যেতো, বিলুপ্ত হতো এবং পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যেতো। তবে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ইচ্ছাই প্রাধান্য পেয়েছে এবং তাঁর প্রতিশ্রুতিই কার্যকর। মুসলিমদের চরম অধঃপতনের সময়েও তারা তাদের দ্বীনের প্রতি অনুগত ছিল। তবে পশ্চিমারা মুসলিমদের ভ্রান্ত মানদন্ড গ্রহণ করা, চিন্তাকে ত্রুটিপূর্ণ করা ও মানসিকতাকে কলুষিত করতে সমর্থ্য হয়েছিল। আর এই কারণে পশ্চিমারা প্রথম ক্রুসেড থেকে অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, মুসলিমদের হৃদয়ে ইসলাম খুব ভালভাবে প্রোথিত হয়েছে এবং সমূল উৎপাটনের যে কোন অপচেষ্টার চেয়ে তা অধিকতর শক্তিশালী। সে কারণে দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্রুসেডের সময় তারা কৌশল পরিবর্তন করে, যার কুফল এখনও আমরা বয়ে বেড়াচ্ছিঃ যেখানে তারা মুসলিমদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত করার পরিকল্পনা করে এবং তাদের চিন্তা, বিশ্বাস ও বুদ্ধিবৃত্তিক মানদন্ডের প্রসার ঘটাতে শুরু করে যাতে তাদের বস্তুগত সার্বিক নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য প্রথমে তারা মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্বকে পাকাপোক্ত করলো এবং বস্তুগত নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে তা বজায় রাখলো। অতঃপর তারা এমন শাসকদের মুসলিমদের উপর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করালো যারা দূষিত বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। রাষ্ট্রকে এর সাথে সম্পৃক্ত করে নিজস্ব স্বার্থে তারা পুরো পৃথিবীকে একটি কোম্পানীর মত একমুখী করে তুললো যেন পশ্চিমারা অর্থলগ্নিকারী ও উৎপাদকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং অন্য রাষ্ট্রগুলো শ্রমিক ও ভোক্তা শ্রেণীতে পরিণত হয়। এরপর তারা পুরো বিশ্বকে প্রচারমাধ্যমের নেটওয়ার্ক দ্বারা এমনভাবে আচ্ছাদিত করলো যেন অন্য রাষ্ট্রের প্রচারমাধ্যমগুলো এদের অধীনস্থ হয়ে থাকে। এসব প্রচেষ্টার পেছনে তাদের কামনা ছিল, তারা যা লিখবে আমরা তাই পড়বো, তারা যা বহন করবে আমরা তাই শুনবো, তারা যা প্রচার করবে আমরা তাই প্রত্যক্ষ করব এবং একমাত্র তাদের ইচ্ছেমতো সবকিছু আমরা অনুধাবন করবো ও কথা বলবো। এটা ছিল নব্য উন্নততর ঔপনিবেশবাদ। পুরনো ঔপনিবেশবাদের চেয়ে এটা ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক। পুরনো ঔপনিবেশবাদ বাহ্যিকভাবে পদানত করতো। আর নব্য ঔপনিবেশবাদ কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে একজনকে ভেতরে ও বাইরে থেকে সার্বিকভাবে গ্রাস করে ও চূড়ান্ত পদানত করে।

এমনকি আমাদের দ্বীনকে বুঝার ক্ষেত্রে পশ্চিমারা তাদের পছন্দমতো পদ্ধতিকে নির্ধারণ করলো। যে এই দৃষ্টিভঙ্গী বিচ্যুত হলো তার বিরুদ্ধে পশ্চিমারা তাদের মিডিয়া প্রপাগান্ডা করতে আঁটঘাঁট বেঁধে নেমে পড়লো। অর্থাৎ তারা ইসলামকে একটি অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা শুরু করলো এবং এর ঐতিহ্য, নিয়মনীতি ও ঐক্যমতকে ভাঁঙ্গার চেষ্টা করলো। তারা ইসলামের সাথে চরমপন্থা, সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতার লেবেল এটে দিলো। তারা দ্বীনকে মানবতার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেখানোর চেষ্টা করলো যে এটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অন্ধকারের মধ্যেই থাকতে পছন্দ করে। এবং এটা আক্রমণাত্মক ও প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে বিদ্বেষভাবাপন্ন যা ঘৃণা ছড়ায়। মূল চিত্রকে বিকৃত করে ও সত্যকে গোপন করার পর বিভিন্ন শাসন দ্বারা তারা এটাকে আঘাত করলো এবং এমনভাবে আঘাত করলো যেন এটাই এর প্রাপ্য ছিল। লোকদের অজ্ঞতার উপর নির্ভর করে তারা এগুলো করলো এবং এতে সহায়তা করলো এমন কিছু বুদ্ধিজীবি যারা পশ্চিমাদের সবকিছুতেই গুণমুগ্ধ ছিল।

বর্তমানে উম্মাহ্’র জাগরণের কারণে দ্বীনের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র কঠিন হয়ে পড়েছে। উম্মাহ্ আজ পশ্চিমাদের, এসব শাসকদের এবং তাদের তল্পীবাহক তথাকথিত উলামাদের একই চোখে দেখা শুরু করেছে; শয়তান হিসেবে এবং শাসকদের শয়তানের অনুসারী হিসেবে। আর এইসব তথাকথিত পন্ডিতেরা রাতারাতি এ অবস্থানে পৌঁছাতে পারতো না, যদি না তারা একই হারে শাসকদের সম্মুখে ইসলামের সম্মানকে বিকিয়ে দিত। এরা অধঃপতিত পন্ডিত। এই অধঃপতনের দিন যেদিন শেষ হবে সেদিন তাদেরও সমাপ্তি ঘটবে। সঠিক ইসলামী পূণর্জাগরণের ধারকগণ সাদামাটা পোশাকে আর্বিভূত হতে পারেন, কিন্তু তারা সৎ ও আল্লাহ্‌ভীরু।

আজ আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করছি যখন পশ্চিমারা ও শাসকগণ ইসলামী শাসন ফিরে আসার ভয়ে ভীত। তাই তারা সকল প্রকার ইসলামী আন্দোলনকে হুমকি হিসেবে গণ্য করে এবং এগুলোকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে ও এগুলোর উপর সকল ধরনের দোষ চাপাতে মিডিয়াকে ব্যবহার করছে, প্রপাগান্ডা অব্যাহত রেখেছে এবং তাদের পোষ্য তথাকথিত উলামাদের ব্যবহার করছে। এবং শুধুমাত্র ইসলামী শাসনের দিকে আহ্বানকারী আন্দোলনসমূহকে তারা সন্ত্রাসী বা চরমপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত করছে। কিছু মুসলিম চিন্তাবিদ, এবং কিছু জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিক লেখক চরমপন্থা পরিত্যাগ করে উদারপন্থার দিকে আহ্বানের জন্য বক্তব্য প্রদান ও বই লিখেছেন। কেবলমাত্র পশ্চিমাদের সন্তুষ্টির জন্যই তারা এ অবস্থান নিয়েছেন। মুসলিম পন্ডিতরা যদি এতে অংশগ্রহণ না করতেন এবং পশ্চিমাদের অবস্থান বৈধ ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা না করতেন তবে আমরা তাদের কাজের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিতামনা। কেননা জনগণের কাছে এসব লোকদের কোন মূল্য নেই, বরং তারা তাদের কাছে শাসকদের মতোই। অনেক সময় তাদের এ আক্রমণ তাদের নিজেদের দিকেই ফিরে আসে। এমনকি উম্মাহ্ এসব পন্ডিত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, কারণ তারা তাদের অবস্থানের পক্ষে প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন অজুহাত দাঁড় করায়, এবং মনগড়া ফতোয়ার মাধ্যমে শারী’আহ্’র প্রতিষ্ঠিত মূলনীতির ব্যাত্যয় ঘটায়। তাদের ফতোয়া ইসলামের সাথে শুধু সাংঘর্ষিকই নয় বরং দালিলিকভাবে প্রমাণিত ও গ্রহণযোগ্য অকাট্য শারী’আহ্ দলিলকেও তারা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছে। এমনকি তাদের কিছু কিছু ফতোয়া এমন যার কারণে অসৎ কাজের আদেশ প্রদান করা হয় এবং সৎ কাজের নিষেধাঙ্গা দেয়া হয় (আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা আমাদের এই অনিষ্ট থেকে মুক্ত রাখুন!)। এসব আলেমাগণ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা নন, বরং কেবলমাত্র শাসক ও তাদের প্রভূদের সন্তুষ্ট করার জন্য ইসলাম থেকে অনেক দূরে থেকে এসব চিন্তা উপস্থাপন করেন। যখন তারা মুসলিমদের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন এবং ইসলামী দাওয়াহ্ নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন তখন উম্মাহ্ তাদের চিন্তার গলদ ধরে ফেলে এবং তাদের সমর্থকদের পথভ্রষ্টতা অনুধাবন করে।

এ ভূমিকার পর যে জিনিসটি অনুধাবন করা জরুরী, তা হলো ‘চরমপন্থা এবং উদারপন্থা’ বিষয়ক আলোচনার যৌক্তিকতা। আমরা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিষয়টিকে উপস্থাপনের চেষ্টা করবো যাতে মুসলিমরা কোন দ্বন্দ্ব ছাড়া সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। কেননা শুধু আবেগ সত্যকে হৃদয়াঙ্গম করার জন্য যথেষ্ট নয়। পূর্বের মতো আমরা শারী’আহ্’র মূলনীতি অনুসারে এ বিষয়ে আলোকপাত করবো যাতে তা ইসলামী আক্বীদার ভিত্তিতে গড়ে উঠা বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

মানব জীবনের সামগ্রিক অবস্থাকে সুবিন্যস্ত করতে ইসলাম এসেছে। সুতরাং এতে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা রয়েছে, যেমন: আখলাক বা চরিত্র, মা’তুমাত বা খাদ্যদ্রব্য এবং মালবুসাত বা পরিচ্ছদ। এতে ব্যক্তির সাথে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা রয়েছে, যেমন: মু’আমালাত বা সামাজিক আচার ব্যবহার এবং উকুবাত বা শাস্তি। এবং এতে ব্যক্তির সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা রয়েছে, যেমন: আক্বাইদ বা বিশ্বাস এবং ইবাদত বা উপাসনা। কেননা মানুষের যেকোন কাজের সমাধানের ক্ষেত্রে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ। এটি একটি সামগ্রিক চিন্তা যা থেকে মানব জীবনের সকল সমস্যা সমাধান পাওয়া যায়।

তাছাড়া ইসলামের গঠন পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক যা একটি বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এবং এ বিশ্বাস থেকে সকল চিন্তা ও সমাধান উৎসারিত হয়। আর তাই এর চিন্তা, বিশ্বাস এবং মাপকাঠি এর মৌলিক চিন্তার মতই একই প্রকৃতির। এর ব্যাখ্যা হিসেবে বলা যায়, আল্লাহ্'র উপর মুসলিমদের ঈমানের উপর ভিত্তি করে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি হলেন আল খালিক বা স্রষ্টা, আল মুদাব্বির বা সববিষয়ের নিয়ন্ত্রণকারী। আর এ বিষয়ে মানুষ হলো দূর্বল, পরনির্ভরশীল, মুখাপেক্ষী, অভাবী ও সমাধান প্রদানের ক্ষেত্রে অক্ষম। সে কারণে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা), রাসূল (সা:)-কে এই শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রেরণ করলেন যে, আল্লাহ্ হলেন আল মাবুদ বা উপাসনার জন্য একমাত্র যোগ্য সত্ত্বা এবং কীভাবে তাঁর উপাসনা করতে হবে এবং তাঁর ইবাদত পালন করা ও না করার সাথে কিভাবে আখিরাতের সওয়াব বা পুরষ্কার এবং ইক্বাদ বা শাস্তি জড়িত। এটি মুসলিমদের যেকোন কাজের জন্য একটি প্রক্রিয়া সুনির্ধারিত করে দেয় এবং তা হলো হালাল এবং হারাম। সে কারণে তার মন যথেচ্ছভাবে আচরণ করে না বা আইনপ্রণেতা বনে যায় না অথবা শারী'আহ্ বাণীর সাথে কোন মনগড়া আইনকে যুক্ত করে না। বরং শারী'আহ্ কী বলেছে সেটাকে হৃদয়াঙ্গম করার চেষ্টা করে মাত্র। শারী'আহ্ গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র পক্ষ থেকে, আর এখানে মানুষের কাজ হলো এগুলোকে গ্রহণ করার জন্য সঠিকভাবে বুঝা। বুঝার ক্ষেত্রে সঠিক বা ভুল হতে পারে। উভয়ক্ষেত্রে ইজতিহাদের সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে সে পুরষ্কৃত হবে। ইসলাম মুসলিমদের দলিল প্রমাণের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত হওয়ার উপর জোর দেয়। এজন্য ইল্ম আল হাদীস বা হাদীস সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞানের উত্থান হয়েছে এবং সর্বোপরী এ সচেতনতা থেকে উসূল আল ফিকহ্ উৎপত্তি লাভ করেছে। এর কিছু কিছু মূলনীতি ইতিমধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে, যেমন: 'আল্লাহ্ হলেন হাকিম বা বিচারক', 'শারী'আহ্ দলিলের গ্রহণযোগ্যতাই হলো কাজ বা যেকোন কিছুর ভিত্তি', 'শারী'আহ্ যাকে সুন্দর বলে তাই সুন্দর এবং যাকে কুৎসিত বলে তাই কুৎসিত', 'ভাল তাই যা আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করে এবং মন্দ তাই যা তাকে অসন্তুষ্ট করে।' আমরা এটাও দেখতে পাই যে, মুসলিমদের বিশ্বাস অনুযায়ী সুখ হচ্ছে যা আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করে এবং প্রবৃত্তি ও জৈবিক চাহিদার প্রশান্তি হচ্ছে আল্লাহ্'র প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর প্রদত্ত শারী'আহ্ অনুসরণের মধ্যে। এজন্য আমরা দেখতে পাই, সামগ্রিক কাঠামোগত দিক থেকে ইসলাম পরিপূর্ণ এবং এর সকল চিন্তা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও একটি ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। আর এই ভিত্তি যা কিছুকে বৈধতা দেয় তাই গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় নয়।

আদর্শ হিসেবে ইসলামের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য পুঁজিবাদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। কেননা এটি একটি আদর্শিক চিন্তা এবং এর বুদ্ধিবৃত্তিক গঠনও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং হয় একে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় পরিপূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। দ্বীনকে জীবন থেকে পৃথকীকরণের মৌলিক চিন্তা থেকে পুঁজিবাদের সমাধানসমূহ উৎসারিত এবং এর উপর ভিত্তি করে সমস্ত চিন্তা গঠিত হয়েছে। আপোষের ভিত্তি উপর প্রতিষ্ঠিত, দ্বীনকে জীবন থেকে পৃথকীকরণের এই মৌলিক চিন্তা মানুষকে তার নিজের প্রভু বানায়। নিজেকে নিজের প্রভূ বানাতে হলে এবং চার ধরনের স্বাধীনতার পথকে অবরুদ্ধ হওয়া থেকে মুক্ত হতে হলে, তার উপর অন্য কারো অভিভাবকত্বকে অস্বীকার করতে হবে। আর এভাবেই স্বাধীনতার চিন্তা জাগ্রত হয়, যা একটি বিশেষ অর্থ বহন করে। নিজেই নিজের প্রভূ বনে যাওয়ার অর্থ হলো কোনরকম বাহ্যিক হস্তক্ষেপ ছাড়া শুধুমাত্র নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে কোন ধর্ম কিংবা অন্যকোন উৎস থেকে মৌলিক চাহিদাসমূহের নিরাপত্তার বিধি-বিধানসমূহ গ্রহণ করা। আর এভাবেই গণতন্ত্রের ধারণা ব্যুৎপত্তি লাভ করে। যে ব্যক্তি দ্বীনকে জীবন থেকে পৃথকীকরণের মৌলিক চিন্তাকে গ্রহণ করেছে সে সর্বোচ্চ পরিমাণে ইন্দ্রিয় সন্তুষ্টিকে সুখ বলে সংজ্ঞায়িত করবে। প্রবৃত্তি নিজেই আইন প্রণেতা হবার দরুণ স্বার্থ হাসিল করাই হয়ে পড়ে যেকোন কাজের লক্ষ্য।

যখন চিন্তা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন এটি অন্য কোন চিন্তার মিশ্রণকে সাধুবাদ জানায় না। শারী'আহ্ পরিভাষায় মিশ্রণ হলো শিরক, হয় এটা কুফর অথবা গুণাহ্।

গণতন্ত্র মানুষের শাসন আর ইসলাম হলো শারী'আহ্'র শাসন, তাই ইসলাম যেমন গণতন্ত্রকে গ্রহণ করে না, ঠিক একইভাবে পুঁজিবাদী চিন্তাও ইসলামকে গ্রহণ করে না কারণ তাহলে তা হবে গণতন্ত্র ও তা থেকে উদ্ভূত সব চিন্তাকে অবলুপ্ত করা। একারণে পশ্চিমারা ক্ষমতা গ্রহণের জন্য সামগ্রিক ইসলামের দিকে আহ্বানকারী ও আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে এধরনের আন্দোলন ভয়ঙ্কর যা তাদেরকে তাদের ভিত্তিমূল থেকে অপসারণ করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই পশ্চিমারা এধরনের আন্দোলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আগ্রাসন চালায়, চিরশত্রু মনে করে এবং বিভিন্ন লেবেল এটে দেয়। পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে এরাই মৌলবাদী, কারণ এরা এমন একটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যা তাদের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয়, এরাই চরমপন্থী কেননা এরা তাদের সাথে আপোষ করতে চায় না, এরাই উগ্রপন্থী কেননা এরা তাদের আহ্বানকে সম্মান দেখায় না এবং তাদের অস্তিত্বকে বিবেচনা করেনা। যদি আমরা এ বিষয়টি নীরিক্ষা করি তবে দেখব যে তারা অন্যদেরকে যে কাজের লেবেল দিচ্ছে তারা নিজেরাই বরং সেসব কাজে লিপ্ত এবং এসব লেবেল তাদের নিজেদের উপরই প্রযোজ্য। পশ্চিমা

দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে তারা মৌলবাদী, কেননা তারা একটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যার উপর তাদের বিশ্বাস রয়েছে এবং এর বিপরীত অন্যকোন কিছুকে তারা এর উপর প্রাধান্য দিতে প্রস্তুত নয়, যদিও মুখে তারা বলে গণতন্ত্রে জনগণের পছন্দ অনুসারে যে কেউ ক্ষমতায় আসতে পারে। তাছাড়া তারাই চরমপন্থী, সন্ত্রাসী, উগ্রপন্থী কারণ তারা রাজনৈতিক ইসলামের অস্তিত্বকে মেনে নেয় না, অথবা এর সাথে আলোচনায় বসে না, এমন কি এর সাধারণ বিষয়সমূহকে নিয়েও নয়। এভাবে কতবার পশ্চিমারা তাদের জীবনব্যবস্থাকে নিয়ে দ্বন্দে জড়াবে এবং অন্যের প্রতিকৃতিতে ঝাঁপ দিবে? এটা কী ধরনের গণতন্ত্র যে তারা নির্বাচন বাতিল করে দেয় যা কিনা তাদের দৃষ্টিতে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলনের পথ এবং একনায়কতন্ত্র কায়েম করে?

তাই আমরা যখন কোন চিন্তাকে সঠিক অথবা ভ্রান্ত এরূপ রায় দিব তখন এর ভিত্তিকে আলোচনায় আনতে হবে এবং এই ভিত্তি দিয়ে একে নিরীক্ষণ ও বিচার বিবেচনা করতে হবে। একটি আংশিক চিন্তাকে অন্য একটি চিন্তার ভিত্তি দিয়ে নিরীক্ষা করা সঠিক নয়। আমরা কখনো বলতে পারবো না যে, ইসলামে সুখ হলো ইন্দ্রিয়গত পরিতুষ্টি। অথবা বলতে পারবো না মুসলিমগণ পশ্চিমাদের মতো স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। কারণ ইসলাম এসবের সাথে একাত্নবোধ করে না অথবা এসবকে গ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি ইসলামকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে সে অবশ্যই যা কিছু ইসলাম থেকে উদ্ভুত তাকেই গ্রহণ করবে এবং ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রহণ করবে। কেননা এর কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান করা পুরোটাকে প্রত্যাখ্যান করার শামিল। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

**"তবে কি তোমরা কিতাবের কিয়দংশ বিশ্বাস করো এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস করো। যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে।"** [সূরা বাক্বারা:৮৫]

এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমরা পশ্চিমাদের এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি যে, ইসলাম একটি উদার দ্বীন এবং এটা কট্টরপন্থাকে অস্বীকার করে। কথাটি শুনতে মিষ্টি হলেও এতে পশ্চিমাদের কু অভিপ্রায় রয়েছে। কারণ তারা তাদের ভ্রান্ত চিন্তার উপর ভিত্তি করেই এসব মন্তব্য করে থাকে।

তাই তাতারুফ (কট্টরপন্থা), ঘুলুও (অতিরিক্ত), ইসরাফ (অতিরঞ্জিত করা) অথবা ইফরাত (অসংযম) এমন কিছু শব্দ যেগুলোর রয়েছে শারী'আহ্গত অর্থ। যদি একজন মুসলিম এর সাথে অমত পোষণ করে তবে সে গুণাহ্গার হবে। একইভাবে ই'তিদাল (উদারীকরণ), ইক্বতিসাদ (মধ্যপন্থা অবলম্বন), ইসতিকামাহ ( সোজা পথ) এবং ওয়াসাতিয়্যাহ (উদারীকরণ) শব্দসমূহেরও একই শারী'আহ্গত অর্থ রয়েছে এবং তা অনুযায়ী এগুলোকে মুসলিমদের গ্রহণ করতে হবে। একই কথা তাফরীত (অবহেলা) এবং তাসাহুল (উদাসীন্যতা) এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমরা যখন এগুলো সম্পর্কে শারী'আহ্গত নিয়মনীতিসমূহ জানার চেষ্টা করবো তখন কখনওই পুঁজিবাদীদের বিশ্বাস ও মাপকাঠির ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবো না। কারণ তা হারাম। তাছাড়া তা পশ্চিমাদের এবং তাদের চিন্তাকে তুষ্ট করে, এবং ইসলাম ও ইসলামী চিন্তাসমূহের মূল্যায়নে ইসলাম ব্যাতীত অন্যকিছুকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে।

অনেক শারী'আহ্ নিয়ম রয়েছে যেগুলোকে মুসলিমদের গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় পরিত্যাগ করলে সে গুণাহ্গার হবে। পশ্চিমারা এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী পোষণকারীদের কট্টরপন্থী, মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী বলে অভিহিত করে। আল্লাহ্'র রাস্তায় জিহাদ করা, খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা, মা'রুফ এর আদেশ প্রদান করা ও মুনকারকে নিষেধ করা যেখানে শাসকরাও যুক্ত রয়েছেন, কুফরের বিরুদ্ধাচরণ করা, দাওয়াহ্'র দায়িত্ব বহন করা, গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করা, সুদকে নিষিদ্ধ করা, নারীদের হিজাব পরিধান করা প্রভৃতি বাধ্যতামূক কাজকে অবশ্যই মুসলিমদের সম্পাদন করতে হবে। আমরা কি এগুলোকে পশ্চিমা নষ্ট ও ভ্রান্ত চিন্তা দ্বারা মূল্যায়ন করবো, যা এখনও পর্যন্ত তাদের নিজেদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি আর অন্যদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনার চিন্তা তো সুদূর পরাহত? তাছাড়া মুসলিমগণ কি এমন কোন কিছুর পক্ষাবলম্বন করবে যে ব্যাপারে পশ্চিমারা অবস্থান নিয়েছে?

এজন্য কট্টরপন্থা বা উদারপন্থা বুঝার ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই পশ্চিমাদের চিন্তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। দ্বীনের ব্যাপারে তাদের হস্তক্ষেপকে অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আর এ কারণেই শুরু থেকে এই আলোচনা শারী'আহ্'র ভিত্তিতে অগ্রসর হয়নি। কেননা এটি একটি রাজনৈতিক অবস্থান যাকে পশ্চিমাদের অনুকূলে উম্মাহ্'র ভেতরে সুরঙ্গ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এবং এই আলোচনার মাধ্যমে মুসলিমদের মনোবৃত্তির ভেতর পশ্চিমা ঔপনিবেশবাদী চিন্তার ধারবাহিকতা বলবৎ থাকে।

এখন আমরা একটি শারী'আহ্ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এ বিষয়ে ইসলাম কী বলে তা বুঝার চেষ্টা করবো যাতে তা দাওয়াহ্'র জন্য সুবিধাজনক হয় এবং আমাদেরকে আল্লাহ্'র আরও নিকটবর্তী করে।

আল মুগহালাহ (কট্টরপন্থা) অথবা ঘুলুহ (অতিরিক্ততা) হলো কোন কিছুকে বাড়িয়ে বলা বা অতিরঞ্জিত করা। দ্বীনের মধ্যে মুগহালাহ হলো হুকুমের সীমাকে অতিক্রম করার ক্ষেত্রে দৃঢ় থাকা বা অটল থাকা। একে ইফরাতও বলা হয়। মুগহালাহ-এর বিপরীত হল তাফরীত বা উদাসীনতা, যা 'ফারাতাহ্' শব্দ থেকে উদ্ভূত, ফারতানের ক্ষেত্রে, যার অর্থ হলো পেছনে পড়া, অপচয় করা এবং এর প্রতি শৈথিল্যতা প্রদর্শন করা। দ্বীনের ব্যাপারে তাফরীত অর্থ হলো এর হুকুম সম্পর্কে অবহেলা করা, এর হক্ক আদায় না করা এবং এ দায়িত্ব পালনে শৈথিল্যতা প্রদর্শন করা। এ থেকেই এ কথার উৎপত্তি হয়েছে যে, 'লা ইফরাত ওয়া লা তাফরিত ফিল ইসলাম' অর্থাৎ ইসলামে বাড়াবাড়ি কিংবা উদাসীনতা কোনটাই নাই।

ইক্বতিসাদ বা মধ্যপন্থা হলো তাওয়াস্সুত (মাঝখানে অবস্থান নেয়া), ই'তিদাল (উদারতা), রুশদ (প্রত্যক্ষতা), এবং ইসতিক্বামাহ (দৃঢ়পদতা)। দ্বীনের মধ্যে মু'তাদিল হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র আদেশসমূহ মেনে চলে এবং এটা থেকে তাফরীত বা ইফরাতের দিকে বিচ্যুত হয় না। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

**"তারা মধ্যপন্থা (ইক্বতিসাদ) অবলম্বনকারীদের অন্তর্গত, কিন্তু তাদের অনেকেই মন্দ কাজে লিপ্ত।"** [সূরা আল মা'য়িদাঃ ৬৬]

এর তাফসীর হলো এটি একটি উম্মাহ্ মুতা'দিলা, যে তার প্রভূর আদেশ মেনে চলছে অর্থাৎ আল্লাহ্'র আদেশ মানার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করছে। আর ফাইওয়ুমি তার 'আল মিসবাহ আল মুনির' এ উল্লেখ করেন যে, "কাসাদাহ ফিল আমর কাসদান অর্থ হলো হুকুমের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক দলিলটি অন্বেষণ করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং সীমা অতিক্রম না করা।"

কেউ এই সংজ্ঞাকে নিরীক্ষা করলে বুঝবে যে, মুসলিমদের অবশ্যই আল্লাহ্ প্রদত্ত হুদুদ বা সীমাকে গ্রহণ করতে হবে এবং তা অতিক্রম করা যাবে না। তাকে আরও মু'তাদিলান হতে হবে অর্থাৎ হুকুম পালনের ক্ষেত্রে মুতাক্বিমান বা দৃঢ় হতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন,

**"বল, 'আমি আল্লাহ্'র উপর ঈমান এনেছি এবং অতঃপর তাঁর পথের উপর ইসতাক্বিম বা দৃঢ় আছি।'"** [মুসলিম এবং অন্যান্য]; অর্থাৎ যা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন তা গ্রহণ করেছি এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থেকেছি। 'ফাসতাক্বিম' অর্থ হল ইত্তাকী (আল্লাহ্'র ভয়) এবং বিষয়টি আরও পরিষ্কার করার জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**"সুতরাং আপনি এর প্রতিই দাওয়াহ্ দিন এবং হুকুম অনুযায়ী অবিচল থাকুন"**। [সূরা আশ শূরা:১৫]

সুতরাং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হচ্ছেন সেই সত্ত্বা যিনি হুকুম করেন এবং মুসলিমগণ সে আদেশ গ্রহণ করেন ও মেনে চলেন। মুসলিমদের নিজের পক্ষে তাক্বওয়ার পথ ও সহজ সরল পথ সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। যদি সে নিজেকে অনুসরণ করে তাহলে সে তার প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করলো। আর যে প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে সে পথভ্রষ্ট। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র আদেশ মান্য করা ও এই সীমার মধ্যে নিজেকে গন্ডীভূত রাখা ছাড়া আর কোন ইসতিক্বমাহ নেই। এ সীমাকে অতিক্রমের কোন সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে সামান্য বেশী বা সামান্য কম করার অবকাশ নাই। আর এটা বুঝতে হলে আমাদের আগের মতো মূল ভিত্তির দিকে ফেরত যেতে হবে।

মুসলিমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং ইসলাম প্রদত্ত সকল সমাধানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে যা মানুষের ফিতরাতের (বৈশিষ্ট্য) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই মানুষের এই ফিতরাত সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবগত, তিনিই এই বৈশিষ্ট্যকে সুসজ্জিত করেছেন এবং মানুষের কল্যাণের জন্য যা প্রয়োজন তাই করেছেন। একই সময়ে একজন মুসলিম বিশ্বাস করে, অন্য ধর্ম ও জীবনব্যবস্থা সমাধান হিসেবে আমাদের সামনে যা নিয়ে এসেছে তা সীমাবদ্ধ, ভ্রান্ত ও পথচ্যুত এবং এগুলো মানুষের জন্য দূর্ভোগ ব্যতিরেকে শান্তি বয়ে আনেনি। এর কারণ খুব সহজ, যেহেতু মানুষ স্বভাবতই অক্ষম, মুখাপেক্ষী, দূর্বল, সীমাবদ্ধ, যার মন মানুষের বাস্তবতার সবকিছুকে পরিগ্রহ করতে অক্ষম, তাই এগুলো যুৎসই সমাধানও প্রদান করতে পারে না; অথবা এসব ধর্মের উৎস স্রষ্টার পক্ষ থেকে হলেও, এগুলো ছিল নির্দিষ্ট কিছু জাতির জন্য সবার জন্য এগুলো প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া মানুষ এসবের সাথে ব্যাপক মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে এগুলোকে পরিবর্তন করে ফেলেছে।

একারণে ঐশী বিধান হিসেবে ইসলাম অন্যান্য মতাদর্শ ও ধর্ম থেকে পৃথক, যা মানুষের সব বিষয়ে সমাধান এমনভাবে প্রদান করে যাতে উভয় জগতে সুখ নিশ্চিত হয়।

**"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করবো। সে বলবেঃ হে আমার প্রতিপালক, আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ্ বলবেনঃ এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব।"** [সূরা ত্বোয়া হা:১২৪-১২৬]; সুতরাং যে ব্যক্তি এ দুনিয়াতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশনা মেনে চলে না সে অন্ধ, সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

এছাড়া আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজে দ্বীনকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং এগুলো বিলুপ্ত হওয়া ও পরিবর্তিত বা অসত্য পরিবেশনা থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**"নিশ্চয়ই, আমি নিজেই এই কুর'আন নাযিল করেছি এবং নিশ্চয়ই আমি নিজেই তা হেফাযত করবো"**। [সূরা হিজর:৯]

তবে তা বুঝার ক্ষেত্রে কারও বিচ্যুতিকে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) হেফাযতের ওয়াদা করেননি। কিতাবের সুরক্ষা ও বিশুদ্ধতা বজায় রাখা আমাদের জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে একটি দলিল। কেউ পথচ্যুত বা ধ্বংস হতে পারে। কিতাবের এমন ব্যাখ্যা দিতে পারে যা মূল অর্থের সাথে সাংঘর্ষিক, নতুন কিছু যুক্ত করতে পারে এবং অর্থকে অসংলগ্নও করতে পারে। কিন্তু এসবই হবে বুঝার ভুল, এর কোনকিছুই মূল কিতাবের বাণীসমূহের সাথে সম্পর্কিত নয়। তাই মুসলিমদের সত্যিকারের ঈমানদার হতে হবে যাতে শরী'আহ্'র হুকুমসমূহকে তারা ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারে, সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞাত আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র আদেশের উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকতে পারে এবং এক ইঞ্চিও পথভ্রষ্ট না হয়।

ইসলাম সব কিছু নির্ধারণ করে এবং মুসলিমগণ ইসলাম যা নির্ধারণ করে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। মানবজাতি নিজের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে না। মানুষের বুদ্ধিমত্তা, অভিজ্ঞতার গভীরতা, ঈমানের শক্তিমত্তা এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় নয়। আইনের প্রক্রিয়ায় মানুষকে অবশ্যই আল্লাহ্ প্রদত্ত কিতাবের দ্বারস্ত হতেই হবে, যদি সে ব্যক্তিটি স্বয়ং আবু বকর সিদ্দিক হয়। খিলাফতের দায়িত্ব পালনকালে প্রথম বক্তৃতার সময় তিনি এটাই বুঝাতে চেয়েছিলেন, **"আমাকে ততক্ষন পর্যন্ত আনুগত্য করো যতক্ষণ আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্'র আনুগত্য করি এবং আমি যদি আল্লাহ্কে না মানি তাহলে তোমাদের আনুগত্যের প্রতি আমার কোন অধিকার নেই। অবশ্যই আমি একজন নিছক অনুসরণকারী, কিন্তু নতুন কোন কিছুর উদ্ভাবক নই।"** এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন,

**"আনুগত্য করো কিন্তু নতুন কিছু বের করো না, আর তোমাদের যা যথেষ্ট তা সঠিক পরিমাণেই দেয়া হয়েছে।"**

আর এ ধরনের চিন্তা কেবলমাত্র আমরা মুসলিমদের মাঝেই দেখতে পাই, অন্য কারও মধ্যে নয়। কারণ অন্যরা নিজেরাই নিজেদের সমস্যা সমাধান করে। এই কারণে ইসলাম মৌলিকভাবে অন্যদের চেয়ে আলাদা।

একইভাবে মুসলিমগণ অনুসরণ করতে বাধ্য এবং তাদের উদ্ভাবনের বদলে অনুসরণই করা উচিত।

আমরা যদি দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাব যে, মহানবী (সাঃ) এর উপর এটা নাযিলের সময় হতে আজ পর্যন্ত কিছু কিছু মুসলিমের দ্বীনের প্রতি ভালবাসার সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। কেউ কেউ আবার দাবি করে যে তারা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'কে সবচেয়ে শক্তভাবে ইবাদত করতে সক্ষম। তারা অন্যদের সঠিক ও নিয়ন্ত্রিত ইবাদতকে খাটো দৃষ্টিতে দেখে, কারণ তাদের ধারণা শারী'আহ্ তাদের কাছে যতটুকু দাবি করেছে তারা তার চেয়ে বেশী করতে সক্ষম। তারা ইবাদতের পরিমাণের দিক থেকে নিজেদেরকে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে নিয়ে গেছে। তারা নফস বা প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে দলিলের তোয়াক্কা না করে উপাসনার নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। বিষয়টি এমনভাবে সীমা অতিক্রম করেছে যেন তারা অন্যের উপর তা চাপিয়ে দিতে চায় এবং কেউ অনুসরণ না করলে তাকে তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে কম যত্নশীল বলে আখ্যায়িত করে। আমরা দেখতে পাই, এরকম কঠোর ও অনমনীয় চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এসব লোকেরা কথা ও কাজে শারী'আহ্ দলিলের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও তাঁর দ্বীনের প্রতি ভালবাসা থেকে এরূপ করলেও এটা হারাম। কারণ এর মাধ্যমে দ্বীনের পরিবর্তন সাধিত হয় এবং সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কর্তৃক নির্ধারিত সীমাকে অতিক্রম করা হয়। সুতরাং, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হচ্ছেন এমন একজন সত্তা যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমরা তার জ্ঞানের পরিসীমা সম্পর্কে অবগত নই এবং তার অপরিহার্যতার বাস্তবতা সম্পর্কেও আমরা ওয়াকিবহাল নই, বরং তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) সব কিছুকে পরিগ্রহ করে আছেন। যেহেতু আমরা আল্লাহ্

সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহ কামনা করি সেহেতু তাঁর আদেশের উপর দৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত থাকাই এক্ষেত্রে এ উদ্দেশ্য হাসিলের একমাত্র পন্থা। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাঁর জ্ঞানের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন,

**"যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না ? তিনি সুক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।"** [সূরা আল মূলক: ১৪]

বুখারী উল্লেখ করেন যে, আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা:) বিশেষ বিবেচনায় কিছু কাজ করতেন এবং কিছু লোক এক্ষেত্রে তাকে অনুসরণ করত না। নবী (সা:) এ বিষয়ে জানতে পেরে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র প্রশংসাপূর্বক বলেন, **"কিছু লোকের আমি যা করি তা পালন করার ক্ষেত্রে কী হল? আল্লাহ্'র কসম, আল্লাহ্ সম্পর্কে আমি সবচেয়ে বেশী জ্ঞান রাখি এবং তাঁকে ভয় করার ক্ষেত্রে আমি তাদের চেয়ে অগ্রগামী।"** এখানে অতিরঞ্জিত করার ব্যাপারে সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে এবং ইসলাম থেকে বিনয়ের সাথে গ্রহণ করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে।

বুখারী উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেছেন,

**"দ্বীন সহজ। কারও দ্বীনের ব্যাপারে কঠিন হওয়া উচিত নয়, সুতরাং সঠিক পন্থা অবলম্বন কর এবং যথা সম্ভব এর নিকটবর্তী থাকার চেষ্টা কর, সুসংবাদ দাও, গুদওয়া'হ (ফজরের পরের সকাল) এর সঠিক ব্যবহার কর। দ্রুত বের হয়ে যাও এবং সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আস। জুলজাহ (সন্ধ্যার প্রারম্ভিক সময়কাল) এর কিছু সময় ভ্রমণে ব্যয় কর।"** আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, **"সঠিক পথের নিকটবর্তী হও, দ্রুত বের হয়ে যাও এবং সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আস এবং রাতের প্রারম্ভিক কিছু সময়ের সদ্ব্যবহার কর। মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, তাহলেই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারবে।"**

যে শুভ ইচ্ছা কোন ব্যক্তিকে কঠোর হওয়া বা অতিরিক্ত করার প্রতি প্রবৃত্ত করে, আল বুখারী ও মুসলিম থেকে আনাস (রা.) উদ্ধৃতি অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা:) ইবাদতের আধিক্য ও তাদের কমের কারণে একদল লোকের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে জানতে পারলেন। যারা বলল, 'আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা:) থেকে কতদূরে রয়েছি যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার সব গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন।' সে কারণে তারা একত্রে শপথ নিল যে, রাতসমূহে তারা ক্বিয়াম করবে, সব দিন রোজা রাখবে এবং নারীদের সাথে কোনরূপ সম্পর্ক রাখবে না। রাসূল (সা:) তাদের বললেন, **"তোমরাই কি সেই ব্যক্তি যারা এরূপ বলেছ? অবশ্যই আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহ্কে অধিকতর ভয় করি এবং অধিকতর তাক্বওয়া প্রদর্শন করি। কিন্তু আমি রোজা রাখি এবং তা ভঙ্গ করি। আমি প্রার্থনা করি এবং রাতে ঘুমাই এবং নারীদের বিবাহ করি।"** অতঃপর তিনি এই বলে হাদীসটি শেষ করলেন,

**"যে আমার সুন্নাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।"**

এটা থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এমন কোন কিছু গ্রহণ করেন না যা তাঁর কাছ থেকে আসেনি। যা মানুষ সংযোগ করে বা উদ্ভাবন করে তা কখনওই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নৈকট্য অর্জনের পাথেয় হতে পারে না। আবু দাউদ তার সুনানে এক ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেন, যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা:)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহ্'র রাসূল (সা:)! কোন ব্যক্তি যদি সবদিন রোজা রাখে সেটা কেমন হবে?" প্রত্যুত্তরে রাসূল (সা:) বলেন, **"বিষয়টি অনেকটা এই রকম যে, সে কোন রোজা রাখেওনি বা ভঙ্গও করেনি।"**; ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেন, একবার এক ব্যক্তি তাঁকে এসে বলল যে তার মা পায়ে হেঁটে হজ্জ করার প্রতিজ্ঞা করেছে। তিনি (সা:) বলেন,

**"তাকে বাহন ব্যবহার করতে বলো, হাঁটার ব্যাপারে আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে তার জন্য কোন নির্দেশ নেই।"**

বুখারী ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, **"যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা:) খুতবা দিচ্ছিলেন তখন তারা দেখল একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। রাসূল (সা:) তার ব্যাপারে জানতে চাইলেন। তারা বলল, 'আবু ইসরাইল নাদারাহ আল্লাহ্'র কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন যে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং বসবে না, সে কখনওই ছায়ায় বসে না, কথা বলে না এবং রোজা পালন করে। রাসুল (সা:) বলেন, 'তাকে কথা বলতে বল, ছায়ায় আশ্রয় নিতে বল, বসতে বল এবং রোজা পূর্ণ করতে বল'।"**

অতিরঞ্জিত করা মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় এবং মুসলিম বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা:) এ ব্যাপারে বলেন,

**"আল মুতানাত্তিনুন বা একগুয়ে লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।"** তিনি এটা তিনবার বললেন। আহমেদ, আন নাসা'ঈ এবং ইবনে মাজাহ্ উল্লেখ করেন এবং ইবনে মাজাহ্'র ভাষায় করা হয় যে, **"হে লোকেরা! ঘুলুহ বা দ্বীনের মধ্যে বাহুল্যতার ব্যাপারে সাবধান হও। অবশ্যই তোমাদের আগে যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তারা ঘুলুহ বা বাহুল্যতার কারণেই হয়েছে।"**

দ্বীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জিতকারীদের মতো উদাসীনরাও একই দোষে দুষ্ট। এধরনের লোকেরা দ্বীনের মূলে বিশ্বাস স্থাপন করে কিন্তু দায়িত্ব পালনের বেলায় উদাসীন, ভয়াবহ বিভিন্ন গুণাহে্ লিপ্ত, মনে মনে ফন্দি এটেছে যে মৃত্যুর আগে অনুতপ্ত হয়ে গুণাহ্ মাফ করিয়ে নেবে। এমন যেন তারা গায়েব এবং আজল সম্পর্কে অবগত। এটা সুস্পষ্ট হারাম। সর্বোচ্চ আনুগত্যের সাথে মুসলিমদের অতি সত্তর পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলাম গ্রহণ করা উচিত। অন্যথায় তাদেরকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সহজ সরল পথ থেকে বিচ্যুত ধরা হবে।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা:), বাহুল্যতা ও অতিরঞ্জিত করার ব্যাপারে যেমন ব্যক্তিকে সতর্ক করেছেন ঠিক তেমনি দল, রাষ্ট্র ও উলামাদেরও সতর্ক করেছেন। আজকে আমরা, দাওয়াহ্বহনকারী এবং তাদের চিন্তাবিদ অনেকের মাঝে ইসলামের প্রতি ভালবাসা, দ্বীনের ভাবমূর্তিকে উজ্জল করতে অণুপ্রাণিত হয়ে দ্বীনকে সহজ ও কঠোরতা মুক্ত হিসেবে প্রমাণিত করার নিমিত্তে এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে দেখি। তারা সীমাকে অতিক্রম করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা:) এর প্রদর্শিত দৃঢ় পথ থেকে বিচ্যুত হয়, অনেক আহ্কামকে অবহেলা করে এবং এমন মতামত প্রদান করে যার সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্ক নেই। এসব কিছুই তারা করে সময় ও বাস্তবতার সাথে ইসলামের একাত্মতা পোষণ করানোর জন্য যতক্ষন না তারা এই পর্যায়ে চলে যায় যে তারা উম্মাহ্'র কাছে স্বীকৃত ও গৃহীত শারী'আহ্'র স্পষ্ট বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে। গ্রন্থের দুরবর্তী ব্যাখ্যাকেও তারা উল্লেখ করে না। তারা এমন মতামত পোষণ করে যে, মুরতাদকে হত্যা করা হবে না, যদিও এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেন,

**"যে দ্বীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর।"** [বুখারী এবং আহ্মদ]

এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি হলো, যে বাস্তবতা ও পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা:) এরূপ বলেছিলেন, সে বাস্তবতা বা পরিপ্রেক্ষিত এখন বিরাজ করছে না। এরূপ অবস্থানের কারণ হলো তারা ধর্মীয় স্বাধীনতায় ধ্বজাধারী পশ্চিমাদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দ্বীনকে ব্যাখ্যা করে। তারা এমন দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে যে নারীরা ইমামতের (খিলাফত) দায়িত্ব পালন করতে পারবে যদিও এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা: )-এর স্পষ্ট হাদীস রয়েছে, **"নারীকে শাসক হিসেবে নিয়োগ দানকারীরা কখনোই সফল হবে না।"** [বুখারী, আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ]

তারা বলে, এরূপ বলা হয়েছে কেবলমাত্র একটি বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, সার্বজনীনভাবে নয়। পশ্চিমাদের মতই ইসলাম নারীদের সম্মান করে এরূপ ভাবমূর্তি প্রদর্শনের জন্য তারা এটি বলে থাকে। এছাড়াও প্রচন্ড কঠিন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কারণে তারা সুদকে মেনে নেবার ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছে।

এসবই ইসলামের হক্বকে ভূলুণ্ঠিত করেছে এবং দেখানোর চেষ্টা করছে যে ইসলাম মানবজীবনের সবকিছু নিয়ে সমাধান দিতে সক্ষম নয়। তাদের প্রদর্শিত দূর্বলতা ইসলামের নয় বরং তাদের নিজেদের। তাফরীত বা অবহেলার পেছনে যে ইস্যুসমূহ কাজ করে ইফরাত বা বাহুল্যতার পেছনে একই ইস্যুগুলো কাজ করে, অর্থাৎ দ্বীন সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা। একারণে দ্বীনের মধ্যে এ দু'ধরনের লোক, যারা অবহেলা করে এবং বাহুল্যতা প্রদর্শন করে, তারা নিজেদের ধ্বংস করে ফেলছে। উভয়েই তাদের প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রথমটি হলো নিজের প্রবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করা, দ্বিতীয়টি হলো মানুষকে সন্তুষ্ট করার পাঁয়তারা। কোথাও আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার কোন প্রচেষ্টা নেই।

এই দু'টি অবস্থানের ভিত্তিতে বাহুল্যতা ও অবহেলাকে বর্জন করে আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আদেশকে মেনে নিতে বাধ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বক্তব্য থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি, যেখানে তিনি বলেছেন,

**"যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না ? তিনি সুক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।"** [সূরা আল বাক্বারাহ :১৪৩]

অন্য কথায়, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই উম্মাহ্কে মানবজাতির জন্য স্বাক্ষীরূপে নির্ধারণ করেছেন, যেভাবে নবী (সা:) তাঁর উম্মতের জন্য স্বাক্ষীরূপে নির্ধারিত হয়েছেন। এ কারণে এই উম্মাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্মানিত। মানবজাতির মাঝে এর অবস্থান পর্বতের চূড়ার মতই, যেখানে সে সর্বোচ্চ ও কেন্দ্রীয় অবস্থানে রয়েছে। আমরা পশ্চিমাদের মতো করে এই আয়াতকে ব্যাখ্যা করি না, যা আপোষের ভিত্তিতে সমাধানের উপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছে। আগের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে

পারি যে, এটা হারাম। আক্বীদা আপোষের ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে না। কেননা এটা নিজেই কুফর। একটি হলো ঈমান এবং অন্যটি কুফর, একটি আলো ও অন্যটি অন্ধকার, একটি সঠিক নির্দেশনা এবং অন্যটি ভুল। শরী'আহগত আইনের ক্ষেত্রে আমরা পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত করেছি যে আল্লাহ্ ব্যতিত আর কোন আইন প্রণেতা, বিচারক নেই। আর কেউ নেই যে তার রায়কে উল্টাতে পারে। কারণ তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক।

উদারপন্থা ও চরমপন্থার ব্যাপারে এটাই হলো পশ্চিমাদের উপলব্ধি। আর বর্ণিত বিষয়গুলো হলো ইসলামের উপলব্ধি। পশ্চিমাদের এ ধরনের অবস্থান নেয়ার পেছনে কারণ হলো তারা সত্যিকারের ইসলামকে তাদের অস্তিত্ব ও ঔপনিবেশবাদের জন্য ধ্বংসাত্মক মনে করে। সুতরাং এভাবে কী আমরা মুসলিমদের কাঁধের উপর দিয়ে পশ্চিমাদের হাতে সব ক্ষমতা তুলে দেব? পশ্চিমাদের সাহায্য করার অর্থ হলো যারা ইসলামের জন্য কাজ করে তাদের বিরুদ্ধে কাজ করা। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

**"সুতরাং আপনি এর প্রতিই দাওয়াহ্ দিন এবং হুকুম অনুযায়ী অবিচল থাকুন; আপনি তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করবেন না।"** [সূরা আশ শূরা: **১৫**]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

**"অতএব, তুমি এবং তোমার সাথে যারা তওবা করেছে সবাই সোজা পথে চলে যাও, যেমন তোমায় হুকুম দেয়া হয়েছে এবং সীমালঙ্ঘন করবে না, তোমরা যা কিছু করছো, নিশ্চয় তিনি তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। নতুবা তোমাদেরকেও আগুন পাকড়াও করবে। আর আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নাই। অতএব কোথাও সাহায্য পাবে না।"** [সূরা হুদ: **১১২-১১৩**]

আমাদের হৃদয় এ দ্বীনের কল্যাণ চায় এবং এর বিজয় কামনা করে। দ্বীনের জন্য যাতে আমাদের হৃদয় ও মন খুলে যায় আল্লাহ্'র কাছে সে তাওফীক আমরা চাই। আমরা নিজেদের জন্য যে কল্যাণ চাই তা অন্যদের জন্যও কামনা করি। আমরা আল্লাহ্'র কাছে প্রার্থনা করি যাতে আমাদের উপদেশসমূহ বারিধারার মত সবার হৃদয় ও মনকে পূণর্জাগরিত করে এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই আমাদের সঠিক পথের দিশা দেখাতে পারেন।